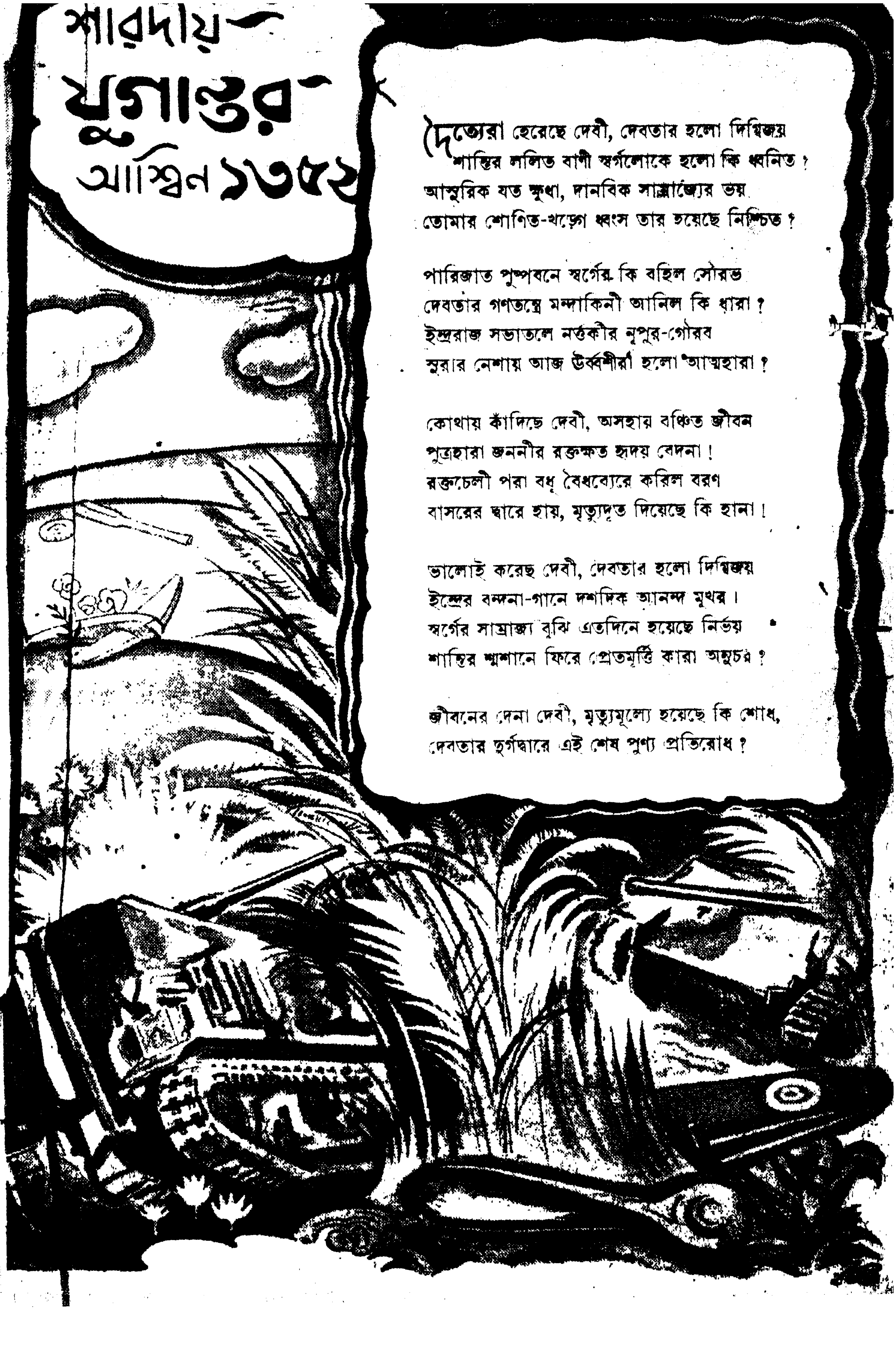


দৈত্যেরা হেরেছে দেবী, দেবতার হলো দিগ্বিজয়
শান্তির ললিত বাণী স্বর্গলোকে হলো কি ধ্বনিত ?
আসুরিক যত ক্ষুধা, দানবিক সাম্রাজ্যের ভয়
তোমার শোণিত-খড়্গে ধ্বংস তার হয়েছে নিশ্চিত ?

পারিজাত পুষ্পবনে স্বর্গের কি বহিল সৌরভ
দেবতার গণতন্ত্রে মন্দাকিনী আনিল কি ধারা ?
ইন্দ্ররাজ সভাতলে নর্ত্তকীর নূপুর-গৌরব
সুরার নেশায় আজ উর্ব্বশীরা হলো আত্মহারা ?

কোথায় কাঁদিছে দেবী, অসহায় বঞ্চিত জীবন
পুত্রহারা জননীর রক্তক্ষত হৃদয় বেদনা !
রক্তচেলী পরা বধূ বৈধব্যেরে করিল বরণ
বাসরের দ্বারে হায়, মৃত্যুদূত দিয়েছে কি হানা !

ভালোই করেছ দেবী, দেবতার হলো দিগ্বিজয়
ইন্দ্রের বন্দনা-গানে দশদিক আনন্দ মুখর।
স্বর্গের সাম্রাজ্য বুঝি এতদিনে হয়েছে নির্ভয়
শান্তির শ্মশানে ফিরে প্রেতমূর্ত্তি কারা অনুচর ?

জীবনের দেনা দেবী, মৃত্যুমূল্যে হয়েছে কি শোধ,
দেবতার দুর্গদ্বারে এই শেষ পুণ্য প্রতিরোধ ?



বাঙালীর শক্তিপূজা

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

বাংলার মহাশ্মশানে মা আসছেন। মায়ের মূল আদ্যাশক্তি জগন্মাতা পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্যময়ী এই সিংহবাহিনী দশভুজা রূপ মানব সভ্যতার ষোল কলায় পূর্ণ বিকাশের মূর্ত প্রকাশ। এমন সর্বাঙ্গ সুবিকশিত পূর্ণ জীবনের প্রতিচ্ছবি বঙ্গদেশ ছাড়া আর কোথাও নাই। এই অপরাজেয় মহাশক্তি হচ্ছে, সিংহবাহিনী—পশুর রাজা কেশরী এই দেবী শক্তির বাহন, মহিষরূপী অসুরও এ মায়ের পদানত; তার রূপের মূলে এই যে, অখণ্ড শক্তির মহা-জাগরণে শুধু দেব ও নরলোক নয়, পশু ও অসুরলোকও পূর্ণ সামর্থ্যে জেগেছে এবং এই দেবী বাহনের সঙ্গে এক মহাসামঞ্জস্যে ও সুসংহিত ঐক্যে বিধৃত হয়ে বিরাজ করছে। মহামায়ার বামে বীণাপাণি ও কার্তিকেয়—নিখিল বিদ্যা ও সামরিক বল, মায়ের দক্ষিণে ধনাধিষ্ঠাত্রী কমলা ও সর্বসিদ্ধিদাতা গণেশ; ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সকল দেবতা এই মহা জাগরণের পট-ভূমিকায় বিরাজিত। বাঙ্গালী এই অধো-ঊর্দ্ধ সপ্তলোকের পূর্ণাঙ্গ সুসমঞ্জস ঐক্যবদ্ধ জাগরিত্রী মহাশক্তির পূজক, এমন মায়ের দশভুজা রূপের পূজক বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আর কোথায় আছে? আর কার ধ্যানে এমন অখণ্ড নিখিল শক্তিরূপা মহামহিমময়ী জগন্মাতার ধ্যান মূর্তি জেগেছে?

আজকের পতিত বাংলায় অন্ধ ধুম-ধামে আনুষ্ঠানিক বাঙ্গালী কিন্তু এ মাকে চেনে না, তাই মাটির মূর্তি গড়ে ঢাকের বাজিয়ে নিরীহ পশুকে শঙ্করী মায়ের পায়ে বলী দিয়ে তামস অজ্ঞানে এই দৈবী মহা-শক্তির পূজা করে। শ্রীঅরবিন্দের ধ্যান-কল্পিতা মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী, মহাকালী ও মাহেশ্বরীর একাধারে একীভূতা এমন পূর্ণ প্রতীক এমন অনুপম বিগ্রহ আর কোথায় পাবে বল দেখি? তন্ত্রের মহাপীঠ বাংলার বীর সাধকই কেবল অন্তঃমন্ত্রে এক দিন এই কারণরূপা সর্বশক্তিবীজময়ী বিশ্ব মাতৃকার পূর্ণ বোধনের জন্য সাধনমগ্ন হয়েছিল। এই প্রতিজ্ঞায় বরপুত্র বাঙ্গালী জাতির ললাটে জগদ্গুরুর রক্তটিকা এঁকে দেবার সে দুর্জ্জয় সাধনা আজও চলেছে, বর্ত্তমান যুগের মহাঋত্বিক শ্রীঅরবিন্দ তার শেষ আধুনিক ঋষি। সে সাধনা সার্থক ও সফল করতে হলে জাতিকে এই মাতৃরূপের অন্তর্নিহিত সত্তা বুঝতে হবে, গভীর সমাহিত ধ্যানে প্রত্যক্ষ করতে হবে জীবনের সমগ্র শক্তির এই প্রকট সকল কলায় পূর্ণ বিশুদ্ধ দৈবী ভাগবতী রূপ।

সাধনাহীন বাঙালী শত শত বৎসর ধরে বহির্মুখী তামস পূজার ব্যর্থ পুনরাবৃত্তি করে চলেছে, তাই তার জাতীয় জীবনও ব্যর্থতায় পঙ্গু। শক্তিহীনের শক্তিপূজা, আত্মবিস্মৃত মাতৃহীন জাতির মাতৃপূজা—এ এক অর্থহীন প্রহসন। যার মা জগতের মূলীভূতা পরাশক্তি সর্ব্বার্থসাধিকা চতুর্ব্বর্গদায়িনী, তার এই হৃতসর্ব্বস্ব কাঙাল পরপদলেহী রূপ, এও কি কখনও সম্ভব? যে শক্তিপূজায় শক্তিলাভ হয় না সে পূজায় নিশ্চয়ই বিষম ত্রুটি আছে, এই শক্তিপূজক জাতির শক্তি কোথায়? কোথায় তার দেশ, রাজপাট, কোথায় তার জীবন্ত সমাজ, সকল বন্ধন মোচনকারী ধর্ম্ম, বিপুল সৃষ্টিমুখর কর্ম্ম, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল আলোড়নকারী সাধনা? তবে শক্তিপূজার নামে এ মৃতকল্প কুসংস্কারান্ধ আনুষ্ঠানিক জাতির কেন এ ঘট স্থাপন, মন্ত্রোচ্চারণ, ষোড়শোপচারে পূজা?

ভারতে মানবের মুক্তি ও লোক-কল্যাণের নামে লক্ষ কোটি নরমুণ্ডের উপর পলিটিক্যাল স্বরাজ গড়ে লাভ নাই। আধুনিক রাবণ-রাজার সে স্বর্ণকিরীটিনী লঙ্কার চোখ ধাঁধানো শোভা যেন ভারত সন্তানকে বঙ্গজননীর বরপুত্রদের মুগ্ধ ও লুব্ধ না করে। মুক্তির নামে নব নব শৃঙ্খল রচনা অনেক হয়েছে, দেশ-গৌরবের নামে পররাষ্ট্র গ্রাস ইতি-হাসের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা মসীলিপ্ত করে রেখেছে, বাণিজ্যের নামে লুণ্ঠন আধুনিক সভ্যতার কৃষ্টি ও উন্নতির মানদণ্ড হয়ে আছে। ভারত ও বঙ্গদেশ এ তস্করী দেশ-প্রীতির এ রক্তক্লিন্ন সভ্যতার দৃষ্টান্তে স্বাধীন হয়ে বসুধার পাপের ভার যেন আর না বাড়ায়। তার চেয়ে পরাধীনতা বরণীয়, মৃত্যু বরণীয়, বঙ্গোপসাগরের জলে গোটা ভারতের আত্মনিমজ্জন বরণীয়। পরাধীনের অঙ্কুশাঘাত আমাদের মানুষ করবে, দেশ আত্মনাশা মুক্তি কিন্তু আমাদের পশুর পদবীতে নামিয়ে দেবে।

আজ মায়ের পুণ্য বোধনে দিকে দিকে প্রতিজ্ঞা তোমরা কর। মানুষ চায়, বর-রূপিণী মায়ের দিব্য সন্তান চায় যে, জগৎকে দেখাও কাকে বলে প্রকৃত সর্বাঙ্গীন মুক্তি, কাকে বলে দেবদুর্লভ কৃষ্টি ও সভ্যতা, কাকে বলে জ্ঞানোজ্জ্বল আত্মজয়ী ভক্ত সমাজ, কাকে বলে খাঁটি বিশ্বাসের প্রজা। শুধু এই বিশ্বমাতা পরাশক্তির সন্তান ইহাই আমাদের হোক পরিচয়; সে অখণ্ড নিষ্কাম সাধনাগ্নিতে আমাদের জাতি-গোত্রের সকল তুচ্ছ ব্যবধান যাক লয় হয়ে; জাতি হোক এক, রাষ্ট্র হোক একচ্ছত্র, ধর্ম্ম হোক জীবনদায়ী, মুক্তিদায়ী শাশ্বতী।



আমাদের পলিটিক্স

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

১৪২

আমাদের দেশের পলিটিক্স নিয়ে আমি যে মধ্যে মধ্যে রসিকতা করি, সে কথা সবুজপত্রের পাঠক মাত্রেই জানেন। এর জন্য দেশের লোক আমার প্রতি যে অসন্তুষ্ট হন তার প্রমাণ বড় একটা পাইনে, তবে পলিটিসিয়ানরা যে ক্ষাপা হন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এতে অবশ্য আমি তাদৃশ দুঃখিত হইনে, কেন না পৃথিবীতে একসঙ্গে সকলের মন যুগিয়ে চলা অসম্ভব। বিশেষতঃ যখন পলিটিসিয়ানদের অসন্তোষের কারণটা আমি ঠিক বুঝতে পারিনে। পলিটিক্সের ভিতর হাস্যরস আনাটা যদি দোষের হয়—তাহলে এ দোষে আমি একা দোষী নই। দেশের লোককে পলিটিসিয়ানরাও হাসান, আমিও হাসাই, আমাদের পরস্পরের প্রভেদটা শুধু উপায় নিয়ে। পলিটিসিয়ানরা লোক হাসান বক্তৃতা করে এবং আমি লিখে,—অবশ্য এছাড়া আর একটা মস্ত প্রভেদ আছে, তাঁদের পাপ অনিচ্ছাকৃত আমার ইচ্ছাকৃত। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। খবরের কাগজে পড়লুম যে, গত কংগ্রেস Peace conferenceএ ডেলিগেট পাঠিয়েছেন। নেতাদের রাজনৈতিক বিষয়বুদ্ধির এহেন পরিচয় পেয়ে আমাদের পক্ষে কান্না ছাড়া আর কি উপায় আছে! অথচ এক্ষেত্রে কাঁদা অনুচিত, কেননা শুভকর্ম্মে চোখের জল ফেলতে নেই, কাজেই আমাদের হাসতে হয়। এর উত্তরে নেতারা অবশ্য বলবেন যে, বিষয়বুদ্ধির কোনরূপ পরিচয় দেওয়াটা তাঁদের মোটেই অভিপ্রায় ছিল না, তাঁরা শুধু তাঁদের ভাব প্রকাশ করাটা যে অনুচিত কিম্বা অনাবশ্যক একথা আর যিনিই বলুন আমি কখনও বলব না, কেন না আমার মতে সাহিত্যের ক্ষেত্রে মানুষের ভাব প্রকাশ করবার অধিকার আছে, যদিচ এ মতের বিরুদ্ধে পলিটিক্সের যে সকল নেতারা সাহিত্যেরও গুরুগিরি করেন তাঁরা মহা খড়্গহস্ত। কবি যে এবস্তু স্বতান্ত্রিক নন, একথা আমি পূর্ব্বে নির্ভয়ে ও লোক সভয়ে বলেছি। সুতরাং যাঁরা পলিটিক্সের ক্ষেত্রে বস্তুজ্ঞানের উপেক্ষা করেন, তাঁদের আমি পলিটিক্সের কবি হিসেবেই ধরে নেই। আমাদের নেতারা যে পলিটিক্সের কবি, তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁদের কবির লড়াই থেকে। পলিটিসিয়ানরা যে আমার উপর নারাজ, তার কারণ আমি ক্রিটিক। কবির সঙ্গে ক্রিটিকের সম্বন্ধটা যে কি তা ত সকলেই জানে।

কবির কাছে আমরা বস্তুতন্ত্রতা চাইনে, অর্থাৎ তাঁর ভাব যে বাহ্য অবস্থার অধীন কিম্বা অনুযায়ী হবে, এ দাবী আমরা মোটেই করি নে। তবে এ আশা অবশ্য করি যে, তাঁর কথার একটা মানে থাকবে এবং তাঁর ভাবের একটা চেহারা থাকবে। অর্থাৎ সে ভাবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির পরস্পরের সঙ্গে শুধু যোগাযোগ নয়, ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকবে এবং সে সম্বন্ধ ইংরাজিতে যাকে বলে Organic তাই হবে। যদি কেউ আমাকে বলেন যে, "আমি তোমাকে চিরদিন বাঁচিয়ে রাখব কিন্তু তার জন্য এমন সব উপায় অবলম্বন করব যার জন্য ফলে তুমি চিরদিন মরে থাকবে।" তাহলে তাঁর সহৃদয়তার শ্রদ্ধা করতে আমরা অবশ্য বাধ্য কিন্তু তাঁর কথাকে শ্রদ্ধা করতে আমরা মোটেই বাধ্য নই—কেন না ও কথা কি আয়ুর্ব্বেদ কি কাব্য ... বুকের কোনটারই অন্ত... ও হেন কথা—যার কোঠায় পড়ে... হচ্ছে "হ-য-ব-র-ল।" আমাদের ... যদি "হ-য-ব-র-ল" বলবার অধিক... ত আমরা কোন্ ন্যায় অনুসারে তাঁ... অগ্রাহ্য করবার অধিকারে বঞ্চি... ভুলে গেলে চলবে না যে, আজ... আমাদের রাজনীতির একমাত্র ... কথা; এক কথায় আমাদের রাজনী... এখন সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত, এবং ... সাহিত্য বই আর কিছুই নয়। ... বক্তাই হই আর লেখকই হই, ... আর ক্রিটিকই হই, আমাদের ... ব্যবসা এক, অর্থাৎ একমাত্র কথ... আমাদের কারবার। বলা বাহুল্য ... যে বস্তু নিয়ে কারবার তার সঙ্গে ... সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় থাকাটা ... আমাদের রাজনীতির কারবার হচ্ছে ... কথা নিয়ে। সম্ভবতঃ সেই কারণে ... দেশী নেতাদের মুখে অনেক কথা... অর্থ থাকে না, আর যে কথার ... তা তাঁদের অপর কথার সঙ্গে খাপ ... যদি Liberty এবং Equality ... আমাদের হবু প্রভুরা কিছুমাত্র ... করতেন, তাহলে তাঁরা বসে ... আমেরিকা ও ফ্রান্সের নকল করে ... of Manএর বুক ফুলিয়ে de... করে, তার পরের দিনই লীগ... দরবারে পার্টেল বিলের বিরুদ্ধে ... না-হুঁ-না-হুঁ করতেন না। পলিটি... স্বাধীনতার কথা শুনে যাঁদের ... ওঠে—সামাজিক ক্ষেত্রে স্বাধীন... শুনলে যে তাঁদের মুখ শুকিয়ে ... প্রমাণ যে তাঁদের ধারণা যে, ... সমাজতন্ত্র সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং ... এরূপ ধারণা যাঁদের আছে, তাঁ... পলিটিক্সের বিলিতি বুলি শোভ...

(অপ্রকাশিত পুর...

চোখের জল

শ্রীযতীন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত

ও চোখে নামাবে না চোখের জল আর।
কাঁদিয়া অপমান কোরো না বেদনার।

নাই সে নীলনভে বোলেখী কালো মেঘ,
নাই ত হুরু হুরু আষাঢ়-উদ্বেগ ;
কোথা সে শাওনীয়া বাতাস পুরবীয়াঁ,
কোথা বা বিজলীর ঝলক চঞ্চলার ?
ও চোখে আনিও না চোখের জল আর।

যে যূথি ঝরি পড়ি জায়াল পরিমল
তারে কি সাজে আর শিশির ঢল-ঢল্ ?
নিদাঘ-নিপীড়নে যে বুক সমতল
সেথা কি ছলছলে কমল কহ্লার ?
ও বুকে ফেলিও না চোখের জল আর।

ও-মুখে হাসি তাও হবে যে উপ...
ঘুঙুরা পায়ে কি গো ফিরাতে ম...
নাই সে ধুপছায়া নাই স মেঘমা...
নাই সে গৌরব হাসি কি কান্...
উষর ও-কপোলে বিফল জলধা...

এখন বস' আসি আসনে উদাসী...
ঘুরায়ে চল জপে দিনের পর দি...
শুনো না কান্না হাসে কাঁদে ও...
এখন কর শুধু জপের মালা সা...
সমুখে বহি যাক্ গঙ্গা খরধার।

ফেলো না ফেলো না গো বিফ...
কোরো না অপমান গোপন বে...



ডাক্তারের ডাক পড়ল।

হকুমালি তালুকদারের বড় ছেলে আক্কেলালির জ্বর। একজনের গায়ে দুই জনের জ্বর। এত প্রবল:

বললে, 'ডাক ডাক্তারকে।'

ফকিরফোকরা'র তোয়াক্কা রাখেনা হকুমালি। সে লেখাপড়া জানে না বটে, কিন্তু তার বিস্তর অবস্থা। তার জমিজায়গা অঢেল, গরু-মোষ অনেকগুলি। যারা গরিব, গ্রাম্য লোক, ক্ষুদ্র প্রজা, তারাই ফকিরফোকরার খবর করে। ডাক্তার না ডাকলে হকুমালির মান থাকে না।

অবস্থার গুণে হকুমালির এটুকু বুদ্ধি হয়েছে যে তুকতাকে ব্যামো সারে না। ব্যামো সারে ওষুধে। আর, কোন্ ব্যামোর কি ওষুধ লাগে, বলতে পারে ডাক্তার। তা ছাড়া, শহরে দেখে এসেছে হকুমালি, যারা বড়লোক তারা দরগায় গিয়ে সিন্নি মানে না, ডাক্তার ডাকে।

হকুমালি ডাক্তার ডাকল।

তিনখানা গাঁয়ে একজন ডাক্তার। ডাক্তার আমাদের শুকলাল বারিক। আগে শহরে কম্পাউণ্ডারি করত। ফেল-করা কম্পাউণ্ডার। হাতে-হেতেরে কাজ শিখে নিয়ে এখন বুক ঠুকে এই বন-বাদাড়ে বসে ব্যবসা করছে। নাপিতের কাছ থেকে ফাড়ন-চিরন শিখেছে এমন দুয়েকজন নকুনে কবরেজ আছে, কিন্তু ডাক্তার বলতে একা শুকলাল। আস্ত এক টাকা ফি।

'ফাড়তে পারে বটে, কিন্তু ফুঁড়তে পারে না।' কবরেজদের গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেনা শুকলাল।

আর, শুকলাল ছাড়া কে সার্টিফিকেট দেবে শুনি? কবরেজরা তো সব টিপ-পণ্ডিত, লিখতেই পারে না, সার্টিফিকেট দেবে কি! সাক্ষীদের কেউ গেছে ভুঁই রুইতে, কেউ গেছে হাটে সওদা নিয়ে, মোকদ্দমার মুলতুবি চাই। নিমুনিয়া, কলেরা, ব্রঙ্কাইটিশ, ডায়রিয়া —ঠিক-ঠিক বানান করে সার্টিফিকেট লেখে শুকলাল। নামের আগে জাঁকালো করে ডাক্তার লেখে। সব মুসাবিদা তার মুখস্থ। এমনভাবে বিতং দিয়ে লেখে যে, কেউ খুঁত ধরতে পারে না। যদি কখনো অগ্রাহ্যও হয়, তবে ফের মোকদ্দমার শুনানির সময় মোকাবিলা সাক্ষী হয়ে আরেক দফায় রোজগার করে।

তা ছাড়া এ-সব গো-বদ্যিদের কি তার মত ডিসপেন্সারি আছে?

'আপনাকে ডেকেছে বড় মিয়া।' হকুমালির হালিয়া-চাকর এসে খবর দিল: 'এখুনি যেতে হবে।'

গ্রেপ্তারী পরোয়ানার চেয়েও তেজী। শুকলাল মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

সাধ্য নেই এ পরোয়ানা সে গরকবুল করে। তিন-তিনটে গাঁ বড় মিয়ার কবজার মধ্যে। শুকলালের যা কিছু ব্যবসা-পসার তা শুধু সে এই বড় মিয়ার তাঁবে আছে বলে। বড় মিয়ার কথায় অবাধ্য হওয়া যায় না।

অথচ বাধ্য হতে গেলে দুর্দশার একশেষ। প্রথমত তিনটে মাঠের কাদা ভাঙতে হবে পর-পর। তারপর যদ্দিন না আক্কেলালি ভাল হয় আটক থাকতে হবে সে-বাড়ি। নিজের হাতে রেঁধে খেতে হবে। খিনিমাগে এক পয়সাও মজুরি পাবে না। কি চাইবারো তার এক্তিয়ার নেই। বড় মিয়ার খুসিতেই সে বেঁচে আছে। তার খুসিতেই সে রুগী পায়, তার বাড়ি-ঘরে আগুন লাগে না।

কোটের উপর চাদর ঝুলিয়ে এবারে জুতো হাতে নিয়ে চলল শুকলাল। আরেক হাতে ওষুধের বাক্স। পিছনে হালিয়া

মাথায় শুকলালের বিছানা। তার কাঁধের র‍্যাকেটে ছাতা ঝুলছে শুকলালের।

'কেমন দেখলে?' হুকুমালি কলকিতে টান মারতে মারতে জিগ্গেস করলে।

ঢোক গিলে মাথা চুলকে গলা খাঁখরে শুকলাল বললে, 'একটু জটিল বলেই মনে হচ্ছে। তা দু'দিনেই সেরে যাবে।'

অনেক ভেবে চিন্তেই বলেছে শুকলাল। সামান্য অসুখ বললে হুকুমালির মর্যাদার প্রতি অবমাননা দেখানো হয়, আর দু'দিনে না সারলেও নিজের মান থাকে না।

'ঠিক দু'দিন। মনে থাকে যেন।'

শুকলাল চোখে সর্ষেফুল দেখল। ভাবল, আগুন লাগে বুঝি তার ডিসপেন্সারিতে।

দু'দিনে গা ঠাণ্ডা হল না। বিছানার উপর আকেলালি এ-পাশ ও-পাশ করতে লাগল।

'কি, কিসের ডাক্তারি শিখেছ তুমি?' হুকুমালি গাল দিয়ে উঠল, 'এক কুইনিন ছাড়া পাপের জন্যে আর কোনো ওষুধ জান না?'

নিচু হয়ে বললে শুকলাল, 'সাতদিন না গেলে জ্বরের চরিত্র ঠিক বোঝা যায় না।'

'রাখ তোমার ও সব হামবড়াই। আর দু'দিনে যদি না সারাতে পার, শহর থেকে বোস ডাক্তারকে ডেকে আনতে হবে।'

হুকুমালি সালিশী করতে গিয়েছিল পাশ-গ্রামে, দু'দিন পরে ফিরে এসে দেখল আকেলালির অবস্থা বড় সঙিন। চোখ-মুখ বসে গিয়েছে, হুঁস-বোধ নেই, শরীরের গিঁট-গাঁট সব ঢিলে হয়ে পড়েছে।

'যাও, বোস ডাক্তারকে নিয়ে এস। যাও খোল শিগ্গির।' ফরমান জারি করল হুকুমালি।

'আমি যাই, নিয়ে আসি গে।' কাঁচুমাচু মুখে বললে শুকলাল।

'না। তুমি যাবে কি করে? তুমি গেলে রুগীর তাকুত রাখবে কে?'

একেবারে শহরে যেতে না পারলেও লাটির ঘাটে, বোস ডাক্তারের সঙ্গে আগ বাড়িয়ে দেখা করলে শুকলাল। বললে, 'ভুলচুক যদি হয়ে থাকে চিকিচ্ছায়, সবাইর সামনে কিন্তু ফাঁস করে দেবেন না। আর, ভুলচুক একটু না করলেই বা আপনাদের ডাকবে কেন? এক ডাক্তার ভুল করে বলেই তো আরেক ডাক্তারের ডাক পড়ে।'

বোস-ডাক্তার দেখলে তন্ন তন্ন করে।

বললে, 'চিকিৎসে ঠিকই হচ্ছে, তবে আরো তেজী ওষুধ দেয়া উচিত দেয়া উচিত ইনজেকশন।'

'এতক্ষণ দাওনি কেনে?' হুকুমালি তেড়ে এল শুকলালের উপর।

'পাবে এ ওষুধ কোথায়? আমার ডিসপেন্সারি তো কাঁকিল।'

'যাও, তবে নিয়ে এস গে শহর থেকে।'

বিলিতি ওষুধ নেই, পাওয়া যাবে দিশি মার্কা। যাই পাওয়া যাক, যত টাকাই হোক, দেখে শুনে নিয়ে আসুক গে শুকলাল।

বোস-ডাক্তারকে কি দিল পঞ্চাশ টাকা। শুকলাল চোখ টিপল। বোস-ডাক্তার বললে, 'দুই জোয়ারের রাস্তা, এখানে কি আমার একশো টাকা।'

'তা গোসা করবার কি হয়েছে? পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনাকে বাকি পঞ্চাশ।'

হুকুমালি তলব করল পড়শীদের। পাশাদুলা, মানেরুদ্দি, সোনামদ্দি পচুরালি, সরিক মোল্লা, কলম সরদার, এমনি প্রায় কুড়ি বাইশ জন।

'শহর থেকে বড় ডাক্তার এসেছে, যার যা অসুখ, এইবেলা দেখিয়ে শুনিয়ে ব্যবস্থা করে নে সব। বার কর নজরানা।'

এ তো মহা মুস্কিল। তাজ্জব... সবাইরই জ্বর-জারি হচ্ছে, কারু ... কারু বুকে সর্দি বসা। এক ... কাজ করে কে থাকতে পারে ... তা, সবাইই তো, শুকলালের দো... কুইনিন কিনে খেয়েছে, শুকলা... দিয়েছে এক প্রস্ত। আবার, ... কেন? তেমন খাওয়া পরা নেই, ... দেশ, অসুখ সবাইরই গায়ে এক... লেগে আছে। রূপ করে অক... পেটের ব্যথায় টোকা-খাওয়া ... হলে কে আবার ডাক্তার ডাকে?

না, এ সুযোগ ছাড়া হবে না। ... বাড়ির দরজায় বয়ে আসবে এমন ... শহুরে ডাক্তার? হুকুমালির ক... করার সাধ্য নেই।

এর চোখ টেনে ওর জিভ ... এর পেট টিপে ওর বুক ঠুকে ... নানারকম ব্যবস্থা বাৎলে দিয়ে ... দুটাকা কারু চার টাকা করে ... বাকি পঞ্চাশ টাকা উশুল হয়ে ... দেখতে।

এ পঞ্চাশের থেকে পঁচিশ টা... নিলে। তার কমিশন। সব ... বিয়াম্ ব্যবসা, ওকালতি আর ... সেখানেও মামলা জুটিয়ে দিলে ... পাওয়া যায়। ডাক্তারদের বেলায় ... উল্টোটা চলবে কেন? ... জেরে মনসা দুলুকেকেও ডাক দে...

দুই ডাক্তার নৌকোয় উঠ... যাচ্ছে ফিরে আর শুকলাল ... আনতে!

'কত আনলে ওষুধের জন্যে?'

'তিরিশ টাকা।'

'টাকা সাতেক লাগবে হয়ত...

[ইহার পর ১৮ পৃষ্ঠায়



বিদ্রোহী

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

শৃঙ্খলে বাঁধি' বিচারশালায় আনিল নগরপাল
দম্পতী— যুবক-যুবতী, লজ্জা-আনত ভাল।
গুরুতর অভিযোগ—
শাস্তি যাহার নির্ব্বাসন বা সুদীর্ঘ কারাভোগ।

সহসা [illegible] যুবরাজ আসি' হইল অভ্যুদয়;
চকিত কণ্ঠে সভাজন সবে গাহি উঠে জয়-জয়
অভ্যর্থনা শেষে
যত মান্যজন লভিল আসন পুনঃ রাজনির্দ্দেশে

শ্রেষ্ঠীতনয়, কহে বিচারক,— মিথ্যা কথার বলে
ব্রাহ্মণসুতা এই যুবতীরে ভুলায়েছ তুমি ছলে।
রহি' সমাজের বুকে
কলঙ্ককালি ঢালি' দিলে তুমি সেই
সমাজের মুখে।

ধর্ম্ম শপথ করি' কহ এই ধর্ম্মায়তন কাছে
সরল সত্য স্বপক্ষে তব বলিবার যাহা আছে;
তোমাদের পরিণয়
শুধু নয় ইহা নীতিবিরুদ্ধ, অপরাধ অতিশয়

নত মস্তকে এস্ত যুবক উত্তরে তার কহে,
গান্ধর্ব্ব এ বিবাহ মোদের অশাস্ত্রীয় তো নহে,
দেখায়ে যুক্তিবাদ
বিবিধ বিচারে করিল প্রমাণ —নহে ইহা
অপরাধ

কহে অমাত্য,—এই কলিযুগে কে আজ
লইবে মানি
অসঙ্গত এ উক্তি তোমার— ভ্রান্ত প্রলাপবাণী?
তোমার যুক্তি তাই
বিচারবিধির ঘোর অমান্য, প্রতীকার
তার চাই।



নিরুপায় মানি' বেদনাদীন ক্রন্দনে উচ্ছ্বাসি'
কহিল যুবক, নিজ প্রাণ চেয়ে উহারে যে
ভালবাসি।
সভার যত জনা
হাসিয়া উঠিল। যুবরাজ শুধু চাহি' রহে উন্মনা।

অতি মৃদু হাসি' বিচারকবর ভাবে বুঝি
মনে মনে,—
ভালবাসা নাকি যুক্তি একটা, বিবাহের
বন্ধনে।
পবিত্র পরিণয়—
শাস্ত্র, আচার, জাতিকুল ছাড়া কভু কি
সিদ্ধ হয়?

কহে অমাত্য নয়ন ফিরায়ে এবারে যুবতী
পানে,
শ্রেষ্ঠীর কথা প্রতারণা বলি' তখন সে কি
তা জানে?
স্পষ্ট কণ্ঠে—'না
কহিল যুবতী;—স্বরে তিলার্দ্ধ সঙ্কোচ
ছিল না।

ফিরে' পুনরায় শুধায় তাহারে,— নিরুপায়
নির্ধন,—
কি করিয়া ভার লইবে তোমার, বলেছিল
কি তখন?
সেই উত্তর—না,—
তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বিন্দুমাত্র ছিলনাক ছলনা।

কহে বিচারক,—ধর্ম্মবিচারে অসিদ্ধ পরিণয়।
নূতন বিবাহে নাহি কোন বাধা, যদি
তব মন হয়;
তাই সে পিতার স্থানে
ফিরে' যাও তুমি অনূঢ়া কন্যা, পূর্ব্বের সম্মানে.

—অপরাধী এই যুবকেরে আমি দিলাম
নির্ব্বাসন,
নগরপালেরে হাঁকিয়া কহিল,— আমার
অনুশাসন—
আজই দাও দূর করে',
ফিরে' আসে যদি, আনিবে রাজ্যে পাঁচ
বৎসর পরে।

সহসা উঠিল মহা গোলযোগ ধর্ম্মের দরবারে,
স্বামীর বসন ধরেছে যুবতী, ছাড়িবা দিবেনা
তারে।
শুনিয়া আর্ত্তধ্বনি,
লয়ে এল হেথা, হাঁকে অমাত্য বিচার-
বিধি গণি',

বাঁধিয়া দুজনে ফিরায়ে আনিল সম্মুখে
যবে তার,
ক্রন্দনে কাটি' কহিল যুবতী, শোন ধর্ম্মাবতার।
দয়া করি' স্বামীসনে
অপরাধভাগী—আমারেও তুমি পাঠাও
নির্ব্বাসনে।

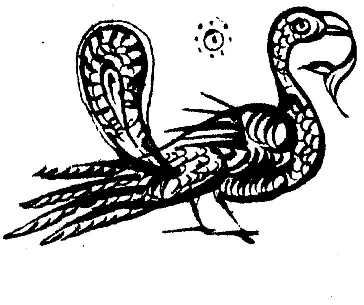
—শোন মহারাজ, শোন বিচারক, দুজনাই
মোরা দোষী,
গৃহহীন করি ওরে, আমি গৃহে কেমনে
রহিব বসি'?
মোদের এ ভালবাসা,
বিবাহ হোক, না হোক, নাহি রাখে
অন্য সুখের আশা।

—আমি ছাড়া আর কে বুঝিবে—ও যে কত
ভালবাসে মোরে?
আমারে না দেখে একদিন প্রাণ ধরিবে
কেমন করে?
আমাদের সুখ দুখ
একসাথে গাঁথা;—দোহাই ধর্ম্ম হয়োনা
পরাঙ্মুখ।

ভাবের আবেগে সহসা ভূতলে ঢলিয়া
পড়িল নারী।
আসন ছাড়িয়া উঠে যুবরাজ অমনি সে
তাড়াতাড়ি।
পরদিন প্রাতে আর
কেহ নাহি রাখে, কেহ নাহি জানে কোনো
সন্ধান তার।

রাজ্য জুড়িয়া হাহাকার উঠে—কোথা
গেল যুবরাজ?
প্রেমধর্ম্মের অবিচার দেখি, হয় ত কোথা
সে আজ—
ফিরে অজ্ঞাতবাসী
রাজধর্ম্মের নববিদ্রোহী সহজিয়া সন্ন্যাসী।

———





অভিজ্ঞতা

তখন সরকারি চাকরী করি। একটি বড় শহরে সদর হাসপাতালের ভার লইয়া আছি। একদিন পাশাপাশি দুইটি কটেজে দুইটি রোগী ভর্ত্তি হইল। রোগী লইয়াই কারবার, বিব্রত হইবার কথা নয় কিন্তু এ দুজনকে লইয়া বেশ একটু বিব্রত হইলাম। বিব্রত হইবার প্রধান কারণ রোগীরা নয়, রোগীর পিতারা। একজন ডাক্তার, আমার খুঁত ধরিবার জন্য সর্ব্বদা উদ্যত-মনোযোগ। আর একজনের পেশা কি তাহা তখনও জানিতাম না। লোকটি নিতান্ত গোবেচারি ভালমানুষ গোছের। প্রত্যহ সন্ধ্যাহ্নিক গীতা-পাঠ করেন। বয়সে আমার অপেক্ষা অনেক বড়, মাথার চুল সব পাকা, কিন্তু আমি গেলেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়ান এবং যে দুই চারিটি প্রশ্ন করেন সসঙ্কোচে করেন। অতিশয় ভদ্রলোক। ইঁহাকে লইয়া বিব্রত হইবার কারণ ইঁহার অতি-নির্ভরশীলতা। ভদ্রলোক সম্পূর্ণরূপে আমার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া আছেন। আমার সমস্ত নির্দ্দেশ নীরবে বর্ণে বর্ণে পালন করিয়া যাইতেছেন, কোনরূপ ব্যস্ততা নাই। অথচ রোগীটি তাঁহার একমাত্র পুত্র এবং রোগটি টাইফয়েড। দুইটিই টাইফয়েড। ডাক্তারবাবুর পুত্রটির চিকিৎসা ডাক্তারবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়াই করিতেছিলাম, তবু কিন্তু তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেছিলাম না। তিনি অতি-আধুনিক একখানি বিলাতি গ্রন্থ খুলিয়া তদনুসারে চলিতে চাহিতেছিলেন। মফঃস্বলের হাসপাতালে অত সব বন্দোবস্ত ছিল না। তিনি ক্রমাগতই আফশোষ করিতেছিলেন, আহা কলিকাতায় লইয়া গেলেই হইত। কলিকাতায় না গিয়াও কিন্তু কলিকাতার প্রায় সমস্ত সরঞ্জাম তিনি ডাকযোগে, তারযোগে, রেলযোগে, লোকযোগে জোগাড় করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পত্রযোগে কলিকাতার দুই চারিজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের উপদেশও আসিয়া পড়িয়াছিল। করিৎকর্ম্মা ভদ্রলোক মফঃস্বলীয় চিকিৎসার ত্রুটি সংশোধনে বিন্দুমাত্র অবহেলা করেন নাই।

পাশের কটেজে বৃদ্ধ কিন্তু নির্ব্বিকার। কোন অশোভন আড়ম্বর নাই, কোন অহেতুক ব্যগ্রতা নাই। একাই নীরবে নিপুণহস্তে সেবা করিয়া চলিয়াছেন। যাহা বলিতেছি বিনা মন্তব্যে নিখুঁতভাবে তাহাই করিতেছেন।

ডাক্তারবাবুটির অতি-বৈজ্ঞানিকতা এবং বৃদ্ধটির অতি-নির্ভরশীলতা দুইই আমাকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে।

ডাক্তারবাবুটি আমার পূর্ব্বপরিচিত নিকটবর্ত্তী একটি সহরে প্র্যাক্টিস করেন। তাঁহার ছেলেটি এখানে হষ্টেলে থাকিয়া কলেজে পড়ে। হষ্টেলেই জ্বর হইয়াছিল। বাড়াবাড়ি হওয়াতে এবং অন্যত্র লইয়া যাওয়া বিপজ্জনক মনে হওয়াতে আমারই পরামর্শে তাহাকে হাসপাতালে আনা হইয়াছে। ডাক্তারবাবুও সপরিবারে আসিয়া পড়িয়াছেন। আমাকে দিনে অন্ততঃ দশবার গিয়া রোগী দেখিতে হইতেছে। একটু টেম্পারেচার বাড়িলে, একটু বেশীক্ষণ চোখ বুজিয়া থাকিলে, একটু অস্থির হইলে, একটু কাসিলে ডাকের উপর ডাক আসিতেছে। প্রতিবারই যাইতেছি এবং প্রতিবারই তাঁহার আফশোষ শুনিতেছি—আহা, সময়মতো যদি কলকাতা নিয়ে যেতাম। তাঁহার স্ত্রীর আফশোষ আরও বেশী। নীলরতন সরকার নাকি তাঁহার সইয়ের মায়ের বকুল ফুলের কি একটা হন।

বৃদ্ধটি এ অঞ্চলে আগন্তুক। ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। প্রশ্ন করিয়া জানিয়াছিলাম তাঁহার এই পুত্রটির চাকুরি ব্যপদেশে তাহাকে লইয়া তিনি এখানে আসিয়া ধর্ম্মশালায় উঠিয়াছিলেন। ছেলেটি সেখানেই জ্বরে পড়ে। জ্বর বাড়াবাড়ি হওয়াতে তাহাকে লইয়া তিনি হাসপাতালে আসিয়াছেন।

উভয়ক্ষেত্রেই টাইফয়েড তাহার অপ্রতিহত প্রতাপে এবং অনিবার্য্যগতিতে চলিতেছিল।

২

একদিন গভীর রাত্রিতে ডাক আসিল।

"শিগ গির চলুন একবার, শিগ গির।"

ডাক্তারবাবু আলুথালুবেশে নিজেই আসিয়াছেন।

"হেমারেজ সুরু হয়েছে। চলুন শিগ গির—"

[ইহার পর ৩৮ পৃষ্ঠায়]

বনফুল

ওষুধ

[১৫ পৃষ্ঠার পর]

বাকি টাকায় কিছু ওষুধপত্র কিনে নিয়ে যাব ডিসপেন্সারির জন্যে। এদের জ্বর একবার নামলেও আবার জ্বর হয়। ঘুরে ঘুরে জ্বর হয়। ওটা বন্ধ করার জন্য কিছু টনিক দরকার। খুব ভিটামিন হবে শুনেছি।'

শহরের সেরা দাওয়াইখানা গুরুচরণ ফার্মেসি। তার থেকে এক বাক্স ইনজেকশন কিনলে শুকলাল। কিনলে মিকশ্চার-টর্নাদার। সেলট্যাক্স সহ সাত টাকা সাড়ে তেরো আনা। আর বাকি টাকায় নিজের ডিসপেন্সারির জন্যে সালসা-টনিক।

গাঁয়ে এসে যখন পৌঁছুলো তখন আক্কেল আলির বে-আক্কেল অবস্থা, শ্বাস উঠেছে। রবি ডাক্তার দূরের কলে এসে এ অবস্থার সামনে কোনো দিন নিজেকে পড়তে দেয় না। পাছে চোখের উপর রুগী মরে গেলে কি না দেয়। গেঁয়ো ডাক্তারের হাতে কোতাকুড়ির চরম দায়িত্ব রেখে শুধু ব্যবস্থা দিয়ে সরে পড়ে। বলে, 'আমাদেরকে ডাকেই একেবারে শেষ সময়

'ইঞ্জিশন এসেছে', 'ইঞ্জিশন এসেছে' সবাই কলরব তুলল। সুঁচের এক খোঁচেই আক্কেলালি চোখ মেলবে। আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসবে।

'আর ভয় নেই।' কোট খুলে ফেললে শুকলাল।

প্যাক-করা ছোট বাক্স, এক কোণে খানিকটা সুতো ঝুলছে। এই সুতো ধরে টানলে বাক্সের ডালা সুতোর লাইন ধরে কেটে যাবে। ভিতর থেকে বেরুবে ইনজেকশনের অ্যাম্পিউল। ভিতরে ছুরির পাত আছে, তা দিয়ে ডগা কেটে সুঁচে ভরে নিতে হবে ওষুধটা। তারপর ফুঁড়তে হবে বিসমিল্লার নাম নিয়ে।

শুকলাল বাক্সের ডালা ছিঁড়ল। কিন্তু কোথায় অ্যাম্পিউল! চারটে খোপে চারটে কাগজের ঢিপলি।

'ওষুধ নেই।' শুকলাল মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল: 'খাঁচা থেকে পাখি বার করে নিয়েছে শালারা।'

হুকুমালি পাথর হয়ে রইল। হাতের লাঠিটা কাঁপতে লাগল ঠকঠক করে।

এলোধাবাড়ি ছুটোছুটি করতে লাগল শুকলাল। এখন কি করে, কি ক'রে বাঁচায় আক্কেলালিকে? হুকুমালি জুলুম করেছে, রবি ডাক্তার জুলুম করেছে, সে জুলুম করেছে, কিন্তু এ জুলুমবাজির তুলনা কোথায়! মুমূর্ষুর প্রাণ নিয়ে জোচ্চুরি! প্রাণ শুধু আক্কেলালিরই যাবে না, শুকলালেরও যাবে। বাক্সের পেটের মধ্যে সে ঢুকতে পারত না এ বুঝলেও হুকুমালি তাকে ক্ষমা করবে না। বাক্সপেটরা তুলে এবার চলে যেতে হবে চরকান্দায়। ডাক্তারির তকমা ঘুচিয়ে হতে হবে হাতুড়ে নাপিত।

ডিসপেন্সারিতে চুপচাপ বসে ছিল শুকলাল। অনেক দিনের মেঘলার পর আজ রোদ উঠেছে। কিন্তু শুকলালের মনে এক কোঁটা সুখ নেই। কবে যে হুকুমালির আক্রোশ দাঙ্গা ও আগুনের আকারে দেখা দেবে তার চারপাশে, তারই ভাবনায় সে মুষড়ে আছে। যে প্রকাণ্ড জুয়াচুরিটা শুকলালের হাতের উপর হয়ে গেল, তাতে শুকলালের কোনই অংশ নেই, এ কথা হুকুমালিকে কেউ বিশ্বাস করতে দেবে না।

লাঠির শব্দ হতেই শুকলাল ত্রস্ত হয়ে চোখ চেয়ে দেখল, সামনেই হুকুমালি।

কতক্ষণ দুজন একে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে।

'মন খারাপ করো না, শুকলাল। তোমার জন্যে এই এক তোড়া টাকা এনেছি।' বলে এক থলে টাকা হুকুমালি শব্দ করে শুকলালের টেবিলের উপর রাখলে। বললে, "তিন গাঁয়ের মধ্যে এই একটামাত্র ডাক্তারখানা। এই টাকা দিয়ে ভাল দোকান থেকে ভাল দেখে ওষুধ কেন তুমি, তোমার ডিসপেন্সারি সাজিয়ে ফেল। আমার আক্কেলালি গেছে, কিন্তু পাগলাছুরা, মানেরদি, সোনামদি, গহরালির ছেলেরা যেন না মরে।"



কৃষাণ শিল্পী—সুনীল পাল



তেলেনাপোতা আবিষ্কার

—প্রেমেন্দ্র মিত্র—

শনি ও মঙ্গলের মঙ্গলই হবে বোধ হয়, যোগাযোগ হ'লে তেলেনাপোতা আপনারাও একদিন আবিষ্কার করতে পারেন। অর্থাৎ কাজে কর্ম্মে মানুষের ভীড়ে হাঁফিয়ে ওঠার পর যদি হঠাৎ দু'দিনের জন্যে ছুটি পাওয়া যায় আর যদি কেউ এসে ফুসলানি দেয় যে কোন এক আশ্চর্য্য সরোবরে—পৃথিবীর সবচেয়ে সরলতম মাছেরা এখনো তাদের জল-জীবনের প্রথম বঁড়শিতে হৃদয়বিদ্ধ করবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে, আর জীবনে কখনো কয়েকটা পুঁটি ছাড়া অন্য কিছু জল থেকে টেনে তোলার সৌভাগ্য যদি আপনার না হয়ে থাকে, তাহলে হঠাৎ একদিন তেলেনাপোতা আপনারও আবিষ্কার করতে পারেন।

তেলেনাপোতা আবিষ্কার করতে হলে একদিন বিকেলবেলার পড়ন্ত রোদে জিনিষে মানুষে ঠাসাঠাসি একটা বাসে গিয়ে আপনাকে উঠতে হবে, তারপর রাস্তার ঝাঁকানির সঙ্গে মানুষের গুঁতো খেতে খেতে ভাদ্রের গরমে ঘামে, ধুলোয় চট্‌চটে শরীর নিয়ে ঘণ্টা দু'য়েক বাদে রাস্তার মাঝখানে নেবে পড়তে হবে আচমকা। সামনে দেখবেন নীচু একটা জলার মত জায়গার ওপর দিয়ে রাস্তার লম্বা সাঁকো চলে গেছে। তার ওপর দিয়ে বিচিত্র ঘর্ঘর শব্দে বাসটি চলে গিয়ে ওধারে পথের বাঁকে অদৃশ্য হবার পর দেখবেন সূর্য্য এখনো না ডুবলেও চারিদিক ঘন জঙ্গলে অন্ধকার হয়ে এসেছে। কোন দিকে চেয়ে জনমানব দেখতে পাবেন না। মনে হবে পাখীরাও যেন সভয়ে সে জায়গা পরিত্যাগ ক'রে চলে গেছে। একটা স্যাঁৎসেঁতে ভিজে ভাপসা আবহাওয়া টের পাবেন। মনে হবে নীচের জলা থেকে একটা ক্রূর কুণ্ডলিত জলীয় অভিশাপ ধীরে ধীরে অদৃশ্য ফণা তুলে উঠে আসছে।

বড় রাস্তা থেকে নেমে সেই ভিজে জলার কাছেই গিয়ে দাঁড়াতে হবে আপনাকে। সামনে ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে মনে হবে একটা কাদাজলের নালা কে যেন কেটে রেখেছে। সে নালার মত রেখাও কিছু দূরে গিয়ে দু'ধারে বাঁশ ঝাড় আর বড় বড় ঝাঁকড়া গাছের মধ্যে হারিয়ে গেছে।

তেলেনাপোতা আবিষ্কারের জন্যে আরো দুজন বন্ধু ও সঙ্গী আপনার সঙ্গে থাকা উচিত। তারা হয়ত আপনার মত ঠিক মৎস্য-লুব্ধ নয়, তবু এ অভিযানে তারা এসেছে,—কে জানে আর কোন অভিসন্ধিতে।

তিনজনে মিলে তারপর সামনের নালার দিকে উৎসুকভাবে চেয়ে থাকবেন। মাঝে মাঝে পা ঠুকে মশাদের ঘনিষ্ঠতায় বাধা দেবার চেষ্টা করবেন এবং সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে এ ওর মুখের দিকে চাইবেন।

খানিক বাদে পরস্পরের মুখও আর ঘনায়মান অন্ধকারে ভালো করে দেখা যাবে না। মশাদের ঐকতান আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠবে। আবার বড় রাস্তায় উঠে ফিরতি কোন বাসের চেষ্টা করবেন কিনা যখন ভাবছেন, তখন হঠাৎ সেই কাদাজলের নালা যেখানে জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেছে, সেখান থেকে অপরূপ একটি শ্রুতিবিস্ময়কর আওয়াজ পাবেন। মনে হবে বোবা জঙ্গল থেকে কে যেন অমানুষিক এক কান্না নিংড়ে নিংড়ে বার করছে।

সে শব্দে আপনারা কিন্তু প্রতীক্ষায় চঞ্চল হয়ে উঠবেন। প্রতীক্ষাও আপনাদের ব্যর্থ হবে না। আবছা অন্ধকারে প্রথমে একটি তীক্ষ্ণ আলো দুলতে দেখা যাবে ও তারপর একটি গরুর গাড়ি জঙ্গলের ভেতর থেকে নালা দিয়ে ধীর মন্থর দোদুল্যমান গতিতে বেরিয়ে আসবে।

যেমন গাড়িটি তেমনি গরুগুলি—মনে হবে পাতালের কোন বামনের দেশ থেকে গরুর গাড়ির এই ক্ষুদ্র সংক্ষিপ্ত সংস্করণটি বেরিয়ে এসেছে।

বৃথা বাক্য ব্যয় না করে সেই গরুর গাড়ির ছই-এর ভেতর তিনজনে কোন রকমে প্রবেশ করবেন ও তিন জোড়া হাত ও পা এবং তিনটি মাথা নিয়ে স্বল্পতম স্থানে সর্ব্বাধিক বস্তু কি ভাবে সংস্থাপিত করা যায় সে সমস্যার মীমাংসা করবেন।

গরুর গাড়িটি তারপর যে পথে এসেছিল, সেই পথে অথবা নালায় ফিরে চলতে সুরু করবে। বিস্মিত হয়ে দেখবেন, ঘন অন্ধকার অরণ্য যেন সঙ্কীর্ণ একটু সুড়ঙ্গের মত পথ সামনে একটু একটু করে উন্মোচন করে দিচ্ছে। প্রতিমুহূর্তে মনে হবে কালো অন্ধকারের দেয়াল বুঝি অভেদ্য কিন্তু তবু গরুর গাড়িটি অবিচলিতভাবে ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে যাবে পায়ে পায়ে পথ যেন ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে।

কিছুক্ষণ হাত, পা ও মাথায় যথোচিত সংস্থান বিপর্য্যস্ত হবার সম্ভাবনায় বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করবেন। বন্ধুদের সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে অনিচ্ছাকৃত সংঘর্ষ বাধবে, তারপর ধীরে ধীরে বুঝতে পারবেন চারিধারের গাঢ় অন্ধকারে চেতনার শেষ অন্তরীপটিও নিমজ্জিত হয়ে গেছে। মনে হবে পরিচিত পৃথিবীকে দূরে কোথায় ফেলে এসেছেন।

অনুভূতিহীন কুয়াশাময় এক জগৎ শুধু আওতায় চারিধারে। সময় সেখানে স্তব্ধ, স্রোতোহীন।

সময় স্তব্ধ, সুতরাং এ আচ্ছন্নতা কতক্ষণ ধরে যে থাকবে বুঝতে পারবেন না। হঠাৎ এক সময় উৎকট এক বাদ্য-ঝঙ্কারে জেগে উঠে দেখবেন, ছই-এর ভেতর দিয়ে আকাশের তারা দেখা যাচ্ছে এবং গাড়ির গাড়োয়ান থেকে থেকে সোৎসাহে একটি ক্যানাস্তারা বাজাচ্ছে।

কৌতূহলী হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলে গাড়োয়ান নিতান্ত নির্বিকারভাবে আপনাকে জানাবে,—এজ্ঞে, ওই শালার বাঘ খেদাতে।

ব্যাপারটা ভালো করে হৃদয়ঙ্গম করার পর, মাত্র ক্যানাস্তারা-নিনাদে ব্যাঘ্র-বিতাড়ন সম্ভব কিনা কম্পিত কণ্ঠে এ প্রশ্ন আপনি উত্থাপন করবার আগেই গাড়োয়ান আপনাকে আশ্বস্ত করবার জন্যে জানাবে যে, বাঘ মানে চিতাবাঘ মাত্র এবং নিতান্ত ক্ষুধার্ত না হ'লে এই ক্যানাস্তারানিনাদই তাকে তফাৎ রাখবার পক্ষে যথেষ্ট।

মহানগরী থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে ব্যাঘ্র-সঙ্কুল এরকম স্থানের অস্তিত্ব কি করে সম্ভব আপনি যতক্ষণ চিন্তা করবেন ততক্ষণে গরুর গাড়ি বিশাল একটা মাঠ পার হয়ে যাবে। আকাশে তখন কৃষ্ণপক্ষের বিলম্বিত ক্ষয়িত চাঁদ বোধ হয় উঠে এসেছে। তারই স্তিমিত আলোয় আবছা বিশাল মৌন সব প্রহরী যেন গাড়ির দু'পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে সরে যাবে। প্রাচীন অট্টালিকার সে সব ধ্বংসাবশেষ,—কোথাও একটা থাম, কোথাও একটা দেউড়ির খিলান, কোথাও কোনো মন্দিরের ভগ্নাংশ, মহাকালের কাছে সাক্ষ্য দেবার ব্যর্থ আশায় দাঁড়িয়ে আছে।

ওই অবস্থায় যতখানি সম্ভব মাথা তুলে বসে কেমন একটা শিহরণ সারা শরীরে অনুভব করবেন। জীবন্ত পৃথিবী ছাড়িয়ে অতীতের কোন কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন স্মৃতিলোকে এসে পড়েছেন বলে ধারণা হবে।

রাত তখন কত আপনি জানেন না, কিন্তু মনে হবে এখানে রাত যেন কখনও ফুরোয় না। নিবিড় অনাদি অনন্ত স্তব্ধতায় সব কিছু নিমগ্ন হয়ে আছে;—যাদুঘরের নানা প্রাণদেহ আরকের মধ্যে যেমন থাকে।

দু'তিনবার মোড় ঘুরে গরুর গাড়ি এবার এক জায়গায় এসে থামবে। হাত পা-গুলো নানাস্থান থেকে কোন রকমে কুড়িয়ে সংগ্রহ করে কাঠের পুতুলের মত আড়ষ্টভাবে আপনারা একে একে নামবেন। একটা কটু গন্ধ অনেকক্ষণ ধরেই আপনাদের অভ্যর্থনা করছে। বুঝতে পারবেন সেটা পুকুরের পানা পচার গন্ধ। অর্ধস্ফুট চাঁদের আলোয় তেমন একটি নাতিক্ষুদ্র পুকুর সামনেই চোখে পড়বে। তারই পাশে বেশ বিশালায়তন একটি জীর্ণ অট্টালিকা ভাঙা ছাদ, ধ্বসে পড়া দেওয়াল ও চক্ষুহীন কোটরের মত পাল্লাহীন জানলা নিয়ে চাঁদের বিরুদ্ধে দুর্গ-প্রাকারের মত দাঁড়িয়ে আছে।

এই ধ্বংসাবশেষেরই একটি অপেক্ষাকৃত বাসযোগ্য ঘরে আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করে নিতে হবে। কোথা থেকে গাড়োয়ান একটি ভাঙা লণ্ঠন নিয়ে এসে ঘরে বসিয়ে দেবে। সেই সঙ্গে এক কলসি জল। ঘরে ঢুকে বুঝতে পারবেন বহুযুগ পরে মনুষ্যজাতির প্রতিনিধি হিসাবে আপনারাই সেখানে প্রথম পদার্পণ করছেন। ঘরের ঝুল, জঞ্জাল ও ধুলো হয়ত কেউ আগে কখন পরিষ্কার করবার ব্যর্থ চেষ্টা করে গেছে। ঘরের অধিষ্ঠাত্রী আত্মা যে তাতে ক্ষুব্ধ একটি অস্পষ্ট ভাপসা গন্ধে তার প্রমাণ পাবেন। সামান্য চলাফেরায় ছাদ ও দেয়াল থেকে জীর্ণ পলস্তারা সেই রুষ্ট আত্মার অভিশাপের মত থেকে থেকে আপনাদের ওপর বর্ষিত হবে। দু'তিনটি চামচিকা ঘরের অধিকার নিয়ে আপনাদের সঙ্গে সমস্ত রাত বিবাদ করবে।

তেলেনাপোতা আবিষ্কারের জন্যে আপনার দু'টি বন্ধুর একজন পানরসিক ও অপরজনের নিদ্রা-বিলাসী কুম্ভকর্ণের দোসর হওয়া দরকার। ঘরে পৌঁছেই, মেঝের ওপর কোনরকমে সতরঞ্চির আবরণ পড়তে না পড়তে একজন তার ওপর নিজেকে বিস্তৃত করে নাসিকা ধ্বনি করতে সুরু করবেন, অপরজন পান-পাত্রে নিজেকে নিমজ্জিত করে দেবেন।

রাত বাড়বে। ভাঙা লণ্ঠনের কাঁচের চিমনি ক্রমশঃ গাঢ়ভাবে কালিমালিপ্ত হয়ে ধীরে ধীরে অন্ধ হয়ে যাবে। কোন রহস্যময় বেতার-সঙ্কেতে খবর পেয়ে সে অঞ্চলের সমস্ত সমর্থ সাবালক মশা নবাগতদের অভিনন্দন জানাবে ও তাদের সঙ্গে শোণিত সম্বন্ধ স্থাপন করতে আসবে। আপনি বিচক্ষণ হ'লে দেয়ালে ও গায়ে বসবার বিশিষ্ট ভঙ্গি দেখে বুঝবেন, তারা মশাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কুলীন,—ম্যালেরিয়া দেবীর অদ্বিতীয় বাহন অ্যানোফিলিস। আপনার দুই বন্ধু তখন দুই কারণে অচেতন। ধীরে ধীরে তাই শয্যা পরিত্যাগ করে উঠে দাঁড়াবেন, তারপর গুমোট গরম থেকে একটু পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে টর্চটি হাতে নিয়ে ভগ্নপ্রায় সিঁড়ি দিয়ে ওপরের ছাদে ওঠবার চেষ্টা করবেন।

প্রতি মুহূর্তে কোথাও ইট বা টালি খসে পড়ে ভূপাতিত হওয়ার বিপদ আপনাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করবে, তবু কোন দুর্বার আকর্ষণে সমস্ত অগ্রাহ্য করে আপনি ওপরে না উঠে পারবেন না।

ছাদে গিয়ে দেখবেন, অধিকাংশ জায়গাতে আলিসা ভেঙে ধূলিসাৎ হয়েছে, ফাটলে ফাটলে অরণ্যের পঞ্চম বাহিনী ষড়যন্ত্রের শিকড় চালিয়ে ভেতর থেকে এ অট্টালিকার ধ্বংসের কাজ অনেকখানি এগিয়ে রেখেছে; তবু কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চাঁদের আলোয় সমস্ত কেমন অপরূপ মোহময় মনে হবে। মনে হবে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলে এই মৃত্যু-সুষুপ্তি মগ্ন মায়াপুরীর কোন গোপন প্রকোষ্ঠে বন্দিনী রাজকুমারী সোনার কাঠি রূপার কাঠি পাশে নিয়ে যুগান্তের গাঢ় তন্দ্রায় অচেতন, তা যেন আপনি টের পাবেন। সেই মুহূর্তে অদূরে সঙ্কীর্ণ রাস্তার ওপারে একটি ভগ্নস্তূপ বলে যা মনে হয়েছিল তারই একটি জানালায় একটি আলোর ক্ষীণ রেখা আপনি হয়ত দেখতে পাবেন। সেই আলোর রেখা আড়াল করে একটি রহস্যময় ছায়ামূর্তি সেখানে এসে দাঁড়াবে। গভীর নিশীথরাত্রে কে যে এই বাতায়নবর্তিনী, কেন যে তার চোখে ঘুম নেই আপনি ভাববার চেষ্টা করবেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারবেন না। খানিক বাদে মনে হবে সবই বুঝি আপনার চোখেরই ভ্রম। বাতায়ন থেকে সে ছায়া সরে গেছে, আলোর ক্ষীণ রেখা গেছে মুছে। মনে হবে এই ধ্বংসপুরীর অতল নিদ্রা থেকে একটি স্বপ্নের বুদ্বুদ ক্ষণেকের জন্য জীবনের জগতে ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে গেছে।

আপনি আবার সন্তর্পণে নিচে নেমে আসবেন এবং কখন এক সময়ে দুই বন্ধুর পাশে একটু জায়গা করে ঘুমিয়ে পড়বেন জানতে পারবেন না।

যখন জেগে উঠবেন তখন অবাক হয়ে দেখবেন এই রাত্রির দেশেও সকাল হয়, পাখীর কলরবে চারিদিক ভরে যায়।

আপনার আসল উদ্দেশ্য আপনি নিশ্চয় বিস্মৃত হবেন না। এক সময়ে যোড়শোপচার আয়োজন নিয়ে মৎস্য আরাধনার জন্যে শ্যাওলা ঢাকা ভাঙা ঘাটের একটি ধারে বসে ছিপ ফেলে সবুজ জলের মধ্যে যথোচিত নৈবেদ্য সমেত বঁড়শি নামিয়ে দেবেন।

বেলা বাড়বে। ওপারের ঝুঁকে পড়া একটা বাঁশের ডগা থেকে একটা মাছরাঙা পাখী ক্ষণে ক্ষণে আপনাকে যেন উপহাস করবার জন্যেই বাতাসে রঙের ঝিলিক খেলিয়ে পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে ও সার্থক শীকারের উল্লাসে আবার বাঁশের ডগায় ফিরে গিয়ে দুর্বোধ ভাষায় আপনাকে বিদ্রূপ করবে। আপনাকে সন্ত্রস্ত করে একটা মোটা লম্বা সাপ ভাঙা ঘাটের কোন ফাটল থেকে বেরিয়ে ধীর অচঞ্চল গতিতে পুকুরটা সাঁতরে পার হয়ে ওধারে গিয়ে উঠবে, দুটো ফড়িং পাতলা কাঁচের মত পাখা নেড়ে আপনার ফাৎনাটার ওপর বসবার চেষ্টা করবে ও থেকে থেকে উদাস ঘুঘুর ডাকে আপনি আনমনা হয়ে যাবেন।

তারপর হঠাৎ জলের শব্দে আপনার চমক ভাঙবে। নিথর জলে ঢেউ উঠেছে, আপনার ছিপের ফাৎনা মৃদুমন্দ ভাবে তাতে দুলছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখবেন একটি মেয়ে পেতলের একটি ঝকঝকে ঘড়ায় পুকুরের পানা ঢেউ দিয়ে সরিয়ে জল ভরছে। মেয়েটির চোখে কৌতূহল আছে কিন্তু গতিবিধিতে সলজ্জ আড়ষ্টতা নেই। সোজাসুজি সে আপনার দিকে তাকাবে, আপনার ফাৎনা লক্ষ্য করবে, তারপর আবার মুখ ফিরিয়ে ঘড়াটা কোমরে তুলে নেবে।

মেয়েটি কোন্ বয়সের আপনি বুঝতে পারবেন না। তার মুখের শান্ত করুণ গাম্ভীর্য্য দেখে মনে হবে জীবনের সুদীর্ঘ নির্ম্মম পথ সে পার হয়ে এসেছে, তার ক্ষীণ দীর্ঘ অপুষ্ট শরীর দেখলে মনে হবে কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে উত্তীর্ণ হওয়া তার যেন স্থগিত হয়ে আছে।

কলসি নিয়ে চলে যেতে যেতে ফিরে তাকিয়ে মেয়েটি হঠাৎ বলবে, "বসে আছেন কেন? টান দিন।"

সে কণ্ঠ এমন শান্ত মধুর ও গম্ভীর যে এভাবে আপনা থেকে অপরিচিতের সঙ্গে কথা বলা আপনার মোটেই অস্বাভাবিক ঠেকবে না। শুধু আকস্মিক চমকের দরুণ বিহ্বল হয়ে ছিপে টান দিতে আপনি ভুলে যাবেন। তারপর ডুবে যাওয়া ফাৎনা আবার ভেসে ওঠবার পর ছিপ তুলে দেখবেন বঁড়শিতে টোপ আর নেই। একটু অপ্রস্তুত ভাবে মেয়েটির দিকে আপনাকে একবার তাকাতেই হবে। সেও মুখ ফিরিয়ে শান্ত ধীর পদে ঘাট ছেড়ে চলে যাবে, কিন্তু মনে হবে মুখ ফেরাবার চকিত মুহূর্ত্তে একটু যেন দীপ্ত হাসির আভাস সেই শান্ত করুণ মুখে খেলে গেছে।

পুকুরের ঘাটের নির্জ্জনতা আর ভঙ্গ হবে না তারপর। ওপারের মাছরাঙাটা আপনাকে লজ্জা দেবার নিষ্ফল চেষ্টা ত্যাগ করে অনেক আগেই উড়ে গেছে। মাছেরা আপনার শক্তি সামর্থ্য সম্বন্ধে গভীর অবজ্ঞা নিয়েই বোধ হয় আর দ্বিতীয়বার প্রতিযোগিতায় নামতে চাইবে না। খানিক আগের ঘটনাটা আপনার কাছে অবাস্তব বলে মনে হবে। এই জনহীন ঘুমের দেশে সত্যি ওরকম মেয়ে কোথাও আছে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না।

এক সময়ে হতাশ হয়ে আপনাকে সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে উঠে পড়তে হবে। ফিরে গিয়ে হয়ত দেখবেন আপনার মৎস্য-শীকার নৈপুণ্যের বৃত্তান্ত ইতিমধ্যে কেমন করে আপনার বন্ধুদের কর্ণগোচর হয়েছে। তাদের পরিহাসে ক্ষুণ্ণ হয়ে এ কাহিনী কোথায় তারা শুনল জিজ্ঞাসা করে হয়ত আপনার পান-রসিক বন্ধুর কাছে শুনবেন,—"কে আবার বলবে! এই মাত্র যামিনী নিজের চোখে দেখে এল যে!"

আপনাকে কৌতূহলী হয়ে যামিনীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেই হবে। তখন হয়ত জানতে পারবেন যে, পুকুরঘাটের সেই অবাস্তব করুণনয়না মেয়েটি আপনার পান-রসিক বন্ধুটিরই জ্ঞাতি স্থানীয়া। সেই সঙ্গে আরো শুনবেন যে, দ্বিপ্রাহরিক আহারের ব্যবস্থাটা সেদিনকার মত তাদের ওখানেই হয়েছে।

যে ধ্বংসস্তূপে গত রাত্রে ক্ষণিকের জন্যে একটি ছায়ামূর্ত্তি আপনার বিস্ময় উৎপাদন করেছিল, দিনের রূঢ় আলোয় তার শ্রীহীন জীর্ণতা আপনাকে অত্যন্ত পীড়িত করবে। রাত্রির মায়াবরণ সরে গিয়ে তার নগ্ন ধ্বংস মূর্ত্তি এত কুৎসিৎ হয়ে উঠতে পারে আপনি ভাবতে পারেন নি।

এইটিই যামিনীদের বাড়ি জেনে আপনি অবাক হবেন। এই বাড়িরই একটি ঘরে আপনাদের হয়ত আহারের ব্যবস্থা হয়েছে। আয়োজন যৎসামান্য, হয়ত যামিনী নিজেই পরিবেশন করছে। মেয়েটির অনাবশ্যক লজ্জা বা আড়ষ্টতা যে নেই আপনি আগেই লক্ষ্য করেছেন, শুধু কাছে থেকে তার মুখের করুণ গাম্ভীর্য্য আরো বেশী করে আপনার চোখে পড়বে। এই পরিত্যক্ত বিস্মৃত জনহীন সমস্ত লোকালয়ের মৌন বেদনা যেন তার মুখে ছায়া ফেলেছে। সব কিছু দেখেও তার দৃষ্টি যেন গভীর এক ক্লান্তির অতলতায় নিমগ্ন। একদিন যেন সে এই ধ্বংসস্তূপেই ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাবে।

আপনাদের পরিবেশন করতে করতে দু'চারবার তাকে তবু চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে আপনি দেখবেন। ওপর তলার কোন ঘর থেকে ক্ষীণ একটা কণ্ঠ যেন কাকে ডাকছে। যামিনী ব্যস্ত হয়ে বাইরে চলে যাবে। প্রত্যেকবার ফিরে আসার সঙ্গে তার মুখে বেদনার ছায়া যেন আরো গভীর হয়ে উঠেছে মনে হবে—সেই সঙ্গে কেমন একটা অসহায় অস্থিরতা তার চোখে।

খাওয়া শেষ করে আপনারা তখন একটু বিশ্রাম করতে পারেন। অত্যন্ত দ্বিধা-ভরে কয়েকবার ইতস্ততঃ করে সে যেন শেষে মরিয়া হয়ে দরজা থেকে ডাকবে, "একটু এখানে শুনে যাও মণিদা।"

মণিদা আপনার সেই পান-রসিক বন্ধু। তিনি দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াবার পর যে আলাপটুকু হবে তা এমন নিম্নস্বরে নয় যে, আপনারা শুনতে পাবেন না।

শুনবেন, যামিনী অত্যন্ত কাতর স্বরে বিপন্নভাবে বলছে, "মা'ত কিছুতেই শুনছেন না। তোমাদের আসার খবর পাওয়া অবধি কি যে অস্থির হয়ে উঠেছেন কি বলব।"

মণি একটু বিরক্তির স্বরে বলবে, "ওঃ সেই খেয়াল এখনো! নিরঞ্জন এসেছে, ভাবছেন বুঝি?"

"হ্যাঁ, কেবলই বলছেন—'সে নিশ্চয় এসেছে। শুধু লজ্জায় আমার সঙ্গে দেখা করতে পারছে না, আমি জানি। তাকে ডেকে দে। কেন তুই আমার কাছে লুকোচ্ছিস!' কি যে আমি করব ভেবে পাচ্ছি না। অন্ধ হয়ে যাবার পর থেকে আজকাল এত অধৈর্য্য বেড়েছে যে, কোন কথা বুঝোলে বোঝেন না। রেগে মাথা খুঁড়ে এমন কাণ্ড করেন যে, তখন ওঁর প্রাণ বাঁচান দায় হয়ে ওঠে।"

"হুঁ, এ'ত বড় মুস্কিল দেখছি। চোখ থাকলেও না হয় দেখিয়ে দিতাম যে যারা এসেছে তাদের কেউ নিরঞ্জন নয়।"

ওপর থেকে দুর্ব্বল অথচ তীক্ষ্ণ ক্রুদ্ধ কণ্ঠের ডাকটা এবার আপনারাও শুনতে পাবেন। যামিনী এবার কাতর কণ্ঠে অনুনয় করবে, "তুমি একবারটি চল মণিদা, যদি একটু বুঝিয়ে শুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে পার।"

"আচ্ছা তুই যা, আমি আসছি।"—মণি এবার ঘরে ঢুকে নিজের মনেই বলবে "এ এক আচ্ছা জ্বালা হয়েছে যা হোক, বুড়ির হাত পা পড়ে গেছে, চোখ নেই তবু বুড়ি পণ করে বসে আছে কিছুতে মরবে না।"

ব্যাপারটা কি এবার আপনারা হয়ত জানতে চাইবেন। মণি বিরক্তির স্বরে বলবে, "ব্যাপার আর কি! নিরঞ্জন বলে ওঁর দূর সম্পর্কের এক বোনপোর সঙ্গে ছেলেবেলায় যামিনীর সম্বন্ধ উনি ঠিক করেছিলেন। বছর চারেক আগেও সে ছোকরা এসে ওঁকে বলে গেছল বিদেশের চাকরী থেকে ফিরে ওঁর মেয়েকে সে বিয়ে করবে। সেই থেকে বুড়ি এই অজগর পুরীর ভেতর বসে সেই আশায় দিন গুনছে।"

আপনি নিজে থেকে এবার জিজ্ঞাসা না করে পারবেন না, "নিরঞ্জন কি এখনো বিদেশ থেকে ফেরে নি?"

"আরে সে বিদেশে গেছল কবে যে ফিরবে! নেহাৎ বুড়ি নাছোড়বান্দা বলে তাকে ওই ধাপ্পা দিয়ে গেছল। এমন ঘুঁটে কুড়ুনির মেয়েকে উদ্ধার করতে তার দায় পড়েছে। সে কবে বিয়ে থা করে দিব্যি সংসার করছে। কিন্তু সে কথা ওঁকে বলবে কে? বল্লে বিশ্বাসই করবেন না, আর বিশ্বাস যদি করেন তা হ'লে এখুনি ... ছুটে অক্কা! কে মিছি মিছি পাতকের ভাগী হবে?"

"যামিনী নিরঞ্জনের কথা জানে?"

"তা আর জানে না! কিন্তু মায় কাছে বলবার উপায় ত নেই। যাই, কর্ত্তব্য ... সেরে আসি।" ব'লে মণি সিঁড়ির দিকে পা বাড়াবে।

সেই মুহূর্ত্তে নিজের অজ্ঞাতসারেই আপনাকে হয়ত উঠে দাঁড়াতে হবে। হঠাৎ হয়ত বলে ফেলবেন, "চল, আমিও যাব।"

"তুমি যাবে!" মণি ফিরে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে নিশ্চয় আপনার দিকে তাকাবে।

"হ্যাঁ কোন আপত্তি আছে গেলে?"

"না, আপত্তি কিসের!" বলে ... বিমূঢ়ভাবেই মণি আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

সঙ্কীর্ণ অন্ধকার ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে ... ঘরটিতে আপনি পৌঁছোবেন, মনে হবে, ওপরে নয়, মাটির তলায় সুড়ঙ্গেই বুঝি তার স্থান। একটি মাত্র জানলা, তাও বন্ধ, বাইরের আলো থেকে এসে প্রথমে আপনার চোখে সব ঝাপসা ঠেকবে, তারপর টের পাবেন, ... ঘরজোড়া একটি ভাঙা তক্তাপোষে ... কন্থা জড়িত একটি শীর্ণ কঙ্কালসার মূর্ত্তি শুয়ে আছে। তক্তাপোষের একপাশে যামিনী পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে।

আপনাদের পদশব্দ শুনে সেই ... মধ্যেও যেন চাঞ্চল্য দেখা দেবে: "কে, ...

[ইহার পর ২৩৬ পৃষ্ঠায়]



বৈপ্লবিক বিবাহ

শ্রী নসীভৃঙ্গী

স্বরাজ আশ্রম। প্রভাতে প্রার্থনার পর কুটিরের বারান্দায় কম্বলাসনে বসিয়া বাবাজী "সুত্র-যজ্ঞে" মনোনিবেশ করিয়াছেন। এমন সময় আশ্রমের সম্পাদক অপ্রসন্ন মুখে সম্মুখে আসিয়া বসিল।

বাবাজী—কি, কিছু বলবে।

সম্পাদক—কি আর বোলবো, রতিকান্তকে আর আশ্রমে রাখা যায় না।

বাবাজী বল কি, এই পাঁচ বৎসর ওকে নিজে মানুষ করেছি, গো-পালন বিভাগে ওর চেষ্টাতেই আমাদের ঘি বেশ জনপ্রিয় হয়েছে, হিসাব কিতাবে খুবই পাকা—

সম্পাদক—খুবই পাকা সন্দেহ নেই, তবে আপনার প্রশ্রয় পেয়ে পাকামো ধরেছে।

বাবাজী—কি, ঘি চুরি করছে?

সম্পাদক—আজ্ঞে না, মন চুরি করছে!

বাবাজী—হেঁয়ালী ছেড়ে স্পষ্ট করে বল।

সম্পাদক—তারামণির সঙ্গে ওর আচরণ আশ্রম-নিয়ম-বিরোধী।

বাবাজী—(চরকার হাতল থামাইয়া বিস্ফারিত নেত্রে কহিলেন) তারামণি!

সম্পাদক—আজ্ঞে, আর রতিকান্ত!

বাবাজী শূন্য দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। মনের মধ্যে ক্রোধ রিপুর উদয় হইল—অহিংস প্যাঁচ মারিয়া তাহাকে ঠাণ্ডা করিতে কিছু সময় লাগিল।

সম্পাদক—গোয়ালন্দ থেকে তারামণি যখন এল, আমি আপত্তি করেছিলাম। ঐ চেহারা আর ফিক্ ফিক্ হাসি—আশ্রমের ব্রহ্মচর্য্যের নিস্তরঙ্গ আবহাওয়া চঞ্চল করে তুলবে। নিরামিষ খেলে কি হবে, আমি যে রক্ত দেখেছি ওর চোখে—

বাবাজী—তুমি থাম, আমার বুদ্ধি গুলিয়ে যাচ্ছে, ঐ এক রত্তি মেয়ে তারামণি!

সম্পাদক—এক রত্তি মেয়ে! নিজ চক্ষে দেখলাম, কাল সন্ধ্যেয় বাগানে বাতাবী লেবু গাছটার তলায়—কেলেঙ্কারী!

বাবাজী—(আঁতকাইয়া) অ্যাঁ—কেলেঙ্কারী! কি বলছো তুমি!

সম্পাদক—যা দেখেছি, তাই বলছি। হাত কাড়াকাড়ি, ঘেঁসাঘেঁসি—চুম্বন।

বাবাজী—(লাফাইয়া উঠিলেন—দুই হাত প্রসারিত করিয়া)—চুম্বন! সন্ধ্যাবেলা পবিত্র প্রার্থনার সময় চুম্বন—অশুচি, অশুচি।

সম্পাদক—আশ্রমে কানাকানি চলছে—মাতাজীর সঙ্গে পরামর্শ করে যা হয়, একটা বিহিত করুন।

বাবাজী গুম হইয়া গেলেন। ইতিপূর্ব্বেও আশ্রমে কয়েকটা প্রেম ও বিবাহ হইয়াছে। কিন্তু রতিকান্ত,—আজীবন ব্রহ্মচারী থাকিয়া আশ্রম ও দেশের সেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ রতিকান্ত এ কি করিয়া বসিল। এই আশ্রমের ভাবী অধ্যক্ষ রতিকান্ত। বাবাজীর কত কথাই না মনে পড়িল। একদিন রতিকান্ত ব্রহ্মচর্য্যের বক্তৃতা দিতে গিয়া নারীদের বিরুদ্ধে শঙ্করাচার্য্যের বাছা বাছা বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছিল, হে ব্রতধারিগণ, তোমরা প্রতিজ্ঞা কর, ভগবান যদি নারীমূর্ত্তিতে দেখা দিতে আসেন, আমরা চক্ষু বুজিয়া থাকিব,—সেই রতিকান্ত লেবুগাছ তলায় তারামণির সহিত—কল্পনায় বাবাজী শিহরিয়া উঠিলেন। সুত্রযজ্ঞে ক্ষান্ত দিয়া বাবাজী কুটিরে প্রবেশ করিলেন—রন্ধনশালা হইতে মাতাজীকে ডাকিলেন। দুইজন মুখোমুখী বসিয়া কত ভাবিলেন, কত পরামর্শ করিলেন। তারপর তন্ময় হইয়া অন্তরের বাণী শুনিবার জন্য দিব্যকর্ণ সজাগ রাখিয়া ধ্যানস্থ হইলেন।

বেলা চারটার সময় আশ্রমবাসীরা শুনিল,—আশ্রমের কলঙ্ক মোচনের জন্য বাবাজী মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া তিনদিন উপবাস করিবেন। ভক্তবৃন্দ বিমর্ষ হইয়া বলিতে লাগিল, আমরাও উপবাস করিব। মাতাজী আদেশ দিলেন,—এ-প্রায়শ্চিত্তে কেবল বাবাজীরই অধিকার আছে।

তিনদিন উপবাসের অবসাদে মন নিস্তেজ হইবার সঙ্গে সঙ্গে রতিকান্তের উপর রাগটাও পড়িয়া গেল; বাবাজী অনেক বিবেচনা করিয়া দেখিলেন,—রতিকান্তকে আশ্রম হইতে বাহির করিয়া দিলে তারামণিকে ঠেকান যাইবে না। বাহিরে গিয়া উহারা কি করিবে কে জানে, মাঝখান হইতে গড়িয়া তোলা ঘি-এর কারবারের সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা—আশ্রমের পৃষ্ঠ-পোষকদের স্বাস্থ্যহানি!

কমলালেবুর সরবৎ আরণ্য মধু সহযোগে পান করিয়া বাবাজী শিরদাঁড়া সোজা



সন্ধ্যাবেলা পবিত্র প্রার্থনার সময় চুম্বন—অশুচি, অশুচি...

করিয়া বসিয়াছেন, সম্মুখে রতিকান্ত অধো-মুখে বসিয়া।

বাবাজী—রতিকান্ত যা শুনেছি, তা সত্য কিনা বল।

রতিকান্ত—সবই সত্য বাবা, রিপুদমন করা সহজ, চিত্তদমন কঠিন।



দিবাকর্ণ সজাগ রাখিয়া ধ্যানস্থ…

বাবাজী—চিত্তচাঞ্চল্য এক প্রকার কায়িক দৌর্ব্বল্য-সঞ্জাত মানসিক বিকার—পঞ্চ-মহাযজ্ঞ ও পঞ্চগব্যাদি সেবন করে সাবধান হও নাই কেন?

রতিকান্ত—সবই করেছি বাবা,—কিন্তু রাত্রে তারামণিকে স্বপ্নে দেখি—আসল তারামণির চেয়েও স্বপ্নের তারামণি অতি প্রগলভা, তার চটুল বিদ্রূপে আমি পাগল হয়ে—

বাবাজী—থাক আর বলতে হবে না। কিন্তু এ আশ্রম-ধর্ম্ম বিরোধী আচরণে আমি ক্ষুব্ধ হয়েছি।

রতিকান্ত—প্রতিকার তো আপনার হাতেই রয়েছে বাবা।

বাবাজী (যেন আলোকের সন্ধান পাইলেন) কি বলছো পুত্র!

রতিকান্ত—(সজল নয়নে) আমাদের বিয়ে দিয়ে দিন।

বাবাজী—কিন্তু আমাদের আশ্রমের নিয়ম—বিবাহ ও ব্রহ্মচর্য্য। পণ করতে হবে, যতদিন ভারত স্বাধীন না হয় ততদিন সন্তান উৎপাদন না করার জন্য তোমাদের অকপটে চেষ্টা করতে হবে। রতিকান্ত—তুমি আমার প্রধান ভক্ত—এই কঠিন পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়ে আমার মুখ রাখবে, শপথ কর।

রতিকান্ত—বাবা, স্ত্রী না-হওয়া তারামণিকে ঠেকান কঠিন,—কিন্তু ও আমার স্ত্রী হলে আমার কথা ও শুনবে। সতী পতির দাসী—হিন্দু নারীর যুগযুগান্তের সংস্কার—

বাবাজী—আবার ভুল করছো, দাসীর ধারণা মন থেকে মুছে ফেলতে হবে—বিবাহের পর তারামণি হবে তোমার সহোদরা ভগ্নী।

রতিকান্ত—(অস্ফুটস্বরে) সহোদরা ভগ্নী!

বাবাজী—হ্যাঁ, সমাজে ও মানুষের মনে এই বিপ্লবই আমরা আনতে চাই। তোমরা হবে তার অগ্রগামী পতাকাবাহী।

রতিকান্ত—তাহলে তারামণির সঙ্গেও পরামর্শ করতে হবে। তার মতটা—

বাবাজী—নিশ্চয় নিশ্চয়—তবে নিভৃতে আলাপ চলবে না। মাতাজীর সম্মুখে দু'জন মনের কথা খুলে বলবে। আমি গোয়াল-নন্দের বংশী বাবুর কাছে চিঠি দিচ্ছি, তুমিও তোমার বাবার—

রতিকান্ত—বাবা-মা'র সম্মতি পেয়েছি।

বাবাজী—(আহত হইলেন, দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন) আচ্ছা এখন এসো।

[রতিকান্তের প্রস্থান ও সম্পাদকের প্রবেশ]

বাবাজী—না, বিয়ে না দিয়ে উপায় নেই—রতিকান্ত রাজী আছে।

সম্পাদক—বিয়ে দিলেই কি ঢাকা যাবে—আশ্রমের কর্ম্মীরা বড়ই মুষড়ে পড়েছে, তারা ভাবছে, আপনার প্রশ্রয় পেয়েই—

বাবাজী—সব ঠিক হয়ে যাবে—এমন বৈপ্লবিক বিবাহ দেবো যাতে সমস্ত বাঙ্গলা দেশ চমৎকৃত হবে। প্রেম কাহিনীর পাঁকের ওপর ফুটে উঠবে ব্রহ্মচর্য্যের অম্লান পঙ্কজ। কত যুবক যুবতীর ইন্দ্রিয় যাবে বিকল হয়ে, পরাধীন ভারতে আর দাসের সংখ্যা বৃদ্ধি হবে না। এ পাশ্চাত্যের ইন্দ্রিয়ভোগমূলক জন্ম-শাসন নয়, এ নিরীন্দ্রিয়-ভাবনা-সিদ্ধ নরনারীর নিঃসন্তান ব্রত।

সম্পাদক—(সম্ভ্রমভরে) আপনি ভা... সদ যোগী—আপনার আদেশ আমাদে... নিকট ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ।

বাবাজী—(যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া) আমি সাধারণ মানুষ, তাঁকে অনুসরণ করা... চেষ্টা করি মাত্র—এখনও মৈত্রী ভাবনা... মন স্থির হয়নি।



রতিকান্ত পড়িল "জীবন সর্ব্বস্ব! কি দুঃ... যে দিন যাইতেছে তাহা কি তুমি বুঝ...?

আশ্রমে কর্ম্মীরা চঞ্চল। আজের ... কাকে রতিকান্তের প্রেমকাহিনীর আলোচ... কেহ রুষ্ট, কেহ বিরক্ত, কেহ ঈর্ষাকাতর ... শালডাঙ্গার শিশির তো মুষড়িয়া পড়িয়াছে... তারামণির প্রতি ওর লোভ ছিল, মুখ ফুটি... বলিতে পারে নাই; তারামণি যে আকাশে... তারা নয়, মাটিতেই সাধারণ গাছের ফুল, ... নত হইয়া হাত বাড়াইলেই ছোঁয়া যায়... একথা বুঝিয়া শিশির নিজেকে নির্বো... বলিয়া গালি দিল। দুই দুইবার ঠকি... শিশির প্রতিজ্ঞা করিল, এবার ... গোছের একটা মেয়ের প্রেমে পড়িবে... কিন্তু রতিকান্তের কাণ্ডের পর আশ্রমে... নিয়ম কঠোর হইয়াছে। অবিবাহিতা মেয়ে... দের কর্ম্মীদের সহিত মেলামেশা একরূপ ... হইয়াছে। বাবাজী... উপবাসের পর প্রতি... দিন সান্ধ্য-উপাসনা... পর ব্রহ্মচর্য্য দৃঢ় করি... বার জন্য বিশে... প্রার্থনা হয়। আশ্রমে... আবহাওয়া থমথমে...

আশ্রমের শান্তি... বিঘ্নিত হইয়া উঠি... ভেছে দেখিয়া বাবাজী... তাড়াতাড়ি শুভকার্য্য... শেষ করিবার জন্য... প্রস্তুত হইলেন... সম্পাদকের ... আমন্ত্রণ-লিপি ... কর্ম্মী ও আশ্রমে... পৃষ্ঠপোষকদের নিক... প্রেরিত হইল...



তোমরা ভক্তিভরে এই পাদোদক পান করিয়া ধন্য হও।

শুভদিন সমাগত। আশ্রমের উপাসনা মণ্ডপ পত্র-পুষ্পে সুসজ্জিত। মণ্ডপশীর্ষে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা। বিবাহ বেদীর দু' পাশে মেয়ে ও পুরুষেরা আলাদা হইয়া বসিয়াছেন। বেদীর উপর পাঁচখানি খদ্দর-মণ্ডিত আসন। সম্মুখে বাঁশের খুঁটিতে বাঁধা একটি ছাগী অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে কাঁঠালের পাতা চিবাইতেছে। পুরোহিতের আসনে খদ্দরের নামাবলী গায়ে বসিয়াছেন হরিজন শিক্ষক নমঃদাস।

এমন সময় বাবাজী রতিকান্তের হাত ধরিয়া এবং মাতাজী তারামণিকে লইয়া মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। সমবেত জনতা জয়ধ্বনি দিয়া বরবধূকে অভ্যর্থনা করিল,—মেয়েরা দিল উলুধ্বনি। রতিকান্ত ও তারামণি পাশাপাশি বসিল,—সম্মুখে বসিলেন—বাবাজী এবং মাতাজী। শুভ-কার্য্য আরম্ভ হইল। বাবাজীর ইঙ্গিতে একটি আশ্রম বালিকা ছাগীটার সম্মুখের দক্ষিণ পদ এক বাটি জলে ডুবাইয়া পাত্রটি বাবাজীর হাতে দিল।

বাবাজী—বৎস রতিকান্ত, কল্যাণীয়া তারামণি—এই অজ-জননী অহিংসা করুণা ও আত্মোৎসর্গের প্রতীক—তোমরা ভক্তিভরে এই পাদোদক পান করিয়া পবিত্র হও।

তথাকরণ।

বাবাজী—পরমপিতা পরমেশ্বরকে সাক্ষ্য রাখিয়া আমি কৃতসপ্তযজ্ঞ রতিকান্ত ও তারামণির বিবাহ সংস্কার সম্পন্ন করিতেছি। যাহারা উপস্থিত থাকিয়া অনুষ্ঠান দর্শন করিতেছেন,...তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করুন এই আদর্শ দম্পতী যেন বাঙ্গলার বিবাহ পদ্ধতি ও দাম্পত্য জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন আনিতে পারে। বাবা রতিকান্ত, মা তারামণি, এইবার তোমাদিগকে আমি কতকগুলি প্রশ্ন করিব, যথাযথ উত্তর দিয়া আমার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত কর।

(১) তোমরা পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে যাইতেছ, তোমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় কার্য্যক্ষম আছে তো?

উত্তরে—আছে।

(২) চক্রবাক যে-ভাবে চক্রবাকীর সহিত মিলিত হয়, পারাবত দম্পতী মিলিত হইয়া যে ভাবে হর্ষ প্রকাশ করে—তাহা হইতে বিরত থাকিয়া ইন্দ্রিয় বৈকল্যযোগে মতিস্থির রাখিতে পারিবে কি?

উত্তরে—আমরা কৃতসঙ্কল্প।

(৩) তোমরা কি বিশ্বাস কর বিবাহের মধ্যে ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার কোন স্থান নাই?

উত্তরে—করি।

(৪) তোমরা কি অতীতের স্বামী-স্ত্রী ভাব বর্জ্জন করিয়া পরস্পরের সহিত সহোদর-সহোদরার মত আচরণ করিতে পারিবে?

রতিকান্ত—আপনার আশীর্ব্বাদ থাকিলে পারিব।

তারামণি—(অস্ফুট অবোধ্য শব্দ উচ্চারণ)

বাবাজী—তোমাদের শুভ সঙ্কল্পে পরম পরিতুষ্ট হইলাম। আমার সহস্ত কর্ত্তিত এই সূত্রমাল্যে তোমাদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিলাম, এই সূত্র তোমরা সযত্নে রক্ষা করিয়ো। যখনই চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিবে, যখনই স্ত্রীর প্রতি স্বামীর, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর চিরাচরিত কর্ত্তব্য পালনের ইচ্ছা অদম্য হইয়া দেহ ও মনে বিকার উঠিবে তখন এই সূত্র স্পর্শ করিয়া, "রাম রাম জয় রাজা রাম, রাজা রাম জয় সীতারাম" এই মহাশক্তি মন্ত্র করতালি দিয়া গান করিবে। মনে রাখিয়ো এ বিবাহ-সংস্কার বৈপ্লবিক—সেবা ও সেবার সহায়তার জন্য পরস্পরের মিলন।

পুরোহিত বাঙ্গলা মন্ত্র পড়াইয়া বিবাহ সমাধা করিলেন। সন্ধ্যার পর রতিকান্ত যখন শুনিল বাসরঘরের ব্যবস্থা হইবে না, তখন সে খাটিয়ায় মনমরা হইয়া শুইয়া রহিল—কর্ম্মীরা ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াও তাহাকে রাগাইতে পারিল না।

কয়েকদিন পর রতিকান্ত বৌ লইয়া বাড়ী গেল। পিতামাতা নববধূ দেখিবার জন্য উদ্গ্রীব। বাবাজী বলিলেন, বৌমাকে রাখিয়া শীঘ্র চলিয়া আসিবে। রতিকান্ত বলিল, আশ্রমের এত কাজ সাত দিনের বেশী বাইরে থাকিবার উপায় নাই। কিন্তু ঘর, সংসারের কাজ, বাপ-মার অনুরোধ প্রভৃতি ছুতা দেখাইয়া রতিকান্ত ফিরিল তিন মাস পর।

আশ্রমের নিয়মমত সব চিঠি বাবাজী খুলিয়া পড়েন, তারপর কর্ম্মীরা পায়। তারামণি যে ভাষায় ও ভঙ্গীতে রতিকান্তকে চিঠি লিখিতেছে,—তাহাতে বাবাজী বৈপ্লবিক বিবাহে আর একটা বিপ্লবের আশঙ্কায় শঙ্কিত হইলেন। রতিকান্ত বাবাজীর নির্দ্দেশমত বারম্বার স্বাবলম্বন

[ইহার পর ৩২ পৃষ্ঠায়]



গ্রাম্যপথে — কালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার



দুঃশাসনীয়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

আগে, কিছুকাল আগে বেশী-দিনের কথা নয়, গভীর রাতেও হাতি-পুর গ্রামে এলে লোকালয়ের বাস্তব অনুভূতিতে স্বস্তি মিলত। মানুষের দেখা না মিলুক, মাঠ, ক্ষেত ডোবাপুকুর, ঝোপঝাড়, জলা অপরিসীম রহস্যে ভরাট হয়ে থাক, হুতোম প্যাঁচা ডেকে উঠুক হঠাৎ, জঙ্গলের আড়ালে শুকনো পাতা মচমচিয়ে হাঁটুক রাত্রিচর পশু। ঘটপুকুরের পুবোত্তর কোণের তালবন থেকে খোনা কান্না ভেসে আসুক আবছেয়ে শকুন ছানার, দীপচিহ্নহীন অন্ধকারে নিঝুম হয়ে ঘুমিয়ে থাক সারাটি গ্রাম: এসবই যোগাত ভরসা, রাত দুপুরে ঘুমন্ত গ্রামের এই সমস্ত লাগলই পরিবেশ। গ্রাম তো এই রকমি বাংলার রাত্রে, সব গ্রাম। গা ছম-ছম করত ভয়ের সংস্কারে, ভয় পেয়ে নয়।

আজ ভয় পাবে। সন্ধ্যার পর বাংলার গাঁগুলির স্বাভাবিক পরিবেশ আজ কি দাঁড়িয়েছে যারা জানে না, বাংলার গাঁয়ের কথা ভেবে সহরে বসে যেসব ভদ্রলোকের মাথা চিন্তা-বোমায় কেটে যাচ্ছে তাদের কথাই বলা যাক, বাংলার গাঁয়ে গাঁয়ে যে অভূতপূর্ব ভৌতিক কাণ্ডকারখানা চলছে সে বিষয়ে একান্ত অনভিজ্ঞ এইরকম কোন ভদ্রলোক আজকাল একটু রাত করে হাতিপুরে এলে ভয়ে দাঁতকপাটি লেগে মূর্চ্ছা যাবে। এরা বড় সংস্কার-বশ, প্রা অবশ। অতএব, দুর্ভিক্ষে গাঁয়ের অধিকাংশের অপমৃত্যু—নিরুত্তর। তারপর সেই গাঁয়ে চারিদিকে ছায়ামূর্ত্তির সকরুণ চোখে দেখে এবং মর্ম্মে অনুভব করে তার কি সন্দেহ থাকতে পারে যে জীবিতের জগৎ পার হয়ে সে ছায়ামূর্ত্তির জগতে এসে পৌঁছে গেছে?

গাছপালার আড়ালে একটা ছন্নের বাড়ী। বেড়া দেখা যায়। বেড়ার ওপাশ থেকে নিঃশব্দে ছায়া বেরিয়ে এসে ঝনঝন করে এগিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে জমকালো কতগুলো গাছের ছায়ার গাঢ় অন্ধকারে, নয়তো কাছা-কাছি এসে পড়ে থমকে দাঁড়াবে, চোখের পলকে একটা চাপা উলঙ্গিনী বিদ্যুৎ ঝলকের মত ফিরে যাবে বেড়ার ওপাশে। ডোবা-পুকুরে বাসন মাজবে ছায়া, ঘাটথেকে কলসী কাঁখে উঠে আসবে ছায়া। ছায়া কথা কইবে ছায়ার সঙ্গে, হাসবে কাঁদবে অভিশাপ দেবে অদৃষ্টকে, আর—। বিদেশীর সামনে পড়ে গেলে চকিতে ঝোপের আড়ালে অন্তরাল খুঁজে নিয়ে [illegible] প্রতিবাদের সুরে ছায়া বলবে, 'কে? কে গো ওখানে?'

কোন ছায়ার গায়ে লটকানো থাকে একফালি ন্যাকড়া, কোন ছায়ার [illegible]

শুভদিন সমাগত। আশ্রমের উপাসনা মণ্ডপ পত্র-পুষ্পে সুসজ্জিত। মণ্ডপশীর্ষে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা। বিবাহ বেদীর দু' পাশে মেয়ে ও পুরুষেরা আলাদা হইয়া বসিয়াছেন। বেদীর উপর পাঁচখানি খদ্দর-মণ্ডিত আসন। সম্মুখে বাঁশের খুঁটিতে বাঁধা একটি ছাগী অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে কাঁঠালের পাতা চিবাইতেছে। পুরোহিতের আসনে সিল্কের নামাবলী গায়ে বসিয়াছেন হরিজন [illegible] নমঃদাস।

এমন সময় বাবাজী রতিকান্তের হাত ধরিয়া এবং মাতাজী তারামণিকে লইয়া মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। সমবেত জনতা জয়ধ্বনি দিয়া বরবধূকে অভ্যর্থনা করিল,—মেয়েরা দিল হুলুধ্বনি। রতিকান্ত ও তারামণি পাশাপাশি বসিল,—সম্মুখে বসিলেন—বাবাজী এবং মাতাজী। শুভ-কার্য্য আরম্ভ হইল। বাবাজীর ইঙ্গিতে একটি আশ্রম বালিকা ছাগীটার সম্মুখের দক্ষিণ পদ এক বাটি জলে ডুবাইয়া পাত্রটি বাবাজীর হাতে দিল।

বাবাজী—বৎস রতিকান্ত, কল্যাণীয়া তারামণি—এই অজ-জননী অহিংসা করুণা ও আত্মোৎসর্গের প্রতীক—তোমরা ভক্তিভরে এই পাদোদক পান করিয়া পবিত্র হও।

তথাকরণ।

বাবাজী—পরমপিতা পরমেশ্বরকে সাক্ষ্য রাখিয়া আমি কৃতসপ্তযজ্ঞ রতিকান্ত ও তারামণির বিবাহ সংস্কার সম্পন্ন করিতেছি। যাঁহারা উপস্থিত থাকিয়া অনুষ্ঠান দর্শন করিতেছেন,…তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করুন এই আদর্শ দম্পতী যেন বাঙ্গলার বিবাহ পদ্ধতি ও দাম্পত্য জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন আনিতে পারে। বাবা রতিকান্ত, মা তারামণি, এইবার তোমাদিগকে আমি কতকগুলি প্রশ্ন করিব, যথাযথ উত্তর দিয়া আমার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত কর।

(১) তোমরা পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে যাইতেছ, তোমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় কার্য্যক্ষম আছে তো?

উত্তরে—আছে।

(২) চক্রবাক যে-ভাবে চক্রবাকীর সহিত মিলিত হয়, পারাবত দম্পতী মিলিত হইয়া যে ভাবে হর্ষ প্রকাশ করে—তাহা হইতে বিরত থাকিয়া ইন্দ্রিয় বৈকল্যযোগে মতিস্থির রাখিতে পারিবে কি?

উত্তরে—আমরা কৃতসঙ্কল্প।

(৩) তোমরা কি বিশ্বাস কর বিবাহের মধ্যে ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার কোন স্থান নাই?

উত্তরে—করি।

(৪) তোমরা কি অতীতের স্বামী-স্ত্রী ভাব বর্জ্জন করিয়া পরস্পরের সহিত সহোদর-সহোদরার মত আচরণ করিতে পারিবে?

রতিকান্ত—আপনার আশীর্ব্বাদ থাকিলে পারিব।

তারামণি—(অস্ফুট অবোধ্য শব্দ উচ্চারণ)

বাবাজী—তোমাদের শুভ সঙ্কল্পে পরম পরিতুষ্ট হইলাম। আমার সহস্ত কর্ত্তিত এই সূত্রমাল্যে তোমাদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিলাম, এই সূত্র তোমরা সযত্নে রক্ষা করিয়ো। যখনই চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিবে, যখনই স্ত্রীর প্রতি স্বামীর, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর চিরাচরিত কর্ত্তব্য পালনের ইচ্ছা অদম্য হইয়া দেহ ও মনে বিকার উঠিবে তখন এই সূত্র স্পর্শ করিয়া, "রাম রাম জয় রাজা রাম, রাজা রাম জয় সীতারাম" এই মহাশক্তি মন্ত্র করতালি দিয়া গান করিবে। মনে রাখিয়ো এ বিবাহ-সংস্কার বৈপ্লবিক—সেবা ও সেবার সহায়তার জন্য পরস্পরের মিলন।

পুরোহিত বাঙ্গলা মন্ত্র পড়াইয়া বিবাহ সমাধা করিলেন। সন্ধ্যার পর রতিকান্ত যখন শুনিল বাসরঘরের ব্যবস্থা হইবে না, তখন সে খাটিয়ায় মনমরা হইয়া শুইয়া রহিল—কর্ম্মীরা ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াও তাহাকে রাগাইতে পারিল না।

কয়েকদিন পর রতিকান্ত বৌ লইয়া বাড়ী গেল। পিতামাতা নববধূ দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। বাবাজী বলিলেন, বৌমাকে রাখিয়া শীঘ্র চলিয়া আসিবে। রতিকান্ত বলিল, আশ্রমের এত কাজ সাত দিনের বেশী বাইরে থাকিবার উপায় নাই। কিন্তু ঘর, সংসারের কাজ, বাপ-মার অনুরোধ প্রভৃতি ছুতা দেখাইয়া রতিকান্ত ফিরিল তিন মাস পর।

আশ্রমের নিয়মমত সব চিঠি বাবাজী খুলিয়া পড়েন, তারপর কর্ম্মীরা পায়। তারামণি যে ভাষায় ও ভঙ্গীতে রতিকান্তকে চিঠি লিখিতেছে,—তাহাতে বাবাজী বৈপ্লবিক বিবাহে আর একটা বিপ্লবের আশঙ্কায় শঙ্কিত হইলেন। রতিকান্ত বাবাজীর নির্দ্দেশমত বারবার সাবধান

[ইহার পর ৩২ পৃষ্ঠায়]



গ্রাম্যপথে কালীকিঙ্কর ঘোষ দাস্তিদার



দুঃশাসনীয়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

আগে, কিছুকাল আগে বেশী-দিনের কথা নয়, গভীর রাতেও হাতিপুর গ্রামে এলে লোকালয়ের বাস্তব অনুভূতিতে স্বস্তি মিলত। মানুষের দেখা না মিলুক, মাঠ, ক্ষেত ডোবাপুকুর, ঝোপঝাড়, জলা অপরিসীম রহস্যে ভরাট হয়ে থাক, হুতোম পাঁচা ডেকে উঠুক হঠাৎ, জঙ্গলের আড়ালে শুকনো পাতা মচমচিয়ে হাঁটুক রাত্রিচর পশু। ঘটপুকুরের পুবোত্তর কোণের তালবন থেকে খোনা কান্না ভেসে আসুক আবদেরে শকুন ছানার, দীপচিহ্নহীন ছায়ান্ধকারে নিঝুম হয়ে ঘুমিয়ে থাক সারাটি গ্রাম: এসবই যোগাত ভরসা, রাত দুপুরে ঘুমন্ত গ্রামের এই সঙ্গত লাগসই পরিবেশ। গ্রাম তো এই রকমি বাংলার রাত্রে, সব গ্রাম। গা ছম-ছম করত ভয়ের সংস্কারে, ভয় পেয়ে নয়!

আজ ভয় পাবে। সন্ধ্যার পর বাংলার গাঁগুলির স্বাভাবিক পরিবেশ আজ কি দাঁড়িয়েছে যারা জানে না, বাংলার গাঁয়ের কথা ভেবে সহরে বসে যেসব ভদ্রলোকের মাথা চিন্তা-বোঝায় কেটে যাচ্ছে তাদের কথাই বলা যাক, বাংলার গাঁয়ে গাঁয়ে যে অভূতপূর্ব ভৌতিক কাণ্ডকারখানা চলছে সে বিষয়ে একান্ত অনভিজ্ঞ এইরকম কো[illegible] কোন ভদ্রলোক আজকাল একটু রাত ক[illegible] হাতিপুরে এলে ভয়ে দাঁতকপাটি লেগে [illegible] মূর্চ্ছা যাবে। এরা বড় সংস্কার-বশ, মন এ[illegible] অবশ। অতএব, দুর্ভিক্ষে গাঁয়ের অধিকাংশো[illegible] অপমৃত্যু—নিরুদ্ধার। তারপর সেই গাঁ[illegible] চারিদিকে ছায়ামূর্ত্তির সঞ্চরণ চোখে দেখে[illegible] এবং মর্ম্মে অনুভব করে তার কি সন্দেহ[illegible] থাকতে পারে যে জীবিতের জগৎ পার হয়ে[illegible] সে ছায়ামূর্ত্তির জগতে এসে পৌঁছে গেছে?

গাছপালার আড়ালে একটা ছন্নের বাড়ী। বেড়া দেখা যায়। বেড়ার ওপাশ থেকে নিঃশব্দে ছায়া বেরিয়ে এসে কনকন কর[illegible] এগিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে জমকালো কতগুলো গাছের ছায়ার গাঢ় অন্ধকারে, নয়তো কাছা-কাছি এসে পড়ে থমকে দাঁড়াবে, চোখের পলকে একটা চাপা উলঙ্গিনী বিদ্যুৎ ঝলকের মত ফিরে যাবে বেড়ার ওপাশে। ডোবা-পুকুরে বাসন মাজবে ছায়া, ঘাট থেকে কলসী কাঁখে উঠে আসবে ছায়া। ছায়া কথা কইবে ছায়ার সঙ্গে, হাসবে কাঁদবে অভিশাপ দেবে অদৃষ্টকে, আর—। বিদেশীর সামনে পড়ে গেলে চকিতে কোণের আড়ালে অন্তরাল খুঁজে নিয়ে [illegible] করুণ প্রতিবাদের সুরে ছায়া বলবে, "কে? কে গো ওখানে?"

কোন ছায়ার গায়ে লটকানো [illegible] একফালি ন্যাকড়া, কোন ছায়ার [illegible]

জড়ানো থাকে গাছের পাতার সেলাই করা ঘাঘরা, কোন ছায়াকে ঘিরে থাকে শুধু সীমাহীন রাত্রির আবছা আঁধার, দ্রৌপদীর অন্তহীন অবর্ণনীয় রূপক বস্ত্রের মত।

সারাটা দিন, সূর্য্যের আলো যতক্ষণ উলঙ্গিনীকে নিজের কাছেই উলঙ্গিনী করে রাখে, ছায়াগুলি বাড়ীর ভিতরে ও ঘরের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে। কোন কোন ছায়া থাকে একেবারে অন্ধকার ঘরের মধ্যে লুকিয়ে বাপ ভাই স্বামী শ্বশুরের সামনে বার হতে পারে না; স্ত্রীলোক-সুলভ লজ্জায়। কোন বাড়ীতে কয়েকটি ছায়া থাকে এক সঙ্গে, মা, মাসী, খুড়ী, পিসী, মেয়ে, বোন, বাড়ুজী বৌ ইত্যাদি বিবিধ সম্পর্ক সে ছায়াগুলির মধ্যে—এক একজন ছায়া পালা করে বাইরে বেরোয়।

ভোলা নন্দী কোমরের ঘুন্সীর সঙ্গে দু' আঙুল চওড়া পট্টি এঁটে তার পাঁচহাতি (তখানা) বাড়ীর মেয়েদের দান করেছে। কাপড়খানা যে কোন সাধারণ গতরের স্ত্রীলোকের কোমরে একপাক ঘুরে বুক ঢেকে কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে—কাঁধে সর্বক্ষণ অবশ্য ধরে রাখতে হয়, নইলে বিপদ। ভোলার বৌ ঘাটে যায়। ঘাট থেকে ঘুরে এসে ভিজে কাপড়টি খুলে দেয়। ভোলার মেজ ছেলে (বড় ছেলে জেলে জেলে পচছে, গন্ধ সকলের নাকে লাগে) পটলের বৌ পাঁচী বা ভোলার মেয়ে শিউলি কাপড়টি পরে ঘাটে যায়।

'কৎকাল এমনি কয়েদ হয়ে থাকবো মা?' বলে পাঁচী হু হু করে কেঁদে ওঠে। 'আর সয় না!' বলে' শাল কাঠের মোটা খুঁটিতে মাথাটা ঠকাস করে ঠুকে দেয়। 'আর সয় না, আর সয়না, আর সয়না গো!' বলতে বলতে মাথা ঠুকতে থাকে খুঁটিতে খুঁটিতে, গড়াগড়ি দেয় আগের গোবর লেপা গুঁড়ো গুঁড়ো মাটিতে, ধুলায় ধূসর হয়ে যায় তার অপুষ্ট দেহ, পরিপুষ্ট স্তন। হায়, ধুলো মাটি ছাই কাদা মেখেও যদি আড়াল করা যেত মেয়েমানুষের লজ্জাজনক পোড়া দেহের লজ্জা!

বৈকুণ্ঠ মালিক মাঠে মাঠে ভীষণ খাটে, নিজেকে আর বৌটাকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে। সন্ন্যাসীবাবুর দালানের পর আমবাগান, তার এপাশে রাস্তা ওপাশে ঘুপচি মারা পথের ইয়ার্কি, দু'বিঘে বিচ্ছিন্ন ধান জমির লাগাও বৈকুণ্ঠের আড়াই কুঁড়ের তিন পুরুষের বসতবাটী। আড়াই কুঁড়ের মধ্যে ঘর বলা যায় একটাকে, তার বাঁশের দরজা—বাঁশ দেয়ালে, বাঁশ দুয়ারে, বাঁশের খিল। বাঁপে থপ থপ থাপড় মেরে বৈকুণ্ঠ প্রায় পিণ্ডি-কাটা তেতো গলায় বলে 'বাড়াবাড়ি করছিল ছোট বৌ, বাড়াবাড়ি করতেছিস বড্ড। মোর কাছে তোর লজ্জাটা কি?'

তার বৌ মানদা ভেতর থেকে বলে, 'মুখপোড়া বজ্জাত! বোনকে কাপড় দিয়ে বোয়ের সাথে মসকরা? যমের অরুচি, লক্ষ্মীছাড়া।'

সুন্দর সকাল, সুন্দর সন্ধ্যা—কচুর পাতার শিশির ফোঁটায় মুক্তা হীরার জয়-জয়কার। সকাল থেকে সন্ধ্যা তক্ ঝাঁপের দু'পাশে এমনি গালাগালি চলে দু'জনের মধ্যে। বাড়ীর তিনদিকে মাঠ ভরে শন উঁচু হয়ে আছে আড়াই থেকে তিন হাত। ছুটে গিয়ে ডুব দিলে লজ্জাসরম সব ঢাকা পড়ে যায়—আকাশের দিকে চেয়ে প্রাণভরে কাঁদা যায় নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে। এই শনের বনের মাঝখানের পায়ে-হাঁটা পথ ধরে বেনারসী শাড়ী পরা গোকুলের বোন মালতী বিপিন সামন্তের পিছু পিছু ছ'কুনের হাটনীর দিকে চলতে থাকে গর্ব্বে ফাটতে ফাটতে, তাই তাকিয়ে ছাখে মানদা ঘরের বেড়ার ফোকর জানালায় চোখ রেখে। দাসু কামারের মেয়েটা আজ ওদের সঙ্গে যাচ্ছে ও-ওতো রাতের ছায়া ছিল কাল রাত্রি তক্, সারাদিন ঘরে লুকিয়ে থেকে চুপি চুপি ঘাটে আসত ছটোচারটে বাসন আর কলসী নিয়ে। ধোপদুরস্ত সাদা থান কাপড়টা কোথা পেল ও সধবা মাগী?

শন ক্ষেতের রকমভঙ্গ রঘু একটু মসকরা করে বেনারসী পরা মালতীর সঙ্গে, দেখে যেন যাত্রাদলের মেয়ে সাজা ছেলে সখির মত ভড়কে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় রাণুর হাপুসকাঁদা ষোল বছরের কাঁচা মেয়ে। এদিক ওদিক চায়। হঠাৎ পিছু ফিরে হাঁটতে থাকে হনহনিয়ে, ফাঁদ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে হরিণী যেন পালাচ্ছে যেদিকে পালানো চলে। ইস্! কি সাদা ওর পরনের ধুতিটা!

'অ বিন্দী! দাঁড়া।' রঘু ডাকে।

বিন্দী দাঁড়ায়। ফাঁদছাড়া হরিণী তো নয় আসলে, মানুষের মেয়ে। দাঁড়িয়ে মুখ ফেরায়। বলে, 'কাল—কাল যাব সামন্ত মশায়। বড় ডর লাগছে আজ।'

বেনারসী পরা মালতী বলে, 'ইহিহে

(ইহার পর ২৫৩ পৃষ্ঠায়)



শোভাযাত্রা কালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার

বন্ধু-বিদায়

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়



কলকাতা শহর। শ্যামবাজার। চমৎকার বাড়ী। দোতলার একখানি ঘর। সুন্দর সাজানো। কেমনভাবে সাজানো, কোথায় চেয়ার, কোথায় সোফা, কোন্‌দিকে দরজা, কোন্‌দিকে জানালা, দরজায় জানালায় পর্দা আছে কি-না, কি রংএর পর্দা—আপনারা যেমন খুশী ভেবে নিন।

বাড়ীর মালিক শিশির চৌধুরী, প্রিয়দর্শন বলা চলে না, তবে বয়স কম। বাড়ীতে বসে থাকলে চলে, তাই বাড়ীতেই বসে আছে।

শিশিরের স্ত্রী নীলিমা। যুবতী এবং সুন্দরী। সুন্দরী বলতে আপনি যা বুঝেন, ঠিক তাই।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনে বসে বসে চা খাচ্ছে।

সবে তখন সন্ধ্যে হচ্ছে। গ্রীষ্মকাল।

দরজার বাইরে থেকে সাহেবী পোষাক-পরা প্রিয়দর্শন একজন যুবক বললে: May I come in?

বলেই আর জবাবের অপেক্ষা না করে' ঘরে ঢুকে পড়লো। নীলিমা তাড়াতাড়ি তার চায়ের পেয়ালাটা হাতে নিয়ে পালিয়ে গেল।

শিশির উঠে দাঁড়িয়ে বললে: কে?

আগন্তুক। চিনতে পারছো না?

শিশির। তুমি। সমর! এলে কবে? এসো—বোসো, বোসো। গোঁফ কামিয়েছ, রং ফরসা হয়েছে, চট করে' চেনাই যায় না।

সমর। (চেয়ারে বসে) তোমার দরোয়ানটা আর একটু হলেই দিয়েছিল তাড়িয়ে। তারপর হেসে কথা বলতেই সে চিনতে পারলে। বললে বাবুজি কোথায় ছিলে এদ্দিন? বললুম—বিলেতে। মংলু অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তারপর বললে—যান, দাদাবাবু ওপরে।

শিশির। তা চিনবে কেমন করে'। ছ' বচ্ছর হ'লো, না?

সমর। হ্যাঁ, ছ' বছর সাত মাস। ইউরোপ আমেরিকার কোনও দেশ আর বাকি নেই। সব ঘুরে এসেছি।

শিশির। কিন্তু এটা তোমার ভারি অন্যায় সমর। যাবার আগে আর-কাউকে না বল, আমাকে বলে' যাওয়া উচিত ছিল। দিনের পর দিন তুমি আসছ না দেখে ভাবলুম বুঝি অসুখ-বিসুখ করেছে। গেলাম তোমার বাড়ী। সর্বনাশ! গিয়ে দেখি কান্নাকাটি পড়ে গেছে। মা কাঁদছে, দিদি কাঁদছে, থানায় থানায় খবর দেওয়া হয়েছে। আমাকে দেখেই দিদি ছুটে এলো। বললে, এই যে শিশির এসেছে, ও ঠিক জানে সমর কোথায় গেছে। কি লজ্জায় যে পড়লুম তখন! শুধু লজ্জা নয়, তোমার কি হ'লো ভেবে ভেবে সারা রাত ঘুমই হ'লো না। সকালে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে যাব, এমন সময় তোমার টেলিগ্রাম আমেরিকা চললে। ছুটতে ছুটতে গে তোমাদের বাড়ীতে। দিদি হাসতে হাস বললে, আমেরিকা। তারপর তুমি আমা একখানা চিঠিও লিখলে না। খুব রাগ

সমর। আমার মাথার ঠিক ছিল

শিশির। লুকিয়ে পালালাম যে। বাক্স ভেঙে টাকা চুরি করে' লুকি পালালাম। কিন্তু তার শাস্তি মা আমা দিয়ে গেছেন। এসে আর তাঁকে দেখ পেলুম না।

শিশির। আমারও জীবনে অ কিছু ওলট-পালট হয়ে গেল সমর, আমা বাবা মারা গেলেন। বিয়ে করলুম।

সমর। বুঝেছি। এই যে এইখা বসেছিলেন, আমাকে দেখেই পালি গেলেন, উনিই বুঝি তোমার স্ত্রী? হাঁ কি সেই—সেই তোমার—আহা-হা, নাম ভুলে গেলাম, সেই বিয়ের আগে যার সা তোমার চিঠি লেখালেখি চলতো—যে যাকে তুমি ভালবেসে—

শিশির। (ঘাড় নেড়ে) হ্যাঁ—হ্যাঁ—সেই—সেই নীলিমা। ভারি চমৎকা মেয়ে। আজ তিন বছর আমাদের বি হয়েছে, কিন্তু একটি দিনের জন্যেও ঝগড়াঝাঁ কিছু হয় নি। শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে ওকে আমি পেয়েছি সমর।

সমর। তাহ'লে তোমরা দু'জনেই সুখী

শিশির। সুখী হব না? আমা কাছে যে মেয়েদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আমি তো আর স্ত্রীকে আমার সম্পত্তি ভেবে আটকে রাখতে চাই না।

সমর। ভাল, ভাল। শুনে খুশী হলেম কিন্তু ঐ যে বললে তিন বছরের মধ্যে একটি দিনের জন্যেও ঝগড়াঝাঁটি হয়নি বৌ-এর সঙ্গে—এটা তো খুব ভাল লক্ষণ নয়। আমি হ'লে ঝগড়াঝাঁটি দূরের কথা, শেষ পর্যন্ত ছাড়াছাড়ি হয়ে যেতো।

শিশির। সে কি হে! মেয়েদের সম্বন্ধে এখনও কি তোমার ঠিক সেই ধারণাই আছে নাকি?

সমর। কি ধারণা?

শিশির। সেই যে তুমি বলতে—'মেয়েদের আমি ঘৃণা করি।'

সমর। নিশ্চয়ই করি। সে ধারণা আমার যতদিন বাঁচবো ততদিন থাকবে। তোমরা শুধু নিজের স্বুধা দিয়ে ওদের বিচার কর, তাই তোমাদের কাছে ওরা দেবী, ওরা মধুর, ওরা অপরূপ,—আরও কতকি......

শিশির। সে মত কি তোমার ওদের দেশে গিয়েও বদলালো না?

সমর। (হেসে) বদলাবে কি হে, বদলায়নি, বরং বেড়েছে। আমাদের দেশে মেয়েরা ঘোমটা টেনে তাদের দীনতা ঢেকে অন্দরমহলে চুপ করে' বসে থাকে, আর ওদের দেশে সব খোলাখুলি। সাজপোষাক থেকে আরম্ভ করে' হাব-ভাব কথাবার্তা চাল-চলন সবেতেই sex. ওরা যেন sex ছাড়া আর কিছু নয়।

শিশির। আমাদের দেশে কিন্তু তা নয় সমর। sex ছাড়াও মেয়েদের যেএকটা পৃথক—

সমর। আরে থামো, থামো, তোমার ও যুক্তিবাদ আমি শুনতে চাই না। সব জায়গাতেই সমান ভাই। মেয়েদের হাব-ভাব দেখলে আমার ঘৃণায় সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়। ওরা নীচ, ওরা স্বার্থপর, ওরা বিশ্বাসঘাতক, ওরা—(সশব্দে দরজা বন্ধ করবার আওয়াজ) এটা কি হলো?

শিশির। সবই শুনছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, বুঝতেই তো পারছো।

সমর। ছাখো—নিজেদের কথা চুরি করে' শোনবার আগ্রহ ছাখো। এক কাপ চা খাওয়াও দেখি।

শিশির। নিশ্চয় খাওয়াবো।—দশরথ! দশরথ!

দশরথ। আমাকে ডাকছেন বাবু?

শিশির। হ্যাঁ, চা নিয়ে এসো। আর তোমার মাকে বল—বাবু আজ রাত্রে এই-খানেই খাবেন, এইখানেই থাকবেন।

(দশরথের প্রস্থান)

সমর। খেতেও হবে, থাকতেও হবে?

শিশির। হাঁ, খেতেও হবে, থাকতেও হবে, আজ আর তোমাকে আমি ছাড়ছি না।

সমর। আমার এই সব কথা শোনবার পরেও কি ভেবেছ তোমার স্ত্রী আমাকে—

শিশির। আরে না না, নীলিমাকে তুমি চেনো না সমর, সেরকম মেয়ে ও নয়। দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে পরিচয় করে' দিই। নীলিমা! নীলিমা! এসো না! এখানে লজ্জা কিসের? সমরের কথা তো তোমাকে আমি কতবার বলেছি—। ও আমার—

(দশরথের প্রবেশ)

দশরথ। মা বললেন, মাসীমার বাড়ী না গেলে তিনি ভারি দুঃখু করবেন।

শিশির। আচ্ছা, সে মাসীমার বাড়ী যাবে'খন। চায়ের কি হ'লো?

দশরথ। চা হবে না। বাড়ীতে দুধ নেই। দোকান থেকে চা আনতে বললেন।

সমর। (হো হো করে' হেসে উঠলো) শুনলে শিশির, শুনলে তো?

শিশির। তোমার সঙ্গে রসিকতা হয়েছে।—আর মাসীমা মানে আমার শালী, এই কাছেই থাকে, ছেলের অন্নপ্রাশন, তাই সেখানে আমাদের দু'জনেরই এক্ষুণি যাওয়ার কথা ছিল।

সমর। বেশ তো, আজ তাহ'লে আমি উঠি। তোমরা যাও।

শিশির। পাগল হয়েছ? এতদিন পরে তোমাকে পেয়েছি, আজ আমি কিছুতেই ছাড়বো না। (উঠে দাঁড়িয়ে) আসছি, বোস।

সমর। (পকেট থেকে সিগারেট বের করে' দেশলাই জ্বেলে ধরিয়ে টানতে টানতে) দশরথ! দশরথ! তুমি এখানে কতদিন আছ?

দশরথ। আজ্ঞে, এক বছর হবে।

সমর। রান্না করবার জন্যে এ-বাড়ীতে ঠাকুর আছে, না, তোমার মা রান্না করেন?

দশরথ। আজ্ঞে না, বামুন-ঠাকুর আছে।

সমর। (পকেট থেকে পয়সা বের করে' দশরথের হাতে দিয়ে) যাও তো বাবা, কাছাকাছি দোকান থেকে চট করে' এক পেয়ালা চা নিয়ে এসো দেখি।

(দশরথের প্রস্থান)

(সিগারেট টানতে টানতে সমর ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলো। দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলির দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ সে যে-ছবিখানির নীচে দাঁড়িয়ে পড়লো, সেখানি নীলিমার ছবি। ঘরে ঢুকলো শিশির ও নীলিমা।)

শিশির। এসো সমর, নীলিমা এসেছে। তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই।

সমর। পরিচয়ের কি এখনও কিছু বাকি আছে? অভ্যাগত অতিথিকে যখনই উনি দোকান থেকে চা আনিয়ে খেতে বলেছেন, ওঁর পরিচয় আমি তখনই পেয়েছি।

নীলিমা। আর ওঁর পরিচয়ও কি আমি পাইনি নাকি? যাঁর বাড়ীতে এসেছেন, তাঁকে দেখবার আগেই যিনি নীচ, স্বার্থপর, বিশ্বাসঘাতক, ইতর—এই সব বলতে পারেন, তাঁরও তো পরিচয়ের কোনও প্রয়োজন নেই।

সমর। (এগিয়ে এসে চেয়ারে বসে) দেখুন, ওই 'ইতর' বিশেষণটা আমার মনে ছিল না, বোধ হয় বলিনি, ওটা আপনি নিজেই প্রয়োগ করলেন, সেজন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

শিশির। একি! তোমরা দু'জনে যে ঝগড়া সুরু করলে দেখছি।

সমর। ওঁদের সঙ্গে যে আমার ঝগড়ারই সম্পর্ক শিশির। চিরকাল ঝগড়া করেছি, আজও করব।

(দশরথ দোকান থেকে চা নিয়ে এলো। সমর হাত বাড়িয়ে পেয়ালাটি নিতেই)

নীলিমা। চা কি দোকান থেকেই এলো?

সমর। আজ্ঞে হ্যাঁ। বাড়ীতে যার সবই থাকে, অথচ কিছুই থাকে না, বাইরের আশ্রয় তাকে নিতেই হয়।

নীলিমা। সব-কিছু থাকতেও নির্বোধের মত চোখ বুজে কিছু নেই বলে' যে অস্বীকার করে, ভাগ্য তার এমনি মন্দই হয়ে থাকে।

সমর। (চা খেতে খেতে) তা হোক্। সেজন্যে সে আর যাই করুক্, আক্ষেপ করে না।

নীলিমা। (হেসে) তর্ক করে' লাভ নেই। (স্বামীর দিকে তাকিয়ে) দিদির বাড়ী যাওয়া কি হবে না?

শিশির। না গেলে খুব খারাপ দেখাবে, না? আচ্ছা এক কাজ করা যাক্, তোমরা ততক্ষণ ঝগড়া কর, আমি চট করে' নিজেই গাড়ীটা নিয়ে গিয়ে একবার দেখা করে' আসি। (দরজার কাছ থেকে ফিরে) এসে যেন পুলিশ ডাকতে না হয়।

সমর। কিন্তু এ যে তুমি আমাকে শত্রুপুরীর মধ্যে রেখে গেলে শিশির?

শিশির। (দোরের বাইরে থেকে) চেষ্টা করে' ছাখো যদি পরাজিত করতে পারো। (সিঁড়িতে শিশিরের জুতোর শব্দ মিলিয়ে গেল)

সমর। শুনলেন তো? আসুন, যুদ্ধং দেহি।

নীলিমা। যুদ্ধক্ষেত্রে নারী পুরুষকে পরাজিত করেছে, ইতিহাসে সেরকম দৃষ্টান্তও খুঁজলে পাওয়া যায়।

সমর। জানি। সে দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। খুঁজতে হয়। তার চেয়ে যা সর্ববাদীসম্মত, যা অবিসম্বাদী সত্য, তা হচ্ছে এই যে, সৃষ্টির আদিকাল থেকে নারী পুরুষের বশ্যতা স্বীকার করবে। এ-ই প্রকৃতির নিয়ম।

নীলিমা। বন্ধুত্বের নাম আপনারা দিলেন বশ্যতা। নারী আপনাদের বন্ধু না হয়ে হলো দাসী, আর সেই পাপেই ভারতবর্ষের দুর্গতির আজ আর অবধি নেই।

সমর। (ঈষৎ হেসে) দাসী না করে' নারীকে যে-দেশ বন্ধুত্বের মর্যাদা দিয়েছে, সে-দেশও আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম নীলিমা দেবী।

নীলিমা। কি দেখলেন সেখানে?

সমর। দেখলাম, আজ যে বন্ধু, কাল সে-ই হয়েছে পরম শত্রু। গৃহ বলে কোনও বস্তু সেখানে নেই।

নীলিমা। গৃহ কি আপনাদের এই-খানেই আছে ভেবেছেন?

সমর।. কেন ভাববো না? এই তো দেখছি চমৎকার গৃহ। বিয়ের আগে দু'জন দু'জনকে ভালবেসেছেন, চিঠিপত্র লিখেছেন, সে-সব চিঠি অবশ্য আমি দেখেছি বলেই বলছি। তারপর এই তো—আপনারা বেশ কেমন দুটিতে সুখের সংসার—

নীলিমা। থাক্ আর শুনতে চাই না। (ঠোঁটের কাঁকে একটু চাপা হাসি হেসে) বিয়ের আগে—আপনার বন্ধুকে আমি চিঠি লিখতাম— কে বললে?

সমর। হাঁ হাঁ উত্তেজিত হবেন না। উড়িয়ে অবশ্য দিতে পারতেন, সে-সব চিঠি যদি-না আমি স্বচক্ষে দেখতাম। শুধু দেখা নয়, আপনার কাছে যে-সব চিঠি যেতো, আজকে আর বলতে দোষ কি, তার বেশীর ভাগই আমার লিখে দেওয়া।

নীলিমা। যাঃন্! (লজ্জিত নতমুখে) তবে যে বললেন, মেয়েদের আপনি ঘৃণা করেন?

সমর। করিই তো, নিশ্চয়ই ঘৃণা করি।

নীলিমা। মিথ্যা কথা। আমি বিশ্বাস করি না।

সমর। কেন? অবিশ্বাসের কি দেখলেন?

নীলিমা। সে-সব চিঠির অর্ধেক তো দূরের কথা, একটি লাইনও যিনি লিখতে পেরেছেন তিনি আর যাই করুন, মেয়েদের ঘৃণা করেন না এ-কথা সত্যি।

সমর। ধরুন, সে আজ অনেক দিনের কথা। সে মত তো আমার বদ্‌লাতেও পারে।

নীলিমা। কিন্তু আপনার বন্ধু বললেন, আমি শুনেছি, আপনি নাকি তারও আগে থেকে নিজেকে নারী-বিদ্বেষী বলে' প্রচার করেন।

সমর। প্রচার করি? অর্থাৎ আমি নারী-বিদ্বেষী নই?

নীলিমা। না। আপনি ভণ্ড। আমাদের দুর্বলতা যে কোথায়—(হাসতে হাসতে) একটু অপেক্ষা করুন আমি আসছি।

(নীলিমা চলে গেল)

(আবার একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে সে নীলিমার ছবিখানির দিকে একাগ্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। দশরথ এলো দোকানের কাপ-ডিস্ তুলে নিয়ে যাবার জন্যে)

সমর। খুব মনে পড়িয়েছিস বাবা, আর এক কাপ চা এনে দে। এটা তেমন সুবিধে হয়নি।

(নীলিমা ঘরে ঢুকলো।)

নীলিমা। ও কি হচ্ছে? আবার চা? না রে না দশরথ, চা আর আনতে হবে না, খাবার হয়ে গেছে। যা তুই রান্নাঘরে যা।

(দশরথ চলে গেল)

সমর। খাবার? খাবার তো আমি খাব না এখানে।

নীলিমা। কেন? (হেসে) দোকানে চা খেতে বলেছি বলে?

সমর। নিশ্চয়। আমি চললুম। শিশিরকে বলবেন—আমার সঙ্গে দেখা করতে হ'লে সে যেন আমাদের বাড়ী যায়। (উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল)

নীলিমা। (ছুটে দরজার কাছে গিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে) না, আপনি না খেয়ে যেতে পাবেন না।

সমর। খাওয়া কিন্তু আমার উচিত। মেয়েদের অপমান সহ্য করার অভ্যেস আমার নেই।

নীলিমা। (ব্যথিতকণ্ঠে) আমি আপনাকে অপমান করেছি?

সমর। নিশ্চয় করেছেন।

নীলিমা। বেশ। তার জন্যে ক… চাচ্ছি। হ'লো?

সমর। (নীলিমার মুখের পানে এ… দৃষ্টে চেয়ে) আচ্ছা, এবারের মত ক্ষমাই … হয় করা গেল। (চেয়ারে বসে) আচ্ছা আপনি কি মনে করেন, শিশিরকে আপনি সুখী করতে পেরেছেন?

[ইহার পর ২৩১ পৃষ্ঠায়]



আহ্বান শিল্পী—সুনীল পাল



ক্ষীরি গয়লানী

সুনীল চন্দ্র সরকার

যে যাই বলুক, কথাটা কিন্তু সত্যি
একদা ক্ষীরির ছিল কিছু সম্পত্তি।
যেথা ছিল ওর গোলা
তাকে কেবল এবড়ো খেবড়ো
মাটিটা সেথানে খোলা;
আজ ঘরে নেই বাসন কাঁসা কি পেতল
তখন কিন্তু কাঁসার বাসনে
দিত ঠাকুরের শেতল;
অ্যালুমিনিয়ম ছেড়ে
মাটির হাঁড়িতে ভাত রেঁধে
আজ খায় কলাপাতে বেড়ে।
ভয় নেই আজ পথের ওপর
খোলা দাবাটায় শুতে,



পাড়ার মাতাল মিনসেরা কেউ
সাহস করে না ঢুকতে,
শুধু দেখে যায় লম্বাটে মুখ,
কপাল শিরায় নীল,
ঘন ভুরু যেন দু'পাখা মেলেছে চিল,
কল চানো চুল জড়ুল চোখের কাছে,
ঠোঁটের ওপরে মিহিকালো রোঁয়া আছে
গড়নে পেটনে যেন পুরুষের সমান;
বুকের কাছটা কিছুটা মেয়েলি প্রমাণ
লোভীকে আস্তে হটায়।
কিন্তু সে মিছে। এই এতবড় গাঁ টায়
সকলেই করে ক্ষীরির জিভকে ভয়।

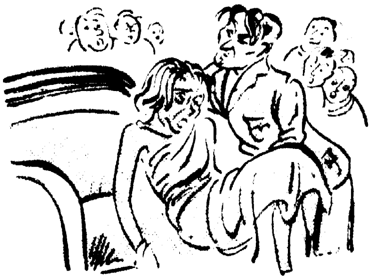
বেধেছে যুদ্ধ, খারাপ সময়,
অভাবে প'ড়েছে ক্ষীরি,
ভিটে বাটি গেছে, বাকি আছে দাসীগিরি।

পাশের বাড়ীতে চালাতে চাইলে ঢেঁকি,
তারা হেসে বলে, সে কি
ধান তো এখন ভানাই নতুন কলে।
ক্ষীরি ভয় পায়, পেটটা কি ক'রে চলে?
ধঞ্জি ডুমুর; তিতকোকাফল,
শাক তো পুকুরে ঘাটে;
তবু কিছু চাল কেনাই তো চাই হাটে?
অপরের গাছে চুরিকরা থোড়
কুমড়ো ও মোচা বেচে
কয়েকটা মাস গেছে,
কিছুকাল গিয়ে খালে
বোল চাটা আর মৌরলামাছ
ধ'রেছে ছাঁকনি জালে,
কতদিন পরিপাটি
কোদাল কুপিয়ে তিনু কুমোরের
যোগান দিয়েছে মাটি,
— তিনু বুড়ো মলে ভেবেই পেলেনা ক্ষীরি
দু'বেলা দু'মুঠো কেমনে জুটবে
না ক'রলে দাসীগিরি।
এদিকে তখন জাপান নিয়েছে
বর্ম্মা দখল ক'রে
আইনের ফাঁকে বাংলার চাল
লুটে নেয় কোন চোরে।
আট আনা দশ আনা সের!
জমিদার বাড়ী কাজ নিল ক্ষীরি,
সামলাবে ছেলেদের।



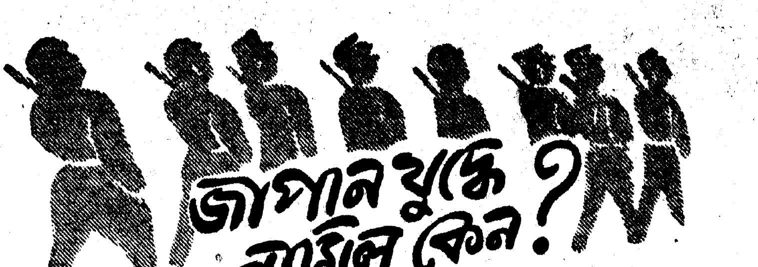
ঘর ঝাঁট দিতে ডেকে ছোটবাবু
দোর দিতে চায় এঁটে,
ভোর রাতে তাই গ্রাম ছেড়ে ক্ষীরি
সহরে চলল হেঁটে।

বাগদীর ছেলে বেণী সে জুটল এসে,
তারো ভাতজোটা বন্ধ হয়েছে দেশে।
এর পরে কিছু কাল
কি হল এদের হাল



কোথায় কখন কিভাবে জোটালো ভাত,
কেমনে কাটালো দুস্তর শীতের রাত,
লোক চরিত্র কতদূর নিল বুঝে
কোন্ লাঞ্ছনা মেনে নিল মুখ বুজে,
হীন মৃত্যুর কতখানি কাছ ঘেঁসে
দেখে বাঁচলো শেষে—
থাক্ সে গল্প—শুধু এই কথা স্পষ্ট
বিপদেও ক্ষীরি করেনি নিজেকে নষ্ট।
শুধু জিভ থেকে ঝাঁঝ গেছে তার উবে
চোখের তারায় আছে সেই ঝাঁঝ ডুবে,
শুধু দুইগালে বেরিয়েছে দুই হাড়
সমভূমি হ'য়ে গিয়েছে বুকের বাড়,
দেখে চেনা যায়, পথ পরিবার ভুক্ত—
যে পথে কেবল মরণের দিক মুক্ত।

রোগের সময় বেণীর সঙ্গে
হ'য়েছিল ছাড়াছাড়ি,
একদিন ক্ষীরি হোটেলের ধারে
খাটছে এঁটোর কাঁড়ি—
চমকে উঠল হঠাৎ বেণীকে দেখে
খাকিসার্টপরা বিড়িমুখে বেণী
বেরোল হোটেল থেকে।
সহরের শেষে মিলিটারিদের কাছে
এখন সে সুখে আছে,



জাপান যুদ্ধে নামিল কেন?

শ্রী বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রথমেই পশ্চাদপসরণ করা যাউক একেবারে শত বর্ষ পূর্ব্বের অন্ধকার পটভূমিকায়। সেই দূর অতীতের যবনিকা উত্তোলন করিলেই দেখা যাইবে, কিভাবে বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য, বন্দর ও নৌদুর্গ পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া এশিয়া খণ্ডে প্রবেশ করিয়াছে শাসন ও শোষণের জন্য। আজ যাঁহারা গণতন্ত্রের বিজ্ঞাপনে বাজীমাৎ করিতেছেন, তাঁহারাই ধনতন্ত্রের অত্যাচারে কিভাবে এই মহাযুদ্ধ ডাকিয়া আনিয়াছেন, তাহাও সেই সঙ্গে বুঝা যাইবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নামজাদা স্বরাষ্ট্রসচিব মি: উইলিয়াম সীওয়ার্ড ঘোষণা করিলেন—"Commerce brings America closer to the Asiatic continent. The new situation which thus arises will bring about great changes in America's position; that is, America is now confronted with a situation requiring her to possess a connecting point between herself and the Asiatic continent: that is a colony. There is no doubt that the Pacific, all the shores of the Pacific and all the Pacific Islands will become a main theatre for this particular purposes."—বাণিজ্যের জন্য আমেরিকা এশিয়া ভূখণ্ডের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। এই নূতন পরিস্থিতির জন্য আমেরিকার অবস্থার বিপুল পরিবর্ত্তন ঘটিবে। এশিয়া মহাদেশ ও আমেরিকার নিজের মধ্যে একটি যোগসূত্রের সন্ধান করিতে হইবে। সোজা কথায়, আমেরিকার একটি উপনিবেশ প্রয়োজন। সুতরাং ইহা নি:সন্দেহ যে, কেবলমাত্র এই একটি উদ্দেশ্যের জন্যই প্রশান্ত মহাসমুদ্র, উহার সমুদয় তীর ও সমস্ত দ্বীপ একটি বিরাট ক্ষেত্রে পরিণত হইবে,—প্রায় ১০০ বৎসর আগেকার এই কথাগুলি আজ অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গিয়াছে। প্রশান্ত মহাসমুদ্রের সর্ব্বত্র বাণিজ্যের স্রোত ধরিয়া রক্তস্রোত বহিয়াছিল। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের এই মার্কিণনীতি অনুসারেই উহার পরের বৎসর জুলাই মাসে কমডোর পেরি (Commodore Perry) জাপানে গেলেন আমেরিকার সহিত ব্যবসায় বাণিজ্যের দাবী লইয়া। ইহার ফলে জাপানের রাষ্ট্রজীবনেও নূতন ধারা, ইউরো-মার্কিণ সভ্যতার উগ্র প্রভাব দেখা দিল। পেরি সাহেব মার্কিণ বাণিজ্যের পথ হিসাবে জাপানের বোনিন ও রিউকিউ দ্বীপ, ফরমোজা, শ্যাম, কম্বোডিয়া, কোচিন, চীন, সুমাত্রা ও বোর্ণিওর উপর নজর রাখিয়াছিলেন। ঐ একই উদ্দেশ্যে মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এলুশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও আলাস্কা ৭২ লক্ষ ডলার মূল্যে জারের রাশিয়ার নিকট হইতে ক্রয় করিলেন। ক্রমে ফিলিপাইন ও হাওয়াই ইত্যাদি দ্বীপপুঞ্জও আমেরিকার হাতে আসিল। এভাবে বাণিজ্য বিস্তারের চেষ্টার সঙ্গে প্রশান্ত মহাসমুদ্রের উপর নৌআধিপত্য বজায় রাখিবার প্রয়োজন হইল। নৌবহরের সঙ্গে প্রশান্ত মহাসমুদ্রের নানা দ্বীপে গড়িয়া উঠিল নৌঘাঁটি। কিন্তু আমেরিকার বহু আগেই বৃটেন এশিয়া মহাদেশের ভারতবর্ষ ও চীন ইত্যাদিতে প্রবেশ করিয়াছিল। ক্যাণ্টনে ইংরাজ ও অন্যান্য বিদেশী বণিকেরা দেখা দিলেন। চীনা কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক ব্যবসায়ে বিঘ্ন সৃষ্টির অভিযোগ ও অহিফেনের চোরাই কারবার বন্ধের নাম করিয়া সুরু হইল ১৮৪০-৪২ খৃষ্টাব্দের ইতিহাস খ্যাত 'অহিফেন-যুদ্ধ'। অত:পর সন্ধিসূত্রে ইংরাজেরা হংকং ও অন্যান্য ৫টি বন্দর পাইলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত বৃটেন সুদূর প্রাচ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া রহিল। হংকং ছিল ইংরাজের প্রধান নৌঘাঁটি ও পণ্যদ্রব্য প্রবেশের প্রধান পথ। ইহার সঙ্গে বৃটেনের কর্ত্তৃত্বে সাংহাইয়ের আন্তর্জ্জাতিক উপনিবেশ ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শ্রমশিল্প বিস্তারের ও শোষণের প্রধান ঘাঁটিতে পরিণত হইল। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত (১৯১৩ সাল) চীনের সমগ্র আমদানী বাণিজ্যের অর্দ্ধেকই আসিত বৃটেন হইতে, এক পঞ্চমাংশ জাপান হইতে এবং ষোল ভাগের এক ভাগ অপেক্ষাও কম আসিত আমেরিকা হইতে। ইহা ছাড়া রেলপথ, ব্যাঙ্ক কারবারি মূলধন ও আর্থিক বিলি ব্যবস্থাও বৃটেনের হাতে ছিল। চীন যেন বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জের লুঠের মালে পরিণত হইল।

কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর এই সৌভাগ্য রহিল না। বিংশ শতকের সূচনার সঙ্গে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র বৃটেনের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দিলেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, জারের রাশিয়া ও জার্ম্মাণীও প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। এই ইতিহাস দীর্ঘ ও জটিল অত্যন্ত সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকাই সর্ব্বপ্রথম চ্যালেঞ্জ জানাইল—মার্কিণ স্বরাষ্ট্র-সচিব জন হে (John Hay) চীন মহাদেশে 'খোলা দরজা' বা 'open door' নীতির দাবী জানাইলেন। এই দাবী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নীতিতেও বজায় ছিল। চীনের সমুদ্রতীরস্থ বন্দর ও সহরগুলির 'লীজ' গ্রহণের ধুম পড়িয়া গেল জার্ম্মাণী, রাশিয়া, ফ্রান্স ও বৃটেনের মধ্যে। ইংরাজ বণিকগণ শঙ্কা বোধ করিতে লাগিলেন এবং সেই হইতে বৃটিশ নীতিতে দূরপ্রসারী পরিবর্ত্তন সুরু হইল জাপান তখনও এশিয়ায় অগ্রধারী দিগ্বিজয়ী বণিক-রূপে দেখা দেয় নাই, বৃটেন জাপানের দিকে ঝুঁকিল অন্যান্য বিদেশী শক্তিকে প্রতিরোধের উপায় হিসাবে। ১৮৯৪ সালে ইঙ্গ-জাপান সর্ত্ত স্বাক্ষরিত হইল। বৃটেনের সহযোগিতায় জাপানী নৌবহর ও নৌবল গড়িয়া উঠিল এবং ইঙ্গ-জাপ চুক্তি স্বাক্ষরের দুই সপ্তাহের মধ্যেই জাপান চীনের বিরুদ্ধে অভিযানে বাহির হইল ১৮৯৪-৯৫ সালে। জাপান কোরিয়া কাড়িয়া লইল এবং লিওটাঙ উপদ্বীপ হস্তগত করিল। কিন্তু বৃটেন ছাড়া আর বাকী সমস্ত বিদেশী শক্তি একত্রে চাপ দেওয়ায় জাপান এই যুদ্ধ অধিকার ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। ১৯০২ সালে ইঙ্গ-জাপানী সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। এই সন্ধিপত্রের পরেই ১৮৯৪ সালের মত এবারও জাপান যুদ্ধে বাহির হইল। ১৯০৪-৫ সালে জারের রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জাপান পোর্ট আর্থার বন্দর দখল, লিওটাঙ অধিকার এবং দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া প্রভাব বিস্তার করিল। ১৯০৫ সালে আবার জাপানের সহিত বৃটেনের সন্ধি হইল এবং সেই সর্ত্তগুলির মধ্যে একদিকে নজর ছিল ভারতবর্ষে বৃটিশ শক্তির রক্ষা ও অন্যদিকে আমেরিকা। এভাবে ক্রমশ: ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, বৃটেনের সাহায্যে ও সহযোগিতায় জাপশক্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ইহা চলিয়াছিল। ১৯৩১ সালে জাপানের মাঞ্চুরিয়া অভিযান, ১৯৩৩ সালে জিহোল অধিকার ও রাষ্ট্রসঙ্ঘ পরিত্যাগ এবং ১৯৩৪ সালে নয় শক্তি সন্ধির (Nine Power Treaty) বাতিল ও নৌ নিয়ন্ত্রণের সর্ত্ত (১৯২২ সালে ওয়াশিংটন সম্মেলনে স্থিরীকৃত) অগ্রাহ্য, ১৯৩৬ সালে লণ্ডনের নৌসম্মেলন পরিত্যাগ, ১৯৩৭ সালে চীনের বিরুদ্ধে নয়া অভিযান (যাহা বৎসর চলিয়াছে), ১৯৪০ সালের অক্টোবর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বৃটেন কর্ত্তৃক বর্ম্মা রোড ইত্যাদি আন্তর্জ্জাতিক জগতের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী এই সাক্ষ্যই দেয় যে, দ্বি

[ইহার পর ২২৭ পৃষ্ঠায়]





ছোড়দিদির বাড়ীটা ছিল বেলেঘাটার শেষপ্রান্তে। এমন একটা ঠিকানা, যেটা খুঁজে বার করতে অমলকে বিশেষ বেগ পেতে হোলো। অমলের বন্ধু নৃপেন নাগপুর থেকে চিঠি লিখে জানিয়েছে, তোরা যদি জাপানীদের ভয়ে নিতান্তই কলকাতা ছেড়ে পালাস, তবে আমার ছোড়দি বেচারীকেও যেখানে হোক নিয়ে যাস, ও বেচারীর কেউ নেই।

অমল ভয় পায়নি, কিন্তু বাঙলার গভর্ণমেণ্ট ভয় পেয়েছিল। সিঙ্গাপুরের পতনের পরেই গভর্ণমেণ্ট কাঁপতে কাঁপতে জানালো, যারা কোনো সরকারী কাজ করে না, তারা পালিয়ে যাক। সুতরাং লক্ষ লক্ষ লোকের মতন অমলও তার বাড়ীর লোকদের এখানে ওখানে সরাতে লাগলো। কেউ কাশী, কেউ পাটনা, কেউ বর্দ্ধমান, কেউ বা রাণাঘাট।

নৃপেনের চিঠিতে ছোড়দিদির ঠিকানাটা ঠিকই ছিল, তবে শহরতলীর গলি-ঘুঁজি পেরিয়ে নাম-নম্বরহীন বাড়ীটি খুঁজে পেতে বেলা অনেক বেড়ে গেল। তখন শীতের শেষ।

বন্ধুর সহোদরাকে অমলও ছোটবেলা থেকে ছোড়দিদি ব'লে ডাকে। তবে এটা ছোড়দিদির শ্বশুরবাড়ী। এ বাড়ীতে সটান ঢোকবার আগে অমল বাইরে থেকে ডাকলো, কেউ আছেন নাকি?

ডাকাডাকি করতে করতে বছর পনেরো বয়সের একটি ফুটফুটে মেয়ে সন্তর্পণে দরজার কাছাকাছি এসে বললে, কে?

আমি অমল, ছোড়দিদি আছেন?

তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে গেল। মেয়েটি হাসিমুখ বাড়িয়ে বললে, একি, অমল মামা, কী ভাগ্যি আমাদের? আসুন?

অমল ভিতরে ঢুকে বললে, কেমন আছিস তোরা টুনু? এখনও পালাসনি?

কোথায় পালাবো বলুন? এপাড়ার ত সবাই চ'লে গেছে। আমরা এখনও আছি, সন্ধ্যার পরে কী ভয় করে।

ভয় কাকে রে?

কেন, চোরের ভয়।

অমল বললে, পাগলি, চোরের প্রাণভয় আরো বেশি,—তারাও পালিয়ে গেছে সকলের সঙ্গে।

টুনু হাসতে লাগলো।

এমন সময় মাথায় ঘোমটা টেনে ছোড়দিদি এলেন। তিনি বিধবা, বয়স আন্দাজ বছর পঁয়ত্রিশ হবে। তিনি শান্ত নম্র কণ্ঠে বললেন, এসো ভাই—দিদিকে মনে পড়লো?

অমল নৃপেনের চিঠিখানা বা'র ক'রে বললে, আমাদের সঙ্গে সে আপনাকে যেতে বলেছে। নৃপেন খুব ব্যস্ত হয়েছে আপনাদের জন্যে।

ছোড়দিদি প্রশ্ন করলেন, সবাই বুঝি পালাচ্ছ? তোমার ভাইবোনেরাও?

অমল বললে, হাঁ, এক একদল এক একদিকে পালিয়েছে তবে কাকা আর কাকীমা এখনও যাননি।

তোমার বাবা?

অমল বললে, বাবা ত এখানে থাকেন না। মা মারা যাবার পর থেকেই তিনি কাশী গিয়ে হোমিওপ্যাথী ডাক্তারি করেন। আপনার এখানে আর কাউকে দেখছিনে যে? আপনার ভাসুর কই?

ছোড়দিদি নত নম্র মুখে বললেন, তিনি সপরিবারে চ'লে গেছেন নলহাটি। বড় তরফের ওঁরাও আজ আটদিন হোলো পালিয়ে গেছেন।

অমল বললে, আপনার দিদিশাশুড়ী আর রাঙাদিদিরা?

তাঁরা ছেলেমেয়েদের সবাইকে নিয়ে গেছেন মালদা।

সহসা অমল একটু চাপা অভিমানে ফুলে উঠলো। বললে, নৃপেন আমাকে সবদিক

ভেবেই লিখেছে। আচ্ছা ছোড়দিদি, সত্যি বলুন ত ?

সস্নেহ শান্ত হেসে ছোড়দিদি বললেন, কি ভাই ?

অমল বললে, এটা আপনার শ্বশুরের ভিটে, এখানে দাঁড়িয়ে কারো নিন্দে করতে চাইনে। কিন্তু এখন বুঝতে পাচ্ছি, আপনাকে ফেলে সবাই পালিয়েছে। আপনি বিধবা, সহায় সম্বল নেই, আপনি লোকের বোঝা।

ছি ভাই অমল, এসব কথা বলতে নেই।

কেন, বলবোনা ছোড়দি ?—অমল বললে, আপনি হিন্দুঘরের বিধবা, পরের দয়ায় মেয়েটাকে খাইয়ে পরিয়ে আপনার দিন কাটে, আপনার জন্য পাঁচসের আলোচাল দিতে ওঁদের গায়ে লাগে, চিরদিন ওঁদের অনাচার আপনি মুখবুজে সইলেন—

অমল! থাক্ ভাই ওসব কথা!

অমল বললে, ছোড়দি আমাকে ক্ষমা করুন। এখানে দাঁড়িয়ে কিছু বলা আমার অধিকারের বাইরে। আপনিও হয়ত পছন্দ করবেন না। কিন্তু যারা পালিয়ে গেল তাদের প্রাণের চেয়ে আপনার আর টুমুর প্রাণের দাম কি কম ?

ক্ষোভে ও সমবেদনায় অমলের চোখ দুটো বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এলো।

ছোড়দিদি কিয়ৎক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইলেন। সহসা এক সময়ে সভয় মিষ্টকণ্ঠে বললেন, তুমি একটা কথা ভেবে দেখোনি ভাই, আমরা চলে গেলে এবাড়ী যে একেবারে খালি! এত বড় পুরানো বাড়ী… দক্ষিণ দিকে পাঁচিল নেই…সন্ধ্যের আলো পড়বে না,—আমার গেলে চলবে কেন ভাই ?

অমল বললে, কিন্তু একা এখানে থাকলে আপনার চলবে কেমন ক'রে ছোড়দি ? তা ছাড়া টুমু এখন একটি বড় হয়েছে।

ছোড়দিদি বললেন, সেই জন্যেই আরো কোথাও যেতে সাহস নেই, ভাই। অত বড় মেয়ে নিয়ে কোথায় ঘুরে বেড়াতে যাবো বলো ? বরং ভাত কাপড় না জোটে, নিজেদের পাড়া ঘরখানার মধ্যে ত' পড়ে থাকতে পারবো ? তাতে মান বাঁচবে— কেউ দেখতেও আসছে না।

এমন সময় টুমু এক পেয়ালা চা হাতে নিয়ে এলো। হেসে বললে, ভাই-বোনে দেখা হয়েছে, আর রক্ষে নেই। বকুনো চলছে ত ? এবার— আপনি কবে পালাচ্ছেন বলুন ত অমল মামা ?

আমি কোথাও যাবো না টুমু।

যাবেন না, তাহ'লে আমাদের এখানে মাঝে মাঝে আসবেন ত ?

অমল হেসে বললে, জাপানীরা যদি না আসে তবে এক আধবার আসবো বৈকি।

ছোড়দিদি আর টুমু দুজনেই হেসে উঠলো। মায়ের পাশে ব'সে টুমু বললে, অমল মামা, এবারে কিন্তু একটা মজা দেখলুম। সবাই পালাচ্ছে বটে— মেয়েরা কিন্তু একটুও ভয় পায়নি। তারা সবাই হেসে আর আমোদে কুটিকুটি। পুরুষমানুষরাই ভয় পেয়ে দৌড় দিচ্ছে, আর মেয়েদের ঘাড়ে নিয়ে ছুটছে। তাই না ?

অমল হাসিমুখে টুমুর দিকে তাকাল। টুমু পুনরায় বললে, মেয়েরা বেশ মজা পেয়ে গেছে এবার। এই দেখুন না, ওবাড়ীর লোকেরা তিরিশ টাকা দিয়ে এক একখানা গরুর গাড়ী ভাড়া করে আনলো—এখান থেকে হাওড়া ইষ্টিশান। মেজগিন্নি সঙ্গে নিল টিয়াপাখী, মেনি বেড়াল, এক প্যাকেট তাস, একটা লুডুর সেট…তারপর কত যে শাড়ী আর জামা—

অমল বললে, তোমার ভয় করেনা, টুমু ?

আমার ? একটুও না। ভয় করলেই ভয় বাড়ে।

যদি জাপানীরা বোমা ফেলে, কিম্বা আক্রমণ করে ?

করুক।

তখন কি করবে তুমি ?

কল্পান্ত

প্রবোধকুমার সান্যাল



টুমু বললে, ইংরেজরা কি করবে তাই আগে শুনি ?

ছোড়দিদি ও অমল দুজনেই খুব হেসে উঠলো।

অমল এই অবসরে চারিদিকে একবার তাকালো। এককালে অবস্থা এদের বেশ ভালোই ছিল, কিন্তু ভাঙতে ভাঙতে এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, জীবনযাত্রাটা এখন দুরূহ হয়ে উঠেছে। দারিদ্র্য আর অনটন এবাড়ীর সর্বত্র সুস্পষ্ট। উপার্জনের কেউ নেই, অভিভাবক কেউ নেই, অদূর-ভবিষ্যতে যে সুদীর্ঘ দুঃসময় আসছে— সে অবস্থাটাকে প্রতিরোধ ক'রে শক্ত হয়ে হাল ধরার মতো মানুষও নেই। এই দু'টি নারীর দিন কেমন ক'রে কাটবে বলা কঠিন।

কি কথা ব'লে অমল তখনকার মতো বিদায় নেবে ভাবছে এমন সময় খিড়কি দরজা পেরিয়ে এক বৃদ্ধা ঠুকঠুকে কাঁপতে কাঁপতে এইদিকে এলেন। তাঁকে দেখে ছোড়দিদি একটু ঘোমটা টেনে উঠে দাঁড়িয়ে মৃদুকণ্ঠে বললেন, তুমি একটু বসো ভাই ঠাকুরঘরে পুজোটা সেরে আসি। টুমু, মামার কাছে একটু বোস, মা।

বৃদ্ধা এসে বললেন, এ ছেলেটি কে, ভাই ?

টুমু বললে, আমার মেজমামার বন্ধু,— অমলমামা!

ও, তা বেশ। একটু কিছু খেতে দেনা দিদি! ওই যে সেই মুগের নাড়ু আছে ঘরে…ওই যে সেদিন দিয়ে গেল ওবাড়ীর নবৌ—

আচ্ছা দেবো, তুমি কাপড় ছাড়োগে, রাঙাদিদি—

বুড়ি ধীরে ধীরে চ'লে গেল। এই প্রাচীন জীর্ণ অট্টালিকার কোন অন্ধ গহ্বরের দিকে গিয়ে বুড়ি ঢুকলো,—আর তাঁর সন্ধান পাওয়া গেলনা।

টুমু বললে, অমলমামা, আপনাকে কিন্তু কিছুই খেতে দিতে পারবোনা!

টুমুর সলজ্জ নতমুখের দিকে তাকিয়ে একটু বিপন্নভাবে অমল বললে, খাবার কথা ভাবছ কেন ? এই ত' চা খেলুম, আবার কি! এবার আমি উঠবো, টুমু—

কিয়ৎক্ষণ পরে ছোড়দিদি শান্ত পদক্ষেপে এসে দাঁড়ালেন। অমল বললে, তাহ'লে আমি নৃপেনকে কি লিখবো, ছোড়দি ?

ছোড়দিদি বললেন, তুমি লিখে দিয়ো, আমরা বেশ ভালো আছি!

আপনারা তাহ'লে কোথাও যাচ্ছেন না ?

হাসিমুখে ছোড়দিদি বললেন, ভগবান কি করবেন তা ত' আর জানিনে ভাই, তাঁর মনে কি আছে তাও বুঝিনে। তবে আপাততঃ এখান থেকে কোথাও যাবার উপায় আমাদের নেই।

অমল বললে, অর্থহীন প্রাণভয়ে এখানে ওখানে পালিয়ে বেড়ানোর চেয়ে এক জায়গায় শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই ভালো।

ছোড়দিদি হেসে বললেন, পালাবার মতন টাকাও আমাদের নেই। তা' ছাড়া অত বড় মেয়ে সঙ্গে নিয়ে কোথায় যাবো

[ইহার পর ২০২ পৃষ্ঠায়]

পাউডার বনাম ধুলো



এ এক অসহ্য কাণ্ড হইয়াছে, ভুলু আর পারে না; বিছানা থেকে নামিয়া মানুষে কোথায় একটু চলাফিরা করিবে তা নয়, একেবারে গা মোছা, পাটকরা জামা পরা, পাউডার মাখা, চুল আঁচড়ানোর ঘটা; তাহার পরই সোনা ছেলে হইয়া এক বাটি দুধ খাও, তাহার পরেই ঝিয়ের কোল আর পেরাম্বুলেটার ঠেলাগাড়ি! একেই তো সমস্ত বাড়িটাতে একটু ধুলো কি একটু কাদার খোঁজ নাই, যদি কোনরকমে ঝিকে ফাঁকি দিয়া কি মায়ের দৃষ্টি এড়াইয়া বাগানের দিকে গিয়া একটু সংগ্রহ হইল তো বাড়িতে হৈ হৈ পড়িয়া যাইবে; আবার ধোওয়া, আবার মোছা, আবার জামা বদলানো, যেন কতই অন্যায় না করিয়াছে খোকা। অথচ চারিদিকেই তো আরও সবাই রহিয়াছে,—কাহারই বা এত দুর্দশা? সামনের বাড়িতে কাতুদিদির মার খোকা, কখনও জামা-ইজের পরা, কখনও শুধু জামা, কখনও শুধু ইজের, কখনও আবার কিছু নেই—কী যে হয় মনে ভুলুর ওকে দেখিলে! আর ভুলুর কুকুর তো মিছি-মিছি, কালো কাপড়ের; কাতুদিদির মার খোকা একেবারে সত্যিকারের কুকুর লইয়া খেলা করে, লাঠি লইয়া পড়ায়, [illegible] করিয়া ঘাড়ে শোয়, ঘোড়া করিয়া পিঠে চড়ে। সেদিন যখন ঘোড়াটা ওকে ভূম করিয়া ফেলিয়া ডাকিতে ডাকিতে রাস্তার দিকে ছুটিয়া গেল, ভুলু আহ্লাদে আপনি-আপনিই হাততালি দিয়া উঠিয়াছিল, জ্যান্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে সত্যি সত্যি পড়া খুব মজার নয়? বেশ মনে পড়ে ভুলুর—ওর একবার মনে হইয়াছিল—ও যদি কাতু-দিদির মার খোকা হইত আর কাতুদিদির মার খোকা যদি ওর মার ভুলু হইত তো কি মজাটাই যে হইত!

বেশ, চুল যদি আঁচড়াইতেই হইবে, পাউডার যদি মাখিতেই হইবে তো তাও তো ভুলু নিজেই পারে। পাশের বাড়িতে ওদের খুকু পারে আর ভুলু পারিবে না কেন? খুকু তো ভুলুর চেয়ে অনেক ছোট, দিদিকে এখনও ডি-ডি বলে। সেদিন মা যখন ভুলুকে লইয়া পালঙে শুইল, তাহার পর ঘুমাইয়া পড়িল। ভুলু একটু মাথা তুলিয়া জানালা দিয়া দেখিল—খুকু ওর মার এতবড় চিরুণি লইয়া নিজের চুল নিজে আঁচড়াইতেছে, তাহার পর কাজল পরিল, কত পাউডার মাখিল—এক মুখ পাউডার, মা ভুলুকে যা মাখাইয়া দেয় তাহার চেয়ে ঢের বেশী। সব মায়েই দুষ্টু, খুকুর মা আসিয়া সব কাড়িয়া লইয়া খুকুকে মারিল। তা বেশ তো, ভুলুর মাও না হয় মারুক না ভুলুকে; কিন্তু চিরুণি, পাউডারের বাক্স অত উঁচুতে না রাখিয়া খুকুর মায়ের মতন আরশির নিচে টানা-বাক্সয় রাখিয়া দিক না।—ভুলুর মা যেন আরও দুষ্টু!

খুকুর মা মারে বড্ড খুকুকে, তবু কিন্তু ভুলু যদি খুকুর মায়ের খোকা হইত আর খুকু যদি ভুলুর মায়ের খুকু হইত তো কী ভালো যে হইত ভুলু ভাবিয়াই কুল পায় না।



যুগান্তর ১৩৫২





যতক্ষণ দুপুর বেলা হয়, ওবাড়িতে খুকুর মাও ঘুমায়, এবাড়িতে ভুলুর মাও ঘুমায়। ওবাড়ীতে খুকু রোজ কত নূতন নূতন জিনিষ আনিয়া কত নূতন নূতন খেলা করে, আর ভুলু বালিস থেকে একটু মাথা তুলিয়া জানালার মধ্যে দিয়া দেখে, মনে হয় কাতু দিদির মার খোকা না হইতে পারুক, পাশের বাড়ির খুকুও যদি হইতে পারিত ভুলু, তো আর কিছু দুঃখ থাকিত না।

বিকাল বেলা আবার সেই গা মোছা, চুল আঁচড়ান, পাউডার মাখা; আবার ঝি, আবার এক বাটি দুধ খাইয়া সেই পেরাম্বুলেটার।...সেদিন ঝিয়ের মেয়ে কোঁচড়ে করিয়া মকাই ভাজা খাইতেছিল, কি সুন্দর জিনিষ! কি সুন্দর গন্ধ! মুঠোর সবগুলাও শেষ করে নাই ভুলু, বাড়িতে একেবারে হৈ-হৈ পড়িয়া গেল। ঝিয়ের কাছে তাহার মেয়েটা মার খাইল, মায়ের কাছে ভুলুর শুধু মার খাইতে বাকি রহিল। হাতের মকাই কাড়িয়া ছড়াইয়া ভুলুকে ধমকাইয়া সে কী কাণ্ড! সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ভুলুর কান্না থামে নাই।

এক এক সময় মনে হয়, মা খুব ভালো; চুমা খাইয়া, বুকে চাপিয়া কত আদর করে, সত্যই মনে হয় মা তাহাকে খুব ভালোবাসে। তবুও এমন কেন? কী ভালো লাগে ভুলুর একেবারেই কেন বুঝিতে পারে না মা? ঝি তো বেশ বোঝে, সে তো বেশ দুধের বাটির বদলে তার মেয়েকে কোঁচড় ভরিয়া মকাই ভাজা দেয়!

মুখ বুজিয়া সব সহিয়া যায় ভুলু, কি আর করিবে?—বাবা, মা, ঝি সবাই যে তাহার চেয়ে অনেক বড়। ঠিক করিয়া রাখিয়াছে যখন ঝিয়ের মেয়ের বাবার মতন বড় হইয়া উঠিবে তখন সব করিবে, খালি গায়ের উপর শুধু একটা গামছা ফেলিয়া গাছে উঠিবে, জলে নামিবে, আর কোথায় কোথায় চলিয়া গিয়া কত কি যে করিবে, তাহার হিসাব করিয়া উঠিতে পারে না খোকা। অনেক দূরের আরও পারে যে 'কত কি'র দেশ আছে—দিনে মার কাছে যার গল্প শোনে ভুলু, রাত্রিরে ঘুম-বুড়ি যেখানে লইয়া যায়, একেবারে সেইখানে চলিয়া যাইবে।

কিন্তু তাড়াতাড়ি সে বড়ই হইয়া উঠিতেছে না। রোজ সকালে আরশির সামনে গিয়া দাঁড়ায় ভুলু, আশা করে এক আরশি না হোক, অন্তত: অর্দ্ধ আরশি বড় হইয়া গেছে, দেখে ঠিক যেমনটিই আছে। মনটা যে কি হইয়া যায় ভুলুর!

(২)

ভুলুর সাধের দেশ শুধু মায়ের গল্পে বা ঘুম-বুড়ির কাছেই নেই, আরও একটি আছে ও-বাড়ির বাগানটার পেছনেই। বাগানের খুব উঁচু দেয়ালের জন্য দেখিতে পায় না ভুলু, কিন্তু মায়ের কাছে সেখানে থাকে কত রকম পাখি, কত রকম প্রজাপতি, কত রকম নূতন নূতন ফল ফুল জানিয়া আসে। ভুল বেশ বোঝে ওখানে যা খুশি লইয়া যা খুশি খেলা করিবার একটা দল আছে, ওখানে ছেলেরা মেয়েরা জামা পরে না, পাউডার মাখে না, পেরাম্বুলেটারে চড়ে না, ওদের কাতুদিদির মায়ের খোকার চেয়েও সুখী, পাশের বাড়ির খুকুর চেয়েও নিশ্চিন্ত ভাবে যা খুশি করিবার সুযোগ।... একেবারে বাগানের পাশেই বসিয়া ভুলুর মনটা এক একবার

[ইহার পর ২১৯ পৃষ্ঠায়



অভিজ্ঞতা

[১৭ পৃষ্ঠার পর]

প্রায় ছুটিয়াই গেলাম। হেমারেজ নিবারণের সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বিত হওয়া সত্ত্বেও এই কাণ্ড। দারুণ হেমারেজ।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভিটামিন সি অ্যামপুল আর আছে আপনার? আমার তো আর নেই, কোলকাতা থেকে যে ক'টা এসেছিল সব ফুরিয়ে গেছে…"

আমার ছিল না। বলিলাম।

"কংগো রেড?" (Congo Red)

"না।"

"এখানকার কোনও দোকানে নেই। খোঁজ করে দেখেছিলাম আজ বিকেলে। ভারী ভুল হয়েছে, কোলকাতা থেকে আনিয়ে রাখলেই হ'ত।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সক্ষোভে বলিয়া উঠিলেন, "আঃ—এমন একটা ব্যাক্‌ওয়ার্ড জায়গা!"

ভয়ে ভয়ে বলিলাম, "একটা মর্ফিন দিলে কেমন হয়?"

"মর্ফিন দিয়েছি, ক্যালসিয়াম দিয়েছি, সিরাম দিয়েছি, পিট্রিসিন্ দিয়েছি, তারপর আপনার কাছে গেছি……"

আর কিছু করিবার ছিল না। আইস-ব্যাগ পেটের উপর রাখাই ছিল। নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। ডাক্তারবাবু আবার প্রশ্ন করিলেন, "কংগো রেড কোথাও পাওয়া যাবে না এখানে? ডাক্তার ভাদুড়ি তো খুব আপ্‌-টু-ডেট, তাঁর কাছে পাওয়া যাবে না?"

"বলতে পারি না।"

"দেখি চেষ্টা করে'।"

তিনি একটা মোটর বাইকও জোগাড় করিয়াছিলেন। একটু পরেই সেটা গর্জ্জন করিয়া উঠিল। ফট ফট ফট শব্দে নিশীথ অন্ধকারকে সচকিত করিয়া কংগো রেডের সন্ধানে তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

…মৃত্যুকালে পুত্রের সহিত দেখা হইল না।

ছেলেটির মা মাথার শিয়রে বসিয়া-ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মুখ দিয়া মৃত্যুপথ-যাত্রীর কর্ণে একটি আশ্বাস বাক্যও বর্ষিত হইল না। যতক্ষণ বসিয়াছিলেন কেবল হাহাকার করিতেছিলেন।

"এমন বেঘোরে তোর প্রাণটা যাবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি রে বাবা…"

একটু পরেই যে চিরকালের মতো সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, তাহার কানের কাছে একটানা এই আর্ত্তনাদ।

তাহার পরদিন যখন তাহারা চলিয়া গেল, আমাকে একটা ধন্যবাদ পর্য্যন্ত দিয়া গেল না। আমিই যেন অপরাধী।

৩

দিন দুই পরে হাসপাতালের নার্স আসিয়া আমাকে জানাইল যে, কটেজ ওয়ার্ডের দ্বিতীয় টাইফয়েড রোগীটির অবস্থাও ভাল নয়। রাত্রি বৈকালের দিকে আরও খারাপ হইয়াছে—গ্লুকোজ ইনজেকশন দেওয়া সত্ত্বেও। সকালে একবার দেখিয়া আসিয়া-ছিলাম, সমস্ত দিন আর কোন খবর পাই নাই। নার্সের কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি গেলাম।

গিয়া দেখি ছেলেটির মা আসিয়াছেন। মাথার শিয়রে বসিয়া নীরবে কাঁদিতেছেন। বৃদ্ধ তারস্বরে গীতার পঞ্চম অধ্যায় পাঠ করিয়া চলিয়াছেন। ছেলেটির শ্বাস উঠিয়াছে।

আমাকে দেখিয়া বৃদ্ধ হাসিমুখে বলিলেন, "আসুন, ডাক্তারবাবু, আপনি অনেক করেছেন, এইবার শেষকৃত্য করুন। আপনার পায়ের ধুলো ওর মাথায় দিন…আশীর্ব্বাদ করুন ওর সব যন্ত্রণার যেন অবসান হয় এইবার…সব গ্লানি যেন মুছে যায়…"

আমি অপ্রস্তুত মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

"আসুন……"

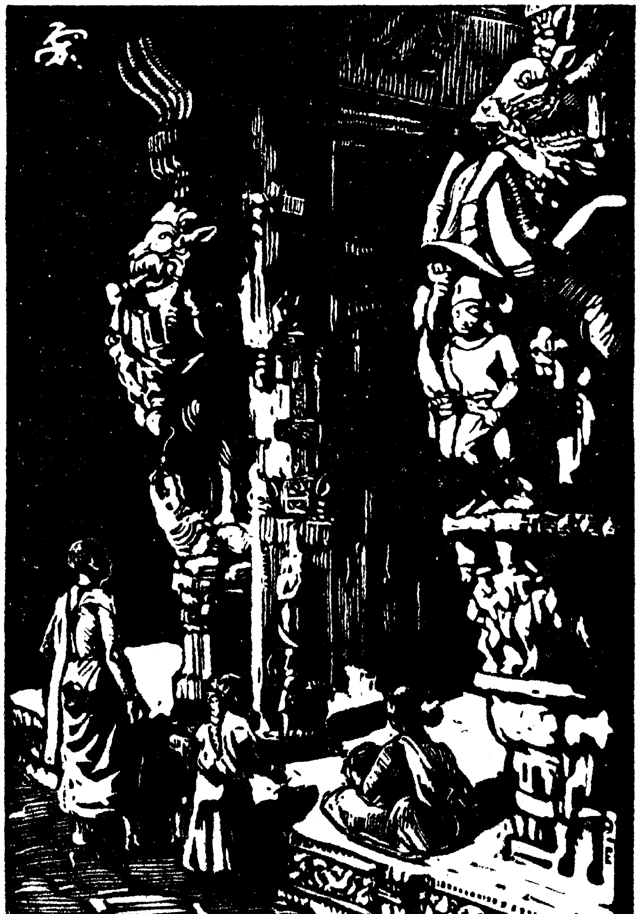
আমাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া বৃদ্ধ আবার বলিলেন, "ইতস্ততঃ করছেন কেন, আপনি ব্রাহ্মণ, আপনার পদধূলিই তো দরকার এ সময়ে। নিন……জুতো খুলুন…দিন…বেশ ভাল করে' মাখিয়ে দিন ওর সমস্ত মাথায়…আসুন—"

তাহার পর স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কাঁদবার সময় অনেক পাবে। এখন নাম শোনাও। ছেলে যাচ্ছে, ওর পাথেয় দিয়ে দাও…"

এতদিন বহু মুমূর্ষু রোগীর গায়ে ছুঁচ ফুটাইয়া বহুরকমে তাহাদের বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছি, সেদিন কিন্তু আর সে প্রবৃত্তি হইল না। হঠাৎ যেন দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইয়া গেল। বৃদ্ধের কথা অমান্য করিতে পারিলাম না। হেঁট হইয়া জুতার ফিতা খুলিতে লাগিলাম।

পরদিন বৃদ্ধ হাসপাতালে এক হাজার টাকা দান করিয়া চলিয়া গেলেন। চেকটা ভাঙাইতে গিয়া আবিষ্কার করিলাম যে, তিনি একজন বিলাতী ডিগ্রীধারী রিটায়ার্ড সিভিল সার্জ্জন।

———



মন্দির — কালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার

ঔষধের সাহায্যে মানবের কল্যাণ

আমাদের অঙ্গীকার:..

সভ্যতার আদিযুগ থেকে মানুষ শারীরিক অসুস্থতার হাত থেকে নিষ্কৃতির উপায় সন্ধান করে আসছে। আমাদের পূর্বপুরুষদের অক্লান্ত পরিশ্রম, আত্মত্যাগ ও প্রতিভার ফলেই চিকিৎসা বিজ্ঞান আজ এত উন্নত যে বহু ঈপ্সিত ব্যাধিহীন পৃথিবী এখন আর নিছক কল্পনা নয়—হয়ত অদূর ভবিষ্যতে তা বাস্তবে পরিণত হবে।

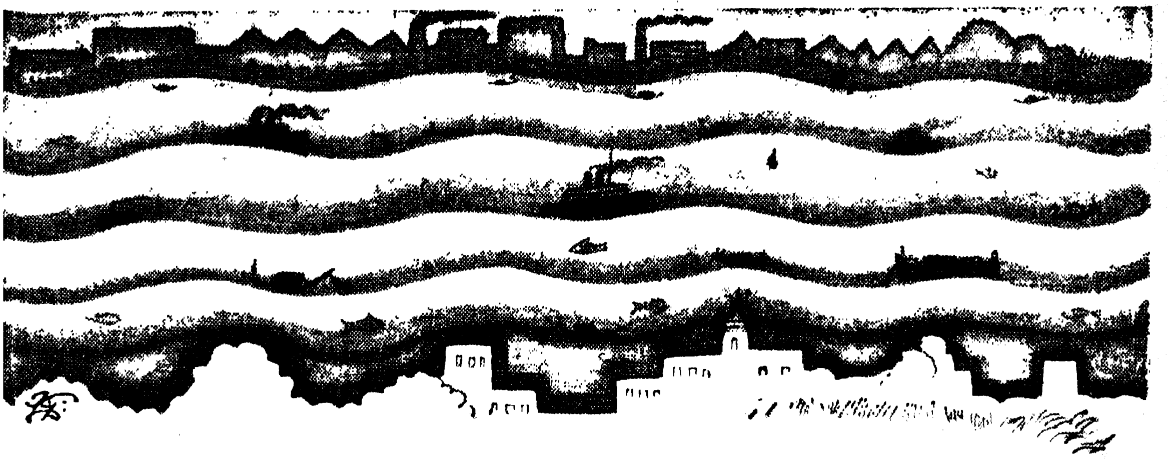
এখনও চলেছে রোগনিষ্কৃতির সন্ধানপর্ব। মানুষের করাল শত্রু রোগ-ব্যাধির বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম করে চলেছেন চিকিৎসকেরা। আর রাসায়নিকরা তাঁদের যোগাচ্ছেন প্রয়োজনীয় অস্ত্র—উৎকৃষ্ট ও কার্যকরী নানা প্রতিষেধক।

ঔষধ তৈরির এই গুরুতর দায়িত্ব নিয়েছেন বেঙ্গল ড্রাগ হাউস।

মৌলিক গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের সাহায্যে নূতন ও উৎকৃষ্টতর ঔষধ প্রস্তুত করে মানুষের ক্লেশের অবসান করার অঙ্গীকার নিয়ে বেঙ্গল ড্রাগ হাউস জনসেবায় ব্রতী হয়েছেন।

১

AD-578



বাংলার গঙ্গা

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১

বাংলা সাহিত্যে গঙ্গা-ভক্তির কথা থাকা বিচিত্র নয়, কারণ এ সাহিত্য এখনও পর্য্যন্ত বাঙালী হিন্দুর সাহিত্য, এবং গঙ্গার ভৌগোলিক পদ-মর্য্যাদা যেমনই হোক, অনেকগুলি কারণে, তাহা হিন্দু-বাংলার 'হৃদয় ধমনী' বলিলেও হয়। তথাপি আমি গঙ্গার সেই আধ্যাত্মিক বা ধর্ম্মমূলক প্রভাবের কথা বলিতেছি না, বাংলা সাহিত্যে এই গঙ্গার গৌণ ও মুখ্য প্রভাব কতটুকু থাকিতে পারে তাহাই ভাবিয়া দেখিতে চাই—এক কথায়, বাংলার যে সংস্কৃতি বাংলা সাহিত্যের মূলে শক্তি ও প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে, তাহার কতখানি এই গঙ্গার সহিত সম্পর্কিত? সাক্ষাৎ সাহিত্যিক প্রমাণ যেটুকু পাওয়া যায়, অর্থাৎ আমাদের একালের কবিদিগকেও গঙ্গার শোভা ও তাহার বিশিষ্ট ভাব-মণ্ডল কতখানি অনুপ্রাণিত করিয়াছে — তাহার দৃষ্টান্ত পরে দিব। এক্ষণে বাঙালীর সংস্কৃতির ইতিহাসে, গঙ্গার স্থান এত উচ্চ কেন, তাহার কিছু কারণ নির্দ্দেশ করিব।

সকল কারণই অল্পবিস্তর ঐতিহাসিক—ভৌগোলিক অবস্থান-ও একটা বড় কারণ বটে। আর্য্য সভ্যতার যে ধারা গঙ্গোত্তরী হইতে যে পথে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা এই বাংলায় প্রবেশ করিয়া কেন যে মূল প্রবাহ ত্যাগ করিয়া একটি ক্ষুদ্রতর স্রোতে ভিন্ন পথ ধরিয়া সাগরাভিমুখী হইল, তাহা পুরাণ ও ইতিবেত্তারা বলিবেন। আমরা বাঙালীরা এই শাখা নদীটিকেই সেই 'গঙ্গা' বলিয়া জানি ও মানি; আর্য্য সভ্যতা বিস্তারের সীমা ও তৎসংক্রান্ত ঔপনিবেশিক তত্ত্ব যেমনই হোক,—আমরা যে শুধুই শাস্ত্রের শাসনে ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি, এমন কথা বলিতে পারিব না। বাংলায় বহু নদ-নদী আছে, সে সকলের উপরে এই অপেক্ষাকৃত ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনীর এমন সম্মানের স্থান হইল কেন? পৌরাণিক শাস্ত্র তাহার দুইটি স্থানকে তীর্থ-মাহাত্ম্য দিয়াছে—এক 'মুক্তবেণী' নামক প্রাচীন সপ্তগ্রামের নিকটবর্ত্তী জলধারাকে ;—ইহার সহিত আর দুইটি ধারা যে এককালে যুক্ত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, যদিও যমুনা-নাম্নী নদীটির সন্ধান দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই মনে হয়; তাহার প্রবাহ-পথ সম্ভবতঃ অতিশয় পরিবর্ত্তন-শীল হইয়াছিল আর একটি,—যেখানে এই নদী সাগরে গিয়া মিশিয়াছে—সেই সাগর-সঙ্গম-তীর্থ ; এই তীর্থ সমগ্র হিন্দু ভারতের তীর্থ। প্রথমটির মহিমা স্থানীয় বলিয়াই মনে হয়,—মনে হয়, বাঙালীই কোন এক-কালে এই তীর্থটির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল; এ বিষয়ে পুরাণ ও ইতিহাসবেত্তারাও সঠিক সংবাদ দিতে পারিবেন।

কিন্তু এই তীর্থমহিমাই গঙ্গার সকল মহিমার কারণ নয়—তাহার সমগ্র স্রোতো-ধারার দুই তীরই বারাণসী-সমান পবিত্র বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল; তাহা কেবল জলের পবিত্রতার জন্যই নয়, অথবা তাহার ওই দুই তীরের ভূমিভাগ অতিশয় স্বাস্থ্যকর বলিয়াই নহে—সেই কারণের সহিত অন্য কারণও নিশ্চয় ছিল; এই নদীই এককালে বাংলার নৌ-বাণিজ্যের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী ছিল—সমুদ্রযাত্রার অতিশয় প্রশস্ত পথরূপেই ইহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছিল। অতি প্রাচীন রাঢ়ের শিল্প-বাণিজ্য এই নদীই দেশ-দেশান্তরে বহন করিত, এবং উত্তর হইতে দক্ষিণ সাগর-দ্বার পর্য্যন্ত ইহার শান্ত ও সুনিশ্চিত সদাপ্রবাহী জলরাশি নৌচালনার পক্ষে বড় হিতকর ছিল (এই শান্তি ও সৌন্দর্য্যের কথা পরে বলিব)। তাই, ইহারই তীরভূমির একস্থানে অতি প্রাচীন নবদ্বীপ নগরী স্থাপিত হইয়াছিল, এবং বাঙালী জাতির শক্তি বুদ্ধি ও বিদ্যা সেইখানে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। বাংলার এই নদী—এই গঙ্গাই নবদ্বীপ-জননী, একথা বোধ হয় মিথ্যা নহে।

অতীতের সেই ভৌগোলিক, রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক অবস্থার সঠিক সংবাদ দিতে পারিব না বটে, কিন্তু বাঙালীর ইতিহাসে ও বাঙালীর জীবনে এই গঙ্গার যে খুব বড় স্থান আছে বা ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। একথাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, যে কারণেই হোক এই নদী হিন্দু-বাঙালীর প্রাণকে যেরূপ আকর্ষণ করিয়াছিল এমন আর কোন নদী করে নাই ; ধর্ম্মই বল, রাষ্ট্রই বল, আর বাণিজ্যই বল—সর্ব্ববিধ বন্ধনে এই নদীই হইয়াছিল বাঙালীর National River বা জাতীয়-চেতনার প্রতীক। মিশরের 'নীল'-নদ, আর্য্যের গঙ্গা-যমুনা, চীনের 'ইয়াং-সিকিয়াং', বাবিরুষের 'দজলা'-'ফোরাত' (Euphrates ও Tigris), প্রাচীন রোমান জাতির 'টাইবার', আধুনিক রুষের 'ডন', এবং জার্ম্মাণগণের 'রাইন' যে গৌরবের অধিকারী—বাঙালীও তাহার এই নদীকে সেই গৌরব দান করিয়াছে; সারা বাংলার জাতীয় চেতনার যদি কোনো ভৌগোলিক আধার থাকে তবে সে এই গঙ্গা। জাতীয় চেতনা বলিতে আমরা অধুনা যাহা বুঝি সেই ভাব ও সেই নাম পূর্ব্বে ছিল না বটে, কিন্তু একটা সমগ্র জাতি যে ভাবের বন্ধনে (তাহা ধর্ম্মই হোক, আর যাহাই হোক) একটা কিছুকে আশ্রয় করিয়া একই হৃদয়-স্পন্দন অনুভব করে,—এখনও উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব্ব-পশ্চিমের দূরতম নিবাস হইতে লক্ষ লক্ষ নরনারী যাহাকে দর্শন এবং যাহার জলে অবগাহন করিবার জন্য ছুটিয়া আসে, এবং যাহার দুই কূলকে 'বারাণসী সমতুল' বলিয়া গৌরব করে—তাহার সম্পর্কে সেই মনোভাব যদি জাতীয়তাব্যঞ্জক না হয়, তবে জাতীয়তা শব্দের একটা সঙ্কীর্ণ অর্থই করিতে হয়; কেবল ইহা বলিলে যথার্থ হইবে যে, কোন জাতির জাতীয়তা রাষ্ট্র

লইয়া, কাহারও বা বংশ বা রক্ত লইয়া, কাহারও বা বর্ণ লইয়া, কাহারও বা এই ত্রিবিধ চেতনা লইয়া। বাঙালীর এই জাতীয়তাবোধের মূলে ঐ তিনই আছে বলিয়া মনে হয়। অতি প্রাচীনকালে এই নদীর তীরভূমিতেই তাহার আদি পিতৃগণ বাস করিয়াছিলেন, এই নদীরই কূলে রাঢ়ের প্রথম রাজধানীর পত্তন হইয়াছিল—প্রথম বলিলাম এই জন্য যে, তৎপূর্ব্বে নানা বংশীয় রাজার রাজধানী অন্যত্র বিদ্যমান থাকিলেও, যে কালে জাতির শিক্ষা-দীক্ষা একটা বিশিষ্ট আদর্শের বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং সেই কারণে একটা সুস্পষ্ট স্বতন্ত্র জাতীয় আত্ম-চেতনা পরিস্ফুট হইয়াছে—এক কথায় বাঙালী যখন বাঙালী হইয়া উঠিয়াছে—সেই কালেই নবদ্বীপের অভ্যুত্থান। ঐ গঙ্গার কূলেই তাহার মানসিক ও আধ্যাত্মিক জাগৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিজস্ব মন প্রাণ ও আত্মার বাস্তুভবন গড়িয়া উঠিয়াছিল; ঐ নবদ্বীপ হইয়াছিল সমগ্র জাতির জেরুজালেম। তারপর গঙ্গা শুধুই পুণ্য তীর্থসলিল নয়—বাঙালীর ধ্যান-জ্ঞান, প্রেম-ভক্তি, তাহার ঋদ্ধি ও সিদ্ধি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির জীবন-স্রোতস্বতীরূপে প্রবাহিত হইয়াছে।

এমন কথাও বলা যাইতে পারে যে, হিন্দু-বাংলার যে পূর্ণাবয়ব দেহ, এই গঙ্গা যেন তাহার সুষুম্না নাড়ী; সমগ্র দেশ ও জাতি-দেহে যাহা কিছু শক্তি-সঞ্চার—দীর্ঘ যোগ-সাধনায় যেটুকু শেষ সিদ্ধিলাভ—তাহা ইহারই দুই কূল বাহিয়া হইয়াছে; এবং ইহাও অতিশয় সম্ভব যে, তাহার দুই কূলের যে তটভূমি তাহাতে বাংলার সর্ব্বপ্রদেশের হিন্দু আসিয়া বসবাস করিয়াছে। অতএব ঐ দুই কূল-বাসী যে সমাজ সেই সমাজ সমগ্র বাঙালী জাতির প্রতিনিধিও বটে।

এই গঙ্গার ধারাকে আর যে দুইটি ধারা পরিপুষ্ট করিয়াছে তাহাতেই বাংলার যুগ ও আধুনিক যুগ পূর্ণ প্রকটিত হইয়াছে। চীন ও পূর্ব্ব-মধ্যযুগে যেমন নবদ্বীপ, শেষ যুগে তেমনই মুর্শিদাবাদ একটি নূতন তা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হইয়াছিল—মুসলীম-রসীক ধর্ম্ম-সংস্কৃতি এবং মোগল-পাঠান এই সকলের মিশ্রণে উদ্ভূত এক অপূর্ব্ব লচার সমগ্র ভারতে একটি নূতন শ্রী সঞ্চার রিয়াছিল। তাহার সেই ধারাকেও এই গঙ্গা র্শিদাবাদের নবাব দরবার হইতে বহিয়া দুই কূলে বিতরণ করিয়াছিল, কোন একটি গের বা সমাজকে নয়—সমগ্র ভাগীরথী-সমাজকে সমৃদ্ধ ও প্রভাবিত করিয়া, বাঙালীর গ্রাম্যতাকে নাগরিক সংস্কারে উন্নীত করিয়াছিল, তাহার মনের আভিজাত্য বিধান করিয়াছিল। কিন্তু সেই প্রাচীন গাঙ্গেয় সংস্কৃতির সহযোগে সে আভিজাত্য ভোগ-সর্ব্বস্ব হইতে পারে নাই। এই আভিজাত্যের গূঢ়তর পরিচয় এখনও এই মৃতকল্প সমাজে মিলিবে; শুধু প্রাচীন ইমারত, মন্দির, মঞ্চ প্রভৃতির ভগ্নাবশেষেই নয়, যে-বার্ত্তাশিল্প সভ্যতার একটা বড় অঙ্গ, বাঙালীর সেই শিল্পপ্রীতিতেই নয়,—তাহার আচারে ব্যবহারে, তাহার আমোদে-উৎসবে, তাহার বেশ-ভূষায়, তাহার ভাষার ভঙ্গিতে ও বৈদগ্ধ্যমূলক রসিকতায় এখনও তাহার চিহ্ন লুপ্ত হয় নাই। ইহার ফলে তাহার সাহিত্যিক রস-চেতনাও উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল—ভোগের পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্য হইতেই একটা নূতন রূপ-পিপাসা জাগিয়াছিল। ব্রাহ্মণ্য শাসনের কঠিন বন্ধনে এবং সংস্কৃত ভাষার ধমকে ভাষায় তাহা মুক্তি না পাইলেও—সেই বৈদগ্ধ্য যে তাহার চিত্তকে সরস করিয়াছিল, এই অঞ্চলের কথ্য ভাষাই তাহার প্রমাণ। উত্তরকালে এই ভাষাই তাহার শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির বাহন হইয়াছে—আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে সম্ভব করিয়াছে।

ইহার পরে এই গঙ্গার সাগর-দ্বার দিয়া য়ুরোপীয় জাতিগণের বাংলায় আগমন ও বাণিজ্যব্যাপদেশে উহারই কূলে শ্রেণীবদ্ধভাবে বসতি স্থাপন; ব্যাণ্ডেল, হুগলী, চুঁচুড়া, চন্দননগর, শ্রীরামপুর ও কলিকাতা বিদেশীর সহিত পণ্য বিনিময়ের ও সমুদ্রপারের বার্ত্তা আদান-প্রদানের মিলন স্থান হইয়া উঠিল, এবং তাহা হইতেই বাংলাদেশে, তথা ভারতবর্ষে, যে নূতন যুগ-দেবতার রথযাত্রা শুরু হইল, তাহারও অভিষেক ওই গঙ্গোদকে সম্পন্ন হইয়াছিল।

অতএব এই গঙ্গা ও গঙ্গার দুই কূল বাঙালী জাতির সর্ব্ববিধ উৎকর্ষ বা সর্ব্বাঙ্গীন সংস্কৃতির সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট,—বাংলা দেশের মর্ম্মস্থল বলিলেও হয়; এমন আর কোনো স্থান নহে। অদ্যাবধি বাঙালী যেটুকু শিক্ষা-সংস্কৃতি দাবী করিতে পারে—বাংলার বিশিষ্ট সভ্যতা বলিতে যাহা বুঝায়, নানাকারণে, ভৌগোলিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক অবস্থা ও ঘটনার সংযোগে, বাংলার হৃদ্দেশে অবস্থিত এই নদী তাহার প্রাণধারার মতোই প্রবাহিত হইয়াছে। 'National River' বলিতে যদি সত্যই কিছু বুঝায় তবে গঙ্গা যে বাঙালীর 'National River' তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার তীর শুধুই পুণ্যভূমি নয়, এককালে শ্রেষ্ঠ সাধনভূমি হইয়াছিল; মধ্যযুগ হইতে ঊনবিংশ শতক পর্য্যন্ত বাঙালীমাত্রেই ইহার তীর্থভূমিকে পিতৃতর্পণ ভূমি বলিয়া পূজা করিয়াছে, এবং 'ভাগীরথীতীর-সমাশ্রিতানাং' প্রভৃতি কত শ্লোক, কত প্রবচনে ইহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছে।

২

আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও এই গঙ্গার সৌন্দর্য্য শ্রেষ্ঠ কবিগণের কাব্যোৎকণ্ঠার তৃপ্তি সাধন করিয়াছে; করিবারই কথা। এই গঙ্গার শুধুই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নয়, ইহার তীরে তীরে জীবন ও মৃত্যুর পাশাপাশি যে রঙ্গাভিনয়—শ্মশান ও উৎসবক্ষেত্র—তাহার তুলনা নাই। গঙ্গাতীরবাসী যাহারা তাহাদের পিতৃপুরুষ-পরম্পরার পুণ্যস্মৃতি ইহার জলকলস্বনে গীত হইতেছে, স্থল-জলের এমন উদার শান্তিময় শোভা আর কোথাও লক্ষিত হয় না—সর্ব্বঋতুতে সমান কল্যাণময়ী এমন মাতৃসমা নদী-নারায়ণী বাংলায় আর কোথায় আছে? একদিকে যেমন সপ্তগ্রাম ও তাম্রলিপ্তের নাম সুদূর অতীতের স্মৃতি-রোমাকে কণ্টকিত করে, তেমনই অদূর অতীতের বৈভব চিহ্ন তীরতরুগুণ্ঠিত শত শত মন্দির শীর্ষ ও জলতলশায়ী ভগ্ন সোপান শ্রেণীর অঙ্গে এখনও কাব্যকাহিনীর প্রেরণা হইয়া আছে। ইহারই তীরে বসিয়া কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়—

"কথা কও, কথা কও।
কোনো কথা কভু হারাওনি তুমি
সব তুমি তুলে লও,—
কথা কও, কথা কও।
তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ
মজ্জায় মিশাইয়া।
যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোলো নাই,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী
স্তম্ভিত হ'য়ে বও।"

সৌন্দর্য্যের কথা আর কি বলিব? প্রভাতে সন্ধ্যায় জ্যোৎস্নারাত্রে ইহার কূলে আসিয়া যে বসিয়াছে, অথবা ইহার জলে সাঁতার দিয়াছে, নৌকা বাহিয়াছে—সেই জানে, ইহার আকাশে বাতাসে ইহার জলে ও স্থলে কি যাদু মিশানো আছে! সেই সৌন্দর্য্য, কেবল মন নয়, প্রাণ ও প্রাণের চেয়েও গভীর একটি চৈতন্যকে স্পর্শ করে; তাই ইহার সেই স্নিগ্ধ শীকর-শীতল বায়ুস্পর্শে অন্তরের চিতাগ্নি জ্বালাও প্রশমিত হয়, শৈশবে যে ইহার তীরে খেলিয়াছে সে বার্দ্ধক্যেও ইহারই সৈকতে চিতাশয্যা কামনা করিবে; সর্ব্বসন্তাপহারিণী সে, জীবন ও মৃত্যু দুইয়েরই সমান আনন্দ বিধায়িনী সে! হিন্দুমাত্রেই মৃত্যুকালে ইহার পুণ্যস্পর্শ কামনা করে—যে দূরান্তরবাসীর ভাগ্যে তাহা ঘটে না, সে এক বিন্দু বারি, এক কণা মৃত্তিকা মাথায় ও ওষ্ঠে স্পর্শ করিয়া শান্তি লাভ করে। এই সত্য একজন আধুনিক বাঙালী কবির একটি গানে খাঁটি কাব্যবস্তুতে পরিণত হইয়াছে। আমি তাহার শেষ কয় পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—

"পরিহরি ভব সুখ দুঃখ যখন মা,
শায়িত অন্তিম শয়নে,
বরিষ শ্রবণে তব জল কলরব,
বরিষ সুপ্তি মম নয়নে,
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে,
বরিষ অমৃত মম অঙ্গে—
মা ভাগীরথি! জাহ্নবি! সুরধুনি!
কলকল্লোলিনী গঙ্গে!"

এই গান যিনি রচনা করিয়াছেন তিনি আধুনিক বাঙালী কবি—মামুলী গঙ্গাস্তব রচনাকারী শাস্ত্রভক্তিপরায়ণ হিন্দু নহেন; তথাপি ঐ পংক্তিগুলিতে যে ভাব ব্যক্ত হইয়াছে তাহা পারমার্থিক নহে—মনুষ্য-


মহোৎসবের দিনে
দুর্গা পূজা! একটা দিনের মতো দিন! সমস্ত বছর আপনি এই দিনটিরই প্রতীক্ষা করে' থাকেন। এমনি আনন্দময় দিনে আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আতিথেয়তার মধ্য দিয়ে আপনার মধুরতর সম্পর্ক গড়ে' উঠুক, আর আপনার বাড়িতে হাস্যকলরবে মুখর নিত্যকার চায়ের মজলিশটি প্রচুর চায়ের পরিবেষণে প্রাণময় হয়ে উঠুক। এরূপ প্রত্যেক স্মরণীয় দিনেই অভ্যাগতদের চা দিয়ে অভ্যর্থনা করুন।
ভারতীয় চা
উৎসবে অতুলনীয়
ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট এক্সপ্যান্শান্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত
IK 130

মাত্রেরই অতি গভীর ও স্বাভাবিক অন্তিম কামনা; কেবল, গঙ্গার উদ্দেশ্যেই সে কামনা এমন ব্যাকুল, এমন গীতিময় হইয়া উঠিয়াছে। চিত্রটিও কি সুন্দর! এ গান যিনি রচনা করিয়াছেন গঙ্গার সহিত শুধুই তাঁহার নিজের জীবনের সাক্ষাৎ সম্পর্ক নয়, তাঁহার রক্তে পিতৃপিতামহের ভাবধারাও অবিচ্ছিন্ন রহিয়াছে।

বাংলার দুই আধুনিক শ্রেষ্ঠ কবি গঙ্গার সৌন্দর্যে অতি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে এইরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও তাহারই আধ্যাত্মিক প্রভাব কবি-কল্পনাকে বিশেষ উদ্দীপিত করে নাই। গঙ্গার নাম তাঁহারাও করিয়াছেন এবং কেহ কেহ পৌরাণিক ও শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসারে গঙ্গাস্তব-ও রচনা করিয়াছেন, কিন্তু গঙ্গার সম্বন্ধে এই মানবীয় ভাব, গঙ্গার সহিত প্রাণের সেই গভীর প্রেমের সম্পর্ক —তাঁহাদের কাব্যে প্রকাশের পথ পায় নাই। সেকালের মানুষ তখনও নিজের মনুষ্যসুলভ বাসনা কামনা, বা জাতি ও ব্যক্তিগত অনুভূতিকে কোনো গুরুতর সাহিত্যিক রচনায় প্রশ্রয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করিত; হয়ত আপনার হৃদয়-মনকে আপনারাই চিনিত না। যখন আমাদের দেশেও মানুষ, মর্ত্ত্যজীবন, প্রকৃতি, মানব-হৃদয়, এই সকলের মহিমা সন্ধানে অন্তর করিবার অবকাশ পাইল, নিত্যপরিচিতের সহিত আত্মীয়তা ও প্রেমের সম্বন্ধ চিন্তা করিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হইল, বাহিরের সহিত অন্তরের সেই যোগ যেন নূতন করিয়া আবিষ্কার করিল,—তখন কাব্যে-উপাখ্যানে, ভাবনা-কল্পনায় সেই প্রাণের অনুভূতিকে প্রকাশ করিতে কবিরও আনন্দের অবধি নাই, তাই আধুনিক বাঙালী কবিগণের রচনায় এই গঙ্গার মাহাত্ম্য বহুরূপে বহু ভঙ্গীতে প্রকাশ পাইয়াছে। পুরাতন যুগের শেষ মহাকবি ভারতচন্দ্রের একটিমাত্র পংক্তি আমাদের প্রাণে আজিও পুলক সঞ্চার করে, সেই—"অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।" নিত্যপরিচিত সে-গঙ্গা তাহার কোন বর্ণনা কবি করেন নাই বটে, কিন্তু ঐ 'গাঙ্গিনী' শব্দটিতে যেন কি একটি মমতার আবেশ রহিয়াছে। তারপর, "গঙ্গা নামে সতা, তার তরঙ্গ এমনি," এবং সেইজন্য সে "স্বামীর শিরোমণি"—ইহাতেও কবির নিজেরই গঙ্গা-প্রীতি প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতচন্দ্র গঙ্গার পৌরাণিক ও শাস্ত্রীয় মাহাত্ম্যকে অন্ততঃ ঐটুকু লৌকিক রস-সংবেদনার ক্ষেত্রে নামাইয়া আনিয়াছেন। তারপর, ঈশ্বর গুপ্তের যুগেও, এবং তাহার পরেও কিছুকাল যে গঙ্গার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন দেখা যায়, তাহা একালের গঙ্গা-প্রীতি নয়। নবযুগের প্রথম কবি শ্রীমধুসূদনের কাব্যেও গঙ্গার শোভা কোথাও স্বপ্নলোক সৃষ্টি করে নাই—তার কারণ, প্রথমতঃ তাঁর কাব্য প্রেরণাই ছিল স্বতন্ত্র; দ্বিতীয়তঃ, গঙ্গার রূপ দেখিবার ও ধ্যান করিবার অবকাশ তাঁহার জীবনে ঘটে নাই। কিন্তু বাংলার অপর দুই মহাকবি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর গঙ্গা-প্রীতিকেই কাব্যের আকারে নানা ভঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রোমান্স-কাব্য 'চন্দ্রশেখরে'র সেই কল্প-জগতের দ্বার-উন্মোচন করিয়াছে এই গঙ্গা; আবার ভাবের চরম অভিব্যক্তিকালেও সেই গঙ্গা; নায়ক-নায়িকার প্রেমও যেন এই গঙ্গার ধারার সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া আছে। তাহার আদিতে যেমন—

"ভাগীরথী তীরে, আম্রকাননে বসিয়া একটি বালক ভাগীরথীর সান্ধ্য জলকল্লোল শ্রবণ করিতেছিল। তাহার পদতলে, নবদূর্ব্বা শয্যায় শয়ন করিয়া, একটি ক্ষুদ্র বালিকা নীরবে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।...

"মাথার উপরে, শব্দতরঙ্গে আকাশমণ্ডল ভাসাইয়া, পাপিয়া ডাকিয়া গেল। শৈবলিনী, তাহার অনুকরণ করিয়া, গঙ্গাকূল বিরাজী আম্রকানন কম্পিত করিতে লাগিল। গঙ্গার তরতর রব সে ব্যঙ্গ-সঙ্গীত সঙ্গে মিলাইয়া গেল।...

"...উভয়ে একাগ্রচিত্তে একখানি নৌকার প্রতি দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিল। নৌকায় কে আছে—কোথা যাইবে—কোথা হইতে আসিল? দাঁড়ের জলে কেমন সোনা জ্বলিতেছে।...

অন্তেও তেমনই—

"দুইজনে সাঁতরিয়া, অনেক দূরে গেল। কি মনোহর দৃশ্য! কি সুখের সাগরে সাঁতার! এই অনন্ত দেশব্যাপিনী, বিশাল-হৃদয়া, ক্ষুদ্রবীচিমালিনী, নীলিমাময়ী তটিনীর বক্ষে, চন্দ্রকর সাগর মধ্যে ভাসিতে ভাসিতে, সেই ঊর্দ্ধস্থ অনন্ত নীল সাগরে দৃষ্টি পড়িল!...উভয়ে সন্তরণ-পটু। সন্তরণে প্রতাপের আনন্দ-সাগর উছলিয়া উঠিতেছিল।

প্রতাপ ডাকিল—"শৈবলিনী—শৈ!"

শৈবলিনী চমকিয়া উঠিল—হৃদয় কম্পিত হইল। বাল্যকালে প্রতাপ তাহাকে "শৈ" বা "সই" বলিয়া ডাকিত।.........

এখন শুনিয়া শৈবলিনী সেই অনন্ত জল-রাশি মধ্যে চক্ষু মুদিল। মনে মনে চন্দ্র-তারাকে সাক্ষী করিল। চক্ষু মুদিয়া বলিল, "প্রতাপ! আজিও এ মরা গঙ্গায় চাঁদের আলো কেন?"

এ যেন বাঙালী-জীবনের অতি-গভীর কাব্যময়ী কাহিনীই নয়—ওই নদীর কাহিনীও বটে। শেষে প্রতাপ বলিল—"কিছু নয়—আইস তবে দুইজনে ডুবি।"

ঠিক এই কাহিনীকে অপর মহাকবি একটি অপূর্ব্ব গীতিচ্ছন্দে কেমন রূপান্তরিত করিয়াছেন! ঐ গঙ্গাই (রূপক-নাম—'যমুনা') বলিতেছে—

"আজি বর্ষা গাঢ়তম
নিবিড় কুন্তলসম
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে।
ওই যে শবদ চিনি,
নূপুর রিনিকি ঝিনি
কে গো তুমি একাকিনী আসিছ ধীরে।

তারপর—

হেথা শ্যাম দূর্ব্বাদল,
নব নীল নভস্তল
বিকশিত বনস্থল বিকচ ফুলে।
দুটি কালো আঁখি দিয়া
মন যাবে বাহিরিয়া
অঞ্চল খসিয়া গিয়া পড়িবে খুলে,

শেষে—

যদি মরণ লভিতে চাও
এসো তবে ঝাঁপ দাও
সলিল-মাঝে।
স্নিগ্ধ, শান্ত, সুগম্ভীর
নাহি তল, নাহি তীর
মৃত্যুসম নীল নীর স্থির বিরাজে।
নাহি রাত্রি দিনমান,
আদি অন্ত পরিমাণ,
সে অতলে গীতগান কিছু না বাজে।
যাও সব যাও ভুলে
নিখিল বন্ধন খুলে
ফেলে দিয়ে এসো কূলে সকল কাজে।
যদি মরণ লভিতে চাও,
এসো তবে ঝাঁপ দাও
সলিল-মাঝে।"

—এ যেন দুই কবিকে ঐ এক গঙ্গা একই রূপ দেখাইয়াছে—সেরূপ বাংলার গঙ্গার রূপ, এবং বাঙালীই তাহা দেখিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে এই গঙ্গার কত রূপ কত রকমের কাব্য সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা পাঠকমাত্রেই জানেন। 'বিষবৃক্ষে' 'নগেন্দ্র-নাথের নৌকা যাত্রা'; 'ইন্দিরা'র—'বাজিয়ে যায় মল' সেই পরিচ্ছেদকে গীতি-কবিতার মত করিয়া তুলিয়াছে; 'রজনী'র সেই 'ধীরে রজনী ধীরে' ঐ একই গঙ্গার গান হইয়া আছে। নায়ক শচীন্দ্র বলিতেছে—

"আমি দেখিলাম—কেবল সেই মৃদু-নাদিনী গঙ্গা, আর সেই মৃদুগামিনী রজনী, ধীরে ধীরে, ধীরে জলে নামিতেছে। চক্ষু মুদিলাম, তবু দেখিলাম সেই গঙ্গা আর সেই রজনী। আবার চাহিলাম, আবার দেখিলাম, সেই গঙ্গা আর সেই রজনী! দিগন্তরে চাহিলাম—আবার সেই রজনী, ধীরে, ধীরে, ধীরে জলে নামিতেছে। ঊর্দ্ধে চাহিলাম—ঊর্দ্ধেও আকাশ বিহারিণী গঙ্গা ধীরে ধীরে বহিতেছে; আর আকাশ বিহারিণী রজনী ধীরে, ধীরে, ধীরে নামিতেছে। অন্য দিকে মন ফিরাইলাম; তথাপি সেই গঙ্গা আর সেই রজনী।"

কবি বঙ্কিমচন্দ্র কি ঐ গঙ্গামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াই বাঙালীর জাতীয়তা মন্ত্রের গুরু হইয়াছিলেন? গঙ্গাবক্ষে বজরার উপর 'দেবী চৌধুরাণী'র সেই দৃশ্য বাংলা ভাষায় অমর কাব্য হইয়া আছে; সেখানে জলের কলধ্বনি, আলো-আঁধারের বর্ণ চিত্র, অকূল জলবিস্তার ও আকাশ প্লাবী জ্যোৎস্না, রমণীর রূপ এবং বিরহ-মিলনের মধুর-করুণ বীণা-ধ্বনি—সকলই একটি ঐকতান রাগিণীতে সমাহিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-হৃদয় আর কোথাও বোধ হয় এত গভীর রসাবেশে বিহ্বল হয় নাই; এ সকলই ঐ গঙ্গার যাদু-মন্ত্রের প্রভাবে। কমলাকান্তরূপেও বঙ্কিম

এই গঙ্গাকেই সম্বোধন করিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন—

"তুমি আছ, সে রাজলক্ষ্মী কোথায়? তুমি যাঁহার পা ধুয়াইতে, সেই মাতা কোথায়? তুমি যাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে, সেই আনন্দরূপিণী কোথায়? তুমি যাঁহার জন্য সিংহল, বালী, আরব, সুমিত্রা হইতে বুক করিয়া ধন বহন করিয়া আনিতে, সে ধনেশ্বরী কোথায়? তুমি তাঁহার রূপের ছায়া ধরিয়া রূপসী সাজিতে, সে অনন্ত সৌন্দর্যশালিনী কোথায়? তুমি যাঁহার প্রসাদী ফুল লইয়া ঐ স্বচ্ছ হৃদয়ে মালা পরিতে, সে পুষ্পাভরণা কোথায়? সে রূপ, সে ঐশ্বর্য্য কোথায় ধুইয়া লইয়া গিয়াছে? বিশ্বাসঘাতিনি, তুমি কেন আবার শ্রবণ-মধুর কল কল তর তর রবে মন ভুলাইতেছ? বুঝি তোমারই অতল গর্ভমধ্যে, যবনভয়ে ভীতা সেই লক্ষ্মী ডুবিয়াছেন, বুঝি কুপুত্রগণের মুখ দেখিবেন না বলিয়া ডুবিয়া আছেন। আমি চক্ষে সব দেখিতেছি—আকাশ মেঘে ঢাকিতেছে—ওই সোপানাবলী অবতরণ করিয়া রাজলক্ষ্মী জলে নামিতেছেন। অন্ধকারে নির্বাণোন্মুখ আলোকবিন্দুবৎ, জলে ক্রমে ক্রমে সেই তেজোরাশি বিলীন হইতেছে। যদি গঙ্গার অতল জলে না ডুবিলেন, তবে আমার সেই দেশলক্ষ্মী কোথায় গেলেন!"

৩

বঙ্কিম সাহিত্যে গঙ্গার এই ভাবপ্রেরণা যে কত গভীর ও ব্যাপক তাহা আমরা দেখিলাম, ইহার কারণও খুব স্পষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম বাঙালীর বাঙালীত্ব সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন হইয়াছিলেন—দেশের অতীত ইতিহাসও যেমন তেমনই তাহার শ্রী ও শক্তি, তাহার আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদের কথা চিন্তা করিয়া তিনি দেশ-প্রেমে বিহ্বল হইয়াছিলেন। অতএব 'বন্দেমাতরম্'-মন্ত্রের ঋষি যিনি, তিনি যে সেই মাতার বক্ষোবিগলিত স্তন্যধারার মতো এই গঙ্গাকে এমন করিয়া প্রাণের পূজা নিবেদন করিবেন, ইহাই ত' স্বাভাবিক। এই গঙ্গাই কবি-হৃদয়ের ভাব-গঙ্গারূপে তাঁহার কাব্যকেও যেমন বন্ধনমোচনী করিয়াছে এমন আর কাহারও কাব্যকে করে নাই।

তথাপি, রবীন্দ্রনাথও তাঁহার কবি-প্রকৃতির পক্ষে যতটা সম্ভব, এই গঙ্গার মোহিনী মায়া প্রাণমনে অনুভব করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বহুদিন পদ্মাতীরে বাস করিয়াছিলেন, সেই ভয়ঙ্করী নদীর বিপুল বিস্তার ও তাহার বিচিত্র লীলা ও বিভিন্ন রূপ তাঁহার কল্পনাকে উজ্জীবিত করিয়াছে—বাংলা সাহিত্যে একটি অভিনব সৌন্দর্য্যের দ্বার খুলিয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু গঙ্গার রূপ ও তাহার বিশিষ্ট ভাব-প্রেরণাই যে তাঁহার কাব্য-সঙ্গীতের মূল সুরটিকে পুষ্ট করিয়াছে, তাহার বহু প্রমাণ আছে। দেশলক্ষ্মীকে বন্দনা করিতে তিনি গঙ্গাকেই বার বার স্মরণ করিয়াছেন—

"নমো নমো নমঃ, সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি,
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।"

—'জীবন জুড়ালে তুমি'—ইহা যে বড় সত্য! জীবন জুড়াইতে এমন স্নিগ্ধ সমীর আর কোন্ নদীকূলে বহিয়া থাকে? ইহার সহিত যে আর একটি শ্লোক আবৃত্তি করিতে গঙ্গাতীরবাসীর হৃদয় জন্ম-জন্মান্তরের স্মৃতি-স্বপ্নে আবিষ্ট হয়, তাহা এই—

"সেই চিরকলতান উদার গঙ্গা
বহিছে আঁধারে আলোকে
সেই তীরে চিরদিন খেলিছে
বালিকা-বালকে।"

ইহার সহিত স্মরণ কর—"ভাগীরথীতীরে আম্রকাননে বসিয়া" ইত্যাদি। সেই এক কথা। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যে একই মায়ের সন্তান! তথাপি ঐ দুইটি মাত্র পংক্তির মধ্যে কবিত্বের কি যাদুশক্তি রহিয়াছে! এখানে ভাগীরথীর ঐ চিরন্তনী জলধারার সঙ্গে বাঙালী জাতির বংশধারা এক হইয়া গিয়াছে; সেই উদার গঙ্গাও যেমন 'চির-কলতান' তাহার তীরেও তেমনই চিরদিন একই বালক-বালিকার মেলা! এখানে ওই দুইটি বিশেষণ 'চির-কলতান' ও 'উদার'—প্রণিধানযোগ্য। এ গঙ্গার জলধারা কখনও শুকায় না, তাই 'চির-কলতান'; আর 'উদার' শব্দটির যে অর্থ এখানে সূচিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইলে কবি বিহারী-লালের কাব্যে ওই শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করিতে বলি। 'উদার' অর্থে শুধু 'মুক্ত' 'অবাধ' বা 'সুপ্রশস্ত' নয়, 'সর্ব্বংসহা' 'নিঃস্বার্থ প্রীতিময়ী' 'কল্যাণকারিণী'ও বুঝিতে হইবে; যথা—

"অস্তাচলে চলে রবি,
কেমন প্রশান্ত ছবি!
তখনো কেমন আহা উদার বিভূতি।
* * *
আনন্দে উদার হাসি,
নয়নে অমৃত রাশি,
অপরূপ আলো এক উজলে ভুবন।"

ইতিপূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের আর কিছু কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছি। এখানে কেবল এই গঙ্গাতীরের আর একটি চিত্র উদ্ধৃত করিব—সে চিত্র যেমন প্রাণস্পর্শী তেমনই নিখুঁত। আসন্ন সন্ধ্যার ছায়াচ্ছন্ন আলোকে গঙ্গার তীরে নৌকা বাঁধিয়া যিনিই পল্লী-মধ্যে প্রবেশ করিবেন, তিনিই জন্মভূমির তর্পণ করার মত মনে মনে এই পংক্তিগুলি আবৃত্তি করিয়া ধন্য হইবেন—

"নামিছে নীরব ছায়া ঘন বন-শয়নে,
এদেশ লেগেছে ভালো নয়নে।
স্থির জলে নাহি সাড়া
পাতাগুলি গতিহারা
পাখী যত ঘুমে সারা কাননে,
শুধু এ সোনার সাঁঝে
বিজন পথের মাঝে
কলস কাঁদিয়া বাজে কাঁকনে।
এদেশ লেগেছে ভালো নয়নে।
* * *
ঝলিছে মেঘের আলো কনকের ত্রিশূলে
দেউটি জ্বলিছে দূরে দেউলে।..."

—এমন নদীকূলে এমন জনপদ-শোভা ত' আর কোথাও নাই! ছায়া নামিবার মতো এমন ঘন-বন-শয়ন, এবং তাহারই মধ্যে কনকের ত্রিশূল ও দেউলে দেউটির আলো—এমন আর কোথায় আছে! ওই 'মন্দির-ত্রিশূল-চূড়া' আর একটি কবিতায় উষার রূপকে যেন একাই সবটুকু ভরিয়া তুলিয়াছে—

"বজ্রসেন বন হ'তে ফিরিল যখন,
প্রথম উষার করে বিদ্যুৎ বরণ
মন্দির-ত্রিশূল-চূড়া জাহ্নবীর পারে।"

রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনাতেও অনেকস্থলে গঙ্গার স্নিগ্ধ-শান্ত কল্যাণময়ী শোভার অতি মধুর কিরণসম্পাত আছে। তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তেও কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে গঙ্গার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের বিবরণ আছে। বাংলার সংস্কৃতি রবীন্দ্রনাথের সাধনায় যে একটি অতি কোমল-মধুর, শান্ত-সুন্দর আভিজাত্যের রূপ লাভ করিয়াছে, তাহার মূলে, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথেরই কবি-মানসের মূলে, ওই গঙ্গাতীরভূমির আকাশ বাতাস কতখানি প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে—রবীন্দ্র-সাহিত্যেই তাহার বহুতর প্রমাণ মিলিবে।

ইহার পর, আমি রবীন্দ্রোত্তর যুগের একজন মাত্র কবির উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করিব—তিনি স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার একটি কবিতার নাম দিয়াছেন 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি'। সম্ভবতঃ বাংলাদেশ-বাসীদের এবং রাঢ়দেশের যে নাম গ্রীক ইতিহাসগ্রন্থে পাওয়া যায় (Gangarides), যাহার অর্থ 'গঙ্গাকূলবাসী জাতি,' তাহারই একটা ভাষান্তর করিয়া, সত্যেন্দ্রনাথ, বাঙালী জাতি নয়—বাংলাদেশের নাম দিয়াছেন 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি'। নামটি কেমন যথার্থ হইয়াছে—'গঙ্গাকে যে দেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়াছে!' কবি এই একটি নামেই আমার প্রতিপাদ্য বিষয়টির যেন চূড়ান্ত সাক্ষ্য দিয়াছেন! এই কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ এমনই করিয়া তাঁহার মাতৃবন্দনা আরম্ভ করিয়াছেন—

"ধ্যানে তোমার রূপ দেখি গো
স্বপ্নে তোমার চরণ চুমি
মূর্ত্তিমন্ত মায়ের স্নেহ!
গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি!"

তারপর, বাংলার নদ-নদীর কথা বলিতে গিয়া তিনি একটিকেও বাদ দেন নাই, যথা—

"ইচ্ছামতী ইচ্ছা তোমার,
অজয় তোমার জয় ঘোষে,
'পদ্মা' হৃদয়-পদ্ম-মৃণাল
সঞ্চারে বল হৃদ-কোষে।
'ডাকাতে' আর 'মেঘনা' তোমায়
ডাকছে মেঘের মন্দ্রে গো,
'ভৈরবে' আর 'দামোদরে' জপছে
"মাভৈঃ" মন্ত্রে গো!
রাঢ়ের 'ময়ূরাক্ষী' তুমি,
বঙ্গে 'কপোতাক্ষী' তুই......

[ইহার পর ৭১ পৃষ্ঠায়]

বেলা বয়ে যায়



পরিমল গোস্বামী

গণতান্ত্রিক জনতা। ডি এস-সি, পি-এচ ডি, ডি লিট, এম এ, বি এ, এম বি, এম এস সি, বি এল, আই এ, মাট্রিকুলেট, ক্লাস টেন, কেরানি, দোকানদার ইত্যাদি ইত্যাদি।

একই ছাদের নীচে।

বাইরে ঝম ঝম বৃষ্টি।

কারও জামাকাপড় ভিজে, কারও গায়ে বর্ষাতি, কারও হাতে ছাতা, কারও জামা-কাপড় শুকনো—সগু গাড়ি থেকে নামা।

এঁদের মধ্যে আলাপ চলছে কিছুক্ষণ ধ'রে। বিষয়, সিনেমা।

ডি এস সি বলছেন, আমাদের দেশে সিনেমা এত বড় একটা শিল্প, অথচ আজ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য একটা ছবি তৈরি হ'ল না।

ডি লিট বললেন, হবে কেমন ক'রে? এদেশের লোক কোন কাজটায় সাহিত্যিক? কোনো রকমে জোড়াতালি দিয়ে একটা কিছু খাড়া ক'রেই বলে শ্রেষ্ঠ অবদান।

এম এ (ইতিহাস) বললেন, আমার বিশ্বাস স্বদেশী আন্দোলন থেকেই এর সূত্রপাত হয়েছে।

এম এস-সি বললেন, আপনার কথাটা বুঝতে পারছি না।

এম এ বললেন, স্বদেশী আন্দোলনের যুগের কথাটি স্মরণ করুন। তখন বাঙালী গাইল, "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই।"

আনডার গ্রাজুয়েট, আই এ, মাট্রিক সমস্বরে ব'লে উঠল, এতে অন্যায়টা কি হ'ল?

এম এ বললেন, বর্তমানে তো অন্যায় হয়েছে। সে সময় মোটা কাপড় পরা অন্যায় হয়নি, কিন্তু কালক্রমে ঐ কথাটির অর্থ লোকে ভুলে গেছে।

বি এ বললেন, কি রকম?

এম এ বললেন, লোকে ক্রমে ভাবতে শুরু করেছে স্বদেশী মোটা জিনিসমাত্রেই মাথায় তুলে নেওয়া দরকার, আর তা থেকে শেষে এই দাঁড়িয়েছে যে, যা কিছু মোটা এবং খারাপ তাই স্বদেশী, এবং তাই আদর্শ।

পি-এচ ডি বললেন, এটা কি একটু বাড়িয়ে বলা হচ্ছে না?

এম এ বললেন, তা হয় তো হচ্ছে, কিন্তু এ কথা ঠিক যে আমাদের আদর্শ সেই থেকে আর উঁচুতে ওঠেনি।

ডি লিট বললেন, বাঙালীদের কিন্তু ধারণা, তারা আর্ট বোঝে।

ডি এস-সি বললেন, সেটা একমাত্র বাঙালীর বৈশিষ্ট্য নয়, সব দেশের সব লোকেরই ধারণা তারা সব কিছু বোঝে। সব কিছু বুঝি না বলতে পারেন তিনিই, যিনি অন্ততঃ একটা জিনিসও ভাল ক'রে বুঝেছেন।

পি এচ ডি বললেন সিনেমা যারা করে তাদের কল্পনার জোর নেই। গল্প অবশ্য তারা মনে মনে একটা ভাবে কিন্তু তা অখণ্ডভাবে ভাবতে পারে না।

আন্ডার গ্র্যাজুয়েট বলল, বুঝতে পারছি না আপনার কথা।

পি-এচ ডি বললেন, গল্পের অংশগুলো পৃথকভাবে কল্পনা করে, কিন্তু সেই অংশগুলো একত্র ক'রে মোটের উপর কি দাঁড়াচ্ছে তা কল্পনা করতে পারে না। অথচ গল্পের সার্থকতা নির্ভর করে তারই উপর।

ডি এস-সি বললেন, আপনি ঠিক বলেছেন। আমাদের সিনেমাকে হিটলারের যুদ্ধ-পরিকল্পনার সঙ্গে তুলনা করা যায়। খণ্ড অংশগুলো পর পর বেশ সাজানো হ'ল, কিন্তু সব মিলে কোনো সফল পরিণতির দিকে নিয়ে গেল না।

ডি লিট বললেন, তার চেয়ে বলুন সিনেমা ডাইরেক্টর সামান্য সাঁতার শিখেই বড় বড় নদী পাড়ি দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু দু' চার গজ গিয়েই হাবুডুবু খেতে থাকে। তারপর কোনো রকমে অপর পারে

গিয়ে হাজির হয় বটে, কিন্তু তখন আর তাকে চেনা যায় না, জল খেয়ে পেট ঢাক হয়েছে, চোখ হয়েছে রক্তবর্ণ, মাথা দপদপ করছে, সমস্ত অঙ্গ অবসন্ন। পারে গিয়েই ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে।

পি-এচ ডি বললেন, আরও একটা উপমা চলতে পারে। ডাইরেক্টর রওনা হ'ল অন্ধকারে। উদ্দেশ্য, অন্ধকারের শেষে আলোর দেশে উত্তীর্ণ হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল আলো তার সহ্য হয় না। তাই সে ঠিক করল আলো থেকে ফের অন্ধকারে ঢুকবে। যতক্ষণ আলো ততক্ষণ তার চোখ ধাঁধা, তারপর অন্ধকারে পুনঃ প্রবেশ ক'রে পরম নিশ্চিন্তে গা ঢাকা দিল।

আনডার গ্রাজুয়েট বলল, আপনারা এ ভাবে নীতি আলোচনা না ক'রে কোনো একটা বিশেষ ছবি নিয়ে আলোচনা করুন না।

ম্যাট্রিক এ কথার সমর্থন করল।

পি-এচ ডি বললেন, একটার নাম করুন।

ম্যাট্রিক বলল, "বেলা ব'য়ে যায়" ছবিটাই ধরুন না।

দোকানদার বলল, ও ছবিতে আবার নিন্দার কিছু আছে না কি? এমন চমৎকার ছবি!

কেরানি এতক্ষণে সাহস পেয়ে বলল, পাঁচবার দেখেছি মশাই, আরও দেখব ব'লে বেরিয়েছি।

বি এল বললেন, ভালমন্দ তোমরা কি বুঝবে?

এ বি বললেন, বেশ তো "বেলা ব'য়ে যায়" নিয়েই আলোচনা হোক।

শেষে সবাই রাজি হ'ল আলোচনা শুনতে। বৃষ্টি আরও জোর আরম্ভ হয়েছে, আলোচনাও বেশ জমে উঠল।

পি-এচ ডি বললেন, ধরুন এই ছবিটার নায়ক শিক্ষিত যুবক, সে দেশের কাজ করবে ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রে ঘর থেকে বেরিয়েছে। তার বাবা নিষেধ ক'রে বলেছিলেন, "বাবা, বাড়িতে বিষয় সম্পত্তি আছে, জমিজমা আছে, তাই দেখ।" ছেলে বলল, "না আমি দেশের কাজ করব।" "তবে বেরিয়ে যাও হতভাগা", ব'লে বাপ তাকে বাড়ি থেকে বের ক'রে দিলেন।—কেমন, ঠিক নয়?

সবাই বললেন, ঠিক।

পি-এচ ডি বলতে লাগলেন, ছেলে তো দেশের কাজ করবে ব'লে বেরিয়ে এল, কিন্তু দেশের কোন্ কাজ সে করবে? ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল পথে বিপথে। কাজ খুঁজে পায় না কোথায়ও। ইতিমধ্যে হঠাৎ পথেই এক মেয়ের সঙ্গে তার আলাপ হ'ল। সেও বোধ হয় কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছিল। তাই না?

সবাই বললেন, ঠিক তাই।

পি এচ ডি বলতে লাগলেন, তারা আলাপ হবার সঙ্গে সঙ্গে ইডেন গার্ডেনে গিয়ে ব'সে মিনিট পনেরো ধ'রে গান গাইল। তারপর দেখা গেল দু'জনেই দু'জনকে ভালবেসেছে। এইখানে গল্প জমে উঠল। মেয়েটি যুবকের হাতে হাত রেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, "আমার কিন্তু বিয়ে করবার উপায় নেই।" "কেন নেই?" যুবক কাতরভাবে প্রশ্ন করল। মেয়েটি কিছুতেই তা বলল না। তখন দু'জনে আবার গান গাইতে লাগল। একটার পর একটা গান গেয়ে চলল—মিনিটে একটা ক'রে। তারপর থেকে এদের যেখানে যখন দেখা হয় তখনই গান গায়।

কেরানি হঠাৎ ব'লে উঠল, কি গান মাইরি! যতবার শোন ততবার নতুন।

ডি লিট তাকে ধমকে থামিয়ে দিলেন।

পি-এচ ডি বলতে লাগলেন, দেশের কাজ করবে ব'লে যে ছেলে প্রতিজ্ঞা করল, সেই প্রতিজ্ঞা তার কোথায় গেল? এত সহজে যদি ভুলবে তা হ'লে ছেলেটাকে শিক্ষিত করা হ'ল কেন?

এম বি বললেন, বোধ হয় শিক্ষিত অশিক্ষিত সবাই দেখে বুঝতে পারবে ব'লে তাকে একই সঙ্গে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত করা হয়েছে।

ডি লিট বললেন, এবং গান দেওয়া হয়েছে যারা গান শুনতে ভালবাসে তাদের জন্যে।

ডি এস-সি বললেন, এবং নায়ক ও নায়িকা পরকালে গিয়ে মিলবে ব'লে শেষ দৃশ্যে তাদের বিষ খাওয়ানো হয়েছে, কিন্তু ওর আসল উদ্দেশ্য নাস্তিক দর্শকদের পরকালে বিশ্বাস বাড়ানোর জন্যে।

এম এ বললেন, এবং শিক্ষিত যুবকের আর কোনো কাজ নেই, সে কেবল একটি মেয়ের পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এটা করা হয়েছে আমাদের দেশের বেকার সমস্যার প্রতি গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করানোর জন্যে।

এম এস সি বললেন, আর আলাপ করতে করতে ওরা ছাদ থেকে পাঁচবার নীচে পড়ে গেছে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রমাণ করার জন্যে।

ম্যাট্রিক সবিস্ময়ে বলল, সে তো নিউ-টনের সময় একবার প্রমাণ হয়ে গেছে।

এম এস-সি বললেন, সে হয়েছে ইউ-রোপে। আমাদের দেশে এতদিনে প্রমাণ হ'ল।

দোকানদার ভয়ে ভয়ে বলল, একটা কথা আপনারা বাদ দিচ্ছেন। ওরা দু জনে তিন চার বার লরির নীচে চাপা পড়েছিল না?

ডি এস-সি বললেন, হ্যাঁ, পড়েছিল "দেখেশুনে পথ চল" অভিযানকে সাহায্য করার জন্যে।

আনডার গ্রাজুয়েট প্রশ্ন করল, কিন্তু ছবির নাম "বেলা ব'য়ে যায়" হল কেন? নামের সঙ্গে গল্পের তো কোনো মিলই নেই।

পি-এচ ডি বললেন, পরকালযাত্রী যেসব বৃদ্ধ এই ছবি দেখবে তারা খুশি হবে ব'লে। তারা পাছে ভুলে যায় যে আর তাদের বেলা নেই, তাই এই সতর্কবাণীটি ছবির নামের সাহায্যে মনে করিয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে।

আলাপ এই পর্যন্ত অগ্রসর হ'তেই এঁদের পাশের দরজা খুলে গেল।

সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। "বেলা ব'য়ে যায়"-এর প্রথম 'শো' শেষ হ'ল। আলাপচারী ভদ্রলোকরা এতক্ষণের অপেক্ষা সার্থক বোধ করলেন।

খোলা দরজা দিয়ে পুরুষ দর্শকরা গুঞ্জন করতে করতে বেরিয়ে আসছে।

মেয়েরাও বেরিয়ে আসছে, কিন্তু তাদের চোখ দিয়ে ঝর ঝর ক'রে জল পড়ছে, অনেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, চোখমুখ তাদের ফুলে গেছে।

বাইরে বৃষ্টি আর নেই।

ডি এস-সির স্ত্রী ক্রন্দনরত অবস্থায় স্বামীর পাশে এসে দাঁড়ালেন।

ডি লিটের স্ত্রীরও একই অবস্থা। চোখ-মুখ ফুলে গেছে কাঁদতে কাঁদতে। তিনি টলছেন, আর এক মিনিটও দাঁড়ালে বোধ হয় পড়ে যাবেন।

পি-এচ ডির স্ত্রীকে মূর্ছিত অবস্থায় ঘর থেকে বের করা হ'ল।

তাড়াতাড়ি ক'রে এঁরা নিজ নিজ স্ত্রীকে গাড়িতে তুলে দিলেন। গাড়িগুলো চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এঁরা সবাই আবার ফিরে এসে পূর্বস্থানে দাঁড়ালেন।

দ্বিতীয় "শো" আরম্ভের আগে দরজা খোলামাত্র ডি এস-সি, পি-এচ ডি, ডি লিট, এম এ, বি এ, এম বি, এম এস-সি, বি এল, আই এ ম্যাট্রিক, সবাই ভিতরে ঢুকে নিজ নিজ আসন দখল ক'রে বসলেন।

বলা বাহুল্য, টিকিট এঁদের পূর্বাহ্নেই কেনা ছিল এবং এরা প্রত্যেকেই ছবিখানা দু তিনবার ক'রে দেখেছেন।

—০—



উত্তরপ্রবেশ

জীবনানন্দ দাশ

পুরোনো সময় সুর ঢের কেটে গেল।
যদি বলা যেত :
সমুদ্রের পারে কেটে গেছে,
সোনার বলের মত সূর্য্য ছিল পুবের
আকাশে,—

সেই পটভূমিকায় ঢের
ফেন শীর্ষ ঢেউ,
উড়ন্ত ফেনার মত অগণন পাখি।

পুরোনো বছর দেশ ঢের কেটে গেল
রোদের ভিতরে ঘাসে শুয়ে ;
পুকুরের জল থেকে কিশোরের মত তুপ্ত হাতে
ঠাণ্ডা পানিফল, জল ছিঁড়ে নিতে গিয়ে,
চোখের পলকে তবু যুবকের মত
মুগনাভিঘন বড় নগরের পথে
কোনো এক সূর্য্যের জগতে
চোখের নিমেষ প'ড়েছিল।

সেইখানে সূর্য্য তবু অস্ত যায়,
পুনরুদয়ের ভোরে আসে
মানুষের হৃদয়ের অগোচর
গম্বুজের উপরে আকাশে।
এ ছাড়া দিনের কোনো সুর
নেই ;
বসন্তের অন্য সাড়া নেই।
প্লেন আছে :
অগণন প্লেন
সার্ব্বভৌম
অগণ্য এয়োরোড্রোম
র'য়ে গেছে।
চারিদিকে উঁচু নিচু অন্তহীন নীড়—
হ'লেও বা হয়ে যেত পাখির মত কাকলীর
আনন্দে মুখর,

সেইখানে ক্লান্তি তবু—
ক্লান্তি—ক্লান্তি ;
কেন ক্লান্তি
তা' ভেবে বিস্ময়,
সেইখানে মৃত্যু তবু,
এই শুধু—
এই ;
চাঁদ আসে একলাটি ;
নক্ষত্রেরা দল বেঁধে আসে,
দিগন্তের সমুদ্রের থেকে হাওয়া প্রথম
আবেগে
এসে তবু অস্ত যায়,
উদয়ের ভোরে ফিরে আসে
আপামর মানুষের হৃদয়ের আগোচর
রক্ত হেড লাইনের—রক্তের উপরে আকাশে।

এ ছাড়া পাখির কোনো সুর—
বসন্তের অন্ত কোনো সাড়া নেই।

নিখিল ও নীড় জনমানবের সমস্ত নিয়মে
সজন নির্জ্জন হয়ে থেকে
ভয় প্রেম জ্ঞান ভুল আমাদের মানবতা রোল
উত্তর প্রবেশ করে আরো বড় চেতনার লোকে ;
অনন্ত সূর্য্যের অস্ত শেষ ক'রে দিয়ে
বীতশোক হে অশোক সঙ্গী ইতিহাস,
এ ভোর নবীন ব'লে মেনে নিতে হয় ;
এখন তৃতীয় অঙ্ক অতএব ; আগুনে আলোয়
জ্যোতির্ম্ময়।

—

আবার কি যাত্রা হবে সুরু?

শ্রী সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

কঙ্কালের শোভা-যাত্রা দেখিয়া এলাম
গ্রাম হতে গ্রামান্তরে,
সহরে সহরে আর বন্দরে বন্দরে ;
অসংখ্য মায়ের কোলে অসংখ্য সন্তান
জরাজীর্ণ বৃদ্ধ আর যুবা ;
সবারই দৃষ্টির আগে জাগে মিথ্যা আশা
যে আশা ভুলায় মন, ভুলায় ভবন
পিতৃপুরুষের ভিটা ;
কতনা যুগের স্মৃতি
পরিপ্লুত শান্তির আবাস।
অশান্তির দাবদাহে, ক্ষুধার জ্বালায়
তাহারা বাহিরে এল
গৃহহীন যাযাবর সম ;
বিকাইয়া দিল তারা
নিরুপায়ে আপন মর্য্যাদা
মানুষের সকল মর্য্যাদা।

দেখিলাম মানুষের অপমান
নারীর লাঞ্ছনা,
শিশুর স্ফুলিঙ্গ-প্রাণ
নিবে গেল বিষাক্ত নিঃশ্বাসে,
দেখিলাম বলিষ্ঠ পেশীতে
দৃঢ় হ'ল আত্মঅবিশ্বাস,
অন্নের মালিক হ'ল
দয়াদত্ত অন্নের ভিখারী।
তাহারা আজিকে নাই,
আমাদের দৃষ্টির বাহিরে
প্রেতায়িত গাঢ় অন্ধকারে
হয়ত নিশ্চিহ্ন হ'ল,
নয়ত বিভ্রান্ত মনে
ঘুরিতেছে আলেয়ার পিছে।

আমরা দাঁড়াই তাই
পথপ্রান্তে সন্ত্রস্ত হৃদয়ে,—
এ উহার পানে চাহি'
বলি, চুপে চুপে,
আবার কি যাত্রা হ'বে সুরু?
কণ্টকে সঙ্কট পথ
অন্ধকারে নিশ্চিহ্ন নিশানা ;
শ্মশানের উৎক্ষিপ্ত আলোকে
মাঝে মাঝে চমকিয়া উঠি ;
আবার কি যাত্রা হ'বে সুরু?—
মৃত্যুর গহন পথে
ধ্বংসের তিমির রাত্রি ব্যাপি'
শবের মিছিল হবে?—
নিজেরই পায়ের শব্দে উঠিব কাঁপিয়া,
শববাহী—ভয়ার্ত্ত যাত্রীরে
বিহ্বল করিয়া দিবে আর্ত্তধ্বনি
চিরপরিচিত?
নিরন্নের অবশো রোদন
আশ্রয়হীনের অশ্রুধারা
বিক্ষুব্ধ মনের কোণে কোণে
শ্রাবণ রাত্রির অন্ধকারে
এনে দিবে সর্ব্বনাশী মায়া?

কঙ্কালের পূজা শেষ ক'রে
নিয়েছিনু শান্তিজল ;
শত শত সন্তানের
শত শত শিশু ও মাতার
সহস্র সহস্র পিতা
তাহাদেরি বক্ষরক্তে লাল
নিয়েছিনু শান্তিজল।
লজ্জামৌন অবনত শিরে
অপরাধ করেছি স্বীকার,
মাথায় নিয়েছি তুলি'
কলঙ্কের পরিপূর্ণ ডালা
প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে কি তা'তে?
কিবা তাতে আসে যায়—
এই আমি, এই তুমি—
এই সর্ব্বলোক,
আপামর সাধারণ,—
মুহূর্ত্তে ভুলিয়া যাই সব,
কখনো বা নিরুপায়ে
অপ্রকাশ্যে করি আস্ফালন
দুর্ব্বলের বাথ আস্ফালন।
তারপর খড়কুটা আহরণ করি
আপন গৃহের লোভে,
নীড় বাঁধি নিশ্চিন্ত আরামে।
আমরা মরিনা কভু
তাই নরকঙ্কালের পূজা—
যুগে যুগে করিতেছি মোরা।
এইত স্বভাব ধর্ম্ম,
এইত ঐতিহ্য, ইতিহাস
আমাদেরই একান্ত আপন,
দেবতার পূজার বেদীতে
শুচিশুদ্ধ রক্তবাস পরি'
মোরা করি কঙ্কালের পূজা।
জন্ম জন্মান্তর ধরি'
চিতাভস্মে লজ্জার তিলক
আঁকা থাকে ললাটে মোদের ;—
মনেরে শুধাই তাই
চুপে চুপে একান্ত গোপনে—
আবার কি যাত্রা হ'বে সুরু?

—



রাজমুকুট



মহকুমা শহর। তিনটি পাকা রাস্তা। আলো সর্বসাকুল্যে গোটা দশেক—তা-ও জ্বালা যাচ্ছে না সম্প্রতি কেরোসিন তেলের অভাবে। শিশির রায় এই জায়গায় বদলি হয়ে এল। স্ত্রী চন্দ্রা—বয়স কম বলে হাকিম গিন্নির যে রকম মন-মেজাজ হওয়া উচিত, তার তা মোটেই নয়।

পাড়াটা ভাল। পাশে সরকারি ডাক্তার-খানা। থানা আর কিছু এগিয়ে। কাল সন্ধ্যায় পৌঁচেছে, সকালবেলা সবাই এসে আলাপ-পরিচয় করে যাচ্ছেন। সকলের শেষে এলেন সেরেস্তাদার বাবু।

শিশির বলে, অনেককাল তো রয়েছেন এখানে। কি কি দেখবার আছে—চন্দ্রাকে নিয়ে দেখে বেড়াই এক একটা ছুটির দিনে। খুব ওর উৎসাহ ঘোরাঘুরির ব্যাপারে।

সেরেস্তাদার বললেন, ধাপধাড়া গোবিন্দ-পুর জায়গা হুজুর, এখানে আবার দেখবার জিনিষ! বউড়ুবির বিল আছে, দেদার ধানক্ষেত রয়েছে, দেখুনগে যান। ক্ষেতে বসে নিড়ানি দিচ্ছে পেট মোটা পিলেরোগা চাষাভুষোর দল—উঠতে গেলে মাথা ঘুরে পড়ে যায়।

চন্দ্রা রহস্যভরা চোখে চেয়ে বলে, আছে আছে একটি দেখবার। আপনি বলছেন না, আমি খবর রাখি।

আছে—কি আছে? সেরেস্তাদার একটু ভেবে নিয়ে বললেন, ওঃ—চণ্ডেশ্বর মন্দিরের কথা বলছেন, কিন্তু মন্দির নয় এখন তো—ইটের স্তূপ। কেউ যায় না। বিছুটি আর কাঁটা মিটকের জঙ্গল বাবাকে ঘিরে ফেলেছে, গোখরো সাপ ছা-বাচ্চা নিয়ে ঘরকন্না করছে তার ভিতর।

চন্দ্রা বলে, মন্দির-টন্দির দেখতে কি মন আসে এখন? সে বয়সের দেরি আছে, কি বলো?

বলে হেসে সে শিশিরের দিকে চাইল।

সেরেস্তাদার বললেন, আর এক আছে খালের উপরে নতুন পুল। এখনও শেষ হয়নি, কাজ চলছে। আগে কালভার্ট ছিল, বিলের জল নিকাশ হত না। আপনার আগে যিনি ছিলেন হুজুর, তাঁকে ধরে অনেক লেখালেখির পর এদ্দিনে রেল কোম্পানীর টনক নড়েছে।

চন্দ্রা মিটিমিটি হাসছে দেখে মনে মনে একটু গরম হয়েই তিনি বললেন, দেখবার জিনিষ আর কিছু নেই, আমিই হলপ করে বলছি মা-লক্ষ্মী।

জিনিষ নয় সেরেস্তাদার বাবু, মানুষ। হাসি থামিয়ে শান্ত শ্রদ্ধা-নিম্ন মুখে চন্দ্রা বলল, গঙ্গেশচন্দ্র পাল থাকেন না এখানে? কাগজে পড়েছি এখানেই তো তাঁর বাড়ি।

বুড়ো সেরেস্তাদার ঘাড় নাড়লেন। গঙ্গেশ—কই গঙ্গেশচন্দ্র বলে তো কেউ······ কি করে বলুন তো লোকটা?

আর্মেনিটোলার এক ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে রিভলভার ছুঁড়তে ছুঁড়তে পালিয়েছিলেন। ছ-বছর পরে ধরল তাঁদের। স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যালে বিচার হল—

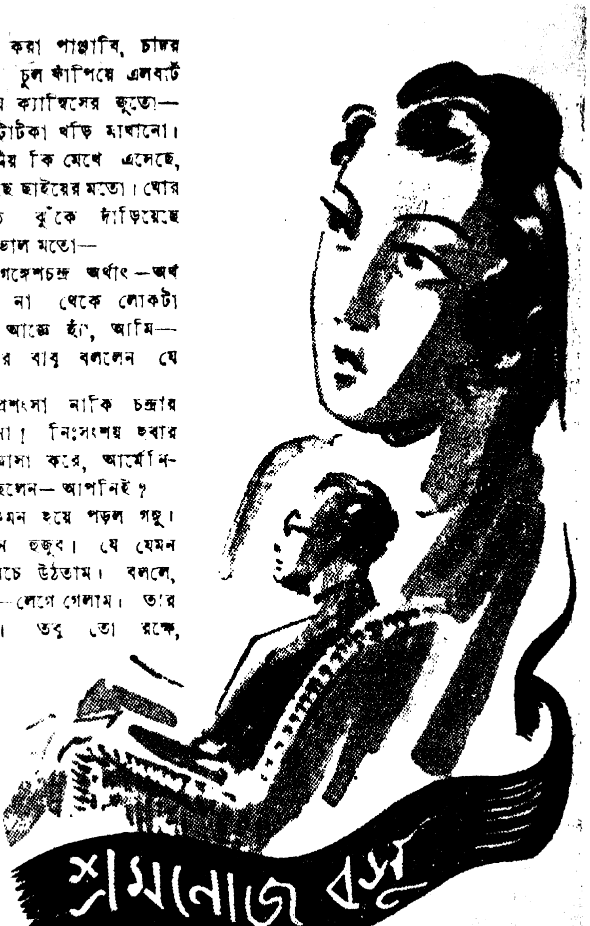
না, না মা-লক্ষ্মী, ভুল হয়েছে আপনার। সে সব এ জায়গায় নয়। ছা-পোষা মানুষ, শাক-চচ্চড়ি ভাত খায়—ম্যালেরিয়ায় ভোগে, রিভলভার ছোঁড়াছুঁড়ির তাকত নেই কারো এখানে।

ঘাড় নেড়ে অধীরভাবে চন্দ্রা বলে, আছেন, আছেন। আমার বাবা ছিলেন সেই ট্রাইবুন্যালের মধ্যে। ঠেসে দিয়েছিলেন অবশ্য আট বছর, কিন্তু আমার কাছে কত প্রশংসা যে করেছেন! বাড়ি তাঁর এখানেই।

সেরেস্তাদার বাবু ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আকাশ-পাতাল হাতড়াতে লাগলেন।

মনে পড়ল না? ভেবে দেখুন, তিন বছর হল জেল থেকে বেরিয়ে এসেছেন—

তিন বচ্ছর—না? হয়েছে। হঠাৎ



তিনি যেন অকূল সমুদ্রে কূল দেখতে পেলেন।

হয়েছে, হয়েছে। নুলো গজুর কথা বলছেন মা-লক্ষ্মী। তা কি করে জানব বলুন যে, খবরের কাগজে ওর নাম হয়েছে গঙ্গেশচন্দ্র—ঐ লোক এত কাণ্ড করে এসেছে কোনখানে। জেল ফেরত না জেল ফেরত—কতই তো জেল থেকে বেরুচ্ছে। কার দায় পড়েছে, কে মুখস্থ করে বসে থাকে বলুন দাগিগুলোর নাম?

চন্দ্রার করুণা হয় আদালতজীবী এই এঁদের উপর। শুধু নথি আর ফাইল, আরজি আর সামলান-খরচা। বাঁ হাত-খানা স্বয়ংক্রিয় নিখুঁত এক যন্ত্র বিশেষ। চেয়ারের হাতার তল দিয়ে পাতাই আছে। সিকি-আধুলি কিছু পড়লে সঙ্গে সঙ্গে সেটা মুঠো হয়ে এসে পকেটে ঢোকে। আবার তখনি ফিরে এসে যথাস্থানে প্রসারিত হয়। কি-ই বা খবর রাখেন, এদের কাছে কি প্রত্যাশা করা যায় এই ছাড়া?

দিন চারেক পরে। সন্ধ্যার একটু আগে শিশির কোর্ট থেকে ফিরল। গাড়ি গ্যারেজে নিয়ে যেতে বলে ফটকের সামনে নেমে পড়েছে। হেঁটে আসছে এইটুকু। কম্পাউণ্ডে ঢুকে ড্রয়িং রুম অবধি দু-ধারে ফুলবাগান। মালী ফুল জড় করে তোড়া বাঁধছে, আর একটা লোক বিড়ি টানছে তার পাশে উবু হয়ে বসে। শিশিরকে দেখে লোকটা বিড়ি ছুঁড়ে ফেলে তটস্থ হয়ে উঠে দাঁড়াল। মালী এসে একটা তোড়া দু'হাতে সসম্ভ্রমে এগিয়ে ধরল। একবার-দুবার গন্ধ শুঁকে প্রসন্ন মনে শিশির চলেছে। চন্দ্রাকে তোড়াটা দেবে। কাজ কর্মের অবসর এবার। চায়ের টেবিল সাজিয়ে দিয়ে খানসামা সরে যায়, চা খায় এই সময় দুটিতে বসে বসে। চন্দ্রার প্রদীপ্ত যৌবন ঝিক-মিকিয়ে ওঠে প্রসাধন-মার্জিত অঙ্গ-হিল্লোলে, মুখের হাসিতে, বেশভূষায়, চা দেবার সময় চুড়ির মৃদু শিঞ্জিনীতে। এর আগের এস. ডি. ও. ক্লাবে টেনিস খেলতে যেতেন, শিশির বেরোয় না। বারাণ্ডায় উঠে শিশির টের পেল, বিড়ি-খাওয়া সেই লোকটা তার পিছন পিছন এসেছে।

কি চাই তোমার?

হুজুর আমাকে দেখতে চান, শুনলাম—

তোমাকে? কে তুমি?

আমার নাম—

বিরক্ত দৃষ্টিতে শিশির তাকিয়ে আছে দেখে সে থতমত খেয়ে গেল, তারপর মরিয়া হয়ে যেন বলে ফেলল, আমার নাম শ্রীযুক্ত গঙ্গেশচন্দ্র পাল—

ফিরে দাঁড়াল শিশির, আপাদ-মস্তক তাকিয়ে দেখল। ঝুলে-পড়া ঠোঁটের পাশ দিয়ে কয়েকটা দাঁত বেরিয়ে এসেছে—পানের ছোপে রাঙা। কিন্তু বাহার আছে লোকটির। গিলে করা পাঞ্জাবি, চাদর চড়িয়েছে তার উপর। চুল কাঁপিয়ে এলবার্ট টেড়ি কাটা। পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো—ছেঁড়া জুতো কিন্তু টাটকা খড়ি মাখানো। মুখেও পাউডার জাতীয় কি মেখে এসেছে, সাদা সাদা গুঁড়ো উড়ছে ছাইয়ের মতো। ঘোর বিনয়ীও বটে—এত ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে যে মুখ দেখা যায় না ভাল মতো—

শিশির বলল, গঙ্গেশচন্দ্র অর্থাৎ—অর্থ শোনবার অপেক্ষায় না থেকে লোকটা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি—আমিই। সেরেস্তাদার বাবু বললেন যে আমাকে।

এই লোকের প্রশংসা নাকি চন্দ্রার বাপের মুখে ধরে না! নিঃসংশয় হবার জন্য তবু শিশির জিজ্ঞাসা করে, আর্মেনি-টোলার কেসে পড়েছিলেন—আপনিই?

ভয়ে লজ্জায় কেমন হয়ে পড়ল গজু। বলে, কাঁচাবয়স তখন হুজুর। যে যেমন বোঝাত, তাতেই নেচে উঠতাম। বললে, ইংরেজ তাড়াতে হবে—লেগে গেলাম। তার প্রায়শ্চিত্তও হয়েছে। তবু তো রক্ষে, হাতে-কলমে কোন কিছু করে বসবার আগেই ধরা পড়লাম। নয় তো ঝুলিয়ে দিত, আর বেরিয়ে আসতে হত না।

সাড়া পেয়ে চন্দ্রা পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়াল। শিশির বলে, এই যে ইনিই হলেন তোমার গঙ্গেশ মহারাজ। মিষ্টি-মিঠাই কি খাওয়াবে খাওয়াও। ফুলের মালা দিতে চাও তো বলে পাঠাও মালীকে। বলে পোষাক ছাড়তে সে চলে গেল।

আপনি? চন্দ্রা আশ্চর্য হয়ে তাকাল।

আজ্ঞে। বড্ড কষ্টের মধ্যে আছি। জেল থেকে মার্কা-মারা হয়ে এসেছি, চাকরি বাকরি কেউ দেয় না। রেলের পুল হচ্ছে, সেখানে লেবার-সুপারভাইজারের কাজ করছি। পঁয়ত্রিশ টাকা করে পাই। কিন্তু সে আর ক'দিন—দু-মাস কি আড়াই মাস বড় জোর। আপনি স্মরণ করেছেন শুনে বড্ড আশা করে এসেছি।

কাতর দৃষ্টি তুলে অসহায়ভাবে সে চন্দ্রার দিকে চাইল। বলতে লাগল, সেরেস্তাদার বাবু খবর দিলেন—মহাফেজখানায় একটা কি কাজ খালি আছে। আপনি যদি হুজুরকে একটু বলে কয়ে দেন—

সত্যি কথাই সেদিন সেরেস্তাদার বলে-ছিলেন। গঙ্গেশ নয়—এই গজু আছে, নুলো বাঁ হাতখানা সন্তর্পণে চাদর-ঢাকা দিয়ে এসেছে।

চন্দ্রা বলে, আপনার ঐ হাত নাকি শুনতে পাই—পুলিশে মুচড়ে দিয়েছিল?

এদিক-ওদিক চেয়ে সভয়ে গজু বলল, সে কি কথা? কে বলল? আমি তো কখনো বলিনি। ওঁরা মোচড়াতে যাবেন কেন? হাত থেকে পড়ে ভেঙে যায়, শেষটা কেটে ফেলতে হল।

যাবার সময়—হাত জোড় করবার ক্ষমতা নেই, নুলো হাতের উপর ডান হাত এনে যুক্ত করের ভঙ্গিতে বলল, চাকরিটা পাই যেন, দেখবেন—

আগষ্ট, ১৯৪২। হঠাৎ যেন মানুষ বদলে গেল। চারিদিকে রহস্যময় থমথমে ভাব। উদ্বেগে শিশির সারারাত ঘুমুতে পারে না।

চন্দ্রা প্রবোধ দেয়, দূর—কি যে অত ভাবো, এ জায়গায় কিছু হবে না। খবরের কাগজটাই পড়ে না এখানকার কেউ। গঙ্গেশকে দেখলে তো—সেই মানুষের ঐ অবস্থা, আর সবাই কি রকম বুঝে নাও ওর থেকে—

শিশির বলে, উঁহু, খবর পাচ্ছি যে বেয়াড়াগোছের—

কি?

ফিসফিস করে শিশির বলল, আট টাকা করে চালের মণ—তার উপর চাল বাইরে চালান হয়ে যাচ্ছে। ভিতরে ভিতরে এই নিয়ে সলা-পরামর্শ চলছে নাকি খুব—

চন্দ্রা নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলে, হোকগে। চাষাভুষো তো—নির্বিষ ঢোঁড়া। আটের জায়গায় আশি হলেও না খেয়ে শুকিয়ে

য়বে, কথা তুলে কেউ দাঁড়াবে না, তুমি দেখো।

সেরেস্তাদার বাবু সন্ধ্যার পর চুপি চুপি সে আবার মুলো গঙ্গুর নামটাও বলে গেলেন। ভেবে চিন্তে শিশির পরদিন কোর্টে যাবার মুখে গঙ্গেশের বাড়ি গিয়ে চল।

রমেশ গঙ্গেশের ছোট ভাই—মাইনর স্কুলে মাষ্টারি করে। বেলা হয়ে গেছে, খেতে বসছিল—মোটরের হর্ণ শুনে মুখ বাড়িয়ে দেখল। দেখে ছুটতে ছুটতে এল। মাইনর ইস্কুলেরও প্রেসিডেন্ট শিশির। এমন বশ পঁচিশটা প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট হতে হয়েছে তাকে, হরিসভা থেকে সাহিত্য সভা পর্যন্ত। মহকুমা শহরের এই রেওয়াজ।

গঙ্গেশ কাজে যায়নি, নিবিষ্ট হয়ে তাস খেলছিল একা একা। চারজনের তাস ভাগে ভাগে রেখেছে, কত কি হিসাবপত্র করে ফেলছে এক একখানা। রমেশ ডাকল, এস, ডি, ও, এসেছেন দাদা—

মুখ না তুলে গঙ্গেশ বলে, কোথায়?

বারান্দায় মোড়া পেতে বসিয়েছি। তাড়াতাড়ি আছে তাঁর—

হুঁ—বলে গঙ্গেশ সমস্ত তাস তুলে আবার সাজতে লাগল।

দেরি কোরো না—বলে আবার বাইরে ছুটল রমেশ। তার হয়েছে বিষম জ্বালা।

শিশির জিজ্ঞাসা করে, কি বললেন?

এক্ষুণি আসছেন। বললেন, কোনরকম অসুবিধা না হয় স্যারের। সিগারেট নেই এ বাড়িতে, গড়গড়া চলবে কি স্যার?

শিশির ঘাড় নাড়ল। হাতঘড়ি দেখে বলে, ইস—দশটা সাতাশ—

এসে যাবেন এইবার। মানে, আমার মেয়ের টাইফয়েড চলছে, সমস্ত রাত দাদা জেগেছেন তাকে নিয়ে। এখন বেদানার রস খাওয়াচ্ছেন। মেয়েটা আবার ওঁর বড্ড নেওটা কিনা—

অপ্রতিভ হয়ে শিশির বলে, অসময়ে এসে পড়েছি, বলুন গে একটা কথা বলেই আমি উঠব। কথাটা জরুরি।

ভিতরে গিয়ে রমেশ কাতর হয়ে ডাকে ও দাদা!

এখন গঙ্গেশ তেল মাখছে। মৃদু হেসে বলল, যাচ্ছিরে ভাই—

তামাক সেজে কলকেটা যেই গড়গড়ার মাথায় তুলেছে, ছোঁ মেরে গঙ্গেশ কেড়ে নিল গড়গড়াটা। ভুড়ুক-ভুড়ুক করে ক'টা টান দিয়ে গড়গড়া হাতে সে বাইরে চলল।

যাক্‌, কথাবার্তা বলুন গে এবার—নিশ্চিন্ত হয়ে রমেশ রান্নাঘরে খেতে বসল।

খেয়ে দেয়ে কাপড় চোপড় পরে রমেশ ইস্কুলে যাচ্ছে, দেখে, শিশির তখনো একা একা চুপচাপ বসে।

দাদা যে এলেন এইদিকে—

শিশির বলে, একজন কাকে দেখলাম খিড়কির দিকে গড়গড়া হাতে চলে গেলেন। গঙ্গেশ বাবুই হয়তো—

সর্বনাশ! দাদা ভেবেছেন, নাটমণ্ডপে এসে বসেছেন আপনি। সেখানে চলে গেছেন।

শিশির ডাকে, শুনুন—এইটে তাঁকে দিনগে। আর বলুন, একটা কথা মাত্তোর, মিনিটখানেক বড় জোর লাগবে।

কাগজখানা হাতে নিয়ে রমেশ দ্রুত চলল। কৈফিয়তটা নিজের কানেই অদ্ভুত লাগছিল, শিশিরের সামনে থেকে সে পালিয়ে বাঁচল। ডেপুটি বাবুর খোঁজে নাট-মণ্ডপেই গিয়ে থাকে যদি, এই আধঘণ্টা ধরে কি করছে সেখানে? তা' ছাড়া মণ্ডপ মরে মরুক, একটা খোড়োঘরও নেই যে ওদিকটায়। একটানা উলুক্ষেত।

উলুক্ষেতের ধারে পুকুর। গিয়ে দেখে, বাঁধানো চাতালের উপর গড়গড়া—মহানন্দে গঙ্গেশ সাঁতার কাটছে।

বিরক্ত কণ্ঠে রমেশ বলল, চান করতে করতে তামাক খাচ্ছ নাকি?

নয়তো গড়গড়া নিয়ে দিতিস তো ডেপুটিকে? আমার গড়গড়ায় যে সে তামাক খাবে, আমি পছন্দ করিনে।

মন্দ কাজ করতে আসেন নি উনি। চাকরি চেয়েছিলে—নিজে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার নিয়ে এসেছেন, এই দেখ। আর কি কথা আছে বলচেন—

ভুস করে ডুব দিল গঙ্গেশ। ডুব সাঁতার দিয়ে অনেক দূরে গিয়ে ভেসে উঠল।

ঐ উলুবন ভেঙেই রমেশ ইস্কুলের পথে নামল। শিশিরের মুখোমুখি পড়ে গেলে মিথ্যে একটা কিছু বানিয়ে বলারও আর পথ নেই।

সেই রাত্রে এক কাণ্ড হল। ঘুণাক্ষরে কেউ ভাবেনি, এমন হতে পারে এ জায়গায়। পুল হচ্ছে। খালের ভিতর থেকে থাম গেঁথে গেঁথে তোলা হচ্ছে। কাঠ ও বাঁশ ঠেকানো দিয়ে লাইন উঁচু করে রাখা হয়েছে, মিটার-গেজের গাড়ি ওর উপর দিয়ে সামাল হয়ে চলাচল করে। জল আটকাবার জন্য অস্থায়ী বাঁধ দেওয়া হয়েছে। বর্ষায় এখন এ অঞ্চলের সমস্ত জল এসে চাপ দিচ্ছে বাঁধের গায়ে। এপাশে খালের মধ্যে বড় জোর এক কোমর জল, আর ওদিকে জল জমে বাঁধের কানায় কানায় উঠেছে। জল ক্রমেই বাড়ছে, মাটি ফেলে ফেলে রোজই উঁচু বাঁধ আরও উঁচু করা হচ্ছে।

দিনে যারা কুলে কাজ করে তাদেরই জন কয়েক বর্ষারাত্রে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বাঁধের উপর এসেছে। কোদাল পাড়ছে অতি সন্তর্পণে। বেশি নয়, হাত দুই গভীর—এমনি পাঁচ সাতটা নালা কেটে দিতে পারলেই, বাস। তারও দরকার হল না—মাঝামাঝি গোটা দুই মাত্র হয়ে যেতেই জলের তীব্র বেগ নতুন মাটি ভেঙে ভাসিয়ে বিস্তীর্ণ পথ করে নিল। পুলের কাঠ বাঁশ ঠেলে ভাসিয়ে বিপর্যয় ঘটাল এক মুহূর্তে। রেলের পাটি আলগা হয়ে নিরালম্ব শূন্যে ঝুলতে লাগল।

রাত্রি তিনটে সাতাশে একখানা মাল-গাড়ি যায়। ধান চালান যাচ্ছে বলে এই গাড়ির সঙ্গে নাকি আরও বাড়তি ওয়াগন জুড়ে দেওয়া হচ্ছে আজকাল। সারা অঞ্চলের মানুষ ঘুমিয়ে থাকে, তাদের মুখের অন্ন সেই সময় চলে যায় দেশ-দেশান্তরে। ড্রাইভার দেখল, দুটো লাল আলো কে দোলাচ্ছে লাইনের উপর। ব্রেক কষে ইঞ্জিন থামাল, লণ্ঠন ফেলে লোকটাও অমনি লাইন থেকে লাফিয়ে পড়ল রাস্তায়। পালাতে গিয়ে পা হড়কে পড়ে গেল জলকাদায়। মুলো গঙ্গু। হেরিকেনের কাচে লাল কাগজ এঁটে দিয়েছে। ভাঙা পুলের উপর গাড়ি উল্টে মানুষ জন মারা না পড়ে,—সেকালের ত্রিশূলভার-ধারী গঙ্গেশ তাই মুলো বাঁ হাতের কনুয়ে ঝুলিয়ে নিয়েছিল একটা হেরিকেন, আর একটা নিয়েছিল ডান হাতে—আলো দুলিয়ে দুলিয়ে গাড়ি থামাবার সঙ্কেত জানাচ্ছিল ড্রাইভারকে।

পুলিশ-লাইনে খবর গেল, হৈ-হৈ পড়ে গেল। এ জায়গার ইতিহাসে এ একটা খণ্ড প্রলয়ের ব্যাপার। খবর চলে গেল শিশিরের বাংলোয়, স্বদেশিওয়ালারা রেল-লাইন ভেঙে দিয়েছে, ধরা পড়েছে তাদের একটা।

ঘুম থেকে উঠে শিশির রওনা হতে যাচ্ছে, পুলিশ-ইনস্পেকটর নিজে চলে এলেন। শুকনো মুখে বললেন, আসামিকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে।

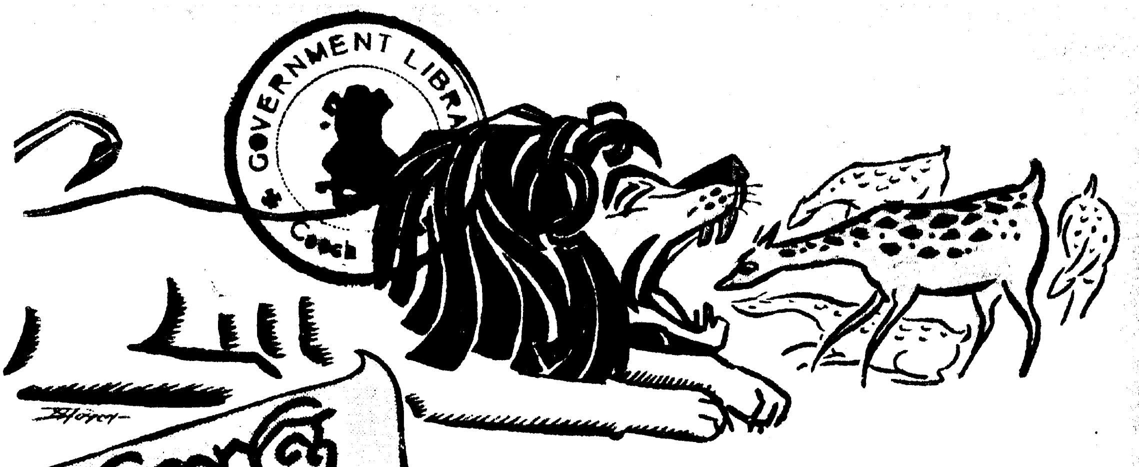
হাসপাতালে কেন?

অজ্ঞান হয়ে গেছে। পাবলিক বড্ড উত্তেজিত হয়েছিল কিনা!

মুখ কালো করে শিশির বলে, বাড়া-বাড়ি করেন আপনারা। আইন-আদালত রয়েছে, শাস্তির ভার আপনারা নেন কেন? আইন দিয়ে কংগ্রেসকে মেরে ফেলা হয়েছে বলে ভাবছেন বুঝি, আপনারাই থাকবেন আর কংগ্রেস মরে থাকবে চিরকাল?

হাসপাতালে গিয়ে দেখে আঘাত গুরুতর—গঙ্গেশ অচেতন তখনো। তারপর গেল পুলের অবস্থা দেখতে। এমন কিছু নয়—বাঁশ-কাঠগুলো কেবল খসে গেছে, এক বেলার মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে, বিকালের গাড়ি স্বচ্ছন্দে চলতে পারবে বলে মনে হয়। বাঁধ কেটে অবশ্য অন্যায় করেছে এরা, কিন্তু জলের চাপেও তো নতুন মাটির বাঁধ ভেঙে যেতে পারত! দোষ রেল-কোম্পানির—এমন শামুকের গতিতে কাজ চালায় কেন? দোষ গবর্ণমেন্টের—চালের দাম বেড়েছে, তবু কেন গাদা গাদা ধান চালান হয়ে যায়? দোষ তো আমেরি-কোম্পানির, কংগ্রেস কি করে না দেখেই কেন এত পায়তাঁরা কষতে গেল,—কোটি কোটি মানুষের এত বড় দেশকে এই দুঃসময়ে কোন্ সাহসে চ্যালেঞ্জ করল?

[ইহার পর ৭১ পৃষ্ঠায়]



প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

রঙ্গনাট্য

জীবন। তাহলে আমি আসব, সে কথা তোমার বাবা বলে গেছেন ?

পটল। আজ্ঞে হাঁ। বাবা বলে গেছেন, তিনি পাঁচটার মধ্যেই ফিরবেন। আপনি যেন ততক্ষণ…

জীবন। তা এখন বাড়ীতে আর কে আছেন ?

পটল। এখন ? মা আর আমি, আর দিদি, আর গোবর্দ্ধন চাকর।

জীবন। তোমার দাদারা ?

পটল। আমিই তো বড়। আমার ত দাদা নেই।

জীবন। ও বটে, বটে, তা তোমার কাকা টাকা…

পটল। এখানে ত কেউ থাকেন না—মেজ কাকা থাকেন খুলনায়, ছোট কাকা বহরমপুরে।

জীবন। হাঁ হাঁ, কি যেন নাম তাদের… কি যেন।

পটল। মেজ কাকার নাম হরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, আর ছোট কাকার নাম নরেন্দ্রনাথ…

জীবন। ঠিক, ঠিক, হরু আর নরু। কত ছোট দেখেছি সব। এখন বোধ হয় বেশ বড় সড়ো হয়েছে… তা কি করছে টরছে ওরা ?

পটল। মেজকাকা ওকালতি করেন, ছোট কাকা করেন প্রফেসারী।

জীবন। বেশ, বেশ। তা তোমার বাবার… কি বলে গিয়ে…

পটল। বাবার নাম ? শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ…

জীবন। হাঃ হাঃ হাঃ, জানি জানি, ওটা জানি বৈকি। তোমার বাবা যে আমার…

পটল। বঙ্গবাসী কলেজে বাবা ও আপনার সঙ্গে পড়তেন।

জীবন। হ্যাঁ হাঁ, এই ত জানো দেখছি।

[দরজায় চাবির আওয়াজ হ'তে পটল ভেতরে গেল, তখনি ফিরে এল বাইরের ঘরে।]

পটল। কাকাবাবু, মা বললেন আপনি ততক্ষণ চান-টান সেরে নিন্—খাবার এক্ষুণি হয়ে যাবে।

জীবন। আহা, সে হবে অখন। ও নিয়ে ওঁকে ব্যস্ত হতে বারণ করো। আগে আমি একটু বাথরুমে যাবো—সেই ব্যবস্থাটা করে দাও দিকি বাবা চট করে।

পটল। আচ্ছা, আসুন কাকাবাবু আমার সঙ্গে। এই গলিটা দিয়ে চলে যান—ঐ যে চৌবাচ্চাটা, ঐখানেই…

[উভয়ের প্রস্থান

[অন্নপূর্ণার প্রবেশ]

অন্নপূর্ণা। সুবি ও সুবি, এখন একবার উঠে আয় সেলাই রেখে।

[শুভার প্রবেশ]

শুভা। কি বলছ ?

অন্নপূর্ণা। বঙ্কিম বাবু এসেছেন, বাথরুমে গেছেন—তুই এই ফাঁকে ষ্টোভটা ধরিয়ে চট করে খান কতক লুচি আর আলু-বেগুন ভাজা করে ফেল দিকি, আমি গোবরাকে দিয়ে কিছু মিষ্টি আনিয়ে রাখছি দোকান থেকে।

শুভা। আমি বাপু আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই বেরুব—আজ আমাদের সিনেমায় যাবার কথা আছে।

অন্নপূর্ণা। পোড়ামুখো মেয়ে! ঘরের একটা কাজ করতে বললেই মুখ হাঁড়িপানা হয়। দিন রাত্তির খালি সাজাগোজা, নভেল পড়া, আর সিনেমা দেখা!

শুভা। হাঁ, আর পড়াশুনা করি না ? বাড়ীর কাজ করি না ?

অন্নপূর্ণা। করিস আমার মাথা আর মুণ্ডু! ভদ্রলোক এসেছেন আমাদেরই জন্যে কষ্ট করে বর্দ্ধমান থেকে—এত বড় মেয়ে, তোর কি উচিত নয়, ওঁর ভালো করে আদর যত্ন করা ?

শুভা। আঁা, আজ বলে টার্জ্জানের সেকেণ্ড পার্টটা হচ্ছে—অলকদা কলেজ থেকে ফিরেই আমায় নিয়ে যাবেন কথা রয়েছে। তা না, এখন বসে বসে তোমার বঙ্কিমবাবুর লুচি ভাজতে হবে!

অন্নপূর্ণা। এ আর কতক্ষণের কাজ ? চটপট সেরে নে, নিয়ে যেখানে খুসী যা—আমি আর এই অবেলায় হাঁড়ি ধরতে পারছি না বাপু!

শুভা। হাঁ, এতগুলো কাজ করে তারপর জামা কাপড় বদলে বেরুতে হলে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

অন্নপূর্ণা। তাহলে যা, এখুনি গিয়ে বসে থাকগে। লক্ষ্মীছাড়ী ধিঙ্গী কোথাকার!

শুভা। বাবা রে বাবা, যাচ্ছি। ভারী খ্যাচখেচে হয়েছো তুমি আজকাল।

[প্রস্থান

অন্নপূর্ণা। খোকন, গোবর্দ্ধনকে কর্ত্তার ঘরে বিছানা করে দিতে বলেছি—ওঁর মুখ-হাত ধোয়া হলে একেবারে ওপরে নিয়ে যাবি—বুঝলি। আর গোবরাকে একবার নীচেয় আসতে বলবি—দোকানে যাবে সে। [প্রস্থান

[বাইরের ঘরে নীলকণ্ঠের প্রবেশ। গোবর্দ্ধন সেখানে বসে ঘর ঝাট দিচ্ছিল]

নীলকণ্ঠ। তোর মা কোথায় রে ?

গোবর্দ্ধন। মা শুয়েছেন বোধ হয়।

নীলকণ্ঠ। ডাক দিকি একবার।

[গোবর্দ্ধনের প্রস্থান। একটু পরে অন্নপূর্ণার প্রবেশ]

অন্নপূর্ণা। কি বলছ ? একটু শোব ভাবছিলাম।

নীলকণ্ঠ। আরাম করেই শোওগে। বাঁকু আসতে পারবে না, তার ছোট মেয়ের ব্যারাম—অফিসে গিয়ে টেলিগ্রাম পেলাম, তাই তাড়াতাড়ি খবরটা দিতে এলাম

অন্নপূর্ণা। বেশ করেছো।

নীলকণ্ঠ। আচ্ছা বিভ্রাট যাহক! আমারি কপাল, নইলে যেমন তাড়াহুড়ো করছি, তেমনি একটা না একটা ব্যাগড়া এসে পড়চে কেন এমন করে? ভালোয় ভালোয় বেচারীর মেয়েটা সেরে গেলে হয়—এদিকে ত আর সময় নেই হঠাৎ বাজার নেমে গেলেই ব্যবসার দফা এক দম রফা হয়ে যাবে!

অন্নপূর্ণা। ন্যাকামি রেখে এখন ওপরে যাও দিকি। ভদ্রলোক একা পড়ে আছেন ঘন্টা খানেক থেকে।

নীলকণ্ঠ। ভদ্রলোক?

অন্নপূর্ণা। ভদ্রলোক কি ছোট লোক, তা তুমিই জানো। তোমারি ত বন্ধু।

নীলকণ্ঠ। কি বলছ সব পাগলের মতো?

অন্নপূর্ণা। আমার ত সব কথাই পাগলের মতো। তোমার সেই বঙ্কিম বাবু না কোন্ যম এসেছেন, খেয়ে দেয়ে ওপরের ঘরে পড়ে ঘুম দিচ্ছেন—দেখো গে গিয়ে!

নীলকণ্ঠ। তার মানে? বেলা আটটায় টেলিগ্রাম করেছে, আমি পেয়েছি বেলা এগারোটায়—এর মধ্যে সে বর্দ্ধমান থেকে এসে খেয়ে দেয়ে শুয়ে আছে, ব্যাপারটা কি?

অন্নপূর্ণা। তা আমি কেমন করে জানবো? ওসব ঠাট্টা রাখো বাপু, আমার বুক ঢিপ ঢিপ করছে।

নীলকণ্ঠ। ঠাট্টা? আরে এইত টেলিগ্রাম—Last daughter's cholera—Bankim.

অন্নপূর্ণা। রসিকতা করেছেন আর কি!

নীলকণ্ঠ। কিন্তু রসিকতা করার মানুষ ত সে নয়। আর এমন ভয়ানক কথা নিয়ে রসিকতা!

অন্নপূর্ণা। তা বাপু ওপরেই যাওনা একবার। নিজ চোখে দেখে এলেই ত বুঝতে পারবে সব!

নীলকণ্ঠ। তাই যাই, এ তুমি বলছ কিগো? [প্রস্থান

অন্নপূর্ণা। সব তাতেই আদিখ্যেতা! বুড়ো বয়সে ভালো লাগে এ সব!

[প্রস্থান

[শুভার প্রবেশ]

শুভা। অলকদার কি একটুও বুদ্ধি নেই? আর ত রয়েছে মোটে দশ মিনিট—এর মধ্যে যাওয়াই বা হবে কি করে? টিকিটই বা কেনা হবে কখন? মিথ্যে মিথ্যেই এত করে সাজগোজ করলাম! আচ্ছা, আসুক, বোঝাচ্ছি মজাটা!

[পটলের প্রবেশ]

পটল। বেশ হয়েছে! আমায় নিয়ে যেতে বললাম, তা না ব'লে দেওয়া হল! এখন যা টার্জ্জান দেখগে। অলকদা একাই চলে গেছে, তোকে নিয়ে যাবে না কচু!

শুভা। ভালো হচ্ছে না কিন্তু খোকন।

পটল। বারে আমি কি করেছি?

শুভা। তোকে কেউ টিপ্পনী কাটতে ডেকেছে?

পটল। টিপ্পনী কাটলাম কোথায়? আমি ত শুধু বলেছি, অলকদার সঙ্গে তোর...

শুভা। হতভাগা কোথাকার! [পটলের দৌড়ে প্রস্থান। পিছু পিছু শুভা ছুটলো।]

[অন্নপূর্ণা ও নীলকণ্ঠের প্রবেশ]

অন্নপূর্ণা। ওমা সে আবার কি?

নীলকণ্ঠ। হাঁ, আমি বাঁকুকে চিনি না? আমার ছেলেবেলার বন্ধু—বছরে অন্ততঃ পাঁচবার তার সঙ্গে আমার দেখা হয়—তার রং ধবধবে, এটা কালো মোষ, তার মাথায় টাক, এর কোঁকড়া চুল, সে রোগা, আর এ দিব্যি দোহারা—এ কেন সে হবে?

অন্নপূর্ণা। তা তুমি কি করলে?

নীলকণ্ঠ। উপস্থিত ও ঘরে ছেকল দিয়ে রেখেছি—ঘুমুচ্ছে ঘুমুক, তারপরে যা হয় করবো।

অন্নপূর্ণা। সে আবার কি? লোকজন ডাকো—ঘরের ভিতর একটা বাইরের লোক পোরা থাকবে এ আবার কেমন কথা?

নীলকণ্ঠ। থামো, থামো। সব তাতেই অত উদ্ধান্ত হলে চলে না। আমি বাড়ী ছিলাম না, বাড়ীতে কোন ব্যাটা ছেলে নেই—এর ভেতর একটা বাইরের লোক এসে নেয়ে খেয়ে ঘুম দিচ্ছে, এ শুনলে লোকে তোমায় কি বলবে জানো?

অন্নপূর্ণা। কি ঘেন্নার কথা!

নীলকণ্ঠ। হাঁ, সেই কথাই বলবে সবাই।

অন্নপূর্ণা। তা হলে কি করবে? রাজ্যের কাজ পড়ে রয়েছে—ঘরে ঢোকার উপায় কি হবে?

নীলকণ্ঠ। র'স র'স, অলক আসুক—চালাক চতুর ছেলে, তার সঙ্গে একটা পরামর্শ করি, তারপর যা হয় করবো।

অন্নপূর্ণা। জানি না বাপু। [উভয়ের প্রস্থান।]

[শুভার প্রবেশ]

শুভা। বাবার সব তাতেই অনাছিষ্টি! বাইরের লোক কখনো পরের বাড়ী ঢুকে নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমুতে পারে? এলো অলকদা—তাকে টেনে নিয়ে গেলেন পরামর্শ করতে। আর অলকদাও ত তেমনি—হুজুগ পেলে হয়!

[পটলের প্রবেশ]

পটল। দিদি, জানিস কি মজা হয়েছে?

শুভা। জানি জানি যা, সব বাজে কথা। দেখিস শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হবে, ইনিই বঙ্কিম বাবু। মধ্যে থেকে শুধু আমার সিনেমা দেখাটাই মাটি হল!

পটল। বেশ হয়েছে—আমি খুব খুসী হয়েছি। [উভয়ের প্রস্থান

[অলক, নীলকণ্ঠ আর পটলের প্রবেশ।]

অলক। আপনি যান, তুলে নিয়ে আসুন। আমি নীচেয় আছি।

নীলকণ্ঠ। সাহস হচ্ছে না যে!

অলক। কিচ্ছু ভয় নেই বরং একগাছা লাঠি হাতে করে যান, আর আমিও এক গাছা নিয়ে অপেক্ষা করি। তেমন তেমন দেখলে পিটিয়ে সিধে করে দেওয়া যাবে।

নীলকণ্ঠ। দাঁড়াও বাবা, আগে আর একটু তদন্ত করে নিই। কি মতলব নিয়ে এসে ঢুকেছে, হাতে কি হাতিয়ার পাতি আছে, কিছুই ত জানিনে! হ্যারে পটলা, তুই ভালো করে দেখেছিস, পিস্তল বন্দুক কিছু নেই টেই ত?

পটল। না বাবা, জামাটা খুলে হুকে রেখেই ত গেলেন—কোমরে কাপড়ের কষি ছাড়া আর কিছু ছিল না।

নীলকণ্ঠ। কিন্তু জামার পকেটে, কিংবা ট্যাঁকে ত কিছু থাকতে পারে। তা তুই কি করে দেখবি?

পটল। সে আমি জানিনে। না বাবা কিচ্ছু নেই, তুমি বরং দেখো গে। খুব সুন্দর গল্প বলে বাবা, ওঁকি কখনো বন্দুক ছুড়তে পারে?

নীলকণ্ঠ। তুই ত ভারী মানুষ চিনিস! তা এক কাজ কর দেখি—রান্নাঘর থেকে তিনখানা চেলা কাঠ নিয়ে আয়, একখানা আমায় দে, একখানা গোবরাকে দে, একখানা তুই নে। তারপর চল, তিনজনে একসঙ্গে ওপরে যাই, আর অলক নীচেয় থাকুক—কি বলো বাবা?

অলক। বেশ ত!

[পটল ও নীলকণ্ঠের প্রস্থান]

[অলক জামার আস্তিন গুটিয়ে কাপড়ে মালকোঁচা দিলে, তারপর দরজার খিলটা খুলে সেটা ঘাড়ে নিলে।]

[শুভার প্রবেশ]

শুভা। বা বা বেশ চেহারা খুলেছে—ঠিক একটি বিনা মাইনের বরকন্দাজ!

অলক। কি করব বলো? তোমার বাবা যে কাণ্ডটি বাধালেন!

শুভা। যান, আপনি ভারী ইয়ে! একটু আগে এলে কি হত? তা হলে কোন্ কালেই চলে যাওয়া যেত—এসব ফ্যাসাদের মধ্যে পড়তে হত না আর!

অলক। একটু বিশেষ কাজে দেরী হয়ে গেল—সত্যি ভারী অন্যায় হয়ে গেছে আমার!

শুভা। আঁা, অন্যায় হয়ে গেছে! তা সাড়ে ছ'টার শোতে যাওয়া হবে ত, না সেটাও গেল?

অলক। নিশ্চয় হবে। আলবৎ হবে—একদম বিদ্যে ছুঁয়ে বলছি।

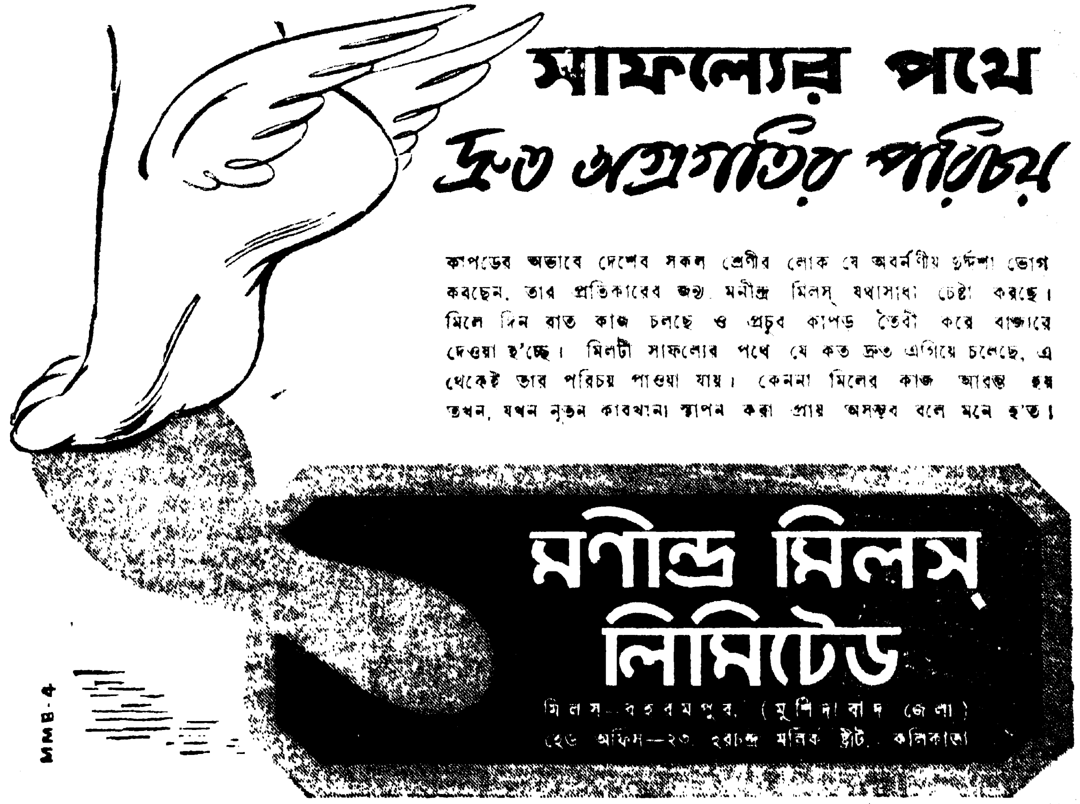
শুভা। হাঁ, সে কথাটার কি হল?

অলক। আছে খবর—সিনেমায় গিয়ে বলবো।

শুভা। আমি চায়ের জল চাপিয়ে এসেছি, এখন চললাম, আপনি ততক্ষণ দারোগা-গিরি সেরে নিন। [প্রস্থান


বৈচিত্র্য
প্রকৃতির কারুকার্য্য ও মনোহারি যে বিশ্বশিল্পীর যেমন নিপুণতার প্রকাশ তেমনই আমাদের সুদক্ষ শিল্পীর তৈরী অলঙ্কারও বৈচিত্র্যময় অথচ আধুনিক।
ন্যাশনাল জুয়েলারী ওয়ার্কস
২০ নং কালিঘাট রোড : ফোন সাউথ ২৬৩৯
শো: রুম-১৬১, রসা রোড, (পূর্ন থিয়েটারের সম্মুখে) কলিকাতা


নিত্য প্রসাধনে
Indus
CANTHARIDINE
Indus
TALCUM POWDER
Indus
Indus
CASTOR OIL
ইণ্ডাস কেমিক্যাল কোং · কলিকাতা


সাফল্যের পথে
দ্রুত অগ্রগতির পরিচয়
কাপড়ের অভাবে দেশের সকল শ্রেণীর লোক যে অবর্ণনীয় দুর্দ্দশা ভোগ করছেন, তার প্রতিকারের জন্য মনীন্দ্র মিলস্ যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। মিলে দিন রাত কাজ চলছে ও প্রচুর কাপড় তৈরী করে বাজারে দেওয়া হ'চ্ছে। মিলটী সাফল্যের পথে যে কত দ্রুত এগিয়ে চলেছে, এ থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা মিলের কাজ আরম্ভ হয় তখন, যখন নূতন কারখানা স্থাপন করা প্রায় অসম্ভব বলে মনে হ'ত।
মণীন্দ্র মিলস্ লিমিটেড
মিলস্—বহরমপুর, (মুর্শিদাবাদ জেলা)
হেড অফিস—২৩, হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা
MMB-4

[কাঠ চেলা হাতে নীলকণ্ঠ, পটল ও গোবর্দ্ধনের প্রবেশ—সঙ্গে সদ্য ঘুম থেকে উঠে আসা জীবনবাবু, ধন ঘন হাই উঠছে।]

নীলকণ্ঠ। ওসব কথা শুনতে চাইনে। আপনি কি জন্যে ভরা দুপুর বেলা ভদ্রলোকের বাড়ীতে ঢুকেছেন, তাই শুনি। এ কি বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা পেয়েছেন? জানেন আপনাকে……

অলক। এ্যা? বাবা?

জীবন। তুই—এখানে? কি সর্ব্বনাশ!

অলক। আমি ত এই বাড়ীতেই পড়াই, ইনিই নীলকণ্ঠবাবু।

জীবন। রক্ষে হক! আমি ভাবছিলাম, বুঝি বাপ-ব্যাটা দু-জনেই এক জালে জড়িয়ে পড়েছি!

নীলকণ্ঠ। ব্যাপার কি অলক? ইনি তোমার……

অলক। আজ্ঞে, আমার বাবা। [প্রস্থান—পিছু পিছু পটল এবং গোবর্দ্ধনের প্রবেশ]

নীলকণ্ঠ। আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না।

জীবন। দাঁড়ান, দাঁড়ান, বুঝিয়ে দিচ্ছি। এসেছিলাম সিমলা ষ্ট্রীটে একটু কাজে, হঠাৎ বাথরুমের দরকার হয়ে পড়ল—কি করি? কাছে-ভিতে পার্ক নেই, আশে-পাশে চেনাশুনো লোক নেই—বেগতিক দেখেই ঢুকে পড়লাম আপনার বাইরের ঘরে। ছোট ছেলেটি খেলা করছিল, ভাবলাম, তাকে একটু বুঝিয়ে সুজিয়ে ব্যবস্থা করে নোব। তা আমি ঢুকতেই খোকাটি খুব অভ্যর্থনা করলে—বললে, বাবা বলে গেছেন, আপনি এলে যেন আপনার নাওয়া-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, বাবা ফিরবেন পাঁচটায়। বুঝলাম, কারুর আসার কথা আছে—তিনি আসেন নি, আর তাঁকে এরা চেনেও না। ভাবলাম, এই ত সুযোগ—কার্য্য সেরে সরে পড়বারই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যে পরিমাণ আদর যত্ন লাভ হল, তাতেই বেসামাল হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আর ধরাও পড়ে গেলাম তাতেই।

নীলকণ্ঠ। হাঃ হাঃ হাঃ, করেছেন ত মন্দ নয়। তা ওরা একটুও ধরতে পারলো না? পারবে কি করে? আমার এক বন্ধুর আসার কথা ছিল কিনা—ওরা তৈরী ছিল সেইজন্যে। এদিকে অফিসে গিয়ে টেলিগ্রাম পেলাম, সে আসতে পারবে না—তাড়াতাড়ি বাড়ীতে সেই খবর দিতে এসে শুনলাম, সে এসেছে। বুঝুন তখন আমার অবস্থাটা! তা না চিনে বড়ই…

জীবন। কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, দু-পক্ষেই একটু রঙ্গ করে নেওয়া গেল—মন্দ কি?

নীলকণ্ঠ। দেখুন, অলককে আমরা ছেলের মতোই দেখি—আপনি তার বাবা, আপনি ত আমাদের পরমাত্মীয়।

জীবন। বটেই ত। আপনাদের কথা প্রায়ই শুনি খোকার মুখে—দৈবে আজ আলাপ হয়ে গেল, ভারী আশ্চর্য্য কিন্তু।

নীলকণ্ঠ। দেখুন, আপনার সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা হবে বলেই দৈব এই যোগাযোগ ঘটিয়েছেন—নইলে এতগুলো জিনিষ এক সঙ্গে হবে কেন? বাঁকু আসতে পারলো না, আমাকে বেরুতে হল, আপনার অমন একটা দরকার হয়ে পড়লো…এ থেকে কি বিধাতার গভীর একটা উদ্দেশ্যেরই আভাস পাচ্ছেন না আপনি?

জীবন। না ত।

নীলকণ্ঠ। আচ্ছা চলুন ওপরে, সব বুঝিয়ে বলছি।

জীবন। ভোম্বল কোথায়?

নীলকণ্ঠ। কে, অলক? সে তার কাকীমার সঙ্গে গল্প করছে বোধ হয়। আসুন, আপনি ওপরে আসুন। ওরে, ওপরে তামাক দে। [উভয়ের প্রস্থান]

[অলক আর শুভার প্রবেশ]

অলক। চলো, চটপট বেরিয়ে পড়ি, নইলে হয়ত এখনি ডাক পড়বে।

শুভা। ভালোই ত হবে, সামনাসামনি পাকা কথা হয়ে যাবে।

অলক। ধাঃ, তাই কখনো পারা যায়?

শুভা। কেন, তখন যে বলতেন, আমার জন্যে কারুর বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই আপনার ভয় নেই।

অলক। মুখে বলা, আর কাজে করা…

শুভা। তা আমি জানতাম, তাইতেই দিন-রাত ভয়ে আমার গা ছম ছম করত।

অলক। এখন ভয় ভেঙ্গেছে ত?

শুভা। তা ভেঙ্গেছে, কিন্তু সে ত ভেঙ্গে দিলে দৈব। আপনার বাহাদুরীটা কোথায়? যাক, এখন চলুন—সন্ধ্যার শো'ও যদি দেখা না হয়, তাহলে কিন্তু…

অলক। না না চলো, আর দেরী নয়। [উভয়ের প্রস্থান

[অন্নপূর্ণা ও পটলের প্রবেশ।]

অন্নপূর্ণা। কি বলছে? মত করেছে ত বিয়েতে?

পটল। ইস, মত করবে না? ঠেঙিয়ে হাড় ভেঙে দোব না তাহলে।

অন্নপূর্ণা। চুপ কর গাধা ছেলে, ওকথা বলতে আছে?

[গোবর্দ্ধনের প্রবেশ]

গোবর্দ্ধন। মা; ওপরে আসুন, বাবু ডাকছেন।

পর্দ্দা

ইতিহাস

অজিত দত্ত

গহীন নিশ্ছিদ্র তবু অরণ্যেরো পারে
আছে পথ,
আছে পর্ণকুটিরের চুম্বন-সম্বল ভালোবাসা,
দুর্বল মুহূর্ত শেষে তাই মনে বলিষ্ঠ দুরাশা,
কামচারী, দুর্নিবার তাই আজও কল্পনার রথ।
একদা যে স্বেচ্ছাক্রমে বদ্ধ হয়ে করেছি শপথ
লিখে যাবো হৃদয়ের ইতিহাস—তৃপ্তি ও
পিপাসা—
আশা জাগে হয়তো বা সে দুর্লভ,
দুষ্প্রকাশ ভাষা
কোনোদিন লেখনীতে ধরা দেবে
প্রেমাস্পদাবৎ।

হৃদয়ের ইতিবৃত্ত! বোধাতীত, পরিবর্তমান!
যার হাতে হাত দিয়ে লঙ্ঘেছি দুর্গম,
দীর্ঘ আয়ু
আমার সত্তার মাঝে সে ত আজ
ওতপ্রোত মাথা,
সহস্রের আত্মা আজ আমারে যে শোনায়
আহ্বান—
প্রাণ তাই বলোচ্ছ্বীন, সদ্যোজাত যেন সে
জটায়ু
চলেছি সম্মুখে শুধু এইমাত্র ইতিবৃত্তে রাখা।

মধ্যবয়সী

বিষ্ণু দে

মধ্যবয়সী, তবুও তনু তোমার
আশ্বিন আলো ছড়ায় আমার মনে।
ফেলে দিই ভয় ফেরার পীত বোমার,
জীবন ঘনায় তোমার আলিঙ্গনে।
তোমার বাহুতে আমার জীবনস্মৃতি
দ্বৈত রচনা গত-অনাগত প্রীতি।
উপমা তোমার খুঁজি নি কো আকিতেনে
এলেও নোরে তো সঞ্জিয়া ক্রবাদুর,
হেলেন-কে চাওয়া উদ্বায়ু ফাঁকি জেনে
দেহমনে মনজীবনে ভেদ-আতুর
রোমাঞ্চ-গান করি নি, প্রেম তোমার
অলকনন্দা, অনন্ত-গতি তার।
একাগ্রতাই সত্তা, জীবনতটে,
বয়ে যায় দেখি তোমারই সে মহানদী,
আমার প্রাণের অশ্বত্থে ও বটে
অচিন্ পাখির গান শোনা যায় যদি,
গঙ্গোত্রীতে জেনো তার নীল বাসা
কিম্বা হয়তো আনে সাগরেরই ভাষা।

নদীর ধারের বাড়ি



শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্যামলীদের বাসা ছিল পীতাম্বর চৌধুরী লেনে। দু'নম্বর পীতাম্বর চৌধুরীর লেন। সেকেলে পুরনো বাড়ি, দোতলার ছ'টি ঘরে ছ'টি পরিবারের বাস। কলতলায় দুটিবেলা সমানে ঝগড়া চলে জল তোলা নিয়ে। শ্যামলী ওর মধ্যে একটু দেখতে ভালো, বয়েস তিরিশের সামান্য ওপরে, দু'এক বছর ওপরে। চার সন্তানের মা, দুটি মেয়ে দুটি ছেলে।

বেলা দশটা বাজে।

শ্যামলীর স্বামী খেতে বসেচে। শ্যামলী ডালের বাটিতে হাতা ডুবিয়ে সামনে বসে আছে।

শ্যামলী বল্লে—ফিরবে কখন?

শ্যামলীর স্বামীর নাম যদুনাথ ভট্টাচার্য। যদুনাথ একটা বাঙালী সওদাগরি আফিসে সত্তর টাকা মাইনের চাকুরী করে। যুদ্ধের বাজারে তাতে চলে না। খাওয়া দাওয়ার অসীম কষ্ট। ছেলেমেয়েগুলো দুধ খেতে পায় না, দুটো শুকনো মুড়ি চিবোয় স্কুল থেকে এসে।

যদুনাথ বল্লে—ফিরতে সাতটার পরে।

—আর একটা বাড়ি দ্যাখো, বুঝলে?

—সে তো বুঝলাম, বাড়ি মিলচে কই? খুঁজতে কি কম করচি?

—এ বাড়িতে আর টেঁকা যায় না।

—কালও ঝগড়া হয়েছিল?

—কবে না হয়? বিশ্বেস গিন্নির সঙ্গে মতির মা'র ঝগড়া কালও খুব। অভয়ার সঙ্গে রাম বাবুর বৌয়ের ঝগড়া।

—জল তোলা নিয়ে?

—তা আবার কি নিয়ে। ও তো রোজকার ঘটনা লেগেই আছে। রোজ রোজ এ হৈ-হল্লা আর ভালো লাগে না। অসহ্য হয়ে উঠেচে।

যদুনাথ চলে গেল। শ্যামলীর ছেলে-মেয়েরা খেয়ে দেয়ে স্কুলে চলে গিয়েছিল, ছেলে দুটিই বড়, তারা হাইস্কুলে পড়ে। মেয়ে দুটি পড়ে মোড়ের কর্পোরেশন স্কুলে। ছোট রান্নাঘর, একটি লোক কায়ক্লেশে বসে দুটি আহার করতে পারে।

আজ ন'টি বছর এ বাসায়, বড় মেয়ে লীলার বয়েস। এই বাসাতেই লীলার আঁতুড় হয়েছিল। রান্নাঘরের সামনে খোলা ড্রেনে তরকারির খোসা, ফেন, শাকের ডাঁটা, চিংড়ি মাছের খোসা জমে দুর্গন্ধ বার হচ্ছে। এই দুর্গন্ধ আর এই কুশ্রী দৃশ্য আজ ন'বছর ধরে সহ্য করতে করতে নাক অসাড় হয়ে গিয়েচে, এখন আর দুর্গন্ধকে দুর্গন্ধ বলে মনে হয় না।

বীণা ওপরের তলার মনোরঞ্জন বাবুর মেয়ে। সে শ্যামলীকে ভালবাসে। কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বল্লে—কাকিমা কি রাঁধলে?

—মুসুরির ডাল আর চচ্চড়ি।

—মাছ আনেননি কাকাবাবু?

—নাঃ। দুটাকা চিংড়ি মাছের সের। মাছ আর কি কিনবার জো আছে? উনি গিয়ে ফিরে এলেন।

—এবার রেশনের চালে কাঁকর কম, কাকীমা! আপনারা রেশন আনেন নি?

—বুধবারে আসবে রেশন। এখনো আনা হয়নি। তোমার কাকা যেতে সময় পান নি।

বিকেলে কলে জল আসতেই ওপরের ভাড়াটে গিন্নিরা বড় এক এক বালতি ঘড়া বসিয়ে দিলেন কলের মুখে। একজন একটা তুলে নিয়ে যায় তো আর একজনে একটা বসায়, এইজন্যে চৌবাচ্চায় মোটে কয়েক ইঞ্চির বেশি জল জমতে পায় না। গা ধোয়ার কি কষ্ট বিকেলে। এই গুমো গরমে স্নিগ্ধ জলে স্নান করতে পারলে কি আনন্দই পাওয়া যেতো। কিন্তু তা হওয়ার যো নেই। এক একজন ঝোবড়া সাবান নিয়ে ন মবে ওপর থেকে আর ঘ ধরে থাকবে। প্রথমে নামবে অভয়া, তা পর নামবে মতির দিদি, এরা দুজনে ভীষণ ঝগড়াটে। যতক্ষণ তারা কলতল না ধোবে, ততক্ষণ কলে এক ঘটি জল কা নেবার যো নেই—তাহোলেই বাধ ধুন্দুমার ঝগড়া।

অভয়া বাঙাল দেশের মেয়ে। বেশ সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী। শ্যামলীকে ডেকে বল্লে—ও দিদি, কি হচ্ছে?

—কুটনো কুটচি ভাই।

—কি কুটনো?

—ঝিঙে আর ঢেঁড়স। আলু তো বারো আনা সের উঠেচে। আমাদের সাধ্যিতে কুলোলে তো কিনবো।

—রেশন এসেচে?

—না ভাই, বুধবারে আসবে।

—আমায় আধপোয়া চিনি দিতে পারবে দিদি তোমাদের রেশন থেকে?

—আসুক আগে, দেখবো এখন।

এদের মধ্যে সবাই সমান অবস্থার মানুষ। কেরাণীর বৌ। পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া দ্বন্দ্ব করে এদের দিন কাটে। পান থেকে চুণ খসলেই আর নিস্তার নেই। বিশ্বাস গিন্নি দলের মোড়ল, ওপরের ভাড়াটেদের সর্দ্দার। তিনি সকলের হয়ে ঝগড়া করতে এগিয়ে আসেন। তাঁর সর্দ্দারিতে ওপরের মেয়েরা কোমর বাঁধে, তাদের মধ্যে একজন হচ্চে এই অভয়া। দেখতে সুন্দরী হোলে কি হবে, যেমনি স্বার্থপর তেমনি কুটিল মন। এই যে বল্লে চিনি দিতে হবে, 'না' বল্লে আর রক্ষে আছে? কোন কালে এক বাটি নুণ ধার দিয়েছিল, সেই ঘটনার উল্লেখ করে খোঁটা দিয়ে বলবে বরিশালের টানে—আমরা কি কোনোদিন কিছু কাউকে দিই না কি! সময়ে অসময়ে নুণ রে তেল রে—তা নিয়ে মনে থাকবে ক্যানো? ঘোর কলি যে! কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরুলে পাজি—আচ্ছা আমরাও কি আর কখনো কাজে লাগবো না? তখন যেন—ইত্যাদি।

এই বাসাটাতে কি গুমট গরম। দক্ষিণ দিক চাপা, এতটুকু হাওয়া আসে না, প্রাণ আই ঢাই করে গরমে। আজ ন' বছর এই কষ্টভোগ চলচে। এই ঝগড়ার আবহাওয়া আর এই দারুণ স্থানাভাব। সকলের ওপরে এই অপরিষ্কার, নোংরা পরিবেশ। সবাই সমান অশিক্ষিতা, ভালো বল্লেও এ বাড়িতে মন্দ হয়। সেদিন অপরাধের মধ্যে ও শশী বাবুর স্ত্রীকে বলেছিল—দিদি, চিংড়ি মাছের খোসাগুলো একেবারে সামনেই ফেললে, কলতলায় সকলেরই যেতে আসতে হয়—সকলেরই তো অসুবিধে।

আর যাবি কোথায়। শশী বাবুর বৌ চীৎকার জুড়ে দিলে—আমি কি একলা ফেলি নাকি, সবাই তো ফেলে, কেনই বা না ফেলবে; ভাড়া দিয়ে সবাই বাস করে, কারো একার সম্পত্তি তো নয়; সবারই সুবিধে এখানে দেখতে হবে—যদি তাতে অসুবিধে হয় তবে গরীব ভাড়াটেদের সঙ্গে বাস করা কেন, তাহোলে দোতলা বাড়ি আলাদা ভাড়া নিয়ে বালিগঞ্জে গিয়ে বাস করলেই তো হয়—ইত্যাদি।

শ্যামলীও চুপ করে থাকবার মেয়ে নয়, সে বল্লে—দিদি, কি পাগলের মত বকচেন? আপনি চিংড়ি মাছের খোসা ফেলবেন তাতে কেউ বারণ করচে না, তবে আমারই রান্নাঘরের সামনে কেন ফেলবেন? কেন আমি তা ফেলতে দেবো?

—ফেলতে দেবে না তোমার কথায়? কি তুমি এমন লাট সায়েব এয়েচ রে বাপু। তুমি পাগল না আমি পাগল? রান্নাঘরের বাইরের জায়গা তোমারও যা, আমারও তা—তুমি বলতে আসবার কে?

—তা বলে পরের সুবিধে অসুবিধে যারা না দেখে, তারা আবার মানুষ? তাদের আমি ঘোর অমানুষ বলি।

এই পর্য্যন্ত গেল সাধারণ ভাবের কথা, একে ঝগড়া বলে অভিহিত করা যায় না। এরপর বাধলো আসল ঝগড়া যার নাম—। শ্যামলীও ছাড়লে না, শশী বাবুর বৌও না—উভয়পক্ষে বাধলো কুরুক্ষেত্র। তারপরে কথা একদম বন্ধ হয়ে গেল দু'পক্ষেই। নানারকম শত্রুতা আরম্ভ করলেন শশী বাবুর প্রৌঢ়া স্ত্রী। ছেলেমেয়ের হাত ধরে খোলা ড্রেণে বসিয়ে দিতে লাগলেন সকালবেলা, পায়খানা থাকা সত্বেও। প্রায় শ্যামলীর রান্নাঘরের সামনেই। কিছু বলবার যো নেই। ওই আর গোলমাল। একটি মাত্র পায়খানা নিচে। মেয়ে পুরুষ তাতে যাবে। কি নোংরা করেই রাখে মাঝে মাঝে! ভোরে অন্ধকার থাকতে থাকতে যদি ঘুম ভাঙ্গে, তবে কল পায়খানা ব্যবহার করা যাবে সেদিন, নয়তো বেলা এগারোটা। পুরুষরা সবাই আফিসে বেরিয়ে গেলে। চৌবাচ্চায় তখন দু'ইঞ্চি মাত্র জল থাকে কোনোদিন, কোনোদিন তারও কম।

শ্যামলীর দম বন্ধ হয়ে আসে।...

এমন কি কোনো বাসা পাওয়া যায় না যাতে অন্ততঃ মেয়েদের একটা আলাদা নাইবার জায়গা আছে?...

আষাঢ় মাসের প্রথম।

ফিরিওয়ালা গলির মধ্যে হাঁকচে—চাই ল্যাংড়া আম—ল্যাংড়া আ-আ-ম—বৃষ্টি এখনও নামেনি এবার। জ্যৈষ্ঠ মাসের গরম প্রায় সমান ভাবেই চলচে। মতির ছোট বোন এসে বল্লে—দশ পলা তেল ধার দেবেন কাকিমা?

শ্যামলী বল্লে—হবে না। তেল নেই।

—আট পলাও হবে না?

—কিছু নেই।

মেয়েটি চলে গেল। শ্যামলী তেল দেবে কি, ওদের কোনো আক্কেল নেই। শ্যামলী কি সাধে বিরক্ত হয়েচে? উনি খারাপ কলের তেল খেতে পারেন না বলে একনম্বর কানপুর কিনে আনেন ওঁর আফিসের রেশন থেকে। সে কি ঝাঁজওয়ালা তেল! মতিরা এক কৌশল ধরেচে কি, বিশ পলা সেই ভালো তেল হপ্তায় ধার নেবে, আর ধার শোধ দেবে পাঁচ সিকে সেরের কলের তেল দিয়ে। উনি বলেন, ও তেল খেলে বেরিবেরি হয়। শ্যামলীদের কি হপ্তায় বিশ পলা তেল অপব্যয়ে যায়।

ওরা চালাক আছে। একবার নেবে দশ পলা, তারপর আর একদিন এসে নেবে দশ পলা। এক সঙ্গে নেবে না। একেবারে যেন মৌরসী পাট্টা করে বসেচে। দেবো না তেল, রোজ রোজ ও চালাকি খাটবে না আমার কাছে। দেখি কি হয়।

কিন্তু মতির মায়ের কৌশল অন্যরকম। সে এতটুকু চটলো না, আবার একবার বাটি হাতে এসে হাজির স্বয়ং মতির মা।

—ও শ্যামলী, দে দিকি ভাই একটু তেল।

—তেল নেই দিদি।

—দিতেই হবে। মাছ ভাজা হচ্ছে না, পাঁচ পলা তেল দে—

—যা আছে আমারই কুলোবে না দিদি—

—দেখি তোর তেলের বোতল? দে ভাই আমায় পাঁচ পলা—

অগত্যা শ্যামলী উঠে গিয়ে তেল দেয়, ও আবার পরের কাঁদুনি মিনতি বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারে না। ঠকচেই তো দেখাই যাচ্চে, ঠকুক। লোকে তাতে খুসি হয় হোক।

কিন্তু এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে দোতলার ভাড়াটেদের মধ্যে মহা ঘোঁটমঙ্গলের সৃষ্টি হোল। মতির মা গিয়ে সাতখানা করে লাগিয়েচে তাদের কাছে। তেল থাকতেও দিতে চাচ্ছিল না, বোতল দেখতে চাইলুম, তাই তো দিলে। এমন ছোট নজর তো কখনো করতে পারিনে আমরা। এই যে সেদিন বোশেখ মাসে ওঁর পেটের ব্যথা ধরলো রাত্তিরে, যদুবাবু সোডা চেয়ে নিয়ে যান নি আমাদের এখান থেকে? দিই নি আমরা? লোকের কাছে হাত পেতে যেমন নিতে হয়, তেমনি দিতেও হয়। তবে লোকে মানুষ বলে।

তারপরের দিন আর কলতলায় যাওয়া যায় না। বড় বড় বালতি, কড়া আর টব পড়লো একের পর এক সকাল থেকে। সে সব সরিয়ে এক বালতি রান্নার জল নিতে গেলেও ঝগড়ায় মুখর হয়ে উঠবে সারা বাড়িটা—সেকথা শ্যামলী ভাল রকমেই জানে। অনেকবারের অভিজ্ঞতায় জানে। সুতরাং আষাঢ় মাসের গুমট গরমে বেলা এগারোটা পর্য্যন্ত তাকে অস্নাত অবস্থায় থাকতে হোল। এগারোটার পর কলের জল কখন চলে গেলো। যখন সে নাইতে গেল, তখন চৌবাচ্চায় ইঞ্চি চারেক মাত্র জল। কাকের মুখ থেকে তার মধ্যে পড়েচে ভাত।

এই সময়ে একদিন যদুবাবু এসে বল্লেন, ওগো শোনো, একটা সন্ধান পেয়েছি। রাণাঘাট থেকে নেমে যেতে হয় প্রায় এগারো মাইল উত্তরে, বল্লভপুর বলে পাড়াগাঁ। সেখানে কলকাতার এক বড় লোকের জমিদারি কাছারি ছিল, বিক্রি করে ফেলচে। জমিদারি বিক্রি হয়ে গিয়েচে, কাছারি বাড়িটাও ওরা আলাদা বিক্রি করবে। মাঝে মাঝে যেতো বলে কাছারি বাড়ির

সংলগ্ন দোতলা বাড়ি তৈরি করেছিল, ওপরে নিচে পাঁচখানা ঘর, বারান্দা, রান্নাঘর, নাইবার ঘর সব আছে। দশ বিঘে জমির ওপর কাছারি বাড়ি, তাতে আম কাঁঠালের গাছ, কলাগাছ আছে। বাড়ির সেই জমির নিচে দিয়ে একটা ছোট নদী বয়ে যাচ্ছে, তাতে জমিদার বাঁধানো ঘাটলা করে দিয়েচেন, বাড়ির মেয়েরা যখন গিয়ে থাকতো, তাদের নাইবার সুবিধের জন্যে। সবশুদ্ধ তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার টাকা হোলে বাড়িটা পাওয়া যায়—জমিশুদ্ধ—কিনবো? প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকা সব যদি তুলে নিই—

—অত কমে হবে?

—পাড়াগাঁ। কে সেখানে খদ্দের হচ্চে? বড্ড দূর শুনলাম, চাষা গাঁ। গাঁয়েও অত টাকা দিয়ে কিনবার লোক নেই।

—টাকা দেবে কোথা থেকে?

প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকা সব তুলে নিই। তোমার গহনা কিছু দাও আর ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কাছ থেকে কিছু ধার করি। আমার কাছেও সামান্য কিছু আছে।

শ্যামলীর মন নেচে উঠলো। কতদিন সে পাড়াগাঁয়ের মুখ দেখেনি। বাপের বাড়ি ছিল হুগলী জেলার তারকেশ্বর লাইনে দাসপুর গ্রামে। সে বংশে বাতি দিতে কেউ নেই। জ্ঞাতি কাকারা পর্যন্ত উঠে এসে কলকাতা বাস করচেন, ঘোর ম্যালেরিয়া, চলে না সেখানে থাকা।

যদি এ সম্ভব হয়!

ভগবান কি এত দয়া করবেন? তা কি তার কপালে সম্ভব হবে?

শ্যামলী বল্লে—কিন্তু তুমি কোথায় থাকবে?

—কেন, সেখানে।

—আপিস?

—চাকুরি ছেড়ে দেবো। একঘেয়ে হয়ে গিয়েচে এ জীবন। আর ভালো লাগে না। স্বাস্থ্য যেতে বসেচে। একটু সাহস করে দেখি, যা আছে কপালে। ওখানে জায়গা জমি নিয়ে চাষবাস করবো।

—ছেলে দুটোর লেখাপড়া?

—রাণাঘাটে বোর্ডিংয়ে থাকবে। সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে এখন। আর এ যা লেখাপড়া শিখচে, এ শিখে তো কেরাণী হবে? তার চেয়ে ভালো কাজ ওখানে শিখতে পারবে। বিলেত থেকে লোক গিয়ে আমেরিকায় বাস করে আমেরিকা যুক্তরাজ্য স্থাপন করেছিল। অজানায় পাড়ি না দিলে মানুষ মানুষ হয়ে ওঠে না। জীবন উপভোগই যদি না করলুম, বেঁচে থেকে কি হবে? গ্রামের লোকদের কাছে দুটো ভালো কথা বলবো। নাইট স্কুল করবো। বই পড়াতে শেখাবো। এ আমার অনেকদিনের ইচ্ছে।

স্বামী-স্ত্রীতে মিলে সারা বিকেল আর রাত ধরে পরামর্শ হোল। শ্যামলীর চোখে রঙীন স্বপ্ন ভেসে উঠেচে—দূরের পাখী-ডাকা ফুল-ফোটা সুমুখ জ্যোৎস্না রাত্রির প্রহরগুলি। কত অলস মধ্যাহ্নে বনানীকোলে ঘুঘুর ডাক শোনা বিছানায় আধ জাগরিত আধ ঘুমন্ত অবস্থায় শুয়ে শুয়ে! কত আম্রমুকুলের গন্ধে সুবাসিত সকাল সন্ধ্যা!

দিনপনেরো পরে।

যদুবাবুর সঙ্গে একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক শ্যামলীদের বাসায় ঢুকলেন। যদুবাবু বল্লেন, উনি এখানে খাবেন।

শ্যামলীকে আড়ালে বল্লেন—উনি ওদের ষ্টেটের নায়েব, ওঁরও নাম যদুবাবু। তবে উনি কায়স্থ। আমাকে বলে কয়ে উনিই বাড়ি দেওয়াচ্ছেন। অতি ভদ্রলোক। একটু ভাল করে খাওয়াও দাওয়াও। সাড়ে তিনের মধ্যে হয়ে যাবে আর সেই সঙ্গে জমিদারের খাস কিছু রোয়া ধানের জমি আছে, সেটাও ওই সঙ্গে হয়ে যাবে।

আহারাদির পরে ভদ্রলোক অনেকক্ষণ কি পরামর্শ করলেন যদুবাবুর সঙ্গে। তারপর চা খেয়ে বিদায় নিলেন। এর তিনদিন পরে শ্যামলীকে যদুবাবু এসে বল্লেন, বাড়ি রেজেষ্ট্রি করা হয়ে গিয়েচে।

আষাঢ় মাসের শেষের দিকে জিনিষপত্র গুছিয়ে শ্যামলীরা তাদের নতুন কেনা বাড়িতে বাস করতে চললো। কলকাতার বাসা একেবারে উঠিয়ে দিলে না, কিছু কিছু জিনিষপত্র ঘরে রেখে ঘর চাবিবন্ধ করে গেল।

রাণাঘাট থেকে ট্রেণ বদলে বনগাঁ লাইনের সাংনাপুর ষ্টেশনে ওরা বেলা দশটার সময় নামলো। আগে থেকে বন্দোবস্ত করার ফলে বল্লভপুর গ্রামের একখানা গরুর গাড়ি ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল।

মাঠ ও বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এ গ্রাম ও গ্রাম পেরিয়ে চললো গাড়ি। বেলা প্রায় তিনটের সময় সামনের একটা ঝাঁকড়া বটগাছ দেখিয়ে গাড়োয়ান বল্লে—ওই বুঁদীপুরের বনবিবিতলা দেখা যাচ্চে—ওর পরেই বল্লভপুর।

শ্যামলীর বুক দুলে উঠলো। কি জানি কেমন হবে এত আশা-সুখে কেনা বাড়িটা, কেমন হবে সেখানকার জীবনযাত্রা! জানাকে ফেলে অজানাকে তো আঁকড়ানো হোল চোখ বুজে, এখন সেই অজানার প্রকৃতি কি, সেটা এখুনি তো বোঝা যাবে আর একটু পরেই। কি গিয়ে দেখবে যে সেখানে, কি জানি? সর্বস্ব খুইয়ে তার বিনিময়ে কেনা। ক্রমে আরও আধঘণ্টা কেটে গেল। বেলা বেশ পড়ে এসেচে। এমন সময়ে গাড়োয়ান বল্লে—এই যে বাবু বাড়ির সামনে এসে গিয়েচে গাড়ি। নামুন মা ঠাকরুণ এবার।

দুরুদুরু বক্ষে শ্যামলী নামলো সকলের আগে। যদুবাবু বল্লেন—না দেখে বাড়ি কেনা। অতগুলো টাকা—বলতে গেলে সর্বস্ব খুইয়ে—এই দূর গাঁয়ে বাড়ি কেনা। তুমি আগে নেমে বাড়িতে ঢোকো। মেয়েরা ঘরের লক্ষ্মী কিনা, তুমি আগে ঢোকো। আমার তো সাহস হচ্চে না, কি জানি কি রকম হবে? নামো আগে।

—হাঁগো, বাড়ি কি পরিষ্কার করা আছে, না একগলা ধুলো আর মাকড়সার জাল আর চামচিকের বাসা। গিয়ে এখন ঝাঁট দিতে হবে? চাবি কোথায়?

গাড়োয়ান শুনতে পেয়ে বল্লে—মা ঠাকরুণ, বাড়িতেই আছে মুক্তোর মা গয়লানী আর তার ছেলে। তারাই বাড়ি দেখাশুনো করে, নিচের একটা ঘরে আছে। চাবি তো নেই, বাড়ি খোলাই পড়ে আছে।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে একটা বাঁশ-ঝাড়ের আড়াল ছাড়িয়ে একেবারে শ্যামলীর সামনেই যে বাড়িটা পড়লো, সেটা দেখে ও আনন্দে ও বিস্ময়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এই বাড়ি তাদের! এমন বাড়ি এই অজ পাড়াগাঁয়ে!

কলকাতায় এমনি হলদে রং করা সবুজ রংয়ের জানালা খড়খড়িওয়ালা দোতলা বাড়ি দেখেচে—দোতলাও নয়, বাড়িটা তেতলা—কিন্তু এমন বাড়িটা সত্যিই তাদের নিজস্ব!

শ্যামলী আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে বল্লে—ওগো দ্যাখো, এসে দ্যাখো—

পরক্ষণেই ওর লজ্জা হোল। গাড়োয়ানটা না জানি কি আদেখ্‌লেই মনে করলে ওকে! ততক্ষণে যদুবাবু ও ছেলেমেয়েরা বাঁশঝাড়ের মোড় ছাড়িয়ে বাড়ির কাছে এসে গিয়েচে। যদুবাবু বল্লেন—বাঃ, বেশ—বেশ—

রাস্তায় আসতে গাড়োয়ানকে যদুবাবু বাড়ির কথা বহুবার জিগ্যেস করেছিলেন। সে বলেছিল—চমৎকার বাড়ি বাবু। কলকাতার বাবুরা থাকবার জন্যে করলেন। তেতলা বাড়ি, সবাক জায়গা, নদীর ধারে বাঁধাঘাট আছে, কল পাকুড়ের গাছ। জাহাজের বাড়ির মত বাড়ি।

কিন্তু ছোটলোকের সে কথায় আস্থা স্থাপন করতে পারেনি শ্যামলী বা তার স্বামী। এখন বাড়িটা দেখে মনে হোল গাড়োয়ান অনেক কমিয়ে বলেছিল। বাড়িটা সম্বন্ধে আসল কথা হচ্চে অনেকখানি ফাঁকা জায়গার মধ্যে বাড়িটা দাঁড়িয়ে, অথচ ঠিক পাশেই গ্রামের বসতি।

বনানীর ও মাঠের সবুজের মধ্যে হলুদে রংয়ের বাহার।

ওরা হুড়মুড় করে সবাই গিয়ে বাড়ি ঢুকলো। নিচের ঘরে গিয়ে দেখলে সেখানে এক বুড়ি মাদুরের ওপর ঘুমিয়ে আছে। শ্যামলী ডাকলে—ও ঝি, কি যেন নাম ওর? মুক্তোর মা? ও মুক্তোর মা—

বুড়ি ধড়মড় করে জেগে উঠে বসলো। তারপর ঘুমজড়ানো চোখে ওদের দিকে খুব সামান্য একটুখানি চেয়ে থেকে তাড়াতাড়ি মাদুর ছেড়ে উঠে এসে শ্যামলীর পায়ে গড় হয়ে প্রণাম করে বল্লে—পোড়াকপাল আমার মা, ঘুমিয়ে পড়িচি এই অবেলায়। বেনবেলা থেকে ওপরে নিচে সব ঘর ধোলাম, পোঁছলাম, ছাদ ঝাঁট দেলাম, বলি মা ঠাকরুণরা আসচেন, বাবু আসচেন—তা ছাদ তো নয় গড়ের মাঠ, এই হাতির মত বাড়ি ধোয়ানো সামলানো কি একদিনের কম্মো? আসুন, মা ঠাকরুণ, আসুন বাবা—

[ইহার পর ২৪০ পৃষ্ঠায়]



শারদীয় আমন্ত্রণলিপি
কাঞ্চন
কাবেরী
সুপ্রভা স্নো
'কাঞ্চন'—মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকর মনোরম সুবাসিত, নারিকেল তৈল।
'কাবেরী'—সুগন্ধি আয়ুর্ব্বেদোক্ত অতুলনীয় সুশীতল তিল তৈল।
'সুপ্রভা স্নো'—মুখলাবণ্যবর্দ্ধক অনুপম স্নো।
কোনার্ক কেমিক্যাল এণ্ড বিউটি প্রোডাক্টস
নৈহাটি

বাংলার 'গঙ্গা'

[৪৬ পৃষ্ঠার পর]

এবং—

'তিস্তা' তোমার ঝাঁপ্টা সীথি—
যে দেখেছে সেই জানে,
ডান কানে তোর 'বাঁকা'র ঝিলিক—
'কর্ণফুলী' বাম কানে।"

এমনই করিয়া, কবি আলঙ্কারিক ভাষায় অলঙ্কার রচনা করিয়া, অর্থাৎ ভৌগোলিক নাম-মালাকে কাব্যরসমণ্ডিত করিয়া, কল্পনায় সারা বাংলাদেশটিকে প্রদক্ষিণ করিয়াছেন—মানচিত্রকে মন-চিত্র করিয়া সমগ্র বঙ্গভূমিকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি বড় সত্য কথা বলিয়াছেন, সত্যেন্দ্রনাথের মত চিন্তাশীল ভাবুক ও পণ্ডিত ইতিকথা-কবিদের পক্ষে ইহা যে অতিশয় সঙ্গত ও স্বাভাবিক। সত্যেন্দ্রনাথও বলিয়াছেন—

"গলায় তোমার সাতনরী-হার
মক্তাঝুরির শতেক ডোর,
ব্রহ্মপুত্র বুকের নাড়ী,
প্রাণের নাড়ী গঙ্গা তোর।"

বুকের নাড়ী ও প্রাণের নাড়ীতে তফাৎ আছে; বুকের নাড়ী—বল ও শক্তিসঞ্চারিণী নাড়ী; প্রাণের নাড়ী—গভীরতর চৈতন্য-বাহিনী নাড়ী—যে প্রাণ সারাদেহে চৈতন্য সঞ্চার করে, যাহা মৃত্যুকে ঠেকাইয়া রাখে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠিকই বলিয়াছেন। এই স্বজাতি-বৎসল দেশ-প্রেমিক কবির কাব্য হইতে আরও কয়েক পংক্তি গঙ্গা-স্তোত্র উদ্ধৃত করিয়া আমি এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব; এই গঙ্গার উদ্দেশে কবি বলিতেছেন—

তোরে ঘিরি উর্ব্বরতা, তোরে ঘিরি
স্তব-উপাসনা;
তোরে ঘিরি চিতানল উদ্ধারের
শ্বসিছে কামনা
তীরে তীরে প্রেতভূমে; অয়ি
রুদ্র জটানিবাসিনী!
শবেরে করিছ শিব তুমি দেবী
অশিব-নাশিনী।
পর্ব্ব রচি তাই মোরা তোরি তীরে
মিলি' বারম্বার,
পরশি তোমারে—অয়ি পিতৃপুরুষের
ভস্মাধার!
চক্ষে হেরি শূদ্র দ্বিজ সকলের
মিলিত সমাধি;
অয়ি গঙ্গা ভাগীরথী! ভারতের
অন্ত, মধ্য, আদি!

—বাংলার গঙ্গা সম্বন্ধে আমি যত কথা বলিয়াছি, এ যেন তাহারই ঘনীভূত ভাব-নির্য্যাস, কেবল ঐ 'ভারতে'র স্থানে 'বাংলা' বুঝিতে হইবে।

কিন্তু গঙ্গার সে পরিচয়ে আর লাভ কি? আজ বাঙালী জাতির মৃত্যু আসন্ন বলিলেও হয়—অন্তত: যে জাতিকে আমরা এতদিন বাঙালী জাতি বলিয়া জানিতাম সেই জাতির বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে। তাই, গঙ্গার দিকে চাহিয়া দেখ। সে রূপ আর নাই, জলধারা ক্ষীণ হইয়াছে, তাহার কূলে কূলে মহামারী আসন পাতিয়াছে, বিদেশী বণিকের আগ্নেয় শোষণ-যন্ত্রে ইন্ধন জোগাইয়া গ্রাম-সমাজ নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। গঙ্গার সে কল কল নাদ আর নাই, স্রোতোবেগ মন্দীভূত হওয়ায় পলিমৃত্তিকায় তাহার কণ্ঠরোধ হইয়াছে! এতদিনে গঙ্গা মজিল—বাঙালীর জীবন-নদীও শুষ্কপ্রায়;—আশ্চর্য্য নহে কি? ইতিমধ্যেই বাংলা ভাষায় ও বাংলা সাহিত্যে যে একটি নূতন জাতির আবির্ভাব ক্রমেই যেন স্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে, তাহারা এই গঙ্গার নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়াছে, বাংলা ভাষায় ইহার নাম হইয়াছে—'হুগলী নদী'! নামটিও কি অর্থপূর্ণ! জাত হারাইলে ভাষাও এমনই বিভাষা উঠে। ইহা অপেক্ষা মৃত্যুও ভাল!

রাজমুকুট

[৫৮ পৃষ্ঠার পর]

সকাল হয়েছে। হাসপাতাল থেকে এসে খবর দিল, গঙ্গেশের জ্ঞান ফিরেছে। কিন্তু বিষম বেয়াড়াপনা করছে, জেলখানার গাড়িতে সে কিছুতে উঠবে না।

পাশেই হাসপাতাল। শিশির, চন্দ্রা দু-জনে চলল। তাদের দেখে দু-খানা বেতের চেয়ার তাড়াতাড়ি এনে দিল হাসপাতালের বারাণ্ডায়। গঙ্গু দাঁড়িয়ে তখন চিৎকার করছে, যেতে হয়, হেঁটে যাব। চোর না ডাকাত—কেন আমি ঢুকব কয়েদির গাড়িতে? মারবে? কায়দায় পেয়ে গেছ, ছাড়বে কেন? এতক্ষণ তো দেখলে, খুশি না হয়ে থাকো, মারো আবার যতক্ষণ পার

মাথায় প্রকাণ্ড ব্যাণ্ডেজ। পোষাক-আঁটা পুলিশদল মসমস করে বেড়াচ্ছে। গঙ্গুর কণ্ঠস্বর একটু কাঁপে না, মুখের ভাববিকৃতি নেই—যেন ইস্পাতে তৈরি মুখ, যেন বুলেট বেরিয়ে আসছে ইস্পাতের মুখগহ্বর থেকে। চন্দ্রার বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে ওঠে। চেয়ার ছেড়ে সে উঠে দাঁড়াল।

টলছেন—পড়ে যাবেন যে! বসুন।

কিন্তু সে বসল না। লাঠির মতো খাড়া সে দাঁড়িয়ে রইল। শিশির জিজ্ঞাসা করে, দলটার সেনাপতি কে?

বুকে থাবা দিয়ে গঙ্গু বলে, আমি—আমিই—

তুমি? তবেই হয়েছে। কদর বোঝা গেল তোমাদের রেজিমেণ্টের—

কি করা যাবে? উপরে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের ধরে ফেলেছে। আমায় এসে ঠেকেছে। কাজ তো বন্ধ থাকতে পারে না তা বলে?

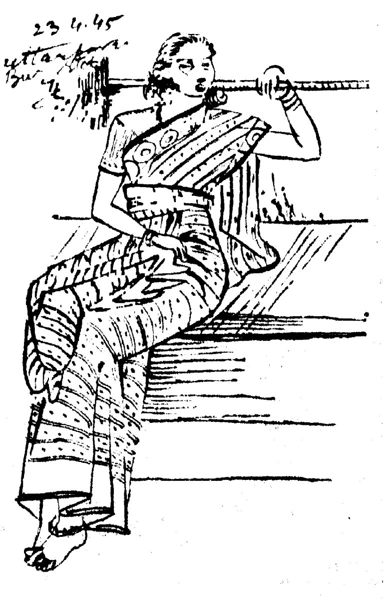
শিশির বলে, কিন্তু তোমাদের নেতারা কখনো এসব পছন্দ করতেন না।

গঙ্গু হেসে বলে, বেশ তো, ছেড়ে দিন তাঁদের। পছন্দ না করেন, তক্ষুণি তোবা করব সকলে। কি করতেন না করতেন, আপনার কথা মেনে নিতে পারি না তো!

চন্দ্রা দেখছে গঙ্গেশকে। বাপ শত কণ্ঠে যার কথা বলতেন।

পাঁচ পাঁচটা চার্জ সত্ত্বেও আদালতে মাথা নীচু হয়নি যার। অন্যায় তার নয়, তারই উপর অন্যায় হচ্ছে—এমনি একটা ভাব চলনে-বলনে। সেই মানুষটাকে চোখে দেখবে বলে কত লোলুপ হয়েছিল সে মনে মনে! তাদের বাংলোয় গিয়েছিল সেদিন আর কোন লোক—আজকে হাসপাতালে এই প্রথম তাকে দেখছে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অবস্থায়। এরা সেই ক্ষ্যাপার দল—দু'শ বছরের পরাধীনতা মনের সঙ্গে যারা মানান করে নিতে পারল না। দিব্যি খাচ্ছে, ঘুমুচ্ছে, চাকরির জন্য করজোড়ে দরবার করে বেড়াচ্ছে—সাধারণ সময়ের দীনাতিদীন অতি-বিনম্র মানুষ। হঠাৎ ঝড় ওঠে এক-একটা, ডাক এসে যায়। পায়ের ধুলো ঝেড়ে মেতে ওঠে অমনি, প্রাণ যেন হাতের মুঠোয় করে ছুঁড়ে ফেলতে এগিয়ে ছুটে যায়। পুরুষ পুরুষান্তর ধরে চলছে—ঢেউয়ের পর ঢেউ উঠছে, উত্তাল জন-প্রবাহ। জব্দ করা গেল না এদের কিছুতে, বংশ বেড়েই চলেছে। বাইরের চেহারায় বুঝবার জো নেই, মনে মনে সবাই পাগল, সকলে কবি—স্বপ্নে মসগুল হয়ে আছে ঐ শিশির পর্য্যন্ত। ভাগ্যিস সরকার বাহাদুর পরম অনুগতদের বুকের ভিতরটা দেখতে পায় না!

বিমুগ্ধচোখে চন্দ্রা গঙ্গেশের দিকে চেয়ে আছে। সকালের প্রসন্ন আলোয় রাজাধিরাজকে দেখছে যেন। চাকরির নিয়োগ চিঠি ছেঁড়া কাগজের সামিল এর কাছে, মহকুমা হাকিম তুচ্ছাতিতুচ্ছ লোক। কত লম্বা দেখাচ্ছে আজ! যে মাথা সেদিন নুয়েছিল, ব্যাণ্ডেজ বেঁধে উঁচু হয়ে গেছে সে মাথা। ব্যাণ্ডেজ যেন রাজমুকুট।



বেলায় মালিমা আসিয়াছেন—বিবেকানন্দ রোডেই তো তাঁর বাসা। তিনি তাঁহার সঙ্গে তিন চারিজন আত্মীয় ও আত্মীয়া লইয়া আসিয়াছেন। ভজহরিও নিমন্ত্রণ করিয়াছে কয়েকজন বন্ধুকে। তাঁহাদেরও সঙ্গে আসিয়াছেন কয়েকজন মহিলা ও তরুণী।

একখানি বড় ঘরের মাঝখানে কার্পেটি পাতা হইয়াছে। সেখানেই গণকঠাকুর বসিবেন। এই ঘরে আর কাহারও বসিয়া থাকিবার ব্যবস্থা নাই। শুধু যিনি গণকঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন, তাঁহার জন্য কার্পেটের পাশেই স্থান নির্দিষ্ট করা আছে। কত জনে কত মনের কথা বলিবে, কত গোপন কথা, কত গোপন বাণী গণকঠাকুর গণনা করিয়া বলিবেন, সে সব কথা শুধু যার একান্ত আপন কথা, তিনি ছাড়া অন্যে শুনিবে কেন? তাই ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এই ঘরের দুই পাশে দুইখানি ঘরে অভ্যাগতেরা বসিয়া অপেক্ষা করিবেন, একঘরে ধুতী, পাঞ্জাবী, পেন্টুলন; অন্য ঘরে শাড়ী, শেমিজ, ফ্রক। পর্যায়ক্রমে এক একজন করিয়া আসিয়া গণকঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন।

ঘড়িতে যখন টিং টিং করিয়া দুইটা বাজিল, তখন গণকঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একখানি রিক্সা হইতে নামিবামাত্র ভজহরি ও বেলা আগাইয়া আসিয়া পদধূলি লইল এবং সমাদর করিয়া তাঁহাকে উপরে লইয়া গিয়া কার্পেটের উপর বসাইল। দুইপাশের দুই ঘর হইতে খস খস, ফিস ফাস টুং-টাং শব্দসহ অনেকগুলি চোখ গণকঠাকুরকে একবার দেখিয়া লইল। একগ্লাস সরবৎ আস্তে আস্তে চুমুক দিয়া খাইয়া ঠাকুর মহাশয় নিস্তব্ধ হইয়া বসিলেন। দুইপাশের দুই ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া ভজহরি বাহির হইয়া গেল।

ফিন্‌ফিনে পাঞ্জাবী-পরা চশমা চোখে এক ভদ্রলোক সর্বপ্রথম হাত দেখাইবার জন্য আসিয়া গণকঠাকুরের সম্মুখে বসিলেন। বহুদিন হইতে বাসনা একবার ইউরোপ ও আমেরিকা ঘুরিয়া আসিবেন কিন্তু একের পর আর এক বাধা আসিয়া পড়ায় তাঁহার যাত্রা করা হইতেছে না। তাই হাত দেখাইতে আসিয়াছেন, যাওয়া আদৌ হইবে কি না এবং হইলে কবে হইবে। হাত দেখিয়া গণকঠাকুর বলিলেন, আপনাকে শীঘ্রই বিস্তীর্ণ জলরাশির উপরে দিনাতিপাত করিতে হইবে। প্রশ্নকর্তা খুসী হইয়া উঠিয়া গেলেন।

এবার বিপরীত দিক হইতে একটি বর্ষীয়সী মহিলা আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া নিজের বাঁ হাতখানি বাড়াইয়া দিলেন এবং করুণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি আজ দশবছর যাবৎ অম্বলের অসুখে ভুগছি, কোন ওষুধে কিছু হয় না। এ অসুখ কি আমার সারবে না?

নিশ্চয়ই সারবে। ছ'মাসের মধ্যেই সেরে যাবে। তেল, লঙ্কা, আচার আর ভাজাভুজি খাবে না। আর রোজ দু'বেলা ঠিক এক সময়ে ভাত খাবে।

এসব কথা তো ডাক্তারেরা বলে।

তোমার হাতেও ঐসব কথাই লেখা আছে।

আচ্ছা, বাবা আসি।

এবার আসিলেন অন্য ঘর হইতে চাপকান পরা এক ভদ্রলোক। তিনি নূতন শেয়ার-বাজারে ঢুকিয়াছেন। সম্প্রতি একটি দালালের পাল্লায় পড়িয়া কিছু মোটা রকম ইন্‌ভেষ্টমেন্ট করিয়া অনিদ্রা ও হৃদরোগে ভুগিতেছেন। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া প্রশ্ন করিতেই গণকঠাকুর মহাশয় হাতখানি দেখিয়া বলিলেন, ফল অর্ধ-অর্ধ।

বুঝলাম না তো ঠাকুর মশায়?

মানে, ঠকবেনও না, জিতবেনও না।

কিন্তু, আমি তো ঠাকুর বড় আশা করে—

তোমার হাতের রেখায় আশা-নিরাশার কোন চিহ্নই নেই।

তাহলে কি আমি শূন্যেই ঝুলবো?

আপাতত।

তা'হলে আসি।

আসুন।

তারপর আসিলেন একটি মহিলা। পরনে কালোপাড় টাঙ্গাইল শাড়ী, হাই-হিল জুতো, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ। পা-জোড়া একপাশে রাখিয়া হাঁটু ভাঙিয়া বাঁ হাতের উপর ভর দিয়া বসিলেন এবং ব্যাগটি পাশে রাখিয়া ডান হাতখানা বাড়াইয়া দিলেন গণকঠাকুরের দিকে। গণকঠাকুর হাত দেখিতে লাগিলেন এবং মহিলাটি বলিয়া যাইতে লাগিলেন, তিনি বি,এ পাশ করিবার পর ক্রমাগত বহুস্থানে চাকুরির দরখাস্ত করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও সদুত্তর পাইতেছেন না। তাঁহার ললাটে কি আছে, তাহা যদি ঠাকুর মহাশয় বলিয়া দেন, তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত বাধিত হইবেন। ঠাকুর মহাশয় বলিলেন, তোমাকে চাকরি করতে হবে না। তোমার হাতে দেখছি গৃহিণী-রেখাটি খুব স্পষ্ট। তুমি শিগ্‌গিরই উপযুক্ত স্বামীর ঘরণী হবে। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ডানহাত দিয়া ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করিয়া, সোজা হইয়া ব্যাগের ভিতর হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখখানি ভাল করিয়া মুছিয়া লইয়া তিনি ঠাকুর মশায়কে আর একবার ধন্যবাদ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

অন্য ঘর হইতে আসিলেন এক বৃদ্ধ ঠাকুরের চরণধূলি লইয়া কানে কানে মৃদুস্বরে বলিলেন, কথাটা একটু গোপনীয়।

বেশ তো। এখানে তো আপনি আর আমি। আর তো কেউ নেই।

দেখুন, আমার দ্বিতীয় পত্নী বিয়োগের পর থেকে কিছুতেই আর একটি তৃতীয়া সংগ্রহ করতে পারছিনে। দেখুন তো ভাগ্যে কি আছে?

আপনার হাতখানা তো খাসা। পাণি-গ্রহণের পক্ষে এমন চমৎকার পাণি সচরাচর দেখা যায় না। আপনি ব্যস্ত হবেন না। মনে হয়, এক বৎসরের মধ্যেই আপনার আশা পূর্ণ হবে।

বৃদ্ধ গদ্‌গদ চিত্তে নমস্কার করিয়া একখানি এক শত টাকার নোট গণকঠাকুর মহাশয়ের আসনের নীচে রাখিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

এবার আসিল অপর দিক হইতে একটি নব-বিবাহিতা তরুণী। খুট খুট শব্দে পা ফেলিতে ফেলিতে, বাঁ হাতে এক গোছা নূতন চুড়ীর শব্দ করিতে করিতে এবং ডান হাতে ঘন ঘন মুখ মুছিতে মুছিতে ঠাকুরের সামনে আসিয়া ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল এবং নমস্কার করিতে ভুলিয়া গিয়া ঠাকুরকে সোজা জিজ্ঞাসা করিল, দেখুন আমার স্বামী আমাকে ভয়ানক বিরক্ত করেন। দেখুন তো হাতখানা, কোন প্রতিকার আছে কি না।

ঠাকুর মহাশয় হাতখানি দেখিয়া বলিলেন, কোন ভয় নেই মা। তোমার হাতের রেখা অতি চমৎকার। তিন বৎসর তোমার স্বামী তোমাকে বিরক্ত করবেন। তারপর সারাজীবন তুমি তাঁকে বিরক্ত করবে।

থ্যাঙ্কস্। নমস্কার।

তারপর আসিলেন কোট-প্যাণ্ট পরা ছিপছিপে এক ভদ্রলোক। যথারীতি নমস্কার করিয়া গণকঠাকুরের পার্শ্বদেশে বসিয়া বলিলেন, ঠাকুর, আমার তো আজ কয়দিন ঘুম হইতেছে না।

দেখি হাতখানা। কই ঠিক অনিদ্রা রোগের লক্ষণ তো হাতে নেই।

হাতে না থাকতে পারে, কিন্তু মনে আছে।

মনটা আমার কাছে উন্মুক্ত করতে তো কোন বাধা নেই।

আজ্ঞে না। দেখুন, এবারকার বিরাট অঙ্কের আমি একটা ক্রসওয়ার্ড পাজলের সমাধান পাঠিয়েছি। তাতে ভুল হয়েছে কিনা, কটা ভুল হয়েছে, জানবার জন্য মনটা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে গেছে। দেখুন তো হাতখানা একবার। সঙ্কোচ করবো না, ভাল করে সাবান দিয়ে খুব পরিষ্কার করে ধুয়ে এসেছি।

কিন্তু, ফল তো কয়েকদিন পরে বেরুবে।

তা তো বেরুবে কিন্তু আমার তো ধৈর্য নেই। দেখুন না দয়া করে—

হাতখানা তো খুবই পরিষ্কার। কিন্তু—

কিন্তু কি, ঠাকুর মশায়?

কিন্তু প্রাইজ পেতে হ'লে যে কটা ভুল হওয়া দরকার, তার চেয়ে একটা ভুল বেশী আছে তোমার সমাধানে।

'অঁ' বলিয়া ভদ্রলোক প্রায় মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

ঠাকুর মহাশয় আদর করিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, বাছা, এত সহজে আশা ছাড়লে কি চলে? জুয়া যখন ধরেছ তখন জোরসে চালিয়ে যাও। আজ

হয় কাল, এবছর না হয় আগামী বছর, এ জন্মে না হয় পরজন্মে, ফল পাবেই পাবে। সেই আশায় বুক বেঁধে চালিয়ে যাও সমাধান পাঠানো। খাসা হাতখানা তোমার, কিছু ভাবনা নেই।

আচ্ছা, আসি তাহলে, নমস্কার।

এমনি করিয়া দুই-দিক হইতে পর্যায়ক্রমে এক একজন আসিয়া হাত দেখাইয়া যাইতে লাগিলেন। কেহ কেহ বাহিরে বারান্দা প্রভৃতি স্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, আবার কেহ কেহ নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গেলেন। যাইবার পূর্বে সকলকেই বেলা বহু সমাদর করিয়া কিছু মিষ্টিমুখ করিয়া দিল।

দুই দিকের দুইখানি ঘরই যখন প্রায় খালি হইয়া আসিয়াছে, তখন গণকঠাকুরের আসনের তলা রীতিমত ভরিয়া আসিয়াছে। যাহারা হাত দেখাইতে আসিয়াছেন, দুই একজন ছাড়া কেহই খালি হাতে আসেন নাই। হাত দেখানর কি বলিয়াই হোক বা সাধু দর্শন শুধু হাতে করিতে নাই বলিয়াই হোক, মোটের উপর ঠাকুর মশায়ের আজকার দক্ষিণা বেশ মোটা রকমই হইয়াছে। বেলা ও ভজহরি ভাবিতেছে, ঠাকুর কি আর এসব স্পর্শ করিবেন? নিশ্চয়ই না। এই টাকা দিয়া সে মা কালীকে একখানি গহনা গড়াইয়া দিবে। মা কালীর কৃপায়ই তো এই মহাপুরুষের সাক্ষাৎ সে পাইয়াছে।

এবার যিনি আসিলেন, তিনি যুবতী কি প্রৌঢ়া, ঠিক বোঝা যায় না। শরীর কৃশ, বেশভূষা একেবারে আটপৌরে, খালি পা, পিঠের উপর চাবির গোছা, হাতে শাঁখা, কপালে সিন্দূর। গণকঠাকুর মহাশয়ের কাছে আসিয়া গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়াই চমকিয়া উঠিয়া বলিয়া ফেলিলেন, তুমি?

গণকঠাকুর মহাশয়ও কম বিস্মিত হন নাই। চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, তুমি? তুমি এখানে?

হাঁ, আমি এখানে। বলি এ দু'বছর—

এই চুপ, চুপ। আস্তে—

দাঁতে দাঁত চাপিয়া রমণী কহিলেন, চুপ করছি। চল না একবার বাড়ী—

বাড়ী তো যাবই। লক্ষ্মীটি, এ লোকগুলো চলে না যাওয়া পর্যন্ত একটু ধৈর্য ধরে থাক। চেঁচিও না যেন।

আচ্ছা চেঁচাচ্ছি নে। চল না একবার বাড়ী, তোমার গণকগিরি বের করছি।

আহা-হা, অত চটছ কেন?

না, চটবো না! এই দুটো বছর আমার যে করে কেটেছে—বলিতে বলিতে রমণীর চোখে প্রায় জল আসিয়া পড়িল।

আচ্ছা লক্ষ্মীটি এখন ত যাও। এই কটা লোক বিদেয় হলেই আমি উঠছি।

রমণী উঠিয়া আসিলেন। যে কয়জন বাকি ছিলেন তাঁহারা একে একে হাত দেখাইতে লাগিলেন। রমণী বেলাকে একটু নিভৃত স্থানে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, এ ঠাকুর মশায়কে আপনারা কোথায় পেলেন?

এঁর সঙ্গে দেখা আমাদের কালীঘাটে। কেন, আপনি চেনেন নাকি এঁকে?

চিনি। খুব চিনি!

আপনি বুঝি ওঁর শিষ্যা।

শিষ্যা-টিষ্যা আমি কারো নই। উনি আমার স্বামী।

আপনার স্বামী! বলেন কি? উনি তাহলে সন্ন্যাসী নন?

সন্ন্যাসী ওঁর চৌদ্দ পুরুষের মধ্যে কেউ নেই।

ব্যাপারটা তো ঠিক বুঝতে পারছি নে।

উনি ছিলেন রহিমপুর ষ্টেশনের গুড্‌স্ ক্লার্ক। লোকে বলত মালবাবু। ওখানকার একজন বিচালি ব্যবসায়ীর মাল চালান দেবার সময়ে একগাড়ী মাল দশ গাড়ী পনর গাড়ী বলে চালান দিয়ে কিছু পয়সা করেছিলেন। তারপরে যখন হিসেব-নিকেশের সময় এল, তখন দিলেন গা-ঢাকা। তারপর এই প্রথম দেখা ওঁর সঙ্গে।

কি আশ্চর্য! উনিই সেই মালবাবু। তাঁকে তো আমি খুব চিনতাম! আমাদের উনিই তো বিচালির ব্যবসা করেছিলেন রহিমপুরে। সেই জন্যই তো আমাদের বাড়ীর নাম রেখেছি 'বিচালি ভবন।'

আপনার সঙ্গে যে আজ এমনভাবে আলাপ পরিচয় হবে, তা স্বপ্নেও ভাবিনি। আমি তো আমাদের পাড়ার লোকের মুখে খবর পেয়ে গণকঠাকুরের কাছে এসেছিলাম হাত দেখাতে, কবে ওঁকে ফিরে পাব জানতে।

একেবারে হাতে হাতে ফল পেয়ে গেলেন।

ইতিমধ্যে হাত দেখা পর্ব শেষ করিয়া ভজহরি গণকঠাকুরকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া আসিয়াছে, বেলার কাছে। কিছু মিষ্টিমুখ করাইতে হইবে তো। সেখানে অপরিচিতা রমণীটিকে দেখিয়া ভজহরি বেলাকে জিজ্ঞাসা করিল, উনি কে?

বেলা বলিল, ঠাকুরকেই জিজ্ঞাসা কর।

আমতা আমতা করিয়া ঠাকুর বলিলেন, উনি আমার স্ত্রী।

মানে?

বেলা মানে বলিয়া দিল। ভজহরি ও ঠাকুর উভয়েই অবাক হইয়া কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকিবার পর গণকঠাকুর ওরফে মালবাবু ওরফে রামহরি বলিল, আমার কোন বিপদ নেই তো?

আর বিপদ! তোমার সে খড়-কোম্পানীর মালিকরা অনেকবার গণেশ উল্টে এখন আমারই পার্টনার। সুতরাং তুমি নিশ্চিন্ত মনে দক্ষিণার টাকাগুলি পকেটে পুরে গৃহিণীকে নিয়ে মনের আনন্দে স্বগৃহে প্রস্থান করতে পারো।

———

নেপথ্যে

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

হঠাৎ একেকদিন আমাদের হৃদয়ের তীরে
ভিড় করে আসে দেখি কথার ময়ূর:
অনেক ময়ূর আসে, অনেক ময়ূরী নাচে
নরম কথার সব ময়ূর, ময়ূরী তারা—
কথার রঙীন সব মোমের ময়ূর।

হঠাৎ প্রত্যহ ভোরে
তোমার নরম চোখে, কাজলাভ
চোখের তারায়
দিনান্তের সূর্য অস্ত গেলে
হৃদয়ের তীরে তীরে জেগে ওঠে
ঘুমের তিতির।
বিগত বসন্তক্ষণ যেমন হঠাৎ এলে
মনে হয় পুরাতন স্মৃতিকথা,
নরম নরম ভিজে, আবছায়া কথার ছায়ারা;
তেমনি তোমার চোখে দেখি আমি
আমার মুকুর।
আমার হৃদয়ে জাগে পিছনের স্মৃতির ফসল।

হঠাৎ একেকদিন ডুবে যায় পরিপার্শ্ব,
খসে যায় জীবনের ধূসরতা, দিনান্তের ক্লেদ
যেমন বাসন্তীদিনে বর্ষীয়ান্ পাখীর পালক
ঝরে পড়ে, নতুন কল্পনা নিয়ে
গেয়ে ওঠে গান,
কিংবা অনেক রাত মুছে গিয়ে মৃত্যুর মতন
পরম প্রভাত আসে—
তেমনি হঠাৎ দেখি—ডুবে যাই
তোমার ছোঁয়ায়,
ক্লান্ত কানে মুছে যায় সময়ের স্বর।
তোমার চুলের বনে ডুবে যায়
প্রত্যহ-বিলাস।

হঠাৎ একেকদিন তুমি এলে পরে
আমি যেন ছুটি পাই।
ছুটি পাই—
জীবনের প্রত্যহের ঝঞ্ঝার আকাশে
তোমার প্রদীপ্ত মুখ আমার হৃদয়ে আনে
আধফোটা ভিজে ভিজে স্বপন সৌরভ।
আমার হৃদয় যেন আমাকেই ঘিরে
ধরে থাকে।
পরিপার্শ্ব খসে যায়। জীবনের
চারিদিক থেকে
ভিড় মুছে যায়।

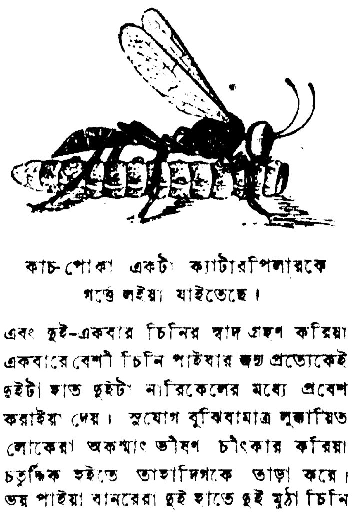
———



কীটপতঙ্গের বিচিত্র শিকার কৌশল

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

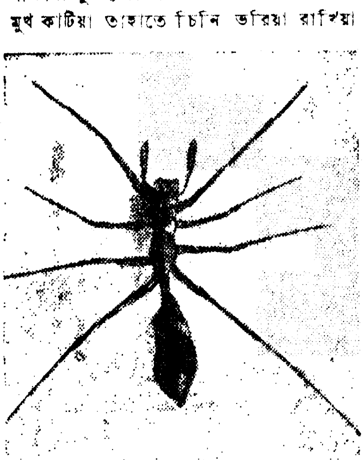
ছলে, বলে বা যেকোন কৌশলে হিংস্র-প্রাণীরা অপর প্রাণীদিগকে শিকার করিয়া থাকে। এই হিসাবে মানুষকেই সর্ব্বাপেক্ষা সুদক্ষ শিকারী বলা যাইতে পারে। অপর প্রাণীদিগকে শিকার করিবার নিমিত্ত মানুষ যে কতরকমের ছল-চাতুরী, কল-কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার মধ্যে কতকগুলি কৌশল অতি সাধারণ হইলেও যেমন কার্য্যকরী তেমনই কৌতূহলোদ্দীপক। দৃষ্টান্তস্বরূপ সুমাত্রা দ্বীপের অধিবাসীদের বানর ধরা বা ছোটনাগপুর অঞ্চলের পার্ব্বত্য অধিবাসীদের বাঘ শিকারের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বানর অতি চতুর প্রাণী, তাছাড়া অতি ক্ষিপ্রগতিতে ইহারা বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে ছুটাছুটি করিতে পারে। কাজেই ইহাদিগকে ধরা খুবই শক্ত ব্যাপার। বানরেরা চিনি খাইতে খুবই ভালবাসে। সুমাত্রাবাসীরা খুব ছোট করিয়া ডাব নারিকেলের মুখ কাটিয়া তাহাতে চিনি ভরিয়া রাখিয়া দেয় এবং নিজেরা গাছপালার আড়ালে আত্মগোপন করিয়া থাকে। চিনির লোভে বানরেরা দলে দলে গাছ হইতে নামিয়া আসে



কাচ-পোকা একটা ক্যাটারপিলারকে গর্ত্তে লইয়া যাইতেছে।

এবং দুই-একবার চিনির স্বাদ গ্রহণ করিয়া একবারে বেশী চিনি পাইবার জন্য প্রত্যেকেই দুইটা হাত দুইটা নারিকেলের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়। সুযোগ বুঝিবামাত্র লুক্কায়িত লোকেরা অকস্মাৎ ভীষণ চীৎকার করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে তাহাদিগকে তাড়া করে। ভয় পাইয়া বানরেরা দুই হাতে দুই মুঠা চিনি লইয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু নারিকেলের খোলের মধ্যে চিনি মুঠা করিয়া ধরিবার ফলে সরু মুখ দিয়া হাত বাহির করিয়া লইতে পারে না। অথচ চিনির মুঠাও ছাড়িবে না। এই অবস্থায় দুইটা নারিকেলের গুরুভার বহন করিয়া তাহারা ব্যাঙের মত থপ থপ করিয়া লাফাইতে লাফাইতে কোন বৃক্ষে আরোহণ করিবার জন্য বৃথাই চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে শিকারীরা আসিয়া অনায়াসেই তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলে এবং দলে দলে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। আমাদের দেশেও কোন কোনক্ষেত্রে সরুমুখ কুজোর মধ্যে চাউল বা অন্য কোন খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া এইভাবে বানর বন্দী করিতে দেখিয়াছি।

ছোটনাগপুর অঞ্চলে আঠা দিয়া বাঘ ধরার রেওয়াজ আছে। বাঘ অনেক সময়েই একটা নির্দ্দিষ্ট পথে যাতায়াত করে। গাছের পাতার এক পিঠে একোনাইটের আঠা মাখাইয়া শিকারীরা বাঘের যাতায়াতের পথে কোন এক সুবিধাজনক স্থানে সেগুলিকে বিছাইয়া রাখিয়া দেয়। সেস্থলে পা দিবামাত্রই আঠা মাখানো পাতাগুলি বাঘের পায়ের তলার মাংসপিণ্ডে দৃঢ়ভাবে লাগিয়া যায়। পাতাগুলিকে কোন রকমে ছাড়াইতে না পারিয়া বাঘ ঠিক বিড়ালের মত মুখে পা ঘষিতে



নালসো-পিঁপড়ে অনুসরণকারী মাকড়সা



আমাদের 'দেশীয়' ডুমুরে মাকড়সার মৎস্য শিকার

থাকে—ফলে আঠা ও পাতার কতকাংশ তাহার নাকে মুখে জড়াইয়া যায়। তখন বিরক্ত হইয়া সে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে থাকে—ফলে সারা গায় এবং মুখে চোখে পাতা আঁটিয়া যায়। দৃষ্টি-শক্তি বন্ধ হওয়ায় ক্রোধে, বিরক্তিতে উত্তেজিতভাবে গর্জ্জন করিতে করিতে বাঘ তখন ইতস্ততঃ লাফালাফি করিতে থাকে। এই অবস্থায় গুপ্ত স্থান হইতে লোকজন বাহির হইয়া অনায়াসেই তাহাকে কাবু করিয়া ফেলে। মানুষ বুদ্ধিমান জীব। শিকার আয়ত্ত করিবার জন্য বুদ্ধিবলেই সে অবস্থানুযায়ী বিবিধ কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে অতি নিম্নস্তরের কীট-পতঙ্গেরাও সহজাত সংস্কারবশে শিকার ধরিবার জন্য যে সকল কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে, মনুষ্য-অবলম্বিত কৌশল অপেক্ষা তাহা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে এই সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

অনেকদিন আগে পল্লীগ্রামের একটা ছাড়া-বাড়ীর উন্মুক্ত ভিটার উপর বসিয়া পিপীলিকার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলাম। অনেককাল উন্মুক্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকার ফলে ভিটার মাটি ধূলার মত আল্গা



গোলাপ গাছের উপর লেবরেটরীতে প্রতিপালিত দুই জাতীয় দুইটি গঙ্গা-ফড়িং দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

হইয়া গিয়াছিল। সেই আল্গা ধূলা-বালির উপর দিয়া একদল পিপীলিকা মস্তবড় একটা শিকারকে অতি কষ্টে বহন করিয়া গর্ত্তের দিকে চলিয়াছে। পায়ের নীচে আল্গা বালি ধ্বসিয়া পড়িতেছে—একটা বালির স্তূপ অতিক্রম করিতে গিয়া পিপীলিকাগুলি দুই তিনবার শিকার সমেত নীচে পড়িয়া গেল; কিন্তু তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। আরসোলার একটা ছিন্ন-ঠ্যাং লইয়া কতকগুলি পিপীলিকা পরম উৎসাহভরে গর্ত্তের দিকে যাইতেছিল। বারকয়েক ঠ্যাংটাকে আটক করিলাম—কিন্তু প্রত্যেকবারই তাহারা বাধা অতিক্রম করিয়া গেল। পিপীলিকাগুলির এই সকল ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছি এমন সময়েই দেখি—খুব ছোট একটা পোকা ধূলা-বালির নীচ দিয়া আমার সামনে আসিয়া এক ইঞ্চি পরিমিত



ডিম পাড়িবার পর কাচ-পোকা গর্ত্তের মুখ বন্ধ করিতেছে।

একটা বৃত্ত অঙ্কিত করিল। পোকাটা বৃত্তের মধ্যেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া শরীরের পশ্চাদ্ভাগের সাহায্যে কেবলই বালি ছিটকাইয়া বাহিরের দিকে ফেলিতেছিল। ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্য্য বোধ হইল; কাজেই একমনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। প্রায় পনর-বিশ মিনিটের মধ্যেই পোকাটা বালি ছিটকাইয়া ঠিক কুয়ার মত একটি গর্ত্ত খুঁড়িয়া ফেলিল। তারপর সব চুপচাপ। পোকাটা বালির নীচে বেমালুম আত্মগোপন করিয়াছিল; কেবল গর্ত্তটা যেমন ছিল তেমনই পড়িয়া রহিল। গর্ত্ত খুঁড়িবার কারণটা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর কয়েকটা সুড়সুড়ে পিঁপড়েকে গর্ত্তের পাশ দিয়া আনাগোনা করিতে দেখিলাম। একটা পিঁপড়ে খানিকদূর অগ্রসর হইয়া আবার পিছন ফিরিয়া ছুটিয়া যাইবার মুখে অসাবধানতাবশতঃ গর্ত্তের কিনারায় পা দিতেই গড়াইয়া নীচে পড়িয়া গেল, গর্ত্তের ঢালু পাড় বাহিয়া পিঁপড়েটা যতবারই উপরে উঠিবার চেষ্টা করে ততবারই সে আল্গা বালি সমেত নীচে পড়িয়া যায়। বারংবার ব্যর্থ চেষ্টার পর পরিশ্রান্ত পিঁপড়েটা একটু দম লইতেছিল; ইতিমধ্যে বালির তলা হইতে সাঁড়াশীর মত ছোট একটা পা বাহির হইয়া পিঁপড়েটাকে ধরিয়া লইয়া পুনরায় বালির নীচে অদৃশ্য হইয়া গেল। ব্যাপারটা বুঝিতে আর বাকী রহিল না। পিঁপড়ে শিকার করিবার জন্যই পোকাগুলি কুয়ার মত গর্ত্ত খুঁড়িয়া থাকে। এই পিঁপড়ে শিকারীরা এক জাতীয় কাঠি ফড়িঙের



বাচ্চা। বাচ্চাগুলির আকৃতি অনেকটা গুবরে পোকার মত। ইহারা পিপীলিকার রস-রক্ত উদরসাৎ করিয়াই বর্দ্ধিত হয়। কিছুকাল পরে গুটিকায় রূপান্তরিত হইয়া সে মাটির নীচেই অবস্থান করে। তারপর



ক্ষুদ্রকায় খরো-মাকড়সার মাছি শিকার

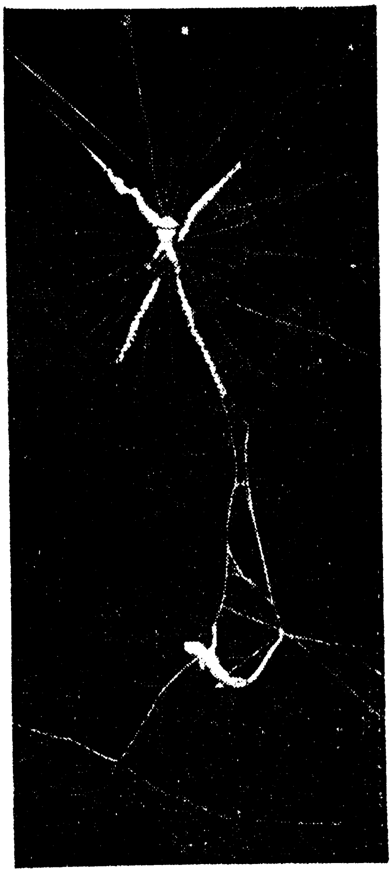
গুটিকা হইতে পরিণতি লাভ করিয়া ফড়িং-রূপে বাহির হইয়া আসে। পিপীলিকাভুক এই কীটগুলি পিপড়ে-সিঙ্গী বা 'অ্যাণ্ট লায়ন' নামে পরিচিত। আমাদের দেশে ধুলা-বালি পূর্ণ শুষ্ক জমিতে এই পিপীলিকা-ভুক পোকাগুলিকে প্রচুর সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়।

আমাদের দেশে রাম-ফড়িং ও গোয়ালে ফড়িং সকলের নিকটই পরিচিত। ইহাদের বাচ্চাগুলি প্রায় এক ইঞ্চি, দেড় ইঞ্চি লম্বা হইয়া থাকে। দেখিতে অনেকটা বড় বড় ঘুঘরা পোকার মত। ফড়িঙের রূপ পরিগ্রহ না করা পর্য্যন্ত বাচ্চাগুলি জলের নীচেই বসবাস করে এবং ছোট ছোট মাছ ও অন্যান্য জলজ পোকা-মাকড় শিকার করিয়া জীবনধারণ করে। ইহাদের শিকার কৌশলও কম বিস্ময়কর নহে। শিকারের সন্ধানে বাচ্চাগুলি জলের নীচে লতাপাতা বা আবর্জ্জনার আড়ালে আত্মগোপন করিয়া অতি সন্তর্পণে হাঁটিয়া বেড়ায়। তিন চার হাত দূরেও কোন শিকার দেখিতে পাইলে ইহারা বিড়ালের মত গুঁড়ি মারিয়া বসে এবং শরীরের পশ্চাদ্ভাগ হইতে খুব জোরের



মাকড়সা ফিতার মত সুতা বাহির করিয়া শিকারটাকে জড়াইয়া ফেলিয়াছে।

সহিত পিচকিরির মত জল ছুড়িয়া দেয়। জলের ধাক্কায় পোকাটা ছিটকাইয়া গিয়া শিকারের কাছাকাছি উপস্থিত হয়। ফড়িঙের বাচ্চার উপরের ঠোঁটটা ঠিক লম্বা একটা হাতার মত। হাতার লম্বা বাঁটটা কনুইয়ের মত ভাঁজ করিয়া বুকের উপর মুড়িয়া রাখে। শিকারের নিকটবর্ত্তী হইবা-মাত্রই হাতার মত পদার্থটাকে অকস্মাৎ বাড়াইয়া দিয়া তাহাকে ছোঁ মারিয়া ধরিয়া ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখে পুরিয়া দেয়। ইহাদের লক্ষ্য অব্যর্থ। পরীক্ষাগারে ইহাদিগকে পুষিবার সময় কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে দেখি নাই।



তাঁতী-বৌ মাকড়সার টিকটিকি শিকার

কাঠি-পোকা, জল-ফড়িং, গঙ্গা-ফড়িং প্রভৃতি প্রাণীগুলির শিকার প্রণালীও অতীব কৌতূহলোদ্দীপক। অনেকেই ইহারা মৃতের মত ভাণ করিয়া অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত বর্ণসামঞ্জস্যে আত্মগোপন করিয়া শিকার আয়ত্ত করে। কাঠি-পোকা-জল-ফড়িং শিকার ধরিবার জন্য হাত-পা ছড়াইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠিক নির্জ্জীব পদার্থের মত চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। ছোট ছোট পোকা-মাকড়েরা ইহাদিগকে খড়-কুটা মনে করিয়া নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র নির্জ্জীব পদার্থটা যেন অকস্মাৎ সজীব হইয়া তাহাদিগকে ছোঁ মারিয়া ধরিয়া লইয়া যায়। এই হিসাবে গঙ্গা-ফড়িঙের শিকার প্রণালী আরও অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়।

আমাদের দেশে সবুজ, বাদামী, ধূসর, লাল প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের বিভিন্ন জাতীয়



অ্যাণ্ট-লায়ন বা পিপড়ে সিঙ্গি পিপড়ে শিকারের জন্য মাটিতে গর্ত খুঁড়িয়া রাখিয়াছে। ডানদিকে নীচে পিপড়ে-সিঙ্গি দেখা যাইতেছে। ডানদিকে উপরে ইহার ফড়িংরূপে পরিণত অবস্থা

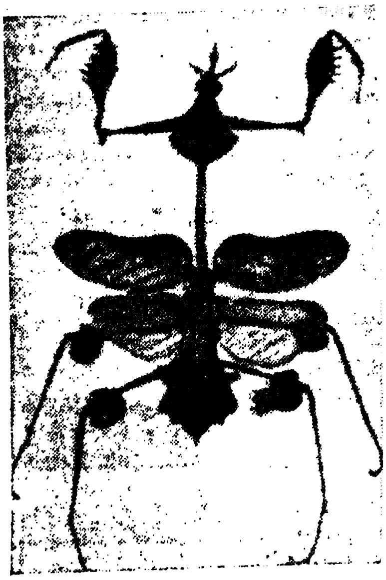
গঙ্গা-ফড়িং দেখা যায়। গঙ্গা-ফড়িঙের দেহের আকৃতি অনেকটা আরসোলার মত—চওড়া এবং চেপ্টা, ডানাগুলি আরসোলার মতই পিঠের উপর ভাঁজ করা থাকে। কিন্তু গলাটা অসম্ভব লম্বা; একটা কাঠির মত সরু। এই সরু কাঠির উপরে ত্রিকোণাকার মস্তকটি যেন আলাভাবে বসানো রহিয়াছে। মাথাটিকে যেকোন দিকে ইচ্ছামত ঘুরাইতে পারে। মাথার একটু নীচেই, সরু গলায় সহিত সংলগ্ন খুব জোরালো, সুদীর্ঘ সাঁড়াশির মত এক জোড়া পা আছে। এই পা দুইখানিই ইহাদের শিকার ধরিবার প্রধান অস্ত্র। শিকারের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিবার সময় এই সাঁড়াশী দুইটি ইহারা কনুইয়ের মত ভাঁজ করিয়া রাখে। সবুজ গঙ্গা-ফড়িঙের গায়ের রং গাছের কচি পাতার মত। বাদামী রঙের ফড়িংগুলি দেখিতে ঠিক শুষ্ক পত্রের মত। ইহারা যখন শিকারের



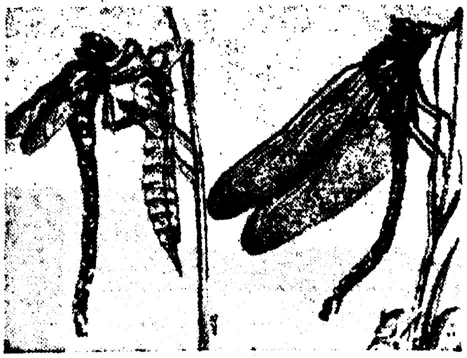
গঙ্গা-ফড়িং গাছের গায়ে ডিম পাড়িবার ব্যবস্থা করিতেছে।

প্রতীক্ষায় পত্রপল্লবের মধ্যে নিশ্চলভাবে অবস্থান করে তখন তেমন সন্ধানী চক্ষুও তাহাদিগকে সহজে আবিষ্কার করিতে পারে না। কীট-পতঙ্গেরা ভুল করিয়া ইহাদের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্রই ধারালো সাঁড়াশীর চাপে নিষ্পেষিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। লালরঙের গঙ্গা-ফড়িং লতাপাতার গায়ে একটা ঠ্যাং আটকাইয়া অর্কিড ফুলের মত ঝুলিয়া থাকে। সহসা দেখিয়া একটা অর্কিডের ফুল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না; কাজেই কীট-পতঙ্গেরা সহজেই ইহার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং নিকটবর্ত্তী হইবামাত্রই সাঁড়াশীর চাপে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে।

বিভিন্ন জাতীয় শিকারী কীট-পতঙ্গের মধ্যে কাচপোকাদের শিকার-প্রণালী সম্পূর্ণ অভিনব ধরণের। আমাদের দেশে কয়েকশত বিভিন্ন জাতীয় কাচপোকা দেখা যায়, জাতীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্রত্যেকেই উহারা সুনির্দ্দিষ্ট এক এক জাতীয় প্রাণীকে শিকার করিয়া থাকে। শিকারের পার্থক্য অনুসারে ইহাদিগকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। বিভিন্ন জাতীয় কতকগুলি কাচপোকা কেবল বিভিন্ন জাতীয় মাকড়সাই শিকার করিয়া থাকে। কেহ কেহ বিভিন্ন জাতীয় শুঁয়া-পোকা, কেহ উইচিংড়ি, কেহ বা আরসোলা শিকারেই অভ্যস্ত। কোন অবস্থাতেই ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা যায় না। ইহাদের শিকারের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, বাচ্চাদের জন্যই ইহারা শিকার করে, নিজেদের উদরপূরণের জন্য নহে। তা'ছাড়া মুখে সুদৃঢ় ধারালো চোয়াল থাকা সত্বেও শিকার আয়ত্ত করিবার জন্য প্রধানতঃ ইহারা বিষাক্ত হুলই ব্যবহার করিয়া থাকে। অনবরত যেখানে সেখানে ইহাদিগকে শিকারের সন্ধানে ব্যস্তভাবে ঘোরাঘুরি করিতে দেখা যায়। শিকার দেখিতে পাইলেই বিদ্যুৎগতিতে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। ইহাদের মত বেপরোয়া, হিংস্র প্রকৃতির শিকারী বোধ হয় খুব কমই আছে। শিকার প্রবল হইলে ভয়ানক প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হইয়া যায়। কখনও পিঠে চড়িয়া, কখনও মাটিতে পড়িয়া, কখনও বা লুটোপুটি খাইয়া কাচ-পোকা শিকারের মর্ম্মস্থলে হুল ফুটাইয়া তাহাকে অসাড় করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। শিকার যতই বৃহৎ বা শক্তিশালী হউক না কেন, কাচ-পোকার কাছে তাহাকে পরাজয় মানিতেই হইবে। কোন অবস্থাতেই ইহারা শিকারকে মারিয়া ফেলে না; হুলের সাহায্যে শরীরে বিষ প্রবেশ করাইয়া অসাড় করিয়া রাখে মাত্র। অচৈতন্য শিকারকে তারপর টানিয়াই হউক, কি মুখে করিয়া বহন করিয়াই হউক, গর্ত্তের মধ্যে লইয়া যায় এবং সেখানে তাহার গায়ে ডিম পাড়িয়া গর্ত্তের মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। দুই তিনবার কাচ-পোকাকে ক্ষুদ্রকায় একজাতীয় আরসোলা শিকার করিতে দেখিয়াছিলাম। সাধারণ অবস্থায় আরসোলারা পলায়ন করিতে সুপটু হইলেও কাচ-পোকা দেখিলেই যেন কেমন একপ্রকার হতভম্ব হইয়া যায়। পলায়ন করিতে চেষ্টা করে বটে। কিন্তু ক্ষিপ্রতার যথেষ্ট অভাব লক্ষিত হয়। কাচ-পোকা উড়িয়া আসিয়াই সরাসরি তাহার পিঠের উপর চাপিয়া বসে এবং অনায়াসেই তাহাকে চিৎ বা কাৎ করিয়া ঘাড় বা গলার কাছে হুল ফুটাইয়া দেয়। হুল ফুটাইবার পর কাচ-পোকা শিকারটাকে ছাড়িয়া দিয়া ব্যস্তভাবে তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে থাকে। আরসোলাটা কিন্তু ইতিমধ্যে উঠিয়া দাঁড়ায় এবং একটুও নড়াচড়া না করিয়া একই স্থানে নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। দেখিয়া মনে হয় না—ইহার কিছুমাত্র অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তারপর আরসোলাটার শুঁড় কামড়াইয়া ধরিয়া কাচ-পোকা পিছনের দিকে হাঁটিতে থাকে। আরসোলাটাও ঠিক দড়ি-বাঁধা ছাগল-ভেড়ার মত তাহার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিতে সুরু করে। চলিতে চলিতে কাচ-পোকাটা শিকারটাকে ছাড়িয়া দিয়া গর্ত্তে পৌঁছাইবার জন্য ঠিক রাস্তায় চলিয়াছে কিনা—ইহা পরখ করিবার জন্য অনেক দূর পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া আসে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সময় আরসোলাটা এক পা-ও এদিক ওদিক নড়ে না। এমন কি, কাঠি দিয়া তাহাকে কিছুদূরে সরাইয়া দিয়া দেখিয়াছি, পরক্ষণেই আবার পূর্ব্বের জায়গায় আসিয়া নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। হুল ফুটাইবার ফলে আরসোলাটা কি যে একটা অদ্ভুত সম্মোহিত অবস্থায় উপনীত হয় তাহার রহস্য সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। যাহা হউক, এইরূপভাবে টানিয়া লইয়া গাছের গায়ে কোন গর্ত্তে প্রবেশ করাইবার পর কাচ-পোকা তাহার গায়ে ডিম পাড়িয়া গর্ত্তের মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইবার পর সে আরসোলার রস-রক্ত উদরস্থ করিয়া বর্দ্ধিত হয় এবং যথারীতি পুত্তলীতে রূপান্তরিত হইয়া কিছুকাল পরে পরিণত কাচ-পোকারূপে গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া আসে।



অর্কিড-ফুল অনুকরণকারী গঙ্গা-ফড়িং



গোয়াল-ফড়িঙের বাচ্চাটি ঘাসের গায়ে আঁকড়াইয়া বসিয়া আছে। ইহার আকৃতি অনেকটা গুবরে-পোকার মত। ইহার পিঠ কাটিয়া উপরে অবস্থিত প্রকৃত গোয়াল-ফড়িংটি বাহির হইয়া আসিয়াছে। ডানদিকে গোয়াল-ফড়িঙের প্রকৃত রূপ।

এইবার মাকড়সার শিকার-কৌশলের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। আমাদের দেশে বিভিন্ন জাতীয় অসংখ্য রকমারি মাকড়সা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি জাল পাতিয়া শিকার ধরে, কতকগুলি হিংস্র জন্তু জানোয়ারদের মত দূর হইতে শিকারের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়ে, কেহ কেহ আশেপাশের অবস্থার সহিত বেমালুম আত্মগোপন করিয়া নির্জীব পদার্থের মত চুপ করিয়া বসিয়া থাকে—কীট-পতঙ্গেরা ভুল করিয়া নিকটে আসিবামাত্র পলায়ন করিবার পথ পায় না। কেহ কেহ আবার জলের উপর ঘোরাফিরা করিয়া ছোট ছোট মাছ ধরিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। তা' ছাড়া এমন কতকগুলি মাকড়সাও দেখা যায় যাহারা পিপীলিকার মত দল বাঁধিয়া শিকার আয়ত্ত করে এবং সকলে মিলিয়া ভাগাভাগি করিয়া খায়। যে সকল মাকড়সা জাল পাতিয়া শিকার ধরে তাহারা সন্ধ্যার একটু আগেই জাল তৈয়ারী করিয়া তাহার মধ্যস্থলে, কেহ কেহ আবার জালের বাহিরে কোন নিরিবিলি স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। জালের সূতার গায়ে বিন্দু বিন্দু আঠালো পদার্থ মালার মত সজ্জিত দেখা যায়। কোন কীট-পতঙ্গ উড়িয়া আসিয়া

[ইহার পর ৯৯ পৃষ্ঠায়]





এক বৎসরের সাহিত্য

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

তেরশ' একান্ন সাল—একটি পুরো বছর বাংলা দেশের সাহিত্য কোন পথে চলেছে এবং কি কি নতুন বই বেরিয়েছে তারি হিসাব-নিকাশ করতে গিয়ে কয়েকটি মোটা কথা নজরে পড়ছে। প্রথমতঃ দেখতে পাচ্ছি, কাগজ নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি একটু কমেছে এবং তার ফলে মুদ্রাযন্ত্রগুলি অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। ভালো মন্দ হরেক রকমের বই বাজারে ছড়িয়ে গেছে এবং তার মধ্যে বাংলা দেশের সাহিত্যিকদের বইও কিছু কিছু আছে। কিন্তু তাঁদের সবাই যে সাহিত্য রচনায় নিযুক্ত এমন কথা বলা যাচ্ছে না। দ্বিতীয়তঃ, দেখা যাচ্ছে বাংলা দেশের পাঠক-সংখ্যা গত পাঁচ বছরের চেয়েও অনেক বেশী পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে। ছাপা অক্ষরে যে জিনিষ বেরুচ্ছে, তা গল্প-উপন্যাসই হোক অথবা প্রবন্ধ-জাতীয় রচনাই হোক, তার কাটতি বেশী। এটা কি কারণে হচ্ছে, তা সঠিক করে বলা শক্ত। বাংলা দেশের সাধারণ পাঠকের জ্ঞানলিপ্সা বেড়েছে, তারি জন্য বইয়ের এত চাহিদা, না সবাই পয়সার মুখ দেখছে বলে আয়ের খানিকটা অংশ বই কেনাতে খরচ করছে? এ দু'টো কথার মধ্যেই কিছুটা সত্য রয়েছে। যুদ্ধের কল্যাণে এক শিক্ষক-সম্প্রদায় ছাড়া সবাই কিছু-না-কিছু বেশী রোজগার করেছেন ও করছেন এবং পূর্ব্বে যে পাঠক এক টাকা মূল্যের বই কিনতে ইতস্ততঃ করতেন, তাঁকে অনায়াসে তিন টাকা মূল্যের বইখানি কিনতে দেখছি। শিক্ষকরা অবশ্য এখনও অধিকাংশই বই ধার করে পড়ছেন। সেই সঙ্গে এটাও সত্য যে, সাধারণ পাঠক পূর্ব্বে প্রবন্ধের বই দেখলে পিছিয়ে যেতেন, লাইব্রেরীতে অথবা বইয়ের দোকানে গিয়ে ছোট গল্প প্রবন্ধ বাদ দিয়ে মোটা-মোটা উপন্যাস খুঁজতেন, তিনিই এখন প্রবন্ধ পড়ছেন ও ছোট গল্পের বই কিনছেন। ছোট গল্পের বাজার দর কম কিংবা প্রবন্ধ অচল, এ গুজব অনেকটা কমেছে। এটা সাহিত্যের আশাপ্রদ সুসংবাদ। যুদ্ধের পরও যদি সাধারণ পাঠকের এই মনোভাব টিকে থাকে এবং না থাকার কোনও কারণ দেখছি না, তা হলে সাহিত্যের এই দু'টি অবহেলিত বিভাগের পুষ্টি-সাধন হবে এবং মোটামুটি সব সাহিত্যেরই ব্যবসায়িক মূল্য সুনির্ণীত হবে।

বিগত বৎসরের বাংলা সাহিত্যের মোটামুটি বিবরণ দিতে গেলে দেখতে হয়, বিভিন্ন লেখক কি কি নতুন বই লিখেছেন অথবা প্রকাশকেরা কি বই বার করেছেন। কিন্তু এই তালিকা প্রস্তুত করার আগে আর একটি করণীয় আছে। সেটা হ'ল ব্যক্তিগত কৃতিত্ব ছেড়ে দিয়ে সমস্ত জিনিষটাকে এক নজরে দেখা। লেখক ও পাঠক একসঙ্গে দুই ব্যক্তির মনোভাব নিয়ে দেখলুম যে, উভয়ের মধ্যে মানসিক সহযোগিতা আগের চেয়ে অনুকূল হয়েছে। লেখক-সম্প্রদায় মাত্রেই অবাস্তব ও কল্পনাবিলাসী প্রাণী, যারা কথার পর কথা সাজিয়ে বাজার গরম করেন, পাঠকের মন থেকে এ ভাবটা অনেকখানি কেটে গিয়েছে। আর পাঠকবর্গের ওপর লেখকদেরও যে অপরিসীম অবজ্ঞা ছিল, সেটা কমে গিয়েছে। বরঞ্চ সাধারণ পাঠকের বুদ্ধি ও গ্রহণ করবার শক্তি—এ দু'টো জিনিষ মনে রেখে রচনার ধারা কিছুটা বদলাতে বাধ্য হয়েছে। সাধারণ পাঠকের আগ্রহ ও বোঝবার চেষ্টা যেমন নিশ্চিত বেড়েছে, লেখক-সম্প্রদায়ও তেমনি মিথ্যা অভিমান ও আভিজাত্যের উঁচু বেদীতে বসে থাকতে আর রাজী নন।

এই যে পাঠক-লেখকের অনুকূল সহযোগিতা, পারস্পরিক চাহিদা মেটানোর চেষ্টা—এটা অবশ্য একটি বিচ্ছিন্ন নিরালম্ব ঘটনা নয়। এটি হ'ল সামাজিক প্রক্রিয়ার একটি অবশ্যম্ভাবী ফলবিশেষ। বাংলা দেশে যে সামাজিক চৈতন্যের উদ্বোধন হয়েছে, তার পিছনে আছে শুধু ১৩৫০ সালের মন্বন্তর অথবা তীব্র জাতীয় আন্দোলন নয়, বিগত পনেরো কুড়ি বছরের ইতিহাস। অনেক দিন ধরে বাংলার সাহিত্যিকরা নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন এবং পাঠকদের মনের ওপরও এই সার-ফেলার কাজ চলেছে। তারি ফলে আজ দেখতে পাচ্ছি জনসাধারণের মনে একটি জাগ্রত ভাব। দৈনিক ও মাসিক পত্রিকা, পুস্তিকা এবং নানা জাতীয় প্রবন্ধের মধ্যস্থতায় বাঙালী পাঠকের নিরুত্তাপ উদাসীনতা অনেকটা অপসারিত হয়েছে। যারা শ্রমিক, যারা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, তারাও দিনান্তে কিছু পড়ে এবং তাদের উপযুক্ত করে লেখা রচনার প্রয়োজন এবং প্রয়োজনা দিন দিন বাড়ছে। তার প্রমাণ রাজনৈতিক ও প্রগতিশীল সাহিত্যের বিস্তার।

সাহিত্যিক হিসাব-নিকাশের বেলাতে এই কথাই বলা চলে। যে সব লেখক গত পনেরো কুড়ি বছর ধরে লিখছেন, আজও তাঁরাই কর্ণধার। গত দু'এক বছরের মধ্যে কোনো নবীন আগন্তুক হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে সাহিত্যের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছেন, একথা বলা চলে না, যেমনটি বিদেশী সাহিত্যে মাঝে মাঝে নজরে পড়ে। 'রেণ-বো' অথবা 'ফল্ অব প্যারী'র মতন বই আমাদের দেশে বেরোয়নি যার আকস্মিক আবির্ভাবে মন চঞ্চল ও আশান্বিত হতে পারে। অথচ দেশে যে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আবহাওয়া তা' বিশেষ অনুকূল না হলেও নূতন সাহিত্য রচনার সম্পূর্ণ প্রতিকূল বলেও মনে হয় না।

বোধ হয়, বাঙলা দেশে যে রাজনৈতিক আবেষ্টনী ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে আমরা বাস করছি এবং একটা অনির্ণীত, অনিশ্চিত সঙ্কীর্ণ পথ ধরে চলেছি, সেটা আমাদের শ্বাসরোধ করে এনেছে। নিষ্ফল আক্রোশে এবং অক্ষম বার্থতায় নতুন সৃষ্টি-মূলক কাজ ব্যাহত হয়েছে। তবু, একথা সত্য, এই আবহাওয়ার মধ্য থেকেই সাহিত্য রচনা চলেছে এবং অন্ততঃ কয়েকজন লেখক উজ্জ্বল আশার পর্ব্বদিনটির দিকে লক্ষ্য রেখে অগ্রসর হবার চেষ্টা করেছেন।

প্রথমে তারাশঙ্কর বাবুর কথা ধরা যাক্। এই লেখকের ওপরে আমাদের আস্থা ও আশা অনেকখানি। 'রাইকমল' এবং 'জলসা ঘর' থেকে 'ধাত্রী দেবতা' ও 'গণ-দেবতা' অনেকখানি পথ এবং সে পথ তিনি সহজ ও সাহসী পদক্ষেপে অতিক্রম করেছেন। বাঙলা দেশের ক্ষয়িষ্ণু আভি-জাত্যের দীর্ঘনিঃশ্বাস 'কালিন্দী'তেই শেষ দেখেছি। এখন তিনি নিম্ন, দুঃস্থ ও পীড়িত জনগণের আশা ভরসার কথা লিখছেন, দেখছেন সুস্থ মানুষের সফল স্বপ্ন যার উজ্জ্বলতা বলকেন্দ্রিক মেরুদণ্ডে। সামাজিক চৈতন্য ও সত্তার অভিব্যক্তিতেই শিল্পের রূপান্তর। অবশ্য, তাঁর রচনায় মতবাদের প্রাধান্য নেই। 'মন্বন্তর' এবং '১৩৫০' বই দুখানি ভাবযুক্ত মানবিকতারই জয়গান। তবু তাঁরি হাতে বাংলা উপন্যাসের নূতন ভবিষ্যৎ, এ কথা জোর করেই বলছি।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ হলেন আরেকজন লেখক, যাঁর 'মোহানা' বইখানি পাঠক-সমাজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। এই নিয়ে তাঁর তিন খণ্ডের উপন্যাস শেষ হল। 'অন্তঃশীলা' ও 'আবর্ত্ত' এই দুই খণ্ডে প্রধান চরিত্র খগেন বাবুর যে পূর্ব্বাভাস ও ক্রম-অভিব্যক্তি দেখেছিলুম, তার পরিণতি পেয়েছি 'মোহানা'য়। আত্মকেন্দ্রিক, বুদ্ধিবাদী নায়ক নানা পরীক্ষা ও বিচারের জাল কাটিয়ে একজন পুরো, সুস্থ মানুষের রূপ পরিগ্রহ করেছে। যেখানে ছিল বিতর্কের আবিল আবর্ত্ত, সেখানে এসেছে সমাজবোধে উদ্বুদ্ধ মনের বিপুল প্রেরণা। ব্যক্তিত্ববাদের অন্তঃশীলা স্রোত খুঁজে পেয়েছে কর্ম্মক্ষেত্রের আকুল মোহানা। জীবনের নামে আত্ম-প্রবঞ্চনা ও অন্ধ আত্মরতির দিন-শেষে যে সত্যের সাক্ষাৎ পেলেন খগেন বাবু, তার সার্থকতা ও ভিন্ন আবেষ্টনীতে তার পরিণতি অথবা প্রতিক্রিয়া দেখবার ইচ্ছা আমাদের রইল। যে জীবননিষ্ঠ চিন্তা ও কর্ম্মের আকর্ষণে খগেন বাবু একটি অভিজাত, সঙ্কীর্ণ ভাবধারা থেকে মুক্ত হয়ে বৃহত্তর জীবনে ঝাঁপ দিলেন, সে জীবন তাঁকে কি খোরাক দিল, কি ভাবে তাঁর জড়োত্তম প্রচেষ্টাকে নতুন রূপ দিল, রমলার এবং সুজন-বিজনের পরিণতিই বা কোন্ দিকে গেল, এগুলো কেন্দ্র করে চতুর্থ খণ্ড লেখা যেতে পারে। 'মোহানা' বইতে আরেকটি জিনিষ লক্ষ্য করলুম। ভাষা খুব হৃদয়গ্রাহী না হলেও তার মধ্যে অনেকখানি স্বচ্ছতা এসেছে। আঙ্গিক অর্থাৎ গঠন কৌশলের দিক থেকেও প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের চেয়ে শেষ খণ্ডটি আরো বেশি পরিণত। তাই বলছি 'মোহানা'য় শুধু কল্লোল নয়, কর্ম্ম-সাগরের প্রশান্ত বিস্তারের যে প্রতিশ্রুতি আছে, তা সত্যই বাংলা সাহিত্যের একটি অভিনব সম্পদ। গোপাল হালদার-এর 'ত্রিধারা' উপন্যাসের দু'খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। ভাষার দিক থেকে ও গঠন পদ্ধতিতে গোপাল বাবুর মৌলিকতা লক্ষ্য করা যাবে 'পঞ্চাশের পথ' ও 'তেরশ পঞ্চাশে'। গত তিন বছরে বাঙলার সমাজে ও অর্থনৈতিক জীবনে যে প্রতিক্রিয়া চলেছে তার একটা যথার্থ ছবি শিক্ষিত বাঙালীর চোখের সামনে ধরাই গোপাল বাবুর উদ্দেশ্য। বই দু'খানির খণ্ডচিত্র হিসাবে যথেষ্ট সার্থকতা আছে, কিন্তু বিশেষ একটি দলের দৈনন্দিন কর্ম্মসূচী অনুসরণ করা সাধারণ পাঠকের কাছে একটু বৈচিত্র্য-হীন হতে বাধ্য। তবে বইখানিতে প্রতিভা ও আন্তরিক কর্ম্মনিষ্ঠার ছাপ সুস্পষ্ট।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র গত বছরে কোনো সাহিত্য রচনা করেন নি। তাঁদের কর্ম্মক্ষেত্র সাহিত্য থেকে দূরে সরে এসেছে এবং বাঙালী চিত্তকে তাঁরা অন্য দিক থেকে রস-পরিবেশন করছেন। চলচ্চিত্র-শিল্পের যেটা লাভ, সাহিত্যের সেটা লোকসান এ কথা স্বীকার করতেই হবে। বাঙালী পাঠকের স্মরণশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ। জনসাধারণের কাছে এঁরা শুধুই সিনেমা-গল্পের লেখক ও পরিচালক অথচ দু'জনেই বরাবর সাহিত্য সাধনা করে এসেছেন এবং দুঃখের সঙ্গে। আজ যদি ওঁরা আর্থিক ও ব্যবসায়িক দিকটা দেখেন, তার জন্য অনেক পরিমাণে দায়ী নির্বিকার ও নিরুৎসাহ পাঠক-চিত্ত। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন পত্রিকায় গল্প লিখে চলেছেন, কিন্তু আলোচ্য সময়ের মধ্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য কোনো বই বেরোয় নি। তাঁর সম্বন্ধে এই কথাটি বলা চলে যে, নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন নিয়ে তিনি তো অনেক গল্প লিখলেন এবং হোটেল-ওয়ালা, রাঁধুনি বামুন ইত্যাদি নগণ্য মানুষকেও কল্পনায় সোনার মুকুট পরালেন এবারে যারা সত্যিকারের দুঃস্থ, বঞ্চিত এবং শোষিত তাদের নিয়ে তিনি গল্প রচনা করুন। তাতে কৃত্রিম রোমান্টিক আবহাওয়া কেটে যাবে এবং তাঁর অপরূপ সাবলীল ভাষায় ফুটে উঠবে দ্বিধাহীন জীবনের সত্য পরিচয়। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি বৎসরই কিছু না কিছু বই বেরোয়। এবারে তাঁর উল্লেখযোগ্য বই হ'ল 'রাঙ্গা মাটির চাষী'। সুখের বিষয়, মাণিক বাবুর লেখায় ইদানীং যে বিশ্লেষণ বৃত্তির আতিশয্য আর মনো-বিকলনের আধিক্য-প্রকাশ লক্ষ্য করা যাচ্ছিল, শেষ বইখানি তার প্রভাবদুষ্ট নয়। তবে মোটের উপর বইখানি তেমন ভালো জমেনি। এতে মাটির পরিচয় নেই, চাষীও নেই। কিন্তু আছে কয়েকখানি চিঠি 'বৈম চিন্তামণি'কে লেখা, যেগুলিতে রীতিমত শক্তিমত্তার পরিচয় আছে। তাই মনে হয় মাণিকবাবু যে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি এবং জোরালো কলম নিয়ে সাহিত্য জীবন সুরু করেছিলেন, তিনি আবার সেখানে ফিরে যান। কারণ তখন তিনি এমন রচনায় হাত দিয়েছিলেন, যা ছিল প্রকৃত জীবন এবং পরবর্ত্তী যুগের পূর্ব্বাভাস।

কিন্তু সুবোধ ঘোষের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টো কথাই বলতে ইচ্ছা করে, তিনি মুখ ফেরান এবং এগিয়ে আসুন। 'ফসিল', 'পরশুরামের কুঠার' প্রভৃতি গল্পে তাঁর যে উজ্জ্বল চিন্তা ও ভাষার সমন্বয়, তা অনেকখানি ম্লান হয়েছে 'তিলাঞ্জলি'তে। জাতীয়তার গুণগান ভালো কিন্তু কোন্ ধরণের জাতীয়তা ও বিপক্ষকে বিদ্রূপে বিধ্বস্ত করার চেষ্টা কখনোই শিল্পের পর্য্যায়ে ওঠে না এবং শেষ পর্যন্ত সাহিত্যিক মনকে স্পর্শও করে না। দলীয় মনোভাব থেকে মুক্ত হলে সুবোধবাবু মিথ্যা আত্মপ্রত্যয় থেকে রেহাই পাবেন, যেটি সার্থক রচনার বৃহত্তম অন্তরায়।

সরোজ রায় চৌধুরীর নতুন বই 'ক্ষুধা' হল গল্প-সঙ্কলন। দুর্ভিক্ষের সঙ্গে যে দুরবস্থা ও অর্থ-সঙ্কট দেখা দিয়েছে, সেই পটভূমির ওপর লেখা এই গল্পগুলিতে সরোজকুমার যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর ভাষায় ও বক্তব্যে একটি চমৎকার ভারসাম্য আছে যা সহজে নড়ে না। কলকাতা সহরে যে সব গৃহহীন, গ্রামছাড়া লোকের ভিড় এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, যাদের লাঞ্ছনাটা গভীর এবং প্রকাশ্য দৃষ্টির অন্তরালে যাদের ভদ্রতা রক্ষাটুকুও বিড়ম্বনা—সরোজকুমার এদের কথাই অতি নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন। তাঁর রচনায় অবান্তর প্রসঙ্গ নেই, নেই বক্তৃতা অথবা গম্ভীর হবার প্রচেষ্টা। অথচ এই গুণের অভাব দেখলুম 'বনফুলের' লেখা 'জঙ্গম' দ্বিতীয় খণ্ডে। 'তৃণখণ্ডে' এবং অন্যান্য ছোটগল্পে বনফুলের যে লঘু ও সূক্ষ্ম স্পর্শ ছিল তা যেন হারিয়েছে। অবশ্য উপন্যাসের গঠনকৌশল আলাদা। তবুও 'জঙ্গম' দ্বিতীয় খণ্ডখানি শেষ করতে বেগ পেতে হল। কোনো কোনো জায়গায় তিনি অকারণ গম্ভীর হয়ে পড়েছেন। বিভূতি মুখোপাধ্যা-য়ের 'হৈমন্তী' ছোটগল্পের বই। কয়েকটি গল্প ভালো উতরেছে, বিশেষ করে, নাম-গল্পটি। 'আবুহোসেন,' 'মল্লিনাথ' গল্প দুটিও উপভোগ্য। বিভূতি বাবু উপন্যাসেও হাত দিয়েছেন। 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড বেরিয়েছে। বইখানিতে নতুন কিছু নেই, তবে প্রধান চরিত্র কাত্যায়নী পাঠকের মন স্পর্শ করবে।

বুদ্ধদেব গত বৎসরে বিশেষ কিছুই লেখেন নি। 'অদর্শনা'ই তাঁর একমাত্র আধু-নিক উপন্যাস। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সম্প্রতি নাটিকার বই প্রকাশিত করেছেন, তার মধ্যে কয়েকটি সংলাপে ও রচনা পদ্ধতিতে সুন্দর। কথাসাহিত্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য বই যতন বিবি' সম্প্রতি বেরিয়েছে। কয়েকটি গল্পের সঙ্কলন হলেও



এ গল্পগুলি মৌলিক সৃষ্টি। এতদিন অচিন্ত্যকুমার মফঃস্বলের চাকরিজীবীদের নিয়ে রসসৃষ্টি করছিলেন, যাতে একঘেয়েমি দোষ এসে পড়ছিল। এইবার তিনি গ্রামের মানুষ ও নিম্নস্তরের জীবন এঁকেছেন। এই ধরণের রচনা আমরা আরো প্রত্যাশা করি, কেননা তিনি দেখতে জানেন এবং লিখতেও জানেন।

নক্সায় এবং হালকা রস-রচনায় পরিমল গোস্বামীর নাম সর্ব্বাগ্রে করতে হয়। দৃষ্টিভঙ্গী আর লিখনভঙ্গী দু'টি গুণই পরিমল বাবুর আছে কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা তিনি থামতে জানেন। কোনো একটি বিষয় নিয়ে লিখতে বসে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেন না। 'ট্রামের সেই লোকটি' এবং 'ব্লাক মার্কেট' পড়লে এই কথাটি বোঝা যায়। তা'ছাড়া, রস-রচনার পিছনে একটি বিশেষ ফিলজফি থাকার দরকার, নইলে সঙ্গতি বোধ থাকে না। এই কারণে পরিমল বাবুর লেখা জমে ওঠে। 'আষাঢ়ে দেশে' আরেকখানি চমৎকার ও নতুন ধরণের বই। ছোটদের জন্যে লেখা হলেও আসলে বয়স্করাই এর বিদ্রূপ এবং প্রতীক-চিত্র উপভোগ করতে পারবেন। সরল ও সহজ ভাষায় তিনি লেখেন এবং তার বিদ্রূপে বিশেষ একটি অর্থ ও 'পয়েন্ট' থাকে। এ কথাটি কিন্তু শিবরাম চক্রবর্ত্তীর বেলায় খাটে না। ছোটদের বই তিনি খুবই ভালো লেখেন। কিন্তু 'মেয়ে ধরা ফাঁদে'র মত রস-রচনায় তিনি কষ্টকল্পিত ভাষায় ও কথার অযথা মোচড়ে পাঠকের মনকে কিছুটা বিরক্ত করে তোলেন। প্রমথনাথ বিশীর 'শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্ব্ব' বেরিয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি লেখা ভাল হয়েছে। প্রমথ বাবুর মস্তিষ্ক অত্যন্ত উর্ব্বর। একটি আইডিয়া মাথায় প্রবেশ করা মাত্রই তাকে তিনি হাসির খোরাকে পরিণত করতে পারেন। 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' প্রমথবাবুর দ্বিতীয় বই। লঘু হাস্যরসে, স্মৃতিচিত্র রচনায় এ বইখানি অনেক পাঠকের চিত্ত জয় করেছে।

কথা-সাহিত্যের মধ্যে সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর দু'খানি উপন্যাস সম্প্রতি বেরিয়েছে, 'দিনান্ত' আর 'কস্মৈ দেবায়'। প্রথম বইখানিতে দেখানো হয়েছে ভারতের মত একটি ঔপনিবেশিক দেশে পুঁজিবাদী জীবনের শোচনীয় ট্র্যাজেডি। বেশি বিতর্কমূলক হওয়াতে উপন্যাসে রস জমেনি, অবনীবাবুর চরিত্রও মনে দাগ কাটে না। 'কস্মৈ দেবায়' হল আরেকখানি উপন্যাস যেখানি রাজনীতিঘেঁষা। একজন তরুণ কর্ম্মীর চিন্তাধারার বিকাশ হিসাবে বইখানির সার্থকতা, কিন্তু এখানেও সেই তর্কপ্রিয়তা রসসৃষ্টি ব্যাহত করেছে। দীপা ও চিত্রা চরিত্র দু'টি কিন্তু নায়কের চেয়ে অনেক ভাল ফুটেছে। মনোজ বসু অনেক লিখেছেন কিন্তু তাঁর শক্তিমত্তার কোন পরিচয় পেলাম না তাঁর নতুন গল্পের বইয়ে 'দুঃখ নিশার শেষে'। প্রগতিশীল হবার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা দৃষ্টিকটু লাগে। তবে 'দ্বীপের মানুষ' গল্পটি সুন্দর, অবশ্য শেষাংশটি ছাড়া। 'মহাস্থবিরজাতক' একখানি চমৎকার স্মৃতি কাহিনী। স্মৃতিমূলক কথা-সাহিত্যের দোষ-গুণ দু'টিই এ বইয়ে আছে। অংশবিশেষে বইখানি সুন্দর ও উপভোগ্য কিন্তু সমগ্র দৃষ্টিতে একটা পরিণতির অভাব লক্ষ্য করা যায়। *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ' পড়ে মনে হয় যে, লেখার ধারায় তিনি তারাশঙ্কর বাবুর রচনা দ্বারা অনেকটা প্রভাবিত। নারায়ণ বাবুর ভাষা ভালো এবং* তাঁর একটি নিজস্ব ষ্টাইল আছে। ভঙ্গী বদলালে তাঁর রচনায় আমরা মৌলিকত্ব পেতে পারি। নবেন্দু ঘোষ উদীয়মান লেখক। 'নায়ক ও লেখক' প্রকাশিত হবার পর থেকে তিনি সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 'ডাক দিয়ে যাই' এবং 'মানুষ' তাঁর সাম্প্রতিক রচনা। শেষোক্ত গল্পের বইখানি সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছি যে, ভাষায়, পারিপার্শ্বিক চিত্রণে এবং মানুষের জীবনকে বিশেষভাবে দেখার ভঙ্গিমায় নবেন্দু বাবু নূতনত্ব দেখিয়েছেন। তবে আমার মনে হয়, ছোট গল্পের চেয়ে অনতিদীর্ঘ উপন্যাসেই তাঁর ক্ষমতার বেশি পরিচয় পাওয়া যাবে। ভবানী মুখোপাধ্যায়ের 'যথাপূর্ব্বম' একখানি সুন্দর ছোট গল্পের বই। কথা-সাহিত্যে জ্যোতির্ম্ময় রায়ের নাম সর্ব্বশেষে উল্লেখ করছি এই কারণে যে, তাঁর নাম এখন সকলের মুখাগ্রে। 'উদয়ের পথে' উপন্যাসখানি চলচ্চিত্রের গল্পাংশ নিয়েই রচিত কিন্তু উন্নততর সংস্করণ। 'তমসা' বইখানিতে 'ভঙ্গুর' শ্রেষ্ঠ গল্প। এখানে তিনি স্বকীয় ভাষার দৃঢ়তা দেখিয়েছেন এবং বিশেষ করে ছোট গল্পের একটি বিশিষ্ট কৌশল তিনি যে করায়ত্ত করেছেন, এ কথা জোরের সঙ্গেই প্রমাণ করেছেন। কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সব রকম লেখেন, কবিতা, ছোট গল্প ও উপন্যাস। সম্প্রতি তাঁর উপন্যাস ছাড়া 'দ্বিতীয়' নামে গল্পের বই বেরিয়েছে, যেখানি উপন্যাসের চেয়েও ভালো। আমার বক্তব্য, তিনি কবিতা ছেড়ে কথা-সাহিত্যে নজর দিন। 'মাটির'র মতন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর একটি গল্প যিনি লিখতে পারেন, তাঁর কাছে কিছু প্রত্যাশা করা যেতে পারে। 'রংমশাল' কাগজখানি নিয়ে তিনি অনেকটা ভালো কাজ করেছেন। কেননা ছোটদের পত্রিকার সংখ্যা কমে এসেছে এবং তার উৎকর্ষও অনেকটা ম্লান হয়ে আসছে।

হালকা ও ব্যক্তিগত প্রবন্ধে জ্যোতির্ম্ময় রায়ের কৃতিত্ব বেশি, এটা আমার ব্যক্তিগত ধারণা। বুদ্ধদেবই খেয়ালী প্রবন্ধের পথ প্রথম দেখিয়েছেন কিন্তু জ্যোতির্ম্ময় বাবুর হালকা প্রবন্ধ হ'ল অন্য জাতের। সম্প্রতি প্রকাশিত 'অন্যাক্ষ' এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করবে। বুদ্ধদেব বাবুর 'উত্তর তিরিশ' বেরিয়েছে, কয়েকটি প্রবন্ধ উপাদেয়।

এদিকে সাধারণ প্রবন্ধের চাহিদা বর্ত্তমান সময়ে বেড়ে চলেছে। আজকাল পাঠক অনেক কিছু জানতে চায়। ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞান ইত্যাদি নানাবিষয়ে তার জ্ঞানস্পৃহা নজরে পড়ছে। ডাঃ ভূপেন দত্তের লেখার অনুরাগী পাঠক-সংখ্যা দেখলে প্রবন্ধ-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হতে হয়। তবে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার *জন্য এমন লেখা ও লেখকের দরকার, যাঁরা সহজ ও সরস করে একটি বিষয়কে পাঠকের মনে ধারণা করিয়ে দিতে পারেন। এ কাজে 'শতাব্দী গ্রন্থমালা' এবং 'বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ'* আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করছে। পাদটিকা-কণ্টকিত এবং পণ্ডিতী তর্কমূলক প্রবন্ধের বই এই সিরিজে প্রকাশিত হচ্ছে না। অথচ বইগুলি পণ্ডিত ব্যক্তিদেরই লেখা, যেমন ৺প্রমথ তর্কভূষণ মহাশয়ের 'মায়াবাদ' এবং ভবতোষ দত্তের 'ধনবিজ্ঞান'। সাধারণ পাঠক পড়ে আনন্দ পাবেন এবং শিখতেও পারবেন। এই ধরণের আর একখানি প্রবন্ধের বই হ'ল 'শতাব্দী গ্রন্থমালা'র অন্তর্ভুক্ত নবেন্দু বসুর 'রস-সাহিত্য'। ভঙ্গী ও রীতি, গদ্যে রস-রচনা, অনুবাদ-সাহিত্য প্রভৃতি কয়েকটি অধ্যায়ে নবেন্দু বাবু রস সাহিত্যের বিভিন্ন ধারাকে চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। বাংলা ভাষায় এই জাতীয় আলোচনা সম্পূর্ণ নতুন। অন্যান্য প্রবন্ধ লেখকের মধ্যে সুকুমার সেন ও নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, প্রবোধচন্দ্র সেন ও কালীকান্ত বিশ্বাস বিভিন্ন পত্রিকায় ভালো প্রবন্ধ লিখছেন। কিন্তু এঁদের নতুন কিছু বই বেরোয়নি। প্রবোধ সেন মহাশয়ের সম্বন্ধে নালিশ এই, তিনি তাঁর নিজস্ব ষ্টাইলে চমৎকার ঐতিহাসিক প্রবন্ধ আর লিখছেন না কেন? রাজনীতিক প্রবন্ধের মধ্যে হুমায়ুন কবীরের 'মোসলেম রাজনীতি' সব দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

নাটক ও কাব্য সম্বন্ধে দু'য়েকটি কথা না বল্লে গত বৎসরের সাহিত্যালোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সাহিত্যের এই দুই বিভাগে তেমন পুষ্টিসাধন হয় নি, এ কথা অপ্রিয় সত্য। নন্দগোপাল সেনগুপ্তের চমৎকার নাটিকার সঙ্কলন "পায়ে চলার পথ" এবং বিজন ভট্টাচার্য্যের 'নবান্ন' ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য নাটক প্রকাশিত হয় নি। আঙ্গিকের দিক্ থেকে বিজন বাবুর নাটকে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও সংলাপে, প্রযোজনায় ও বাস্তবনিষ্ঠায় 'নবান্ন' প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেছে। কাব্যজগতে যাঁরা তারকা, তাঁরা বর্ত্তমান কিন্তু তাঁদের লেখা অনেক কমেছে। বুদ্ধদেব বাবুর 'কবিতা' টিকে আছে এবং 'নিরুক্ত'ও সাময়িকভাবে আত্মপ্রকাশ করে চলেছে। বুদ্ধদেব বাবু কেবল 'রূপান্তর' নামে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন কিন্তু এ বই সাধারণের জন্য নয়। এখানি কবির স্বাক্ষরিত এবং বেশী দামের। বিষ্ণু দে কয়েকটি চমৎকার অনুবাদ করেছেন এবং 'সাতভাই চম্পা' নামে কবিতার বই প্রকাশ করেছেন। ইদানীং

[ইহার পর ১০৩ পৃষ্ঠায়]



পঞ্চশর রায়

শ্রীমতী বাণী রায়

রাজ্ঞী ক্রিশ্চিনা নিজের প্রেমিকের বিরুদ্ধে কঠোর আদেশ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিচারের আসনে বসিলে প্রেমও বিচারাধীন হয়। ইতিহাসে পঠিত ক্রিশ্চিনার উপাখ্যানের সহিত গ্রেটা গার্বোর ক্রিশ্চিনা এক হইয়া আজ আমার নয়ন সম্মুখে শাদা পর্দায় কাল ছবিরূপে ফুটিয়া উঠিতেছে ক্রমাগত।

—নীল সমুদ্রের বক্ষে অর্ণবপোত। ক্রিশ্চিনা যাত্রা করিয়াছেন ইটালি অভিমুখে। গুষ্টাভাস আডলফাসকে সিংহাসন দিয়া ক্রিশ্চিনা রাজ্য ত্যাগ করিলেন। —ইতিহাস বিস্তৃত বর্ণনা দেয় নাই। প্রণয়ীর উদ্দেশ্যে ক্রিশ্চিনা রাজ্য ত্যাগ করিলেন তাহারি সহিত মিলিত হইবার জন্য। কিন্তু তাহা হইল না। তাহার পূর্ব্বেই রাজরোষ উপলক্ষ্য হইয়া সেই প্রেমিকের মৃত্যু ঘটাইল। মৃতদেহের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া ক্রিশ্চিনা ধীরে ধীরে বলিলেন—"আমাকে তো চলিতেই হইবে।"

আজ আমিও আমার একমাত্র প্রিয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমার মতবাদ ব্যক্ত করিয়েছি। কিন্তু ক্রিশ্চিনার সহিত আমার প্রভেদ ক্রিশ্চিনা অপর পক্ষের নিকট হইতে অপরিসীম প্রেম লাভ করিয়াছিলেন। সেই স্মৃতি আজন্ম তাঁহার জীবনকে পুষ্পসৌরভসমাকুল করিয়া রাখিত। কিন্তু আমি? আমার প্রিয়তম ব্যক্তি আমার প্রেমিক নহে। তিনি আমাকে ভালবাসেন নাই। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। আমি সুইডেনের অসামান্যা রাজ্ঞী নহি, মিলিটারী অফিসের রূপহীনা কেরাণী মাত্র।

তাহাতে ক্ষতি ছিল না। তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন নাই। তাঁহাকে আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলাম, প্রেম জানাই নাই। দূর হইতে তাঁহাকে পূজা করিয়া তাঁহার ভক্তের দলের অন্যতম হইয়া থাকিয়াও আমার জীবন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আজ তিনি আমার কাছে মৃত। তবু আমার জীবনধারণ করিতে হইবে। 'আমাকে চলিতেই হইবে।'

যখন স্কুলে পড়ি তখন চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের একটি অভিজ্ঞতা আমার জীবনের সুর যেন বাঁধিয়া দিল। স্কুল হইতে বহু ছাত্রী আমরা শিক্ষয়িত্রীদের সহিত সার্কাস দেখিতে গিয়াছিলাম। শীতের সন্ধ্যা, ট্রামের জন্য আমরা পথের ধারে অপেক্ষা করিতেছিলাম। পাশেই একটি ছায়াচিত্রগৃহ সহসা দেখিলাম প্রতীক্ষমান মোটরগাড়ীর দ্বারে হাত রাখিয়া জনতা-পরিবেষ্টিত অবস্থায় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি কথা বলিতেছেন। শুভ্র উত্তরীয়ের উপর দিয়া কণ্ঠে লম্বিত রহিয়াছে শাদা গোড়ে মালা। দীর্ঘ শীর্ণদেহ ইস্পাতের মত ঋজু, অতি বিশাল দুই নয়নে প্রতিভার জ্যোতি। ললাটে, অধরে বিশিষ্টতার ছাপ, মানুষ সমাজে নৃপতির যোগ্যতা আছে। তিনি!

সকলেই, বিশেষতঃ বয়স্কা ছাত্রী এবং শিক্ষয়িত্রীরা, জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিলেন। আমার সোৎসুক প্রশ্নের উত্তরে একজন প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী বলিল, "চেননা? ইনি যে এ দেশের সবচেয়ে বড় সাহিত্যিক। ইংরেজি বাংলা দুখানা কাগজের সম্পাদক। কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার—একাধারে সব। পঞ্চশর রায়।"

পঞ্চশর রায়! মনে পড়িয়া গেল আমার দাদার পড়িবার টেবিলে একখানা কাব্যগ্রন্থ দেখিয়া মুগ্ধচিত্তে না বুঝিয়াও গোগ্রাসে গলাধঃকরণ করিয়াছি। পঞ্চশর রায়ের একটি কবিতার পংক্তি চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল :—

—আমি তোমাদের, তোমরা আমার, এই মোর পরিচয়।—

কবির কথায় নিজের সহিত তাঁহার যোগসূত্র সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া তাঁহাকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম।

সেই প্রথম আমার জীবনে পুরুষের পূজা আরম্ভ হইল।

তাহার সুদীর্ঘ দশ বৎসর পরে পঞ্চশর রায়ের সহিত মিশিবার সুযোগ এবং সৌভাগ্য লাভ করিলাম। আমাদের পার্টির একখানা মাসিকপত্র আছে, তাহার পূজা-সংখ্যা রচনার জন্য পঞ্চশর রায়ের দ্বারস্থ হইয়াছিলাম।

বিশাল অফিস। প্রবেশ করিতে হৃৎকম্প হইল। তাঁহার সম্মুখে উপনীত হইয়ে

আবার অন্তর্নিহিত গোপন শ্রদ্ধা আমার কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিল।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ফাইল হইতে মুখ তুলিয়া পঞ্চশর রায় বলিলেন "কি চাই ?"

অর্দ্ধস্ফুট স্বরে উত্তর দিলাম, "আমাদের পত্রিকায় পূজোসংখ্যায় একটা লেখা—"

বাধা দিয়া তিনি সবেগে বলিয়া উঠিলেন, "অসম্ভব। লেখার সময় আমার নেই।" দণ্ডায়মান অবস্থাতেই সভয়ে বলিলাম, "আমি—পার্টির লোক। সেখানে সভাপতিত্ব করতে যেয়ে আপনি একটা লেখা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন।"

"ও"—, চকিতে পঞ্চশরের কণ্ঠে আপ্যায়নের সুর দেখা দিল,—"তাই বলুন। আমাকে এত যে-সে লোক এসে বিরক্ত করে যে, কি বলবো! বসুন, বসুন। ওরে একখানা চেয়ার—"

বসিবার আমন্ত্রণ পাইয়া ধন্য হইলাম।

তাহার পর হইতে আমার বাস্তবলোক, আমার ধ্যানলোক আচ্ছন্ন করিয়া রহিলেন পঞ্চশর। তাঁহার নিকটে যাইয়া তাঁহার সহিত কথা বলিবার অধিকার আমার চরম প্রাপ্তি হইল। অনুগতা শিষ্যা হইয়া তাঁহার সামান্য কাজে নিজেকে প্রযুক্তা করিতে পারিয়া তাঁহার মতবাদ গলার জোরে সর্ব্বত্র প্রকাশ করিয়া এই নূতন দেবতার উপাসনায় আমার দিন কাটিতে লাগিল। আজ নিস্পৃহ চিত্তে বসিয়া নির্লিপ্ত মনোযোগে খণ্ড খণ্ড ঘটনা-সংস্থানে আমার সহিত তাঁহার পরিচয়ের যাথাথ্য রূপটি নিজের সম্মুখে নিজেই টানিয়া আনিতেছি। অতিক্রম করিতে পারিতেছিনা। তখন যাহা প্রতিভার স্বাভাবিক অস্বাভাবিকত্ব বলিয়া মনে হইয়াছিল আজ অন্যরূপে সেইগুলি ফিরিয়া দাঁড়াইতেছে। শেষ হইতে নূতন করিয়া প্রথম দেখিবার শিক্ষা, হে গুরুদেব, তুমিই দিয়াছ।

ছোট ছোট দুই একটা প্রবন্ধ লিখিয়া নাম হইয়াছিল। সেগুলি পার্টির পত্রিকায় উপর্য্যুপরি প্রকাশিত হইলেও পঞ্চশর কখনও উল্লেখ করেন নাই। তখন তাঁহার সহিত প্রায় একবছর ঘনিষ্ঠ আলাপ হইয়াছে। অফিস-ফেরৎ প্রায়ই তাঁহার অফিসে যাই। তাঁহার কপি করিবার কাজকর্ম্ম করিয়া দিয়া হাতের লেখা দুই একটি টুকরা লইয়া বাড়ী ফিরি। তাঁহার করমাসমত দুরূহ জটিল তথ্য বড় বড় বই হইতে সংগ্রহ করিয়া তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাবলীর ভিতর মালমশলা জোগাই। সময়বিশেষে প্রুফও দেখি, তাঁহার কাজ উপলক্ষে এখানে ওখানে ছোটাছুটি করি। তাঁহার সাহিত্য-সমিতির জন্য বাড়ী বাড়ী চাঁদা তুলি। নিরালা নিশীথে তাঁহার কাব্য আবৃত্তি করিয়া গগনের চন্দ্রের প্রতি চাহিয়া নিশ্বাস ফেলি। তাঁহার ছায়ার প্রতিচ্ছায়া হইয়া দিন কাটাইয়া ভাবি,—"স্বর্গ এইখানে।"

প্রতিদানে কিছু চাহিবার কথা মনে আসে নাই। চাহিবার সাহসও বোধহয় মনের ছিল না। শেলীর লেখায় খদ্যোতের চন্দ্রকামনা নিজের উপর আরোপ করিয়া বেশ নিশ্চিন্ত ছিলাম। চতুর্দ্দশ বৎসরে প্রথম আকর্ষণ আজ অলঙ্ঘ্য শক্তি হইয়াছে। সেই তরুণ যুবক পঞ্চশর রায় আজ প্রৌঢ়। তাঁহার ললাটের পার্শ্বে কাল চুলে শাদা ছোপ ধরিয়াছে। পুত্র-কন্যাপরিবৃত হইয়া ধর্ম্মপত্নীর সহিত মহানন্দে তিনি সংসার-ধর্ম্ম পালন করিতেছেন। কিন্তু তাহাতেও এ মোহান্ধ মনের কিছুমাত্র মোহবিচ্যুতি ঘটিল না।

দেড় বছর পরে সঙ্কোচের সহিত নিজের একটি লেখা তাঁহার হাতে দিলাম, —"এই লেখাটা একটু পড়ে দেখবেন ? যদি ভাল লাগে তাহ'লে আপনার কাগজে—"

উজ্জ্বল-ভাস্বর দৃষ্টি কিছুক্ষণ আমার প্রতি মেলিয়া পঞ্চশর নীরবে হস্ত প্রসারণ করিলেন। মনে হইল অপরাধ করিলাম। যাঁহার রচনাবলী আমার জীবন-গীতা হইয়া রহিয়াছে, তাঁহার আমার লেখার একটি অক্ষরও পড়িবার সময় হয়তো নাই। অপ্রতিভ স্বরে বলিলাম, "যদি আপনার সময় না থাকে—"

কি ভাবিয়া পঞ্চশর হাসিমুখে উত্তর দিলেন,—"সময় আমার কখনও থাকে না, তা তুমি জান লীলা। তবে তোমার লেখা দেখার সময় আমার করতেই হবে "

সহসা আপাদমস্তক পুলকে প্লাবিত হইয়া গেল। পঞ্চশরের কণ্ঠের কোমলতায় কিসের যেন সন্ধান খুঁজিতে মন ব্যগ্র হইয়া উঠিল। দুরাশার স্বপ্ন গাঁথিবার সূত্র তাঁহার সহসা কোমল কণ্ঠস্বর যেন আমার দিকে ছুঁড়িয়া দিল। জানি স্থান-কাল-পাত্র হিসাব-নিকাশ করিয়া পঞ্চশরের দুর্লভ বাগ্মী কণ্ঠের উত্থানপতন তিনি নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন। তবে আমি ? আমি তো সেই বহুপুরাতন লীলা, তাঁহার একজন অন্ধভক্ত, চিরদিনই যে অন্ধ থাকিয়া যাইবে। তাহার জন্য কোমলতার মুক্তাফল ছড়াইবার প্রয়োজন ছিল না। তবু এই আকস্মিক দানে আমার কাঙালী চিত্তছেঁড়া-কাঁথায় লক্ষ মুদ্রার স্বপ্ন তন্ময় হইয়া উঠিল।

সলজ্জদৃষ্টিতে পঞ্চশরের দিকে চাহিলাম। টেলিফোনের রিসিভার হস্তে পাকা ব্যবসাদারী চালে পঞ্চশর তাঁহার এক বিশিষ্ট বন্ধুর সহিত কথা আরম্ভ করিয়াছেন। কয়েকদিন পরেই পঞ্চশরের জয়ন্তী হইবে। সে জয়ন্তীর প্রধান উদ্যোক্তা পঞ্চশর নিজে। আমার রচনাটি টেবিলে পড়িয়া রহিল। আমি তাঁহার কাগজে নিজের নামের ছাপা অক্ষর দেখিবার লোভে লেখা দেই নাই। তিনি আমার রচনা নিজে পড়িবেন ইহাই আমার কাম্য ছিল।

নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া আসিলাম। অনেক সময়ে পাত্রপাত্রী নির্ব্বিশেষে পঞ্চশর অস্ত্রাদি প্রয়োগ করিয়া ধার দিয়া রাখেন। মনে ঈশপের নীতিকথাটি উদিত হইল,—"তোমার যাহা ক্রীড়া আমার তাহা মৃত্যু।"

ছয়মাস অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। পঞ্চশরের কাগজে লেখাটি দেখিলাম না, মুখেও তিনি কিছুই বলিলেন না। দীর্ঘ ব্যাকুল প্রতীক্ষার পরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

ললাটে চক্ষু তুলিয়া পঞ্চশর বলিলেন, "হ্যাঁ পড়েছি বৈ কি। বেশ হয়েছে। তোমার মধ্যে ভাব আছে, কিন্তু আর একটু সংযত হওয়া প্রয়োজন। দুই এক জায়গায় ভাববিলাস হয়ে গেছে। সেগুলো বদলে নিয়ে এস। দেখিয়ে দিচ্ছি " দেরাজ খুলিয়া পঞ্চশর বৃথা অন্বেষণ করিলেন,—"তাই তো *কোথায় গেল ? পড়ে রাখলাম সে দিন এখানেই তো ? পিনাকী ?"*

তাঁহার সেক্রেটারী—কাম—কর্ম্মচারী পিনাকী সবিনয়ে জানাইল,—"সেদিন তো আপনার দেখবার সময় হলো না। আপনি বেরিয়ে গেলেন। এখানেই পড়ে রইলো লেখাটা। হারিয়ে যাবে ভয়ে আমার দেরাজে তুলে রেখেছিলাম। সেখানেই আছে।"

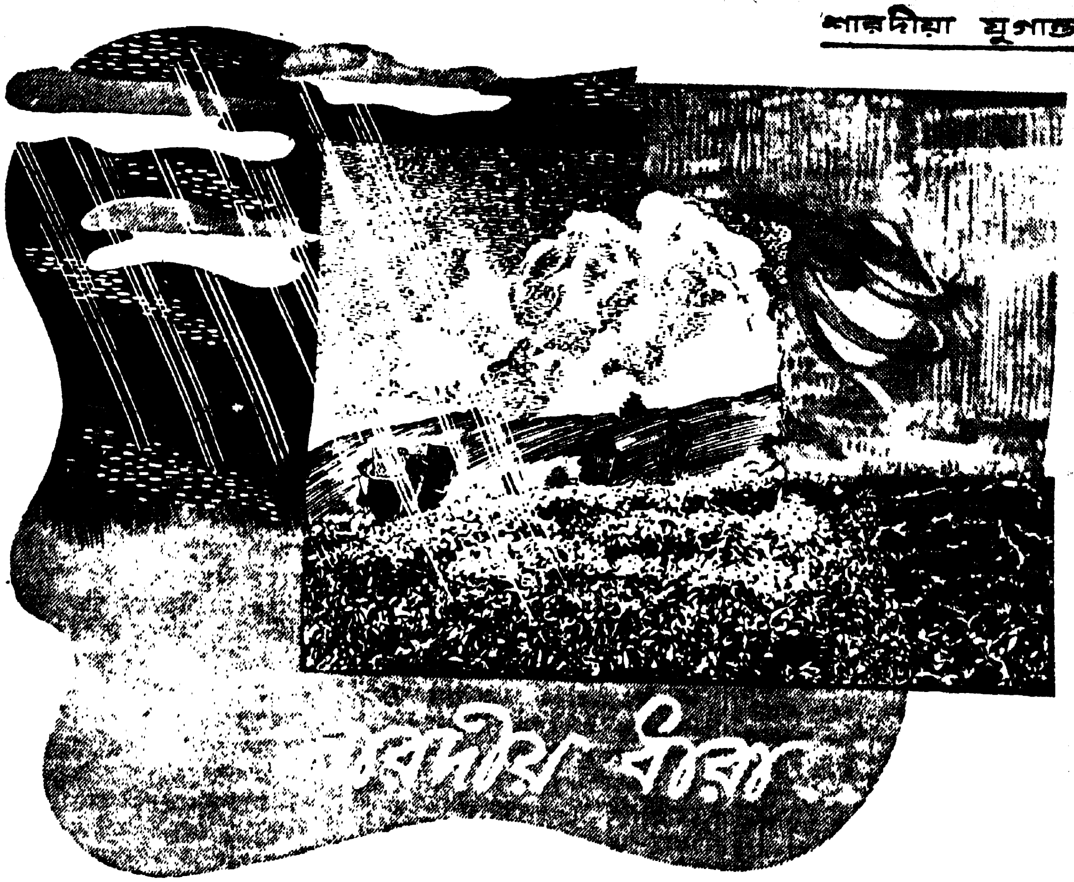
ব্যস্ত-ত্রস্তভাবে পঞ্চশর বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা। খুব করেছ। এখন এনে দাও তো সেটা। যত সব হয়েছে আমার !"

আমার দিকে সকৌতুক হাস্যের তীর প্রেরণ করিয়া পঞ্চশর কহিলেন—"রাগ করলে লীলা ? মিথ্যা আমি বলিনি। তোমাকে এতদিন দেখছি। তোমার লেখা না পড়েই আমি সমালোচনা করতে পারি সত্যি, এ কয়মাস এত ব্যস্ত ছিলাম। লক্ষ্মী মেয়ে, রাগ কোর না।"

তাঁহার উপরে রাগ করিবার অথবা তাঁহার বিচার করিবার ক্ষমতা তখনও আমার হয় নাই।

পঞ্চশরের ভক্তশিষ্যা এবং বান্ধবীর অভাব ছিল না। হত্যা যাহার বিলাস, সে প্রয়োজন না থাকিলেও অযথা তীরক্ষেপ করিয়া নিরীহ প্রাণীর জীবনের অবসান ঘটায়। সেই সমস্ত শবদেহে তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকে না ; পথপার্শ্বে তাহারা ধূলায় অবলুণ্ঠিত হয়। ইহা শিকারীর নিজ অস্ত্রাদি পরীক্ষা করিবার পক্ষেও প্রয়োজনীয়। ইহাতে তাহার আত্মবিশ্বাস বাড়ে। পঞ্চশরের দেখিতাম নারীমাত্রের প্রতি অবাধ শরক্ষেপ। তাহাদের তাঁহার প্রয়োজন নাই, তাহারা তাঁহার নিকট হ'তে কিছুমাত্র নিঃস্বার্থ প্রতিদান আশা করিতে পারে না। তবু কেবল অভ্যাসানুযায়ী পঞ্চশরের 'প্রেম করিবার' বাসন মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সাহিত্যিক হিসাবে সমাজের সকল স্তরের নারীর সম্পর্কে তিনি আসিতেন। প্রত্যেককে কোমল সুরে বাজাইয়া মধুসঙ্গীতে নিজের দক্ষতার প্রমাণ পাইয়া তবে তিনি শান্ত হইতেন। নাহলে তাঁহার আত্মবিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হইত, তিনি অশান্তি বোধ করিতেন।

[ইহার পর ২৪৩ পৃষ্ঠায়]



আবার অন্তর্নিহিত গোপন শ্রদ্ধা আমার কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিল।

জ্রকুঞ্চিত করিয়া ফাইল হইতে মুখ তুলিয়া পঞ্চশর রায় বলিলেন "কি চাই?"

অর্দ্ধস্ফুট স্বরে উত্তর দিলাম, "আমাদের পত্রিকার পূজোসংখ্যায় একটা লেখা—"

বাধা দিয়া তিনি সবেগে ব
উঠিলেন, "অসম্ভ । লেখার সময়
নেই।" দণ্ডায়মান অবস্থাতেই সভয়ে
লাম, "আমি—পার্টির লোক। সে
দণ্ডাপতিত্ব করতে যেয়ে আপনি এ
লেখা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি

"ও"—, চকিতে পঞ্চশরের কণ্ঠে
মনের সুর দেখা দিল,—"তাই

আসে ন
মনের কি
চক্রকা
বেশ
প্রথম

বাংলার সাম্প্রতিক চিত্রকলা

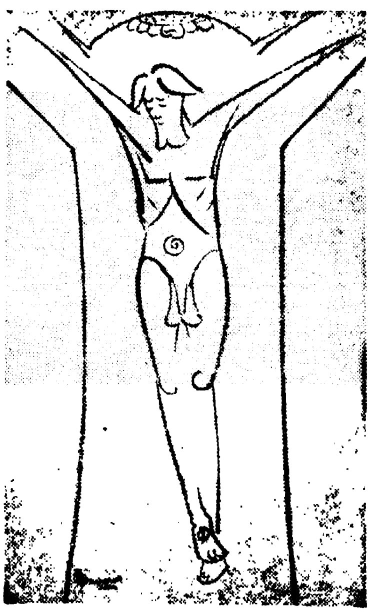
শ্রীকরালীকান্ত বিশ্বাস

যে দেশে মধ্যবিত্তের আর্থিক সঙ্গতি কম এবং যেখানে ধনিকের সংখ্যা নিতান্ত মুষ্টিমেয় সে দেশে চিত্রকলার প্রসার কতদূর হইতে পারে সে বিষয়ে প্রশ্ন করা চলে, কারণ, সর্ব্বপ্রকার চারুশিল্পের মধ্যে স্থাপত্য এবং চিত্রকলা নিঃসংশয়ে ধনিকের মুখাপেক্ষী—ধনিকেরাই প্রধানতঃ এই দুইটি শিল্পের পোষক। অবশ্য রাষ্ট্রের পোষকতা লাভ করিতে পারিলে ধনিকের দিকে চাহিতে হয় না। অর্থনৈতিক সংজ্ঞার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বাংলাদেশে যাহাদের মধ্যবিত্ত আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে তাহাদের সঙ্গতি এতই কম যে, তাহারা চিত্রকলা অথবা স্থাপত্য কোনটিরই যথার্থ পরিপোষক হইতে পারে নাই, তথাপি বাংলাদেশে চিত্রকলা যথেষ্ট অগ্রসর। তাহার কারণ বিগত দীর্ঘদিন ধরিয়া বাংলাদেশে প্রকৃত ক্ষমতাবান শিল্পীর অভাব হয় নাই; তাঁহারা নানারূপ প্রতিকূল অবস্থাতেও অন্তরের প্রকাশের প্রেরণায় শিল্পের সাধনা করিয়া গিয়াছেন। দেশের অবস্থা চিত্রকলা প্রসারের অনুকূল হইলে তাঁহাদের চেষ্টা আরও সার্থকতা লাভ করিত। দেশে সরকারী ও বে-সরকারী একাধিক প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়, বাংলা দেশের মত এমন বিরূপ প্রতিবেশেও যে চিত্রকলা বাঁচিয়া আছে তাহার অন্যতম কারণ এই শিক্ষায়তনগুলির নিরলস চেষ্টা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শিল্পীর অভাব নাই বটে কিন্তু তাঁহাদের সৃষ্টির সহিত দেশের অধিকাংশের যোগ কম, নাই বলিলেই চলে। পরিচয়ের অভাবই তাহার কারণ। দেশের অধিকাংশ লোকের চিত্রকলার সহিত পরিচয় সাময়িক পত্রিকাগুলির ছবি, ক্যালেণ্ডার ও বিজ্ঞাপনের মারফতে। কাজেই চিত্রকলা সম্বন্ধে রুচি না থাকিলে সাধারণকে বিশেষ দায়ী করা চলে না। সাধারণের জন্য স্থায়ী চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতে পারিলে শিল্পী ও দর্শক উভয়েরই সুবিধা। স্থায়ী চিত্র প্রদর্শনীই সাধারণের চিত্রানুরাগ বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করে। **আমাদের দেশের অধিকাংশই চিত্র সম্বন্ধে** একেবারে অজ্ঞ, তাহার অন্যতম কারণ এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের অভাব।

কোন্‌দিন রাষ্ট্র এই ব্যাপারে অগ্রণী হইবে, শিল্পীরা তাহার জন্য অপেক্ষা না করিয়া নিজেরাই সাময়িক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতেছেন। কিছুদিনের মধ্যে অনেকগুলি প্রদর্শনী হইয়া গেল। অভাব অভিযোগ চারিদিক হইতে দেশ ঘিরিয়া রাখিয়াছে—প্রাণ রাখিতেই এখন প্রাণান্ত। এমন অবস্থার মধ্যেও দেশে যে সাংস্কৃতিক বহুতর প্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে তাহার স্থায়ী কোনও ফল পাওয়া যাইবে কি না সে বিষয়ে গবেষণায় প্রবৃত্ত না হইয়াও বলা যায় যে ইহা শুভলক্ষণ। চিত্র প্রদর্শনী অথবা অনুরূপ অনুষ্ঠানকে সামাজিক কর্ম আখ্যা দেওয়া যায়—যাহা ব্যক্তির আত্মকেন্দ্রিক জীবনের ঊর্দ্ধে। সাম্প্রতিক এই প্রচেষ্টাগুলি হয়ত মুনাফাপুষ্ট ব্যবসায়ী ও বিদেশীদের পোষকতায় অনুপ্রাণিত হইতেছে; কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই সব সাময়িক পৃষ্ঠপোষকদের রুচির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিল্পীরা কোনও কাজ করিতেছেন না এবং সাময়িকভাবে হইলেও এই সব ব্যক্তিকেন্দ্রিক পরিধির বাহিরে তাঁহারা আসিতেছেন। কাজেই আশা করা যায় যে, তাহার ফল শুভ হইবে।

আমাদের দেশে সাধারণের সহিত চিত্রকলার যোগ অত্যন্ত কম, নাই বলিলেই চলে। আলপনা, গৃহপ্রাচীরে নানারূপ ছবি আঁকা, পট প্রভৃতি যে সব শিল্প সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, আজ তাহা প্রায় নিশ্চিহ্ন হইতে বসিয়াছে। সহরের নানা কোলাহল হইতে দূরে গ্রামে কোথাও এখনও এই জিনিষগুলির সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও উপরের উক্তির যাথার্থ্য অপ্রমাণিত হয় না। চিত্রকলা বলিতে এখানে যাহা বুঝাইতেছে তাহার সহিত সাধারণের যোগ সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় প্রায় অসম্ভব। প্রাচীন কালে সাধারণের অধিগম্য স্থানে চিত্র অঙ্কিত হইত। তাহাতে সেকালে এখনকার মত সাধারণে চিত্রকলার রসোপভোগ হইতে একেবারে বঞ্চিত হইত না। সাধারণের যে সকল স্থানে **অবাধ প্রবেশাধিকার সেখানে আধুনিক** কালে চিত্র অঙ্কিত হয় না বটে, কিন্তু সাধারণের সম্মুখে আর একভাবে চিত্রকলা উপস্থাপিত হয়। নানা উদ্দেশ্যে এখন প্রাচীরপত্র দেওয়া রীতি দাঁড়াইয়া গিয়াছে। যুদ্ধ উপলক্ষে প্রতিনিয়ত নূতন নূতন প্রাচীরপত্র দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বেও এই ধরণের কাজকে শিল্পীরা হেয় মনে করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমানে সামাজিক উদ্দেশ্য লইয়া চিত্রাঙ্কন নিন্দনীয় বলিয়া অনেকেই মনে করেন না এবং সেইজন্যই আজকাল এমন প্রাচীরপত্র চোখে পড়ে যাহা শিল্প হিসাবে নগণ্য নহে। সাধারণের জীবনের সহিত চিত্রকলার যে সব অঙ্গ যোগ রাখিতে পারে প্রাচীরপত্র তাহার অন্যতম। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা স্বীকার করিয়া লইলে ইহা মানিতেই হইবে যে, একমাত্র প্রাচীরপত্রই সাধারণের নিকটতম। কাজেই প্রাচীরপত্রের ব্যবসার দিকের কথা ভাবিয়া উহাকে অপাংক্তেয় করা অপেক্ষা উহার মহত্তর সামাজিক উদ্দেশ্য স্মরণ রাখা ভাল। এই দিক দিয়া বাংলাদেশের চিত্রকলা নিঃসংশয়ে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। পরিকল্পনা ও টেকনিকের নূতনত্বে ভোলা চট্টোপাধ্যায় প্রাচীরপত্র অঙ্কনে অগ্রণী। কিন্তু তাঁহার অঙ্কিত কোনও ছবির সহিত সাধারণের পরিচয় নাই বলিলেই চলে। ইদানীং সূর্য্য রায়ও কিছু কিছু পোষ্টার আঁকিতেছেন। এই পোষ্টারগুলি তাঁহার ক্ষমতার পরিচায়ক।

সাধারণের পরিচয় আছে চিত্রকলার এমন কোন বিষয়ের নাম করিতে হইলে পোষ্টারের পরেই বিজ্ঞাপনের উল্লেখ করিতে হয়, তারপরে বোধ হয় উঠে বইয়ের ছবির কথা। বিজ্ঞাপনের ছবি অনেকে আঁকিতেছেন বিজ্ঞাপন বলিয়া কুঞ্চিত নাসিকায় সেই



গোপাল ঘোষ আঁক

সব ছবির দিকে দৃষ্টি না দিলে শিল্পীর ক্ষমতা স্বীকার করিতেই হয়। অনেকে বিজ্ঞাপনের জন্য ছবি আঁকিতেছেন, সকলের নাম করা সম্ভব নয়; মোটের উপর বলা যাইতে পারে বিজ্ঞাপনের ছবির প্রকৃতিতে বহু পরিবর্তন আসিয়াছে। বইয়ের ছবি সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়। বইয়ের ছবি যাঁহারা আঁকিতেছেন তাঁদের মধ্যে সত্য রায়, অরবিন্দ দত্ত, শৈল চক্রবর্তী, অনিল ভট্টাচার্য্য, কালীকিঙ্কর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তথা-কথিত 'সুন্দর' ছবির পরিবর্তে জোরালো নিরলঙ্কার রেখা ও ডিজাইনের গুণনতে ইঁহারা বইয়ের ছবিতে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন।

সম্প্রতি 'আর্ট ইন ইনডাষ্ট্রি' প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। আর্ট ইন ইনডাষ্ট্রির উদ্দেশ্য আমাদের সর্ব্বদা ব্যবহারের জিনিষ-পত্রের একটু শ্রী সাধন করা। যান্ত্রিক উৎ-পাদনের ফলে ব্যবহার্য্য জিনিষগুলি ষ্ট্যাণ্ডার্ডাইজড হইয়া পড়িয়াছে। উহাদের শ্রীও প্রায় বিসর্জ্জিত। বাটা শূল কোম্পানীর চেষ্টাতে শিল্পীদের পরিকল্পনা পণ্যের উৎ-পাদনে প্রয়োগের চেষ্টা হইতেছে। পূর্ব্বে যখন যন্ত্রে কোনও কিছু প্রস্তুত হইত না তখন নির্ম্মাতা প্রত্যেকটি জিনিষ তৈয়ারী করিবার সময় আপনার শিল্পবুদ্ধি প্রয়োগ করিতে পারিত। যন্ত্র আসিয়া কর্ম্মীর শিল্পবুদ্ধি অপহরণ করিয়াছে, তাহার কর্ম্ম এখন জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় মাত্র। এখনও হাতে তৈয়ারী জিনিষের সৌন্দর্য্য স্বীকৃত। কিন্তু হাতে তৈয়ারী জিনিষ সহজলভ্য নহে বলিয়া তাহা ব্যবহার করিবার পরিবর্তে ঘর সাজানোর কাজে লাগে বেশী। মাদুর গৃহপ্রাচীরে 'হ্যাংগিং'এর বদলে ঝুলাইয়া রাখা হয়, পাহাড়ী চায়ের বাটি কিউরিও আলমারিতে স্থান পায়। ঘর সাজানও অবশ্যই শিল্পরুচির পরিচায়ক—কিন্তু সাজাইবার বিষয়গুলি সাধারণতঃ এই ধরণের,



রথীন মৈত্র অঙ্কিত



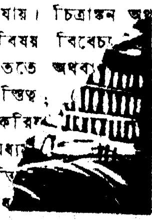
রথীন মৈত্র অঙ্কিত

এই অবস্থার পরিবর্তন হইতে পারে যদি শিল্পীদের ডিজাইনার করা যায়। সুখের বিষয় যে, শিল্পপতিদের এ দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। আর্ট ইন ইনডাষ্ট্রিতে প্রদর্শিত ছবিগুলিতে কিন্তু বিজ্ঞাপনের দিকটাই বেশী নজরে পড়িল। আর্ট ইন ইনডাষ্ট্রির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত জীবনকে শ্রীমণ্ডিত করিয়া তোলা। প্রদর্শিত ছবিগুলিতে দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিষ শাড়ী ব্যতীত আর কিছুই নাই। আর্ট ইন ইন্ডাষ্ট্রির কথা চিন্তা করিলে স্বতঃই যে সকল জিনিষের কথা মনে আসে, তাহার মধ্যে দুই একটি জিনিষ ছাড়া আর কিছু দেখা গেল না। তথাপি এই ধরণের প্রদর্শনী আশার উদ্রেক করে।

বাংলা দেশে সাম্প্রতিক চিত্রকলা প্রসঙ্গে প্রথমে এই বিষয়গুলির অবতারণা করা হইল তাহার কারণ এই যে, বিষয়গুলির সহিতই সাধারণের প্রত্যক্ষ যোগ। যে শিল্প অথবা সংস্কৃতির প্রয়াস সমগ্রভাবে দেশের সাধারণের কাছে পৌঁছিতে অক্ষম তাহার প্রাণশক্তি কম। সাধারণকে অবজ্ঞার চোখে দেখাই উচ্চতর শিল্পীমনের পরি-চায়ক বলিয়া বর্ত্তমানে গণ্য হয় না। বরং দেখা যাইতেছে যে সাধারণের মধ্যে যে সকল শিল্প প্রচলিত ছিল তাহা হইতে আধুনিকে চিত্রশিল্পীরা নূতন প্রেরণা লাভ করিতেছেন।

আধুনিক চিত্রকলার যে নূতনত্ব তাহা শুধু এই প্রাচীন চিত্রাঙ্কন রীতির পুনঃ প্রবর্ত্তনে নহে। আধুনিকেরা আদিম চিত্র-করদের অনুকারী নহে। আমাদের দেশের অথবা যে কোনও দেশের প্রাক-ঐতিহাসিক যুগের চিত্র অথবা ভাস্কর্য্য অনুকরণ করিয়া আধুনিক চিত্রকলা সার্থকতা খুঁজিতেছে এ কথা মনে করিলে আধুনিক চিত্রকলার প্রকৃতি বুঝিতে পারা যাইবে না। আদিম চিত্রকলার সহিত আধুনিকের সাদৃশ্য কেবলমাত্র এক দিক হইতে। অতীতে দৃশ্য-বস্তু শিল্পীমনে জারিত হইয়া সহজ রেখা ও মূল কয়েকটি বর্ণ-চিত্রে প্রকাশিত হইত। শিশুরা দৃশ্যবস্তু আঁকিতে গিয়া এ্যাকা-ডেমিক আর্টের সর্ব্বপ্রকার নিয়মবিরুদ্ধ উপায়ে রং ও রেখার ব্যবহারে দৃশ্যবস্তুর রূপ ও গতি প্রকাশ করে। আদিম শিল্পী ও অচেতন শিশু মনের এই দিকটির সহিত আধুনিক চিত্রকলার মাত্র সাদৃশ্য। রংয়ের ব্যবহার, ডিজাইনের সর্ব্বসম্মত নিয়ম আধুনিক শিল্পী অবজ্ঞা করিতে পারে না।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক হইতে ইউরোপীয় চিত্রকলায় যে পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে তাহার মূল কথা হইতেছে দৃশ্য-বস্তুর 'ফর্ম' রূপায়িত করা। দৃশ্যবস্তুর সহিত সাদৃশ্য রক্ষা করিবার যে রীতি উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে তাহার সহিত নব প্রবর্ত্তিত পোষ্ট ইম্প্রে-স্যানিষ্টদের অনুসৃত রীতির মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। আধুনিকেরা বলেন, ইমিটেশ্যান অথবা রিপ্রেজেন্টেশ্যানের সহিত চিত্রকলার কোনও যোগ নাই। আধুনিক চিত্রকলার গোড়ার কথাই এইটি। আধুনিক শিল্পীরা মনে করেন যে 'ফর্ম'ই চিত্রকলার একমাত্র প্রকাশ্য বিষয়। ক্লাইভ বেল যাহাকে 'সিগনি-ফিক্যাণ্ট ফর্ম' আখ্যা দিয়াছেন, আধুনি-কেরা তাহাই বর্ণ ও রেখায় প্রকাশ করিতে সচেষ্ট। কোনও একটি বস্তু শিল্পীর সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল মনে একটি বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। দৃশ্যবস্তু অনুভূতিতে জারিত হইয়া সম্পূর্ণ নূতন রূপ লইয়া চিত্রে প্রকাশ পায়। আরও একটু সরলভাবে বিষয়টি এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। চিত্রাঙ্কন অথবা মূর্ত্তি নির্ম্মাণে তিনটি বিষয় বিবেচ্য বস্তু—বাহ্যজগতে, স্মৃতিতে অথবা কল্পনায় এই বস্তুর অস্তিত্ব; মন—বস্তুকে অবলম্বন করিয়া যে অভিজ্ঞতা; (৩) মধ্য প্রস্তরে শিল্পীর অনুভূতি বস্তুর প্রকাশ এই মাধ



(ইহার পর স্থ্যীন্দ্র রায় চৌধুরী

কীট পতঙ্গের বিচিত্র শিকার কৌশল

[৮৪ পৃষ্ঠার পর]

জালে পড়িবামাত্রই আঠায় আটকাইয়া যায়। জালের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য শিকার প্রাণপণ চেষ্টা করিতে সুরু করে। এই সময় মাকড়সাটা ছুটিয়া গিয়া ফিতার মত চওড়া সুতার ফালি বাহির করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে জড়াইয়া ফেলে এবং পুটলির মত করিয়া জালের মধ্যস্থলে ঝুলাইয়া রাখে। তারপর অবসর মত শিকারের রস-রক্ত চুষিয়া খায়। লেবরেটরীতে প্রতিপালন করিবার সময় আমাদের দেশের সাদা-কালোয় বিচিত্রিত বড় বড় তাঁতি-বৌ মাকড়সাগুলিকে টিকটিকি, গিরগিটি এবং ছোট ছোট গেছো-ব্যাং প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীকে জালে আটকাইয়া শিকার করিতে দেখিয়াছি। আমাদের দেশের স্বর্ণমণি-লঙ্কার মত আকৃতি বিশিষ্ট কালো অথবা হলুদ ও রূপালি রঙে বিচিত্রিত বড় বড় মাকড়সাগুলি সময় সময় ছোট ছোট পাখীও শিকার করিয়া থাকে।

আমাদের দেশের একরকমের ছোট ছোট কালো রঙের মাকড়সা অদ্ভুত উপায়ে শিকার ধরিয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারা কোন রকমের জাল তৈয়ারী করে না। ইটের পাঁজায় বা ভাঙা দেয়ালের ফাটলের মুখে এলো-মেলোভাবে খানিকটা সুতা ছড়াইয়া রাখে মাত্র। ঐ সুতাগুলির সহিত সরু একগাছি সুতার যোগ রাখিয়া মাকড়সাটা ফাটলের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া থাকে। নিশ্চিন্ত মনে চলাফেরা করিবার সময় কীট-পতঙ্গেরা সুতার সংস্পর্শে আসিবামাত্রই আটকা পড়িয়া যায়। টের পাইবামাত্রই মাকড়সাটা গুপ্ত স্থান হইতে ছুটিয়া আসিয়া শিকারটার উপর ঠিক থুথুর মত কতকগুলি জড়ানো সুতা নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া ফেলে। শিকারের তখন আর মুক্ত হইবার কোনই আশা থাকে না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর মাকড়সা সুতার পুটলিতে আবদ্ধ জন্তু শিকারটাকে টানিয়া ফাটলের মধ্যে লইয়া যায় এবং অবসর মত তাহার রস-রক্ত চুষিয়া খায়।

আমাদের দেশের খাল, বিল পুকুরের জলের উপর কালো এবং ধূসর রঙের এক জাতীয় মাকড়সাকে সারাদিন ঘোরা ফেরা করিতে দেখা যায়। জলের উপরে ভাসমান তেচোখা মাছগুলিকে সুবিধা পাইলেই ইহারা ধরিয়া খায়। দমদমের একটা এঁদো পুকুরে সর্বপ্রথম এই মাকড়সার মৎস্য শিকার প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ হইয়াছিল তারপর অনেকদিন পর্যন্ত ইহাদিগকে লেবরেটরীর সুবৃহৎ কাচের চৌবাচ্চায় পুষিয়া ইহাদের সকল বিষয় অবগত হইতে পারিয়াছিলাম শালুক, পানা বা অন্যান্য ঘাস-পাতার ধারে এই মাকড়সাগুলি শিকারী বিড়ালের মত ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে। মাছগুলিও সাধারণতঃ ওই সকল ঘাস-পাতার আড়ালে বা তাহাদের কাছাকাছিই ঘুরিয়া বেড়ায়। পাতার ধারে নিশ্চলভাবে উপবিষ্ট কোন একটা মাকড়সার নিকটবর্তী হইবামাত্রই অব্যর্থ লক্ষ্যে সে কোন একটা মাছের ঘাড়ে ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং সাঁড়াশীর মত বিষ-দাঁত বিদ্ধ করিয়া তাহাকে পাতার উপর টানিয়া তোলে। তারপর অনেকক্ষণ ধরিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে উদরস্থ করে। এই জাতীয় স্ত্রী-মাকড়সারা ডিমের থলি সঙ্গে লইয়াই জলের উপর ঘোরাফেরা করে এবং ডিম ফুটিবার পর বাচ্চাগুলিও মায়ের পিঠের উপর বসিয়া থাকে। কোন কারণে ভয় পাইলে স্ত্রী-মাকড়সাটা বাচ্চাগুলিকে লইয়াই ১৫-২০ মিনিট পর্যন্ত জলের নীচে ডুবিয়া থাকিতে পারে।

প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর ঘরের দেয়ালে বা মেঝেতে প্রায় সিকি ইঞ্চি লম্বা সাদা-কালো ডোরা কাটা এক রকম মাকড়সা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের শিকার ধরিবার পদ্ধতি ঠিক শিকারী বিড়ালের মত। প্রধানতঃ এই মাকড়সারা মাছি শিকার করিয়াই জীবিকা নির্বাহ করে। কোথাও একটা মাছিকে বসিয়া থাকিতে দেখিলেই মাকড়সা দূর হইতে এক রকম লাফাইতে লাফাইতেই তার নিকটে উপস্থিত হয়। অনেকটা কাছে আসিবার পর গতিবেগ কমাইয়া দেয় এবং পা টিপিয়া অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে থাকে। তিন চার ইঞ্চি ব্যবধানে থাকিতেই মাছিটার ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়ে। যদি দেখে মাছিটা তাহার দিকেই মুখ করিয়া আছে, তবে পাশের দিকে ঘুরিয়া তাহার পিছনে উপস্থিত হয় এবং সেখান হইতেই তাহাকে আক্রমণ করে ইহাদের বাচ্চাগুলি কিন্তু রাহাজানি করিয়াই খাদ্য সংগ্রহ করে। ইহারা পিপীলিকার লম্বা লাইনের ধারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। সুবিধা বুঝিবা-মাত্রই অকস্মাৎ লাফাইয়া পড়িয়া পিপী-লিকার মুখ হইতে খাবার ছিনাইয়া লইয়া চম্পট দেয় আমাদের দেশের কাঁকড়া-মাকড়সার শিকার-কৌশলও কম বৈচিত্র্যপূর্ণ নহে। ইহারাও লতা, পাতা, ফল, ফুলের সহিত দেহের রং মিলাইয়া ঠিক গঙ্গা-ফড়িঙের মতই প্রতারণার আশ্রয়ে শিকার ধরিয়া থাকে। তাছাড়া পিপড়ে-মাকড়সাদের শিকার প্রণালীও অতীব কৌতুহলোদ্দীপক। ইহারা পিপীলিকার ছদ্মবেশে পিপীলিকার দলে মিশিয়া তাহাদিগকেই শিকার করিয়া থাকে। মোটের উপর একমাত্র কীট-পতঙ্গের মধ্যে অনুসন্ধান করিলেও এমন আরও অনেক কৌশলের পরিচয় পাওয়া যাইবে, যাহা মনুষ্য উদ্ভাবিত কৌশল অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে।

গণৎকার

দিলীপ দাশগুপ্ত

জোয়ার আসেনি আজো : যাত্রীদল কেন
অসহায় ?
মধুর লগনে বাঁশি দিকে দিকে বাজে নাকি
কবির কথায়
শ্যামল মৃত্তিকা ভরি। উচ্ছ্বসিত গগনের ডাক
ফাগুনেরে ভুলায়ে কি জাগালোনা
দুরন্ত বৈশাখ ?
সাগরের স্বাদ নিয়ে নভোতলে তারার স্বপন
অনেকে দেখেছে জানি। মধুমাসে
লাস্যময়ী বন
যখন কাঁদিয়া মরে, শুনেছ কি
আহ্বান তাহার ?
ক্রোড় হতে বিলাসী সেতার
যখন সুরের সুখে ঝংকারিয়া ওঠে হর্ম্যতলে
নায়িকার দুটি আঁখি ভরে কভু
উঠেছে কি জলে,
জলে যার শোণিতের স্বাদ ?
সে শোণিত ব্যঙ্গ করে দূরে জানি
ঘুচায়ে আহ্লাদ

পূর্ণিমার রাত কোথা ? অমাবস্যা
ভরেছে জীবনে।
কোটি প্রাণ বিনিময়ে তণ্ডুল-তস্কর একজনে
বাঁচাবার অধিকার কে দিয়েছে,
ভাবো একবার ;
পদতলে বিশ্বের সম্ভার
নিমেষে বিলায়ে দিয়ে দুর্ব্বার গর্ব্বের স্রোতে
যাবে যাত্রিদল পুলক-চঞ্চল।
সেই বিশ্ব এক হ'য়ে গা'বে যবে
সঙ্গীত বহর—
যাত্রিদল, শোনো শোনো শতাব্দীতে
বাজে তারি সুর



সহরতলী — পৃথ্বীশ রায় চৌধুরী

বাংলার সাম্প্রতিক চিত্রকলা

[৯৭ পৃষ্ঠার পর]

প্রকাশ করিতে প্রধান সহায়ক। বাহ্যজগতের দৃশ্যবস্তু ছবির আরম্ভ। মনোরম দৃশ্যবস্তুর পরিবর্তে প্রাক আধুনিক চিত্রকলায় সাধারণ বিষয় অবলম্বনে চিত্র অঙ্কিত হইত। আবার অতি-আধুনিকেরা বাহ্যবস্তু একেবারে বর্জ্জন করিয়া বিষয় নিরপেক্ষ 'ফর্মের' চিত্রাঙ্কন করিতেছেন। কিন্তু দৃশ্যমান জগতের বস্তুপুঞ্জের কোনও কিছু অবলম্বন না করিলে 'ফর্মের' কোনও সার্থক অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কাজেই চিত্রকলা বস্তু পরিত্যাগ করিতে পারে না ;—কিন্তু তাই বলিয়া চিত্রকলা যে স্বভাবানুগ হইবে এমন কোনও কথা নাই। দৃশ্যমান জগতের বস্তুর অন্তর্নিহিত একটি 'ফর্মের' গুণ আছে যাহা আপাতদৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। উদাহরণ স্বরূপ একটি পেচকের কথা ভাবা যাক। পেচকের পেচকমুখত্ব ছাড়াও আরও কয়েকটি গুণ আছে, গম্ভীর নিঃশব্দতা তাহার অন্যতম। আধুনিক কোনও শিল্পী পেচকের ছবি আঁকিতে গিয়া এই রকম একটি 'ফর্মের' বৈশিষ্ট্য অঙ্কন করিয়া থাকেন। আধুনিক চিত্রকলার এই 'ফর্ম'তত্ত্ব সম্পূর্ণ বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয় নহে। ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে গেলে বহু উদাহরণ ও আলোচনার প্রয়োজন, —কিন্তু তৎসত্ত্বেও তত্ত্বটি 'করামলকবৎ' হৃদয়ঙ্গম হয় না। শেল্ডন চেনি আধুনিক চিত্রকলার একজন প্রকাণ্ড সমর্থক, তিনি বলেন :—Art strikes straight to some seperate aesthetic inner being, something as close to the spirit of man as it is possible to penetrate. To me this seems as fundamental an approach to the spirit to disembodied spirituality, as those other two unexplainable highroad love and religious experience……

কাজেই দেখা যাইতেছে যে আধুনিক চিত্রকলার সার্থকতা শিল্পী ও দর্শকের সৌন্দর্য্যানুভূতির উপর নির্ভর করে।

বাংলা দেশে আধুনিক চিত্রকলার প্রবর্ত্তনে সর্ব্বপ্রথম অগ্রণী হয় 'রেবেল আর্ট ক্লাব',—শিল্পী ভোলা চট্টোপাধ্যায় ছিলেন তাহার প্রধানতম উদ্যোক্তা। কিন্তু বিদ্রোহীদের আন্দোলন খুব বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। তথাপি তাহাদের চেষ্টা যে ব্যর্থ হয় নাই তাহার সাক্ষ্য সাম্প্রতিক চিত্রপ্রদর্শনীগুলি। এ্যাকাডেমির চিরাচরিত রীতির পাশাপাশি আমাদের দেশে নূতন পরীক্ষা বরাবরই চলিয়া আসিয়াছে। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত ছবিগুলি এ্যাকাডেমিক রীতিসম্মত নহে। যামিনী রায়ও নূতনত্ব আমদানি করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে কোনও একটি ষ্টাইল প্রবর্তিত হইলে তাহা অচিরেই ষ্টাইলাইজড হইয়া পড়ে। যামিনী রায়ের অনুসৃত রীতিতে নূতন পথের সন্ধান ছিল না, ছিল নূতন পথ অবলম্বনের অভয়বাণী, বাংলা দেশে যে আধুনিক চিত্রকলার প্রবর্ত্তন সম্প্রতি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে তাহার সহিত যামিনী রায়ের এইটুকুই মাত্র সম্পর্ক। মোটা তুলির টানা দাগ দেখিয়া তাহাতে যামিনী রায়ের প্রভাব আবিষ্কার করিতে যাওয়া ভুল।

এই প্রবন্ধে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন শিল্পীদের আলোচনা স্বেচ্ছায় বর্জ্জন করা হইল। কারণ তাঁহাদের গুণাগুণ এখন স্বীকৃত। স্বতন্ত্রভাবে অথবা সমগ্রভাবে তাঁহাদের আলোচনা বহু হইয়াছে। আরও হয়ত হইবে। কিন্তু সম্প্রতি যে সকল শিল্পীর নূতন প্রচেষ্টা প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার আলোচনা বিশেষ হয় নাই। আধুনিক চিত্রকলা সকলের ভাল লাগুক আর নাই লাগুক ইহা সাময়িক হুজুক নহে। কাজেই আধুনিক চিত্রকলা একটু বুঝিবার চেষ্টা করা দোষের নহে।

এই প্রবন্ধে যে কয়েকটি চিত্র মুদ্রিত করা গেল প্রথম দর্শনেই উহার স্বাতন্ত্র্য বুঝিতে পারা যায়। আমাদের দেশের সদ্য অতীত চিত্রকলার সহিত এই চিত্রগুলির মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। প্রথমতঃ ছবিগুলির মূর্তি অসুন্দর, শিল্পীরা যেন ইচ্ছা করিয়াই ছবিগুলিতে ফিনিশ দেবার চেষ্টা করেন নাই। রেখা জোরালো ও সতেজ। মূল ছবিগুলিতে রংয়েরও যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। এই ছবিগুলির অঙ্কনরীতিতে পোষ্ট ইম্‌প্রেশনিষ্ট পাশ্চাত্য বহু শিল্পীর সাধনালব্ধ বিষয় স্থান পাইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া এই ছবিগুলিকে নিছক পাশ্চাত্য অনুকরণ মনে করিবার কারণ নাই। গোগাঁ, মাতিস, পিকাসো প্রভৃতি চিত্রকলার প্রকৃত ধর্ম্ম কি তাহা অনুভব করিয়া তাহা চিত্রে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের দেশের এই তরুণ শিল্পীরা তাঁহাদের অঙ্কিত চিত্র হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াছেন, বিশেষ করিয়া কাহাকেও অনুকরণ করেন নাই। দেশজ শিল্পরীতি অনুসরণ করা প্রত্যেক শিল্পীরই কর্ত্তব্য বলিয়া অনেকে মনে করেন। জাতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য শিল্পীরা যদি না রক্ষা করেন তবে জাতীয় সংস্কৃতি লোপ পাইবার সম্ভাবনা। কাজেই যে শিল্প জাতীয় ট্রাডিশন সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া অপর কিছু অনুসরণ করে তাহার মহত্ত্ব স্বীকার করা যায় না। এই তরুণ শিল্পীদের চিত্রগুলি একটু অভিনিবেশ সহকারে দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, জাতীয় ট্রাডিশন তাঁহারা অস্বীকার করেন নাই। জাতীয় ট্রাডিশন অনুযায়ী আমাদের দেশের ছবির অবয়ব 'ফ্ল্যাট' হওয়া উচিত। মুদ্রিত প্রায় প্রত্যেকটি ছবিতে এই Flatness রক্ষা করা হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে যাহাকে Flat বলিয়া মনে হইবে তাহার মধ্যে দৃশ্যবস্তুর গুরুত্ব, গতি, ছন্দ প্রভৃতি অপূর্ব্ব কৌশলে ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন। পুনরাবৃত্তিতে দেশজ শিল্প রীতি প্রাণহীন হইয়া পড়িবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু আমাদের আধুনিক পন্থী শিল্পীরা দেশজ রীতিতে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

আধুনিক চিত্রকলার পাশ্চাত্য অনেক থিওরিষ্ট চিত্রকে বিষয় নিরপেক্ষ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু শিল্পের একটি সামাজিক মূল্য রহিয়াছে। কাজেই সমসাময়িক সমাজকে বর্জ্জন করিয়া যে শিল্প রচনার প্রয়াস তাহা এ্যাবষ্ট্রাক্ট চিত্রের মতই কিম্ভূত। সুখের বিষয় আমাদের আধুনিক শিল্পীরা আপনাদের সামাজিক কর্ত্তব্যের কথা বিস্মৃত হন নাই। অধিকাংশের ছবিতে একটি সচেতন সমাজ মনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস্‌, ক্যালকাটা গ্রুপ, এ্যান্টিফ্যাসিষ্ট শিল্পী ও লেখক সঙ্ঘ প্রত্যেক প্রদর্শনীতে এমন বহু ছবি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যাহাতে সমসাময়িক সমাজ সম্বন্ধে শিল্পীর সচেতনতা বেশ স্পষ্ট।

জয়নুল আবেদিন, সফিউদ্দীন আহমেদ, আদিনাথ মুখার্জ্জী, দিলীপ দাশগুপ্ত, মাখন দত্তগুপ্ত, কানওয়াল কৃষ্ণ ও বংশীলাল চন্দ্রগুপ্ত—এই কয়েকজন শিল্পীর অঙ্কিত ছবি এ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টসের প্রদর্শনীতে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইঁহারা সকলেই অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত। কিন্তু ইঁহাদের অঙ্কিত ছবি আশার সঞ্চার করে। জয়নুল আবেদিন সমসাময়িক জীবনের বহু ছবি আঁকিয়াছেন, সফিউদ্দীনের Still Life, আদিনাথ মুখার্জ্জীর সরাইখানা, দিলীপ দাশগুপ্তের পারষ্টেল পোর্ট্রেট, মাখন দত্তগুপ্তের প্রধানতঃ লাইনে আঁকা ছবি, কানওয়াল কৃষ্ণের প্রাকৃতিক দৃশ্য ও বংশীলালের আধুনিক ফর্মপ্রাধান্যের সহিত প্রাচ্য অলঙ্কার পদ্ধতির সমাবেশ সত্যই ভাল লাগিয়াছে। ইঁহাদের প্রত্যেকের আঁকা ছবি স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিতে না পারিলে অন্যায় হয়, কিন্তু সেরূপ আলোচনার পথে অন্তরায় যথেষ্ট।

চিত্রে আধুনিকতার দাবী লইয়াই ক্যালকাটা গ্রুপের উৎপত্তি বলিয়া যেন মনে হয়। প্রদর্শনীতে এমন একখানি ছবিও ছিল না যাহার অঙ্কনরীতিকে প্রাচীন আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। গোপাল ঘোষের তুলির টানে আঁকা ছবি রেখাগুলি জোরালো ও জীবন্ত। নীরদ মজুমদারের আঁকা ছবিতে রেখা ও বর্ণের সাহায্যে ফর্ম এবং কম্পোজিশনের অভিনবত্ব। রথীন মৈত্রেরও ফর্ম ও কম্পোজিশনের দিকে দৃষ্টি, তবে রংয়ের প্রয়োগে তিনি নীরদ মজুমদার অপেক্ষা দক্ষ। প্রাণকৃষ্ণ পাল যেন একটু এ্যাবষ্ট্রাক্ট ঘেঁষা। তবে তাঁহার অঙ্কিত চিত্রে একেবারে খাঁটি দেশীয় বিষয়ও আছে। সুভো ঠাকুরের আনন্দ উজ্জ্বল বর্ণের প্রয়োগে এবং জ্যামিতিক ডিজাইনের কম্পোজিশনে।

[ইহার পর ১০৩ পৃষ্ঠায়]

এক বৎসরের সাহিত্য

[৯০ পৃষ্ঠার পর]

তাঁর লেখা অনেকটা সুবোধ্য এবং উচ্চ-মস্তিষ্ক ছাড়া সাধারণ জ্ঞানকেও স্পর্শ করছে, এইটিই সুসংবাদ। অমিয় চক্রবর্তীর নতুন বই 'দূরযানী'। এ বইয়ে তাঁর স্বকীয় কবি-প্রতিভা ও ছন্দোপরীক্ষা অক্ষুণ্ণ আছে। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'মধু বংশীর গলি' এবং 'নবজীবনের গান' দু'টি অর্থপূর্ণ ও পরীক্ষামূলক কাব্য-নাট্য। এ দুটি রচনা মৌলিক এবং নতুন ধরণের কাব্যের সূচনা করে। অরুণ মিত্রের 'প্রান্তরেখা' আরেকখানি উল্লেখ-যোগ্য কবিতার বই। কিন্তু অবশিষ্ট কবিদের তেমন কিছু সার্থক রচনা দৃষ্টিগোচর হয় নি। কলকাতায়, ঢাকায় ও শ্রীহট্টে তরুণ কবিদের অনেক রচনা আজকাল প্রকাশিত হচ্ছে বটে, কিন্তু তাদের সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়।

বাংলা সাহিত্যে অনুবাদের ক্ষেত্র ক্রমশঃই প্রসারিত হচ্ছে। বিদেশী ভাষায় লেখা অনেক নাম-করা বই তর্জ্জমা করা হচ্ছে এটা সত্যিই সুখের বিষয়। কারণ অনুবাদের সাহায্যেই ভাষার ও আদর্শের পুষ্টিসাধন হয়ে থাকে। বুদ্ধদেব বসুর 'হাউই', পবিত্র গাঙ্গুলীর 'রামধনু', মহেন্দ্র রায়ের 'ম্যাক্সিম গর্কি', খগেন্দ্র মিত্রের 'আমার ছেলেবেলা' এবং ভবানী মুখোপাধ্যায়ের 'ওয়ান্ ওয়ার্লড' উল্লেখযোগ্য অনুবাদ। রুশ ও য়ুরোপীয় সাহিত্যের সমসাময়িক উপন্যাস তর্জ্জমার দিকেই পাঠক ও লেখকদের আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, শক্তিশালী লেখকরা তর্জ্জমার আসরে নামলে আমরা বাংলা ভাষায় অব্যবসায়িক কিন্তু দায়িত্বপূর্ণ কাজের নমুনা পেতে পারি।

বাঙলার বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকাগুলি গতানুগতিকভাবে চলেছে। কেবল শারদীয়া সংখ্যা অথবা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের সময়ে যা কিছু সাময়িক উত্তেজনা অথবা আলোচনা। কাগজগুলির আয়তন কমেছে, বৈশিষ্ট্য বাড়েনি। বর্ত্তমানে কাগজের সঙ্কট এবং ছাপাখানার অনির্ভরতা এবং প্রকাশকদের অনিশ্চিত মনোভাব—কাজেই এর চেয়ে ভালো অবস্থা আশা করা যায় না। তবে সাহিত্যের ওপর একটা রাজনীতিক ছাপ পড়েছে—এটা প্রত্যক্ষ দেখা যাচ্ছে। একদিকে ফ্যাসিষ্ট বিরোধী লেখক-সঙ্ঘ, অপরদিকে কংগ্রেস-সাহিত্য সেবীর দল। আদর্শের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেয়ে দলীয় মনোভাব অনেক-স্থলেই প্রকট হয়ে উঠছে। আশা করা যায়, আগামী বৎসরে বাংলা সাহিত্যে আরো উন্নতি লক্ষ্য করা যাবে, অবশ্য যদি দেশের অবস্থা ভালোর দিকে যায়। এই সাধু ইচ্ছা ছাড়া আর কি উপায়?

বাংলার সাম্প্রতিক চিত্রকলা

[১০০ পৃষ্ঠার পর]

পারস্যের গালিচার মত উজ্জ্বল বর্ণে ও জ্যামিতিক নক্সায় আঁকা রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি কৌতূহল উদ্দীপ্ত করে।

ফ্যাসী বিরোধী শিল্পী ও লেখক সঙ্ঘের উদ্যোগে 'আমার দেশ' প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই ধরণের চেষ্টা সমর্থনযোগ্য। তবে সমগ্র প্রদর্শনী দেখিয়া মনে হইয়াছে প্রায় সব শিল্পীরই পূর্ব্বেকার অঙ্কিত ছবি লইয়াই প্রদর্শনী, 'আমার দেশ'কে রূপ দিবার জন্য কোনও শিল্পী বিশেষ করিয়া কোনও ছবি আঁকেন নাই। ফলে প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়াছে। ছবি বাছাইয়ের কাজও বিশেষ প্রশংসনীয় নহে। দেশের রাজনৈতিক অচল অবস্থা দূর করিবার উপায় হিসাবে কম্যুনিষ্ট পার্টির মতবাদ অবলম্বন করিয়া মণি রায়ের আঁকা গান্ধী-জিন্নার ছবিটিই বোধ হয় এই প্রদর্শনীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

উপরে যে সকল শিল্পীদের উল্লেখ করা হইল তাঁহাদের কেহই খ্যাতনামা নহেন। তাঁহাদের অঙ্কনরীতি এখন পরীক্ষামূলক স্তর পার হয় নাই, তথাপি নূতন পথ অবলম্বন করিয়া বাংলা দেশের চিত্রকলায় তাঁহারা যে নবীনত্ব আনিয়াছেন তাহার জন্যই এই শিল্পীদের সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা গেল। *

* প্রবন্ধটির অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে লেখক সচেতন।



ও মশাই, আমাদের খাঁচ ... য় দে ... র্ষ বেরিয়ে গেছে, ওটাকে দেখেছেন ...


নূতনের
স্বপন দেখি
বারে বারে
শরতের ঝকঝকে নীল
আকাশ, আর তারই গায়ে ভেসে
বেড়ানো টুকরো টুকরো সাদা মেঘ
মানুষের মনের সব গাম্ভীর্য্যকে
ওদেরই সঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।
প্রকৃতির চোখ জুড়ানো সবুজ শোভা
মানুষের চোখে স্বপ্নে ভরা সুর্মা লেপে
এক অতীন্দ্রিয় লোকে আকর্ষণ করে।
এমনি দিনগুলিতে নারীর রূপকে
সম্পূর্ণ করে তোলো পি, এম, বাকচীর
রূপ প্রসাধনে।
পি, এম, বাকচি এণ্ড কোং, লিঃ কলিকাতা



চক্রবৎ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সরকার সেলাম—

বন্দীরা উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে। এটা নিয়ম—শান্তি আর শৃঙ্খলার অপরিহার্য অনুশাসন। অবহেলা করলেই ওজন মাফিক পদাঘাত। উঠে দাঁড়াতে এতটুকু দেরী হলে মুখ থুবড়ানো একটা আছাড় খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তার।

সরকার সেলাম—

হাতের পর হাত উঠে যাচ্ছে কপালে। যত বিদ্রোহীই হও, যত বাঁকাই হোক ঘাড়—এখানে এলে সব সিধে হয়ে যাবে। নৈতিক আরোগ্যশালায় মানুষের যাবতীয় ব্যাধির চিকিৎসা করা হয়। কেউ বাদ নেই রোগীর দলে। চোর, পকেটমার, লম্পট, আত্মহত্যা-কামী, হত্যাকারী, বিনা টিকিটে যাত্রী, ভারত রক্ষা বিধান অমান্যে অপরাধী এবং দেশপ্রেমিক। ব্যাধিগুলি মানসিক হলেও শলাকা প্রয়োগটাই একটু বেশী। পুন্নাম, রৌরব এবং কুম্ভীপাকের ইহলৌকিক সংস্করণ। ইংরেজের জেলখানা থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীটা কেন যে স্বর্গপুরী হয়ে যায় না এইটেই আশ্চর্য।

এক—দুই—তিন—চার—

গুণতি করে চলেছে ওয়ার্ডার। পাঁচ—ছয়—সাত—

কিন্তু আঠারো? আঠারো নম্বর?

আঠারো নম্বর নেই—কোথাও নেই। চক্ষে বিশ্বাস করা যায় না—ব্যাপারটা স্বপ্ন হলেই ভালো হত। কিন্তু বিশ্বাস না করে উপায় নেই এবং এমন একটা ভয়ানক দুঃস্বপ্ন স্বপ্নই হতে পারে না কখনো। ওয়ার্ডারের

মাথায় নীল আকাশ ফুঁড়ে বাজ মেঘে এল কড়াক্কর শব্দে।

ঢন্—ঢন্—ঢন্—

আর্ত চীৎকার করে পাগলা ঘণ্টি বেজে উঠল—সমস্ত জেলখানা সমুদ্রের মতো মথিত হয়ে উঠল মুহূর্তে। সসাগরা পৃথিবী—অর্থাৎ এস্-ডি-ও থেকে টাউন দারোগা পর্যন্ত—এক সুরে আর্তনাদ করে উঠল: আঠারো নম্বর ?

কিন্তু কোথায় কে!

আঠারো নম্বর তখন একটা মরা-নদীর পাশে পাশে গা-ঢাকা দিয়ে হেঁটে চলেছে। দু'পাশে ঘন বাঁশ আর আমের ছায়া—আসন্ন সন্ধ্যায় অমাবস্যা রাত্রির মতো সে ছায়া কালো হয়ে গেছে। অন্ধকারে অন্য মানুষ তো দূরের কথা, নিজেকেই সে দেখতে পাচ্ছে না। তবু থেকে থেকে শঙ্কিত সংশয়ে সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠছে তার, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছে।

কেউ কি আসছে ? কেউ কি দেখতে পাচ্ছে ?

চমকে থেমে দাঁড়ায় আঠারো নম্বর। হৃদপিণ্ডে রক্ত যেন উছলে ওঠে—মনে হয় বুকের স্পন্দনটা এত জোরে বাজছে যে, দু' মাইল দূর থেকেও লোকে তা শুনতে পাবে। পায়ের তলায় শুকনো পাতাগুলো এমন ভাবে মচ মচ শব্দ করে কেন ? নিজেই কি সে নিজের শত্রু হয়ে দাঁড়ালো ?

দপ—দপ—দপ—

নদীর ওপারে অত বড় কিসের আলো ওটা ? জলটা মুহূর্তে ঝলসে উঠল খানিকটা তীব্র আগুনের আকস্মিক দীপ্তি-সম্পাতে। নাঃ, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। নিতান্তই আলেয়া।

একটা আম গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে পলাতক বসে পড়ল। আর চলতে পারছেনা সে। সমস্ত দিন পেটে কিছুই পড়েনি—পেটের নাড়িভুঁড়িগুলো ক্ষিদেয় একসঙ্গে জড়াজড়ি করছে—জ্বলে যাচ্ছে। তা ছাড়া একেবারে অক্ষত দেহও সে নয়। অতবড় পাঁচিলের উপর থেকে লাফ দিয়ে নীচের মোটা ডালটা ধরবার সময় পাঁজরে একটা চোট লেগেছিল—তীব্র যন্ত্রণা সেখানে টনটন করে উঠছে। জঙ্গলের পথ দিয়ে ছুটে আসবার সময় লাটা গাছের আঁচড়ে দু'পায়ের চামড়া ছিড়ে গেছে একেবারে—এখান ওখান থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে ধুলোভরা পায়ের পাতার ওপর। পায়ের তলায় অনবরত খচ খচ করে বিঁধছে—অন্ততঃ ডজন খানেক কাঁটা যে মাংসের ভেতরে ঢুকে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করছে তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

অসহ্য ক্লান্তিতে পা ভেঙে সে বসে পড়ল মাটিতে। পিপাসায় বুকের ভিতরটা পুড়ে যাচ্ছে আর সামনে তারার আলোর দীপ্তি পাচ্ছে রুদ্ধ স্রোতা নদীর কালো জল। সে জল থেকে দুর্গন্ধ আসছে—পচা পাতার, জমাট শ্যাওলার—রাশীকৃত পাঁকের। তবু ওই জলটা তাকে হাত বাড়িয়ে আকর্ষণ করতে লাগল। সমস্ত তৃষ্ণার্ত শিরাস্নায়ু-গুলো যেন একসঙ্গে কোলাহল করে বলতে লাগল: চলো, চলো, জুড়িয়ে দাও আমাদের। জ্বলে যাচ্ছি—পুড়ে যাচ্ছি আমরা। চলো, চলো—

কিন্তু উঠতে গিয়েও আঠারো নম্বর উঠতে পারল না। অত্যন্ত গভীর অবসাদ। জল সে খাবে, তার আগে একবার উপলব্ধি করে নেবে তার মুক্তিকে। দীর্ঘ দেড় বছর পরে ফিরে পাওয়া তার স্বাধীন জীবনানন্দকে।

তারায় ভরা আকাশটার দিকে সে একবার তাকালো। অপরিসীম—অপর্যাপ্ত। কোনোখানে এতটুকু ছেদ পড়েনি, কোনো-খানে নিষেধের প্রাকার তুলে সেই নীলিমাকে কেউ খণ্ডিত করে দেয়নি। জেলখানার প্রাচীরের ভেতর দিয়ে যে আকাশ সে দেখত—তা যেন তারই মতো বন্দী। সেখানে একটুকরো মেঘ দেখা দিয়েই পালিয়ে যেত—'ফটিক জল' পাখী নতুন বর্ষার আনন্দে নেচে যেত শুধু একটি মাত্র মুহূর্তের জন্য। ষাঁড়ের কুঁজের মতো ঢেউ খেলানো পাঁচীলের ওপারে মর্মরিত ছোট একটি নারিকেল কুঞ্জের এক ছোপ সবুজ ছাড়া বিশাল পৃথিবীর মহারণ্যের কোনো সংবাদই পাওয়া যেতনা।

আর এই তো দিগন্ত। বন্দী চোখকে মুক্তি দাও—পাঠিয়ে দাও দূরে দূরান্তে। বৃত্তাকার চক্রবালে, মাঠের শেষে—বহু দূরের নাম না জানা গ্রামের সীমানায়। উড়ে চলে যাও শরতের আকাশের সোনা ঝরানো আলো পাখায় মেখে দেওয়া নীলকণ্ঠ পাখীর সঙ্গে। নদীর চর পেরিয়ে কাশের বনে, কাশের বনের ওপারে তাল আর খেজুরের বীথিতে,—তার পরে আরো দূরে। আকাশের শেষ নেই—অরণ্যের শেষ নেই—দিক প্রান্তরের শেষ নেই—জনপদের ইয়ত্তা নেই এবং মহা পৃথিবীর সীমানা নেই।

আর মানুষ। শাসন আর ভয়। প্রতি মুহূর্তে শৃঙ্খলের পেষণ। দুর্বাক্য। পায়ের বেড়ীতে ঝনাঝন শব্দ তুলে সরকার সেলাম।

কিন্তু এখানে বহুধা আর বহুব্যাপ্ত জীবন। হাটে-বাজারে খেয়া নৌকোয়, যাত্রা আর জারি গানের আসরে। এখানে বিয়েতে শানাইয়ের সুর লাগে; এখানে বোধনের ঢাক বাজে—বাঁশি বাজে। এখানে মানুষ হাসে, মানুষ কাঁদে। মানুষ ভালোবাসে, মানুষ অপমান করে। কত বিরাট—কত বন্ধনহীন। ঘর এখানে ডাকে, আবার দিগন্ত এসে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

বুক ভরে প্রকাণ্ড একটা নিঃশ্বাস নিলে সে। ফাল্গুন এসেছে, আমের বনে ধরেছে মুকুল। বাতাসে ভাসছে মধুর আর মদির গন্ধ। শুকনো পাতার ওপর ঝির ঝির করে চুঁইয়ে পড়ছে মধু—শব্দ হচ্ছে টুপ-টুপ-টুপ। আঠার পায়ের তলাটা চট চট করছে।

মরা-নদীর ওপর থেকে বাতাস আসছে। হোক দুর্গন্ধ—তবু মুক্ত বাতাস, তবুও মুক্তির বার্তা। মনে হল যেন এতদিন পরে ওর ফাঁকা আর ফাঁপা ফুসফুসটা পরিপূর্ণ হয়ে গেল। যেন শিরার মধ্যে অচল হয়ে থেমে যাওয়া রক্ত আবার পূর্ণ তেজে বইতে সুরু করেছে।

আঠারো নম্বর উঠে দাঁড়ালো। নিঝুম নিঃশব্দ পৃথিবী—শুধু টুপ-টুপ করে মৌ-ঝরাণির শব্দ। এখানে কেউ আর তাকে খুঁজে পাবে না—তার পেছনে পেছনে এতদূরে অন্তত ছুটে আসেনি কেউ। কিন্তু সরকারের শাসন লোহার বেড়ী তখনও পায়ের গিঁটে খট খট করে বাজছে। সরকারী ডোরা কাটা ফতুয়া আর জাঙ্গিয়া এখনো লজ্জা নিবারণ করছে তার। এই রাজকীয় দাক্ষিণ্য থেকে আগে তাকে মুক্তি পেতে হবে।

কিন্তু উঠে দাঁড়াতেই পায়ে ঠক করে কী একটা ঠেকল তার। শুধু ঠেকলনা—খানিকটা গড়িয়েও গেল যেন। কৌতূহল ভরে সেটাকে তুলে নিতে গিয়েই সে আর্তনাদ করে সভয়ে পিছিয়ে গেল। একটা নরমুণ্ড। বেশিদিনের পুরানো নয়—এখনো তার সঙ্গে শুকনো ক্লেদ আর কয়েকগুচ্ছ চুল জড়িয়ে রয়েছে!

একী ব্যাপার! অন্ধকারের মধ্যে ঝাপসা দৃষ্টিতেও যেন সে স্পষ্ট দেখতে পেল শুধু একটা নয়—পাঁচটা—ছয়টা—সাতটা—আটটা অগুণতি মানুষের মাথা তার সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। দেড় বছরের মধ্যে এই বহু পরি-চিত আমবাগানটা এমনভাবে শ্মশান হয়ে গেল কী করে ?

মুহূর্তে মিথ্যে হয়ে গেল সব। আমের মুকুলের গন্ধ—তারায় ভরা আকাশ, মরা নদীর ঠাণ্ডা জল। মনে হল এখানে যেন থম থম করছে মৃত্যুর বিভীষিকা। উর্দ্ধশ্বাসে আম-বাগান থেকে ছুটে পালালো আঠার নম্বর—জীবিতেরা নয়, এখানে মৃতের দল তার পিছনে পিছনে তাড়া করে আসছে।

নিস্তারণ লোহারের কামারশালা গ্রামের একান্তে।

ছোট চালাঘর। সামনের দরজাটা এত ছোট যে, প্রায় হাঁটু ভেঙে ঢুকতে হয় তার ভেতরে। পয়সার অভাবেও বটে, আর খানিকটা ইচ্ছে করেও বটে—ঘরের দরজাটা নিস্তারণ ছোটোই রেখেছে—ঢোকবার সময় শত্রু, অর্থাৎ পুলিশকে যাতে অনেকক্ষণ দ্বিধা করতে হয় এবং সেই ফাঁকে দরকারী দু'চারটে জিনিষ সে নিরাপদে হাত সাফাই করে ফেলতে পারে। পুলিশের গম্ভীর সন্দেহ তার ওপরে—সে নাকি লোহার ছাঁচ তৈরী করে দিয়ে স্বদেশী টাকা প্রসারের ব্যাপারের সহায়তা করে থাকে।

নিস্তারণ অবশ্য সেজন্যে গর্বিত। এদিক থেকে স্বদেশী বাবুদের সঙ্গে এক জাতীয় একাত্মতা অনুভব করে সে। তোমরা দিশি খদ্দর পরো, তোমরা বিলিতীকে বাদ দিতে চাও—তোমরা বোমা তৈরী করে রাতারাতি স্বাধীনতা আনতে চাও। সেদিক

থেকে আমিই বা কম কী। আমিও স্বদেশী জিনিষ তৈরী করেছি; বিদেশীকে প্রাণে না মেরে তার পকেট মারছি—হরে দরে দুটোই এক কথা। তা ছাড়া রোমাঞ্চ এবং উত্তেজনা আমার ক্ষেত্রেও একেবারেই কম নয়।

আর নিস্তারণ নিজেও ছোট খাটো মানুষ। ভেতরে ঢুকতে এর চাইতে বড় দরজা তার দরকার হয়না। কৈফিয়ৎ হিসেবে এইটুকু বললেই তার যথেষ্ট।

সেই ছোট দরজাটার ঝাঁপ খোলা। আর তাই থেকে একটুকরো লাল আলো বাইরে দপ করে ঝলকে পড়ছে আবার নিবে যাচ্ছে। দশ বারোটা মহিষের নিঃশ্বাস টানবার মতো শব্দ উঠছে একসঙ্গে—হাপর। ঝন ঝন করে ভেতরে হাতুড়ীর ঘা পড়ছে আর খোলা দরজার পাশে আগুনের ফুলকি উড়ে উড়ে এসে বাইরের জোনাকির ঝাঁকের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

—নিস্তার দা, নিস্তার দা!

হাপরের দীর্ঘশ্বাসে নিস্তারণ শুনতে পেলনা। আবার দরজায় টোকা দিয়ে তীব্র চাপা স্বরে সে ডাক দিলে, নিস্তার দা আছো।

বাইরে লাল আগুনের যে আভা পড়ছিল, একবার দপ করে উঠেই নিবে গেল সেটা। ঝনাৎ করে একটা প্রচণ্ড শব্দ করেই বন্ধ হল হাতুড়ী। শেষ ঝাঁক জ্বলন্ত লৌহকণার জোনাকি এসে অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সদাসন্দিগ্ধ নিস্তারণের ঘর স্তব্ধ হয়ে গেল একটা রহস্যময় নীরবতায়।

—নিস্তার দা—ঘরে আছো কি?

—কে?—লোহার হাতুড়ীটা শক্ত করে বাগিয়ে ধরে মিশ কালো রঙের প্রৌঢ় বেঁটে জোয়ানটা তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞাসা করলে: এত রাত্রে কে ডাকছে?

—আমি বাঞ্ছা!

—বা-ঞ্ছা!

যেন ঘরের মধ্যে বোমা ফেটেছে একটা, নিস্তারণ থ' মেরে রইল এক মুহূর্ত। গলার স্বরটা চিনেছে, তবু শেষ পর্যন্ত না যাঁচালে বিশ্বাস নেই।

—বাঞ্ছা। কোন্ বাঞ্ছা।

—আমাকে চিনতে পারছ না গো? সোনাডাঙার বাঞ্ছা হাড়ী।

দরজার পথে নিস্তারণ লোহার এসে দাঁড়ালো। সাড়ে তিন হাত মিশ কালো মানুষ—হাত দুটো প্রায় হাঁটুতে গিয়ে ঠেকে। গায়ে জামা নেই—হাপরের আবছা আলোয় দেখা যায় সাপের পাকের মতো যেন তার সারা গায়ে মাংসপেশী আবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। মুখের ওপর ধবধবে সাদা একজোড়া গোঁফ গায়ের ঘোর কালো রঙের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে ছন্দ মিলিয়েছে।

—তুই কোত্থেকে এলি এ সময়ে?

—আস্তে, চেঁচিয়োনা। আমার দিকে তাকিয়ে দেখনা একবার।

তাই তো, তাই তো। পায়ে বেড়ী, গায়ে সরকারী জাঙ্গিয়া। পলাতকের ক্লান্ত দুর্গম পথ তার শরীরের সর্বত্র প্রত্যক্ষ একটি চিহ্ন এঁকে দিয়েছে।

—কী সর্বনাশ, তুই হাজত থেকে পালিয়েছিস নাকি?

—পালালাম তো। কদ্দিন আর ভালো লাগে বলো। তিন বছর মেয়াদ হয়েছিল—দেড় বছর খেটেছি আর থাকতে ইচ্ছে করলনা।

—পালিয়ে এলি কী করে?

বাঞ্ছা দু'তিনটে পোকা-ধরা দাঁত বের করে আপ্যায়নের হাসি হাসল এইবারে। বললে, যেমন করে পালাতে হয় তেমনি করেই। পাচীল টপকে মাঠ-ঘাট বন-জঙ্গল দিয়ে।

—আয় আয়, ভেতরে আয়। কেউ আবার টপ করে দেখে ফেলবে—নিস্তারণ হাত ধরে তাকে কামারশালার ভেতরে টেনে নিয়ে এল। পেছনে ছোট ঝাঁপটা ধপাস করে দিলে আটকে।

ঘরের মধ্যে পোড়া কাঠ কয়লার গন্ধ—পোড়া লোহার গন্ধ—হাপরের পুরোনো চামড়ার গন্ধ। এক পাশে একটা লণ্ঠন মিট মিট করছে। আগুনের মধ্যে পুড়ে গন্ গন্ করছে লোহা। ছোট ঘর—কোনখানে একটি জানালা নেই—কোথাও এতটুকু আলো আসবার অনাবশ্যক পথ রাখেনি নিস্তারণ। একটা গুমোট গরমে হঠাৎ যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল বাঞ্ছার।

—নাও, আগে বেড়ীটার একটা ব্যবস্থা করো দেখি নিস্তার দা। ভদ্দর লোক না হতে পারলে আর ভালো লাগছে না।

ছেনী দিয়ে বেড়ী কাটতে কাটতে নিস্তারণ বললে, পালিয়ে তো এলি, এখন থাকবি কী করে।

—সে ভাবতে হবে না, একটা ব্যবস্থা করে নেবই।

কট। বেড়ীটা দুখানা হয়ে নীচে পড়ে গেল। শৃঙ্খলের অবসান। বাঞ্ছা নিজের পায়েই একবার হাত বুলিয়ে নিলে।

নাঃ, কোনোখানে কিছু বাজছে না। দু'পা হেঁটে দেখলো সারাক্ষণের সে গুরুভারটা দূর হয়ে গেছে। আঃ—কী অসাধারণ ভাল লাগছে—কী আশ্চর্য একটা মুক্তির অনুভূতি!

নিস্তারণের ঘরে বসে যে ছোট ছেলেটা হাপর টানছিল, সেই একটা গাঁজার কল্কে এগিয়ে দিলে। হলদে রঙের ন্যাকড়াটা তাতে জড়াতে জড়াতে নিস্তারণ বললে, দিবি নাকি একটান।

—নাঃ।—বাঞ্ছা হাসল: এবার ওসব ছেড়েই দেব ভাবছি।

উঃ?—নিস্তারণ সাদা কালো ভ্রূর নীচে চোখ দুটোকে বার কয়েক নাচিয়ে নিলে। —দেখছি এবারে জেল খেটে তুই সত্যিই মানুষ হয়ে এলি।

বাঞ্ছা এবারেও নিরুত্তরে হাসল।

—তা হলে সিঁদকাঠিও আর দরকার হবে না?

—বোধ হয় না।

—যাক বাঁচলি তা হলে—একমুখ ধোঁয়া ছড়িয়ে নিস্তারণ বলল: কিন্তু এখন কী করবি? পুলিশ তো কেউটের মতো পিছনে লেগেছে, ধরলে পাক্কা পাঁচটি বছর ঠুকে দেবে।

বাঞ্ছা বললে তাই ভাবছি। এখন যাচ্ছি বৌয়ের কাছে—শ্বশুর বাড়ীতে। রাতারাতি ওকে তুলে নিয়ে আসামের দিকে চলে যাব। ওদিকে তো শুনেছি যুদ্ধ হচ্ছে, ঢের কুলি খাটছে, তাদের সঙ্গেই—

কুঞ্চিত মুখে নিস্তারণ চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। থেকে থেকে হাপরের আগুনের এক একটা লাল আভা তার মুখের ওপর এসে পড়তে লাগল।

—জেলেই বোধ হয় ভাল ছিলি বাঞ্ছা!

—কেন? বাঞ্ছা বিস্মিত দৃষ্টিতে নিস্তারণের রহস্যমণ্ডিত মুখের দিকে তাকালো।

—না, সে থাক।

বাঞ্ছা উদ্বেগ বোধ করতে লাগল। নিস্তারণের কথার মধ্যে কেমন একটা সুর আছে—নিহিত আছে এমন একটা ইঙ্গিত যাতে সমস্ত মন সংশয়ে আচ্ছন্ন করে তোলে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নিস্তারণের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললে, নিস্তার দা।

—কী বলছিলি?

—সেখ বাড়ীর আমবাগানে অত মরার হাড় কেন?

নিস্তারণ মুখের পাশে গাঁজার ধোঁয়ার কুণ্ডলী রচনা করতে লাগল: মানুষ মরেছে।

—অত মানুষ! কি হয়ে মরল?

—কী হবে আবার, মরতে হয় তাই মরেছে। সে যাক। তুই রাত্তিরটা এখানেই থাকবি, না চলে যাবি বৌয়ের কাছে?

—চলেই যাই।—বাঞ্ছার মুখে এক সঙ্গে উৎকণ্ঠা আর অস্বস্তি প্রকাশ পাচ্ছে: আমার যেন কি রকম লাগছে নিস্তার দা। এই দেড় বছরে দেশটা এত বেশী বদলে গেল নাকি?

—সবই তো বদলায়। পৃথিবী যে বদলাবে তাতে আর আশ্চর্য কী।

আবার খানিকটা নীরবতা। হাপরের হাওয়ায় আগুন চমকে উঠছে। নিস্তারণের মুখের ওপর খেলা করে যাচ্ছে হিংস্র একটা আরক্ত আভা।

নিস্তারণ বললে: থাক, ওসব কথা থাক। যাবি তো সরকারী কাপড় চোপড় বদলে যা। একটা ছেঁড়া ধুতি দিয়ে দিই বরং। ও বেশে রাস্তায় বেরুলে তো রক্ষা থাকবে না।

রাত বাড়ছে। অন্ধকার মেঠো পথ দিয়ে এগিয়ে চলল বাঞ্ছা। তারায় ভরা মুক্ত আকাশের আশীর্বাদ তমসা-বিকীর্ণ বিস্তীর্ণ পৃথিবীর আহ্বান। রাত্রির পাখী ডাকছে—শিরশির করে বয়ে যাচ্ছে হাওয়া। কাঞ্চন

অকারণে কুকুর ডেকে উঠছে—দূরদূরান্ত থেকে তার উত্তর আসছে।

মুক্তি। পায়ে বেড়ী নেই—আঁটোসাঁটো জাঙ্গিয়া নেই। ষাঁড়ের কুঁজের মধ্যে ঢেউ খেলানো প্রাচীরের আড়ালে অবরুদ্ধ জগৎ। সেলের ভিতর থেকে খুনী আসামীটা থেকে থেকে পাগলের মতো চীৎকার করে ওঠে। পাথর ভাঙতে ভাঙতে শিস্ দিয়ে একটা অশ্লীল গান গেয়ে ওঠে একজন। হঠাৎ আসে ভোজপুরী ওয়ার্ডারটা। যমদূতের মতো চেহারা—সিদ্ধির নেশায় দুটো টকটকে রাঙা চোখ। বাপ-বাপান্ত ছাড়া আর কোনো সম্ভাষণই জানে না সে।

—অ্যাও শালা—ক্যা ভোতা হায়?

—ক্যা হোতা হায় জমাদারজী?

আর জমাদারজী। লাথিটা ঠিক যুৎ-মাফিক এসে পড়েছে। পাথরের ওপর পড়েছে মুখটা—ঠোঁটটা ছেঁচে গেছে খানিক। দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত পড়ছে।

তবু সে অবস্থায়ও হাসতে হয়।

সমস্ত মুখটা রক্তে রাঙা হয়ে গেছে। দুই কষে রক্ত—তবু একটা বিগলিত চরিতার্থ হাসি। যেন জমাদার লাথি মারেনি, পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে দিয়েছে মাত্র।

—কসুর মাপ করো জমাদারজী—

—সরকার সেলাম—

মকীবের হুঙ্কার: এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত—আর্যাবর্ত-দাক্ষিণাত্য নিনাদিত রাজকীয় ঘোষণা। যে যে অবস্থায় আছো উঠে দাঁড়াও। সেলাম ঠোকো।

বীভৎস জীবন। নরক। অমানুষিক দুঃস্বপ্ন। তারায় ভরা আকাশের নীচে আর মেঠো আলের পথ দিয়ে চলতে চলতে সেটাকে অবিশ্বাস্য আর অসম্ভব ঘটনা বলে মনে হয়।

মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে আছে গ্রামগুলো। নীড়—স্বপ্ন দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে গড়া মানুষের ঘর। এখানে দুঃখ নিজের, ব্যথাও নিজের। প্রতি মুহূর্তে দুঃসহ অপমানের পীড়ন নেই। বাঞ্ছা অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ক্লান্ত পায়ে হাঁটতে লাগল। অত্যন্ত খিদে পেয়েছে—মাথা ঘুরছে। ইচ্ছে করছে প্রতি মুহূর্তে পথের ওপর লুটিয়ে পড়তে—বুকের মধ্যে খানিকটা অবাধ বাতাস টেনে নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তে।

কিন্তু না—থামলে চলবে না। এখনো সামনে অনেক পথ বাকী—অনেক গ্রাম, অনেক মাঠ, দু'খানা হাটখোলা। একদিন এক রাত্রির রাস্তা। আর নিস্তারণ লোক ভালো—আসবার সময় আট গণ্ডা পয়সা দিয়ে দিয়েছে সঙ্গে—ওই দিয়েই যা হয় খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে।

বাঞ্ছা জোর করে শক্তি সংহত করে নিলে শরীরে—দৃঢ় আর দ্রুত পায়ে চলতে সুরু করে দিলে। মাঠের হাওয়ায় পাঁজরের টনটনে ব্যথাটা জুড়িয়ে আসছে—পায়ের তলায় কাঁটার তীক্ষ্ণ খোঁচাগুলো তেমন করে আর বিঁধছেনা। কিন্তু গ্রামগুলো এমন ঘুমন্ত কেন—একটা গানের কলি, জারি গানের একটি সুরও কোনোখান থেকে ভেসে আসছেনা কেন! শুধু শেয়াল কুকুর ছাড়া দেশে আর মানুষ নেই নাকি! দূরে দূরে আলেয়া ছাড়া লণ্ঠন হাতে একটা লোকও পথ চলছে না—দেড় বছরে বাংলা দেশ কি এতই ঘুম-কাতুরে হয়ে গেল!

এক দিন—এক রাত। সন্ধ্যা ঘোর হয়ে আসছে। বাঞ্ছা এসে দাঁড়ালো মঙ্গল-বাড়ীর মাঠের ধারে।

ওই তো গ্রাম। ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছটা পার হলেই বদন চৌকীদারের ঘর—তার শালা। কিন্তু এতক্ষণে বাঞ্ছার মনটা ভরে উঠল সংশয়ে। যাবে কি যাবে না।

পথে আসতে আসতে অনেক জিনিসই তার নজরে পড়েছে। নতুন রাস্তা হয়েছে যেখানে সেখানে—ঝক ঝকে তকতকে পাথর ফেলা রাস্তা। মাঝে মাঝে নতুন নতুন গ্রাম বসেছে। বড় বড় আটচালা, এক ইটের কোঠাঘর, টিউব-ওয়েল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মোটর সেই সব নতুন রাস্তা ধরে নতুন গ্রামের দিকে এগিয়ে চলেছে। মিলিটারী কলোনী।

এই কি তার চেনা দেশ—দেড় বছর আগেকার দেশ? এখানকার মানুষগুলো কেমন করে তাকায়—কেমন করে কথা বলে! দু' পয়সা দামের জিনিষ বারো পয়সা। তার দিকে ফিরেও কেউ তাকায় না। সকলের চোখ মাটির দিকে আর হলদে রঙের কুর্তিপরা সাদা কালো মিলিটারীদের দিকে। সে যেন এখানে অনাবশ্যক—যেন বিদেশে এসে পড়েছে কোথাও।

চেহারা বদলেছে পৃথিবীর—চেহারা বদলেছে মঙ্গলবাড়ীর। এখানেও মাঠের মধ্যে নতুন মিলিটারী উপনিবেশ। বিকৃত কণ্ঠের গান ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। দৈত্যের মতো বড় বড় চোখের আগুন ছড়িয়ে—পেট্রোলের গন্ধে চারদিক ভরিয়ে দিয়ে ছুটেছে মোটর—যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ওই গ্রামে—ওই তেঁতুল গাছের ছায়ার নীচে বদন চৌকীদারের ঘরটা এখনো কি টিকে আছে। মল্লী কি বেঁচে আছে এখনো?

একটা অনিশ্চিত সন্দেহে বাঞ্ছার হাত পা কাঁপতে লাগল—বুকের ভেতরটা শুকিয়ে আসতে লাগল। যদি মল্লী মরে গিয়ে থাকে? যদি পথে ঘাটে ছড়ানো অসংখ্য নরমুণ্ড আর শুকনো পাঁজরের মধ্যে মিলিয়ে থাকে সেও? এই দেড় বছরের মধ্যে যে বাংলা দেশে মন্বন্তর বয়ে গেছে—সে খবর জানতে পেরেছে বাঞ্ছা। কে আছে আর কে যে নেই আজ তা অনুমান করাও শক্ত।

বাঞ্ছা অন্ধকারময় মঙ্গলবাড়ীর দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কী করবে সে, যাবে ওখানে? এতক্ষণে নিস্তারণের কথার অর্থটা তার কাছে যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল: এমন ভাবে না পালিয়ে জেলে থাকলেই ভালো করতিস বাঞ্ছা—

কিন্তু কতদিন মল্লীকে দেখেনি সে। তার মল্লী—সপ্তদশী সুন্দরী মল্লী। হালকা, চটুল। বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরলে সাপের মতো পিছলে যায়। মল্লীকে বিয়ে করে মেশা ধরে গিয়েছিল তার—বাইরে বেরোনোর বদ অভ্যাসগুলো একরকম ভুলেই গিয়েছিল। প্রদীপের আলোয় নির্জন ঘরে মল্লীর সেই চোখ—সেই খিলখিল ক'রে হাসি!

বাঞ্ছার রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। না—না—মরতেই পারেনা মল্লী। এমন সুন্দর—এমন অপরূপ। আত্ম-বিস্মৃতের মতো সে এগিয়ে চলল।

বদনের ঘর তেঁতুল গাছের ছায়ায় ঠিক আছে। কোথাও এতটুকু রূপান্তর নেই তার। বরং বাড়ীটায় শ্রী ফিরেছে আগেকার চাইতে। বাইরে নতুন দাওয়া—তাতে শালের খুঁটি। কয়েকটা মোটা বড় কাঠ আর বেতের বসবার আসন—বোঝা যাচ্ছে আগের চাইতে সামাজিক হয়েছে বদন।

কী বলে ডাক দেবে ভাবতে ভাবতে সামনের দরজাটা খুলে গেল আর সামনে এসে দাঁড়ালো একটি মেয়ে। হাতে তার প্রদীপ। মুহূর্তে বাঞ্ছা বিমূঢ় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। সুন্দরী তরুণী মেয়ে। রঙীন শাড়ী পরা—মুখে প্রসাধনের চিহ্ন, যেন রূপকথার রাজকন্যার মতো সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বাঞ্ছা কী বলবে ভেবে পেল না, শুধু গলা দিয়ে একটা অব্যক্ত অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল।

মেয়েটি চমকে গেল। হাতের প্রদীপটা তুলে ধরে বললে, কে?

—আ—আমি। বাঞ্ছার স্বর জড়িয়ে আসতে লাগল।

—আমি কে? মেয়েটির গলায় স্বর কঠিন।

—আমি—আমি বাঞ্ছা। আমাকে চিনতে পারছিস না মল্লী?

—অ্যাঁ!

মল্লী পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। তার হাত কাঁপতে লাগল, কাঁপতে লাগল তার হাতের প্রদীপের শিখাটা। যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে দু'জনে। বিমূঢ় বিহ্বল বাঞ্ছা ভাবতে লাগল: মল্লী কি জানতে পেরেছিল আজ সে আসবে—তারই জন্যে প্রতীক্ষা করছিল এমন ভাবে—তাকে বুকের ভিতরে টেনে নেবে বলে? কিন্তু মল্লীর চোখমুখ দেখে তাতো মনে হওয়ার উপায় নেই।

আর মল্লীর যেন বাকরোধ হয়ে গেছে। স্বামীকে দেখছেনা—দেখছে একটা প্রেত-মূর্তি। মুখের ওপর ভয় আর সঙ্কোচের ছায়া নিবিড় হয়ে নেমে এল তার।

মল্লীর ঠোঁটই আগে নড়ে উঠল।

—ভিতরে এসো।

ঘরে ঢুকে মল্লীও দরজা বন্ধ করে দিলে। কিন্তু বাঞ্ছার আর বাকস্ফূর্তি নেই। এ কার

[ইহার পর ১১৮ পৃষ্ঠায়]



প্রায় আধখানা গ্রাম জুড়িয়া যে ধ্বংসপ্রায় প্রাসাদশ্রেণী বিগত গৌরবের নিদর্শন বহিয়া ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মত ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে আজও তাহারা দর্শকের মনে একটা সকরুণ শ্রদ্ধা জাগাইয়া তোলে।

মজুমদার বংশের অতীত মহিমার মূক সাক্ষী।

একদিন নাকি ইঁহাদের "রাজা" বলিয়া খ্যাতি ছিল।

'বারমহল', 'অন্দরমহল', 'কাছারিঘর', 'নাটমন্দির', 'দুর্গাদালান', 'ভোগমণ্ডপ', 'রান্নাবাড়ী' ইত্যাদি নামের আড়ালে ভাঙা ইঁটের স্তূপের ভিতর যে অস্পষ্ট ছবি ভাসিয়া ওঠে তাহার সামনে মাথাটা আপনিই কেমন নত হইয়া আসে, আর আসে একটা 'হায় হায়' ভাব···কেমন ছিল সেই বিচিত্র সমারোহের কোলাহলময় দিনগুলি···কেমনই বা ছিল ইঁহাদের অধিকারীরা···যাহারা এখানে একদিন জন্মমৃত্যু হাসি-কান্না সুখ-দুঃখের অংশ অভিনয় করিয়া গিয়াছে।···

ভাঙা দেয়ালের ফাটলে ফাটলে এখনও কি তাহাদের অতৃপ্ত নিশ্বাস জড়াইয়া আছে? ভোগের এই অজস্র উপকরণ ফেলিয়া যাওয়ার অতৃপ্তি?

চৈত্র-বৈশাখের এলোমেলে-সন্ধ্যায়—কপাট-খসা জানালার ফোকরে ফোকরে যে আর্তস্বর হাহাকার করিয়া ফিরে—সে কি তাহাদেরই সঞ্চিত দীর্ঘশ্বাস?

চামচিকা ও গোলাপায়রার ঝাঁক ছাড়া এখানে অন্য কোন জীবিত প্রাণীর অস্তিত্ব বাহির হইতে বিশ্বাস করা শক্ত—বরং বেশী সহজ ভূতের অস্তিত্ব কল্পনায়—তবু আছে।

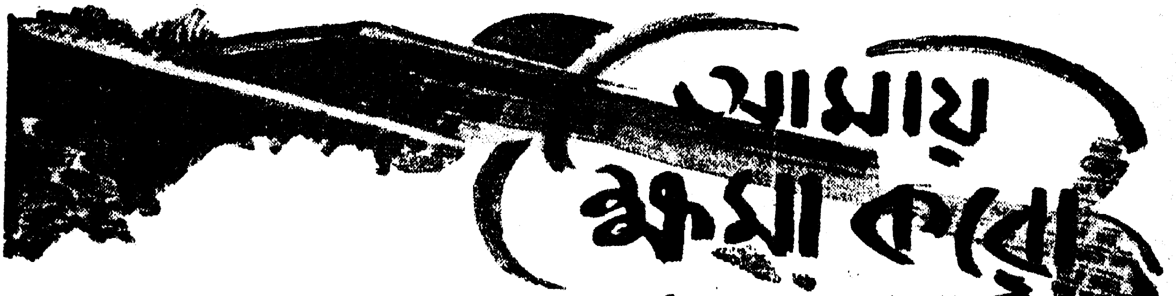
হয়তো নেহাৎ নিরুপায় বলিয়াই আছে।

অন্দরমহলের মধ্যে যে যে ঘরগুলা এখনো কোন প্রকারে টিকিয়া আছে তাহারি একখানিতে থাকেন "নতুন গিন্নি।" নবদ্বীপ মজুমদারের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। সত্তরের কাছাকাছি বয়স, মাজাভাঙা থুনথুনে বুড়ি, চোখের চাহনি নিষ্প্রভ, শুধু গলার জোর আছে সমান।

দিনের মধ্যে পঞ্চাশ বার হোঁচোট খাইতে খাইতে কোনোগতিকে বুড়ি নিজের পেটের ব্যবস্থাটুকু করিয়া লয়, আর ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ হইতে সুরু করিয়া পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ দেব-দানব সকলের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করিতে থাকে।

বিশ্বসংসারে সকলের উপর ওর অদ্ভুত এক বিজাতীয় ঘৃণা। পৃথিবীটাকেই দাঁতে পিষিয়া ফেলিতে পারিলে যেন ওর শান্তি হয়।

রৌদ্রের তাপ অসহ্য হইলে ভাঙা কোমরকে সোজা করিবার ব্যর্থ চেষ্টায় কোমরে হাত দিয়া



আমায় ক্ষমা করো

আশাপূর্ণা দেবী



দাঁড়াইয়া চোখের উপর হাত আড়াল করিয়া আকাশমুখী হইয়া তীব্রস্বরে বলে—'মরছ আগুন জ্বেলে? পুড়িয়ে মারছো পৃথিবীকে? তোমার মরণ হয় না অনামুখো? ভর্ দুপুরে শাপ দিই তোমায়—জ্বলে পুড়ে মরো, জ্বলে পুড়ে মরো।'

অবশ্য সূর্য্যদেবের গায়ে ব্রাহ্মণ কন্যার অভিসম্পাতের আগুন স্পর্শ করে কি না তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না, কিন্তু বুড়ির এই অযথা শক্তিক্ষয়ে আলস্য নাই।

আবার বর্ষার দিনে একঘেয়ে বৃষ্টির শব্দ ছাপাইয়া অসন্তোষ মুখর হইয়া ওঠে... ঝাঁটা খেকো দেবতা, কেঁদে মরছেন, কোন যমে ধরেছে তোমায়?

কাক চিল ইঁদুর আরশোলা সকলের সঙ্গেই প্রতিপক্ষের ভঙ্গীতে বাক্যবাণ বর্ষণ হয়।...উঠানের ওপারে শ্যামাকে দেখা যায়...দুই হাতে একগোছা সজিনা ডাঁটা ও একটা পাকা বেল, কোঁচড়ে গোটা কয়েক পাতিনেবু। নতুন গিন্নিকে দেখিয়া অপ্রতিভের ফিকা হাসি হাসে... সাধ্য পক্ষে ইঁহার সামনে পড়িতে চায় না সে।

শ্যামাকে দেখিয়াই তেলে বেগুনে জ্বলিয়া ওঠে বুড়ি—এই যে পাড়া বেড়ানি 'খুদ মাগুনী' এলেন—সকাল বেলাই লোকের দোরে গিয়ে হাত পাততে লজ্জা করে না শামি? অমন পেটে আগুন ধরিয়ে দে, আগুন ধরিয়ে দে, ভাতারপুতের সংসার নয়—একটা পোড়া পেট তার জন্যে এত আহিংখে? ছিঃ ছিঃ, আমি হলে গলায় দড়ি দিতুম।

শ্যামার যে এ বাড়ীতে সত্যকার কি দাবী আছে সেটা খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত—হয়তো অতি সূক্ষ্ম একটু সম্বন্ধের রেশ থাকিলেও থাকিতে পারে, হয়তো কেবল-মাত্র আশ্রয়হীনতার দাবীতেই আছে।

অথচ এতবড় ভাঙা বাড়ীতে তাহার মন টেঁকেনা—তাই সারাদিন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ায়—সময় অসময় লোকের উপকার করিতেও ছাড়ে না এবং ভদ্রতার আবরণে ভিক্ষাবৃত্তি করিয়াই তাহার দিন চলে।

আরো একজন বাসিন্দা আছে—সে হৈমন্তি।

প্রেতপুরীর অন্ধকার গহ্বরেও কি সোনার প্রদীপ জ্বলে? জ্বলিলে হয়তো তুলনা করিবার মত বস্তু একটা মিলিত হৈমন্তির।

এ বাড়ীর শেষ বংশধর সমুদ্রনারায়ণের স্ত্রী হৈমন্তি, সৌন্দর্য্য আর সুলক্ষণের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া আনা মেয়ে। কিন্তু কোষ্টি-কারকদের শাস্ত্র ব্যর্থ করিয়া হৈমন্তির জীবন-ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে অদ্ভুতভাবে।

নিতান্ত দরিদ্রের ঘর হইতে যখন এ বাড়ীতে বধূ বেশে আসিয়া দাঁড়াইল, তখনও—বাজনার শেষে সুরের রেশের মত পূর্ব্ব গৌরবের কিছু জের আছে। জীর্ণ জামিয়ারের আংরাখা গায়ে দিয়া আর চওড়া কল্কাপাড় শান্তিপুরী ধুতি পরিয়া দাদাশ্বশুর বিশ্বনারায়ণ রূপার থালায় পাঁচখানি আকবরী মোহর দিয়া কন্যা আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিয়াছিলেন।

হৈমন্তি পশ্চিমের মেয়ে, দরিদ্র পিতার ঘর হইতে সে প্রচুর ঐশ্বর্য্য বহিয়া আনিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু আনিয়াছিল অনবদ্য রূপ আর অপূর্ব্ব সঙ্গীতানুরাগ।

তাহাদের বনেদী জমিদারের ঘরে মলপরা নোলোক পরা, অষ্টাঙ্গ গহনায় মোড়া মেয়ে-দের মাঝখানে হৈমন্তি যেন একটা আবির্ভাব।

তা সমুদ্র তাহার মান রাখিয়াছিল, সনাতন নিয়মের গণ্ডী কাটাইয়া তাহার জন্য রাখিয়াছিল অনেকখানি আকাশ, অনেকটা আলো। কিন্তু কয়দিনই বা? উৎসব বাড়ীর হাজার বাতির ঝাড়ের মত নিমিষে মিলাইয়া গেল সেই সমারোহের দিনগুলি।...

... ...

সে দিন চাঁদ উঠিয়াছিল......সদ্য ফোটা চাঁপাফুলের মদির গন্ধে বাতাস উন্মনা...... দীঘির ঘাটের বাঁধানো চাতালে হৈমন্তি বসিয়াছে সেতার হাতে.........জ্যোৎস্নায় মাজা দেহ.........পরনে নীলাম্বরী, পায়ের কাছে সমুদ্রনারায়ণ.........

হৈমন্তি বলিয়াছিল......আজ আর বাজাতে ভাল লাগছে না, কি জানি কেমন যেন ভয় করছে। মনে হচ্ছে—

—কি মনে হচ্ছে বল তো?

—মনে হচ্ছে এত সুখ বুঝি সইবে না—বুকের ভিতরটা কেমন যেন করছে। মনে হচ্ছে এই বুঝি শেষ—

নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে কথার শেষ হারাইয়া গিয়াছিল, সমুদ্র হাসিয়া বলিয়া-

ছিল—বুকের এত কাছে থেকে ভয় কেন হৈম? কিসের ভয়? ওটা দক্ষিণে হাওয়ার গুণ, কবিরা তাই বলেন মাতাল বাতাস। তোমার সেই সুরটা বাজাও……সেদিন ছাদে বসে যেটা বাজালে।

হৈমন্তি ধীরে ধীরে বাজনাটা তুলিয়া লইয়াছিল…কিন্তু হাত খুলিল না, সুর কাটিয়া গেল বার বার…কাতরভাবে বলিয়াছিল—আজ থাক—শুধু তুমি আমার আরো কাছে এসো, খুব কাছে।

আরো কাছে? সমুদ্র হাসিয়া ফেলিল কিন্তু হাসির সুর মিলাইবার আগেই বাড়ীর ভিতর হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিল ক্ষীরোদা ঝি—দাদাবাবু সর্ব্বনাশ হয়েছে—

—কিরে ক্ষীরোদা ব্যাপার কি?

—ইন্দির দাদাবাবু নাকি বাগদীপাড়ায় গিয়ে কি কেলেঙ্কার করেছিল, তারা পাড়া ঝাটিয়ে লাঠি নে' তেড়ে এসেছে—

মুহূর্তে মাথার ভিতর আগুন জ্বলিয়া উঠিল…আবার এই কাণ্ড? এই সেদিন ইন্দ্রের জন্য কত হাঙ্গামা কত অপমান সহিতে হইল। পুলিশকে আক্কেল সেলামী দিতে গিয়া সমুদ্রের উঁচু মাথাটা হেঁট হইয়া গিয়াছিল। পিসির ছেলেকে লইয়া নিত্য এত ঝঞ্ঝাট পোহানোর দায় কিসের?

বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতেই ভীত ইন্দ্রনাথ ছুটিয়া আসিয়া কাতরভাবে বলিল—ছোড়দা তোমার পায়ে পড়ি বাঁচাও, ওরা আমাকে খুন করে ফেলবে—

—ওরা? ওদের হাতে পড়বার আগে আমিই তোমায় খুন করবো রাস্কেল—

আচমকা ধাক্কা খাইয়া ইন্দ্র উঁচু রোয়াকের উপর হইতে ছিটকাইয়া পড়িল শান বাঁধানো উঠানে।

আশ্চর্য্য! পড়িল আর উঠিল না?

সমুদ্রকে জব্দ করিবার জন্য সত্যই খুন হইয়া গেল ইন্দ্র?

জোয়ান ছেলে, স্বাস্থ্য সবল দেহ, পড়িয়া মরিয়া যায়? হয় তো আশঙ্কায় আর উত্তেজনায় স্নায়ু শিরা টান হইয়াছিল…… এতটুকু আঘাতেই ছিঁড়িয়া খান্ খান্ হইয়া গেল?

এখনও সে দৃশ্য চোখের উপর ভাসিয়া ওঠে হৈমন্তির, উঠানের মাঝখানে ইন্দ্রের মৃত দেহ ঘিরিয়া বাগদী প্রজাদের নীরব জনতা, একজনের হাতে একটা মশালের আলো দপদপ করিতেছে……দুরন্ত বাতাসে তাহার সঙ্করণশীল আলোছায়ায় সমুদ্র মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যেন হারাইয়া যাইতেছে।

চাঁদ বোধ করি তখন অস্ত গিয়াছে।

কেমন করিয়া সেই বাগদীদের সাহায্যেই লাশ সরানো হইল, কেমন করিয়া তাহাদের নির্ব্বন্ধে সেই রাত্রেই সমুদ্র গ্রাম ছাড়িয়া ফেরার হইল, সে সব কথা এখন আর হৈমন্তির বোধ করি ভাল মনে পড়ে না।

শুধু সমুদ্রর শেষ কথাটা মনে পড়ে… 'পুলিশের হাতে ধরা দেবার সাহস খুঁজে পাচ্ছি না হৈম, তোমাকে বিধবা করতে পারব না…পারব না তোমায় ফেলে মরতে…'

তাই দীর্ঘ এক যুগ বৈধব্য আর সাধব্যের অদ্ভুত ত্রিশঙ্কুলোকে কাটাইয়া আসিতেছে হৈম। আর মাস দুই গেলেই সিঁদুর মুছিয়া থান ধরিবার ব্যবস্থা, এক যুগ কাটিয়া গেলে নাকি নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে মৃত বলিয়া গণ্য করিতে হয়।

আঠারো বছর হইতে ত্রিশ বছরের দরজায় আসিতে যে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে হইয়াছে হৈমন্তিকে, সেকি এতই ক্লান্তিহীন?

খুনীর স্ত্রী, ফেরারী আসামীর স্ত্রী, এই ঘৃণ্য পরিচয় লইয়া এতদিন বাঁচিয়া আছে হৈমন্তি কি হিসাবে?

হয় তো মরিবার সাহস সেও খুঁজিয়া পায় নাই।

সমুদ্র যদি কোনদিন ফিরিয়া আসে …যদি ডাক দেয়…সাড়া দিবে কে?

শবরীর প্রতীক্ষার মতই বুঝি ধৈর্য্যহীন প্রতীক্ষা হৈমন্তির।

তবু এ বাড়ীতে টিঁকিয়া থাকা আশ্চর্য্য বইকি। কেবলমাত্র শ্যামা আর নতুন গিন্নির মত লোকের আবহাওয়ায় হৈমন্তির মত মেয়ে এতদিন কাটাইল কেমন করিয়া? যেখানে রুচি প্রবৃত্তি শিক্ষা পদে পদে ব্যাহত হইতে থাকে? দারিদ্র্য সহ্য করা সহজ, কিন্তু নির্লজ্জ নগ্নতা সহ্য করা কঠিন নয় কি?……

সমুদ্রের ফটোয় টাটকা মালাগাছটী পরাইয়া বাসি মালাটী খুলিয়া জলে ভাসাইয়া দেওয়া হৈমন্তির নিত্য কাজ। নতুন গিন্নির যে জানা নাই এমন নয়, তবু খিড়কির দরজায় হৈমন্তির শাড়ীর পাড়ের শেষাংশটুকু মিলাইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নতুন গিন্নি ওদিককার দালান হইতে চীৎকার করিয়া শ্যামাকে প্রশ্ন করেন—মেমসাহেবটী কোথায় হাওয়া খেতে বেরুলেন লা শামি?

—কি জানি? দীঘিতে বুঝি—

—'কি জানি' কি লা? জানিস না তুই? ন্যাকা বলে,—চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা, আর শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল। কিন্তু এও বলি মা, ঘরের বৌ ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে বাড়ীর বার হওয়া কিজন্যে? মালা গাঁথছেন—ফুল ভাসাচ্ছেন—কত রঙ্গই জানেন। এই তো—আমার ষোলো বছর বয়সে সোয়ামী গিয়েছিল—বলুক দিকিন কেউ, কোনো দিন আদিখ্যেতা করতে দেখেছে?

তাঁহাকে ষোলো বছর বয়সে দেখিবার সৌভাগ্য যাহাদের হইয়াছিল—তাহারা অবশ্য কেহই উপস্থিত নাই, তবু শ্যামা তোষামোদের ভঙ্গীতে সায় দেয়,—

—তোমাদের সঙ্গে কার তুলনা দিদিমা—

দিদিমা বিরক্তি কুঞ্চিত মুখে বলিয়া উঠেন—খোসামোদ করিসনে শামি, খোসামোদ শুনলে গা জ্বলে যায়।

নিঃসঙ্গ পথিককে এইরূপ আকস্মিক আক্রমণ করিয়া বসা তাঁহার স্বধর্ম।

শ্যামা অপ্রতিভ মুখে বসিয়া থাকে, চট করিয়া উঠিতে পারে না এবং আলোচনাটা ভিন্ন খাতে বহাইতেই বোধ করি একটা নূতন সংবাদের অবতারণা করে।

—সকাল বেলা আমাদের দীঘির ঘাটের ওদিক থেকে আসতে একটা মানুষ দেখলাম দিদিমা—কোট 'পেন্টুল' পরা লম্বা জোয়ান লোকটা, গোরাই হবে নাকি কে জানে, বকুল গাছের ওদিকটায় ঘুর ঘুর করছিল—দেখে কেমন ভয় ভয় করলো পালিয়ে আসতে পথ পাইনা—মনে হল—নতুন এসেছে গাঁয়ে—

—তা' মনে হবে বইকি, তোমার তো আর গাঁ সুদ্ধ চিনতে কাউকে বাকী নেই। বলি পালিয়ে এলি—বললিনা কিছু?

—আমি কি বলবো বাবা? কোট 'পেন্টুল' দেখলে আমার ভয় করে।

—কচি খুকি! মেয়ে ঘাটে পুরুষ আসে কোথা থেকে তার হিসেব নেই? আজ এসেছে কি রোজ আসে কে জানছে? ও সব মালা ভাসানোর লীলেখেলা কেন তাই বা কে জানে? কালামুখী তলে তলে কি কীর্ত্তি করছে তা' ভগবানই বলতে পারেন। সোয়ামী যার খুনের দায়ে দেশত্যাগী, তা'র পরিবারের এখনো সেমিজ কামিজ পরে পটের ছবি হয়ে বেড়াতে লজ্জা করে না? ধন্যবাদ।

নতুন গিন্নির মর্য্যাদা রাখিতেও—হৈমন্তি সম্বন্ধে এতবড় কথাটায় স্পষ্ট অভিমত দিতে মুখে বাধে শ্যামার। বুড়ো হয়েছি কোমড় পড়ে গেছে, চারদিকে চোখ রাখবার ক্ষ্যামতা নেই, নইলে দেখিয়ে দিতাম সবাইকে—বলিয়া নতুন গিন্নি হাঁফাইতে থাকেন।

ঘাটের পথ হইতে ফিরিয়া হৈমন্তি মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল—কাগজ এখনো দিয়ে যায়নি শ্যামা ঠাকুরঝি?

—কই না।

নতুন গিন্নি কাঠের উনানে ফু পাড়িতে পাড়িতে ঘরের ভিতর হইতে বলেন—মেম লায়েবের রোজ খবরের কাগজ না পড়লে চলে না—ধন্যি বাবা, আমি হলে এতদিন গলায় কলসী বেঁধে ডুবে মরতাম ছিঃ। ঘাটে পথে পাঁচজনের সঙ্গে আলাপ করে বেড়াবার সাহস কি অমনি আসে? চব্বিশ ঘণ্টা কাগজ কেতাব নিয়ে থাকলেই বুকের পাটা বাড়ে।

হৈমন্তি বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া দুই দণ্ড শ্যামার মুখের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যায়।

হৈমন্তি কবে কাহার সঙ্গে আলাপ করিল? ঘৃণায় লজ্জায় পৃথিবীর বুক হইতে নিজেকেই তো প্রায় লুপ্ত করিয়াই রাখিয়াছে শুধু একখানি খবরের কাগজের সেতু দিয়া বাহিরের জগতের সঙ্গে এতটুকু একটু যোগসূত্র।

নিউ বাম

বাহ্যিক প্রলেপের জন্য

বাতজনিত সর্বপ্রকার বেদনায় ও যে কোন রকম হাজা, কাউর, দাদ, পাকুইয়ের আশু ফলপ্রদ মহৌষধ। মাথাধরা ও দন্ত-রোগে ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

স্যান্‌কো কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ

৩ ও ৬ হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Tele : "Daliatalor"



শারদোৎসবে
মহিলাগণের অনুপম উপহার
ডালিয়ার
বেনারসী
ও
সিল্ক শাড়ী

ফোন : বি,বি, ১২৭১

চেয়ারম্যান—শ্রীপতি মুখার্জ্জী

সকলপ্রকার উপহার পোষাক, শয্যাদ্রব্য, হোসিয়ারী ইত্যাদি

ডালিয়া

টেলারিং কোং লিঃ

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

ফুটবল— D. G. B. —ফুটবল

ব্লাডারসহ	৫নং	৪নং	৩নং
স্পেশ্যাল ইংলিশ T.	২১৷৷০	১৮৲	১৪৲
ইম্প্রুভড ইংলিশ T.	২০৲	১৬৷৷০	১৩৷৷০
বেষ্ট ইংলিশ T.	১৮৷৷০	১৫৷৷০	১২৲
নিউ স্পেশ্যাল T.	১৭৷৷০	১৫৲	১১৲
ইম্প্রুভড D.G.B T.	১৫৲	১৩৲	৯৷৷০
I. F. A. T.	১০৷৷০	১১৷৷০	৯৲
নিউ কোহিনুর T.	১২৲	১০৷৷০	৮৲
নিউ ষ্টুডেন্ট T.	১০৲	৮৲	৭৲
স্পেশ্যাল সার্ভিস	১৬৷৷০	১৩৷৷০	১০৷৷০
স্পেশ্যাল গ্লোব	১৪৷৷০	১২৷৷০	১০৷৷০
স্কুল ম্যাচ	১০৷৷০	৯৲	৭৲
বেষ্ট প্রেমী	৯৷৷০	৮৲	৭৲

২নং ৪৷৷০, ১নং ৪৲, ভলি বল ১০৲
ফুটবল বুট উৎকৃষ্ট ১৬৷৷০, মধ্যম ১৩৷৷০

ব্লাডার—১নং ১৸০, ২নং ২৲, ৩নং ২।০ ৪নং ২।৵০, ৫নং ২৷৷০। মাগুলাদি ৸০

ইনফ্লাটার—১নং ১৸০, ২নং ২৷৷০, ৩নং ৩৷৷০, ৪নং ৫৲, ৭৷৷০

ফুটবল মোজা—ফুটলেস উৎকৃষ্ট ৬৷৷০, সাধারণ ২৸০, ফুটসহ উৎকৃষ্ট ৭৲, সাধারণ ৩৷৷০।

ব্যাডমিণ্টন ব্যাট—প্রত্যেকটি ১নং ১০৲, ২নং ৭৷৷০, ৩নং ৫৷৷০, ৪নং ৪৷৷০, ৫নং ৩৷৷০, ৬নং ২৷৷০, ৭নং ১৷৷০, ৮নং ১৲।



পালকের বল কম্পিটিসন প্রতি ডজন ১নং ১৬৲, ২নং ১৫৲, ৩নং ১২৲। প্রাকটিশ সুপিরিয়র ১নং ১০৲, ২নং ৮৲, ৩নং ৬৲। **জুনিয়র** সুপিরিয়র ১নং ৫৲, ২নং ৪৲, ৩নং ৩৷৷০ ডজন। **চিপ কোয়ালিটি** ২৷৷০ ডজন। পালকের বল ও র‍্যাকেটের অর্ডার দিবার সময় অন্ততঃ ১৲ অগ্রিম পাঠাইতে হয়। **ব্যাডমিণ্টন নেট** অর্ডিনারী ছোট ৷৷০, বড় ৸৵০। প্রাকটিশ ১নং ১৷৷০, ২নং ৩৲, ৩নং ৪৷৷০। কম্পিটিসন ১নং ৫৷৷০, ২নং ৭৷৷০, ৩নং ১০৷৷০

ভলিনেট ১নং ৩৷৷০, ২নং ৫৷৷০ ৩নং ৭৷৷০। কম্পিটিসন ১০৲ ও ১৫৲।

কাপ—৩" ১৸০, ৪" ২৷৷০, ৫" ৩৷৷০, ৬" ৪৷৷০, ৮" ৬৲, ১০" ৮৲, ১২" ১২৲, ১৫" ২০৲।

মেডেল অর্ডিনারী ৸০, উত্তম ১নং ১।০, ২নং ১৸০, ৩নং ২।০।

ছিপ, বঁড়শী, সূতা, হুইল, ফাতনা

ফোল্ডিং ছিপ তিন ভাঁজ ৮৷৷০।
পিতল হুইল অর্ডিনারী ১৷৷" ১৷৷০, ২" ২৲, ২৷৷" ২৷৷০, ৩" ৩৲। মধ্যম ২" ৩৲, ২৷৷" ৩৸০, ৩" ৪৷৷০।

উৎকৃষ্ট এলুমিনিয়াম পারফোরেটেড ২" ৪৲, ২৷৷" ৫৲, ৩" ৬৲, ৩৷৷" ৮৸০, ৪" ১০৲, ৪৷৷" ১১।০, ৫" ১২৷৷০।

মুগা সূতা—নকল ২৲, আসল ৩৲, ঐ উত্তম ৩৷৷০। হাতে পাকান একষ্ট্রা স্পেশ্যাল ৪৷৷০ প্রতি তার।

বঁড়শী—বর্দ্ধমান ও খনেখালী বড় ।০, মাঝারী ৵০, ছোট ৵০, জোড়া খাটান মজুর ৵০ প্রতি জোড়া। ডি, জি, বি গোল বঁড়শী ।৵০ জোড়া। বিলাতী খাঁচের বা কাতলা বঁড়শী ১।০ জোড়া, ঐ দেশী ।০ আনা। দেশী লিমারীক হুক (টমলসের তার) (১—২০) ১৫৲ হাজার। কাতনা প্রত্যেকটি ৵০, চার ।০ কৌটা

দাশ গুপ্ত ব্রাদার্স এণ্ড কোং

১৩৯-বি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। ব্রাঞ্চ—৭৭।১ হ্যারিসন রোড। ফোন : বি বি ৬৭৪৫

কিসের আশায় যে রাখিয়াছে সে কি নিজেই জানে? বুভুক্ষুর মত তন্ন তন্ন করিয়া সমস্তটুকু না পড়িলে তৃপ্তি হয় না কেন কে বলিবে?

কিন্তু পড়িয়াই কি তৃপ্তি হয়?

কিন্তু নতুন গিন্নির মিথ্যা দোষারোপকে তো আর মিথ্যা বলা চলে না—সন্ধ্যার অন্ধকারে দোতলায় বারান্দায় এক-কোণে হৈমন্তি অমন থর থর করিয়া কাঁপে কেন—শ্যামা-বর্ণিত সেই 'সাহেবের মতন' লোকটার সামনে দাঁড়াইয়া? অমন ভয়কাতর অস্থির ভাব কেন দু'জনের?

অমন আকুল আগ্রহে সে হৈমন্তিকে বুকের উপর জড়াইয়া ধরিল কোন হিসাবে? কে সে? সমুদ্রনারায়ণ? সমুদ্র এখনো বাঁচিয়া আছে?......

অনেকক্ষণ পরে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া হৈমন্তি কম্পিত কণ্ঠে কহিল—লুকিয়ে পালিয়ে যাবো? লোকে কি বলবে?

—লোকে যা খুসী বলুক না হৈম, ক্ষতি কি? তোমাকে নিয়ে যাবো আমার সেই নতুন রাজত্বে, জঙ্গল কেটে সেখানে গড়ে উঠছে নতুন সহর, সেইখানে নতুন করে গড়বো আমাদের সংসার। সেখানে আমি সমুদ্র নয় আমি মিষ্টার মুখার্জ্জি!

—নাম বদলেছ?

—বদলাবো না? বারে! পুলিশের ভয়ে নিজেকে ভাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছি পৃথিবীর অন্য প্রান্তে—তুমি যখন চাঁদের আলোয় ঘুমিয়ে থেকেছ—আমি তখন প্রচণ্ড রৌদ্রে ছুটোছুটি করেছি কুলি মজুরের কাজ নিয়ে।......

দীর্ঘকাল জাপানে আমেরিকায় কাটাইয়া অনেক ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়া সমুদ্র অবশেষে কেমন করিয়া আজ একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন বড়েই ক্ষকিদার হইয়া বসিয়াছে—সঞ্চয় করিয়াছে প্রচুর অর্থ তাহারই ইতিহাস শুনাইতে বসে হৈমন্তিকে···পাহাড়ের কোলে জঙ্গল ঘেঁষিয়া তাহার বাড়ীখানি, আরামের আর বিলাসের সমস্ত উপকরণ আনিয়া বোঝাই করিয়াছে হৈমন্তির জন্য, শুধু হৈমন্তিকে ঘিরিয়া তাহার এতদিনের স্বপ্ন আর সাধনা।

—একবারও তো খোঁজ নিলেনা, যদি মরে যেতুম?

—কক্ষণো না, আমি নিশ্চয় জানতাম হৈম, আবার আমাদের দেখা হবে। আমার তপস্যা ব্যর্থ হবে না।

হৈমন্তিও সমুদ্রর মতন অমন সুন্দর করিয়া বলিতে চায় কিন্তু বলিতে পারে না, বুকের ভিতর মাথা রাখিয়া কাঁদিতে পারে শুধু।

কান্না আর কথার মধ্য দিয়া রাত্রি গভীর হইতে থাকে···শেষ রাত্রে হৈমন্তিকে লইয়া পলাইয়া যাইবে সমুদ্র, রোমাঞ্চকর সেই কল্পনায় মুখর হইয়া ওঠে সে—পরের বৌ নিয়ে পালানোয় তো নতুনত্ব নেই হৈম, তাই নিজের বৌ নিয়ে পালাবো আমি, বেশ চমৎকার মৌলিক হবে না ব্যাপারটা?

তুমি অমন কাঁদছো কেন বলতো? কত পাহাড় জঙ্গল ডিঙিয়ে কত অগাধ সমুদ্র পার হয়ে ফিরে এলাম তোমার কাছে—সারা রাতটুকু কেঁদেই নষ্ট করবে?......আচ্ছা এদিকে কেউ এসে পড়বে না তো? এতদিন পরে আবার ধরা পড়তে রাজী নই কিন্তু।

—কেই বা আছে? নতুন ঠাকুমা সিঁড়ি উঠতে পারেন না, শ্যামা ঠাকুরঝির ভূতের ভয়, সন্ধ্যে হলে ঘরের বার হয় না।

—তা' হলে আজকের রাতটুকু নির্ভয়ে আশ্রয় পেতে পারি তোমার ঘরে?

ঘরে খিল লাগাইয়া সাবধানে আলো জ্বালে হৈমন্তি।

—ঘরের চেহারাটা প্রায় একই রকম রেখেছ দেখছি, কি আশ্চর্য্য লাগছে হৈম, সেই পালঙ্ক, সেই আয়না দেরাজ ছবি আলমারি, সেই জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে তোমার মুখে, সেই তুমি প্রায় তেমনিই সুন্দর রয়ে গেছ, যেন কিছুই পরিবর্তন ঘটেনি তোমার জীবনে, যেন কিছুদিনের জন্য শুধু বিদেশ ঘুরে এলাম—অথচ কত ঝড় বয়ে গেল আমার জীবনে···

টুকরো কথা···টুকরো হাসি······এ ছবি কার? গুরুদেব টেব নয় তো? কী আশ্চর্য্য, এই হতভাগার ছবিতেও মালা ঝোলে? নিলাম এটা আমি, আজ আমার



শোভাযাত্রা : —সুনীল পাল

পাওনা। বিশ্রী এই ... ফুলের মালা মাচ করে না ... ...কাপড়? ধুতি? ধুতি কি ... শার্টের পকেটে নিয়ে বেড়াচ্ছ?...তুমি দেখে? আমার জামা কাপড় ... রেখেছ এতকাল ধরে? হৈম...হৈম...

—তুমি কি কাউকেই দেখা... ? নতুন ঠাকুমা, শ্যামা, ক্ষীরোদা—কাউকে বলব না?

—পাগল হয়েছ? বললে চাঁপা, থাকবে না, ষ্টেশনে ষ্টেশনে ছলিয়া বেরিয়ে যাবে। রূপকথার রাজপুত্তুর পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে এসে রাতারাতি দুঃখিনী রাজকন্যাকে নিয়ে উধাও···দেখছো···খুব বুড়ো হয়ে যাইনি কিন্তু···হৈম, এত সুখ কি আমার জন্যে সত্যিই তোলা ছিল?······

কথার শেষ নাই, রাত্রির শেষ আছে। পাণ্ডুর চাঁদের ফ্যাকাশে হলদে আলো ভোরের নতুন আলোর কাছে সহসা কোন ফাঁকে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিবে কে জানে।

হয়তো একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল··· তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া সমুদ্র হৈমন্তিকে ডাকিয়া তোলে—'মিসেস মুখার্জি' উঠুন উঠুন—তৈরী হয়ে নিন, চারটে চল্লিশের ট্রেণ ধরতে হবে, অবাক হয়ে তাকাচ্ছো কি? মনে নেই আমি আর শ্রীল শ্রীযুক্ত সমুদ্র-নারায়ণ মজুমদার নয়—মিষ্টার এস মুখার্জি, কাজেই তুমি মিসেস মুখার্জি।···তোমার ওই আধা ধুতির মত বিশ্রী শাড়ীটা আমার ভারী খারাপ লাগছে কিন্তু, ভালো একটা কিছু পরে নাও চট করে।

—ভালো আর কি আছে? হৈমন্তি ম্লান হাসে।

আশু বৈধব্যের জন্য প্রস্তুত হইতে চওড়া পাড় শাড়ী অনেক দিন ছাড়িয়াছে সে।

—তবে থাক, যা আছে থাক, মনের সাধ মিটিয়ে সাজাবো এর পরে—শুধু দেরী করে ফেলো না লক্ষ্মী রাণী আমার, সকাল হয়ে গেলে, ভাব অবস্থাটা।

হৈমন্তি শূন্য দৃষ্টি মেলিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখে···এই তাহার চিরপরিচিত আবেষ্টন, তাহার ধ্যান, ধ্যানের দেবতা, শুচিস্মিত নির্মল জীবনখানি, এই মুহূর্তে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। শুধু মালা গাঁথিয়া ফুল ভাসাইয়া বাকী জীবনটুকু কাটানো যায় না? সহসা সমুদ্রের এই রূঢ় পোষাকপরা বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহখানা হৈমন্তির নির্জন একক শয্যায় বেমানান অশুচি লাগে। হৈমন্তির জীবনে সমুদ্র কি অবান্তর নয়? লতাকার রক্তমাংসে গড়া সমুদ্র, পুরুষের দাবী লইয়া যে ডাক দিল? ছবি লইয়াও তো দিন কাটিতেছিল মন্দ নয়! রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে হৈমন্তিকে লোকে বলিবে কি? শ্যামা আর ক্ষীরোদা যখন পাড়ায় পাড়ায় রটাইয়া আসিবে হৈমন্তির নিরুদ্দেশের খবর।

—আমায় ক্ষমা করো।

কে বলিল? হৈমন্তি? সমুদ্রের পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িয়া যে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে?

হতবুদ্ধি সমুদ্র শুধু প্রশ্ন করিতে পারে—যাবে না?

—আমায় ক্ষমা করো।

—কি আশ্চর্য, বলছো কি তুমি? সিদ্ধির দরজায় এসে আমার সমস্ত সাধনা ব্যর্থ হয়ে যাবে? হৈম পাগলামি কোরোনা।

—তবে তুমি পরিচয় দিয়ে দিনের আলোয় নিয়ে চলো।

—তার মানে সাধ করে ফাঁসির দড়ি গলায় পরি? রাত্রের অন্ধকারে লুকিয়ে যাবার সাহস তোমার নেই? আমার সঙ্গেও না? তুমি কি বলছো বুঝতে পারছো না হৈম, ফিরিয়ে দেবে আমাকে? মিথ্যা দুর্নামকে এত ভয়?

—আমায় ক্ষমা করো।

হাঁ, সমুদ্র ক্ষমা করিয়াছে বৈ কি। রাত্রির অন্ধকারে ভোজবাজীর মত মিলাইয়া গিয়াছে ভবিষ্যতের সমস্ত সম্ভাবনা মুছিয়া দিয়া।

কিন্তু হৈমন্তি এ করিল কি?

মাতালের মত কতক্ষণ পড়িয়াছিল কে জানে, হুঁস হইল শ্যামার তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সুরে···

—বলি বৌদি কি আজকাল বুট পরে বিড়ি সিগরেট খেয়ে বেড়াচ্ছ নাকি? সারা দালানে জুতোর ছাপ, দেশলাই কাঠি, পোড়া সিগারেট, বাকী আর কিছু রইল না—জরি পেড়ে ধুতি চাদরও কি রাত বিরেতে পরো নাকি? হা গোবিন্দ, হা গোবিন্দ, নতুন দিদিমা বোঝে ঠিক।

··· ···

এবং খানিক পরে উদ্দাম হইয়া ওঠে নতুন গিন্নির কণ্ঠস্বর···খবরদার বলে দিচ্ছি শামি ও যেন লক্ষ্মীর ঘরের ছায়া মাড়াতে না আসে, ঠাকুরদালানের পৈঠেয় পা ঠেকায় না। মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দূর করে দিতে হয় অমন বৌকে···বুকে বসে দাড়ি ওপড়ানো? হরিনারায়ণ মজুমদারের ভিটেয় এখনো সন্ধ্যে পিদিপ পড়ছে—এত অনাচার ধর্মে সইবে না, ধর্মে সইবে না।

চক্রব্যূহ

[১১১ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

ঘর! খাটের ওপরে পুরু করে বিছানা পাতা—তাতে ধবধবে চাদর। একটা ছোট টেবিলে একটিন সিগারেট, দেশলাই। পেট মোটা রূপার সিলকরা বোতল, গেলাস। বাঞ্ছা স্বপ্ন দেখছে নাকি?

—এ ঘর তোমার!

—হাঁ আমার।

—কিন্তু এসব পেলে কোথায়? কী এ সমস্ত?

সে কথার কোনো জবাব দিলে না মল্লী। বললে, পরশু রাতে তুমি পালিয়েছ শহরের জেল থেকে?

—হুঁ।

—এখানে খবর এসেছে। দাদার মতিগতি খারাপ—তোমাকে দেখলেই ধরিয়ে দেবে। এখনি পালাও।

—ধরিয়ে দেবে! পালাব? কেন?

—কেন? মল্লী হাসল—হাসিটা কান্না না একটা বীভৎস মুখভঙ্গী?—বুঝতে পারছ না এখনো? দেখে আসোনি মিলিটারীদের আস্তানা? ঘরের চেহারা দেখছ না? বুঝতে পারো না এতবড় আকালে আমরা বেঁচে আছি কী করে—রাজার হালে আছি?

রূপকথার গল্পে ডাইনির চুলের ছোঁয়ায় পাথর হয়ে গিয়েছিল রাজপুত্র। বাঞ্ছার গায়েও যেন সেই ডাইনির সাপের মতো চুলের ছোবল লেগেছে এসে। পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত যেন হিম হয়ে আসছে তার—যেন জমে যাচ্ছে। শুধু বিহ্বল দৃষ্টিতে সে দেখছে কী চমৎকার সাজানো ঘরখানা। রাজবাড়ীর মতো বিছানা—রাজকন্যার মতো সেজেছে মল্লী। তার গায়ের থেকে আসছে পাউডারের গন্ধ। টেবিলে দেশলাই—সিগারেট, মদের বোতল, গ্লাস।

যুদ্ধার্থী বীরের জন্য প্রেম মালা নিয়ে প্রতীক্ষা করছে বীর-ভোগ্যা সুন্দরী নারী।

বাইরে নাগড়া জুতোর শব্দ। মল্লীর মুখ পাংশু হয়ে গেল।

হাঁক দিলে বদন চৌকীদার। মল্লী!

পাণ্ডুর মুখে মল্লী জবাব দিলে, উঃ?

—ঘরে লোক আছে?

—হুঁ! এক মুহূর্ত বাঞ্ছার বলির পশুর মত চেহারাটার দিকে তাকালো সে। তারপরে জবাব দিলে: সায়েব এসেছে।

—আচ্ছা—

পায়ের নাগড়া জুতো মচমচিয়ে বদন বেরিয়ে গেল।

আজ আর মল্লীর পরিচয় বাঞ্ছার স্ত্রী হিসেবে নয়। মিলিটারীদের গণিকা সে—বদনের উপজীবিকা, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বচ্ছলতা। এত বড় পৃথিবী—মুক্ত পৃথিবী—তারায় ভরা আকাশ, নিঃসীম দিগ দিগন্ত। কিন্তু বাঞ্ছার স্থান কোথায়, আশ্রয় কোথায়? চারিদিক থেকে কঠিন ফাঁসির দড়ি তার গলায় আটকে পড়বার জন্য এগিয়ে আসছে—চারদিকের পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে আসছে—জেলখানার ষাঁড়ের রুক্ষ তোলা পাঁচীলের চাইতেও আরো—আরো—আরো সংকীর্ণ।

অন্ধকারের মধ্যে মাঠ ভেঙ্গে ছুটেছে বাঞ্ছা। কে যেন তাকে পেছনে পেছনে তাড়া করে আসছে। পুলিশ নয়—চৌকীদার নয়। তারায় ভরা আকাশ—সীমাহীন পৃথিবী—অসীম মুক্তিই আজ তাকে গ্রাস করতে চায়—হত্যা করতে চায়।

থানায় গিয়ে ধরা দেবে সে। বলবে: দয়া করো, দয়া করো আমাকে। জেলে পাঠিয়ে দাও। পাঁচ বছর নয়, দশ বছর নয়—যাবজ্জীবন। দ্বীপান্তর। কালাপানির ওপারে—যেখানে সমুদ্র—যেখানে এতবড় পৃথিবীটা কারো শক্ত হাতের মুঠির মতো ছোটো হয়ে গেছে।




পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই যে মুখে মুখোশ পরিয়া ছদ্মবেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এই গূঢ় তত্ত্বটির প্রতি সাধারণের সতর্ক মনোযোগ আকর্ষণ করা প্রয়োজন। আমি আপাততঃ মাত্র চারিটি চরিত্র নমুনাস্বরূপ সর্ব্বসমক্ষে হাজির করিতেছি, আশা করিতেছি এই চারিটি

তাহা টিপিলেই হাঁড়ির খবর আর কাহারও অবিদিত থাকিবে না।

অর্দ্ধ শতাব্দীকাল পৃথিবীতে বাস করা সত্ত্বেও নরেশবাবু শরীরটিকে দিব্য তাজা রাখিয়াছিলেন, চুলও যাহা পাকিয়াছিল তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। তাঁহার সৌম্য সুদর্শন চেহারাখানি দেখিলে তাঁহাকে একটি পরম শুদ্ধাচারী ঋষি বলিয়া মনে হইত। অবশ্য গোঁফদাড়ির হাঙ্গামা ছিল না, তিনি প্রত্যহ সযত্নে ক্ষৌরকার্য্য করিতেন; সুচিক্কণ মুণ্ডিত মুখমণ্ডলে একটি স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক হাসি সর্ব্বদাই ক্রীড়া করিত। চোখের চাহনিতে এমন একটি স্বপ্নাতুর সুদূর-দুর্লভ আবেশ লাগিয়া থাকিত যে, মনে হইত তাঁহার প্রাণপুরুষ পৃথিবীর ধূলামাটি হইতে বহু ঊর্দ্ধের ত্রিগুণাতীত তুরীয়ানন্দে বিভোর হইয়া আছে। মোট কথা তাঁহাকে দেখিলে মানুষের মনে স্বতঃই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্ভ্রমের উদয় হইত।

নরেশবাবু বিবাহ করেন নাই। সারা জীবন বিদেশে থাকিয়া তিনি ব্যবসাদি দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিয়াছেন; এখন বোধ করি 'পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ' এই নীতিবাক্য স্মরণ করিয়া ব্যবসাবাণিজ্য গুটাইয়া দেশে ফিরিয়াছেন, কলিকাতায় একটি বাসা ভাড়া লইয়া বাস করিতেছেন। নিরুদ্বেগ শান্তিতে জীবনের বাকি দিনগুলি উপভোগ করিবেন ইহাই ইচ্ছা।

বিদেশ হইতে নরেশবাবু একটি অনুচর সঙ্গে আনিয়াছেন, তাহার নাম বাঘাবৎ সিং—সংক্ষেপে বাঘা সিং। নামটি যে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি নয় তাহা তাহার চেহারা দেখিলেই বুঝা যায়। বসন্তের গুটিচিহ্ন আঁকা হাঁড়ির মত একটা মুখ, তাহার মধ্যে ছোট ছোট ধূর্ত্ততাভরা চক্ষু দুটি সর্ব্বদা ঘুরিতেছে, যেন একটা ছুতা পাইলেই টুঁটি কামড়াইয়া ধরিবে। দেহখানা আড়ে-দীঘে প্রায় সমান। হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বা কালো রঙের পাঞ্জাবী পরিয়া এবং মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ী চড়াইয়া সে যখন বুক চিতাইয়া পথ দিয়া হাঁটে, তখন সম্মুখের ভদ্র পথিক অপমানের ভয়ে সশঙ্কে পথ ছাড়িয়া দেয়। বাঘা সিং নরেশবাবুর পুরাতন ভৃত্য। সে কোনও কাজ করে না, কেবল বাড়ীর সদর দরজার পাশে টুল পাতিয়া বসিয়া থাকে; তাহার অনুমতি না লইয়া তাহাকে ডিঙ্গাইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে এমন সাহস কাহারও নাই। সারাদিন টুলের উপর বসিয়া বাঘা সিং পান চিবায়, পানের গাঢ় রস তাহার কস্ বহিয়া গড়াইতে থাকে; যেন সে কাঁচা মাংস চিবাইতেছে।

নরেশবাবুর বাড়ীটি ছোট, ছিমছাম 'দ্বিতল'। পাশেই আর একটি ছোট বাড়ী আছে, সেটি একতলা। পুরানো বাড়ী, উপরে কোমর পর্য্যন্ত পাঁচিল-ঘেরা ছাদ। এই বাড়ীতে যিনি বাস করেন তাঁহার নাম দীননাথ। নিরীহ ভাল মানুষ লোক, সামান্য কেরাণীগিরি করেন। শীর্ণ কোলকুঁজো ধরণের চেহারা, মোটা চশমার ভিতর দিয়া যেভাবে পৃথিবীর দিকে তাকান তাহাতে মনে হয় তিনি পৃথিবীকে ভয় করিয়া

মুখোশ

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ন

স,

রয়া

হইলে

সে ছুটিয়া গিয়া ছাদের আলিসার উপর বুক পর্য্যন্ত ঝুঁকাইয়া নীচে রাস্তার পানে তাকাইয়া দেখে; তাহার গায়ের কাপড় সব সময় ঠিক থাকে না, অতি তুচ্ছ কারণে অসম্বৃত হইয়া পড়ে।

নরেশবাবু নিজের দ্বিতলের জানালা হইতে অমলাকে দেখিয়াছিলেন এবং মনে মনে একটি মন্তব্য করিয়াছিলেন। মন্তব্যটি ঋষি-জনোচিত কি না বলিতে পারি না, কারণ সেকালের মুনিঋষিরা নারীজাতি সম্বন্ধে মনে মনে কিরূপ মন্তব্য করিতেন তাহার কোনও নজির নাই। কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর বাংলা ভাষায় উহা একেবারেই অচল। 'ছলনা' শব্দটা অসভ্য ইতরজনের মুখে মুখে অপভ্রষ্ট হইয়া বড়ই বিশ্রী আকার ধারণ করিয়াছে।

অমলাও নরেশবাবুকে দেখিয়াছিল। অমলা ছাদে উঠিলেই নরেশ বাবু নিজের জানালায় আসিয়া দাঁড়াইতেন; আকাশের পানে এমন মুগ্ধভাবে তাকাইয়া থাকিতেন যেন ঐ দুরবগাহ নীলিমার মধ্যে তাঁহার সাধনার পরম বস্তুকে খুঁজিয়া পাইয়াছেন। মাঝে মাঝে চক্ষু নীচের দিকে নামিত, মুখের হাসিটি আরও মুগ্ধ-মধুর হইয়া উঠিত। অমলার মনে বোধ করি শ্রদ্ধার উদয় হইত; সে সঙ্কুচিতভাবে গায়ের কাপড় সামলাইয়া, চলনভঙ্গীকে অতিশয় মন্থর করিয়া, পিছনে দু'একটি চকিত দৃষ্টি হানিতে হানিতে নীচে নামিয়া যাইত।

দীননাথ এসবের কিছুই খবর রাখিতেন না। অফিস হইতে ফিরিতে তাঁহার সন্ধ্যা হইয়া যাইত; তাড়াতাড়ি এক পেয়ালা চা ও কিছু জলখাবার গলাধঃকরণ করিয়া তিনি বাহিরের ঘরের জানালার পাশে তক্তপোষে গিয়া বসিতেন, তাক হইতে একটি পেঙ্গুইন-মার্কা ইংরেজি ডিটেকটিভ উপন্যাস পাড়িয়া লইয়া তক্তপোষের উপর কাত হইয়া শুইয়া পড়িতে আরম্ভ করিতেন। অমলা আসিয়া তাঁহার সহিত কথা বলিলে তিনি নির্ব্বিচারে হুঁ দিয়া যাইতেন, কারণ কথাগুলি তাঁহার এক কান দিয়া প্রবেশ করিয়া সোজা অন্য কান দিয়া বাহির হইয়া যাইত, ক্ষণেকের জন্যও মস্তিষ্কের কাছে গিয়া দাঁড়াইত না।

একদিন অমলা বলিল,—'বাবা, পাশের বাড়ীতে নতুন ভাড়াটে এসেছে, তুমি দেখেছ?'

দীননাথ বলিলেন,—'হুঁ।'

অমলা বলিল,—'আমিও দেখেছি—বোধহয় খুব সাধু লোক। জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আকাশের পানে চেয়ে থাকে—'

'হুঁ।'

'ঝি বলছিল ওঁর বাড়ীর দরজায় একটা ভুষ মনের মত লোক বসে থাকে, দেখলেই ভয় করে।'

'হুঁ হুঁ' বলিয়া দীননাথ বইয়ের পাতা উল্টাইলেন।

এমনি ভাবে কয়েক হপ্তা কাটিবার পর একদিন সকাল বেলা ছাদে কাপড় শুকাইতে দিতে গিয়া অমলা দেখিল, একটি কাগজের মোড়ক ছাদে পড়িয়া রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি মোড়ক খুলিয়া দেখিল, ভিতরে একটি রাঙা টকটকে গোলাপ ফুল। অমলা চোখ বাঁকাইয়া জানালার দিকে তাকাইল; নরেশ-বাবু স্নিগ্ধ হাসি হাসি মুখে আকাশের পানে তাকাইয়া আছেন, তাঁহার গায়ে চাঁপা রঙের একটি সিল্কের কিমোনো সদ্যঃস্নাত তরুণ তাপসের অঙ্গে গৈরিক বসনের মত শোভা পাইতেছে।

ফুলটিকে অমলা পূজার নির্ম্মাল্য বলিয়া মনে করিল কিনা কে জানে; সে নরেশ-বাবুর দিকে চোখ তুলিয়া একটু হাসিল, তারপর ফুলের দীর্ঘ আঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া সেটি খোঁপায় গুঁজিল। নরেশবাবু একবার চক্ষু নামাইলেন এবং মনে মনে একটি মন্তব্য করিলেন। লোহা গরম হইয়াছে বুঝিয়া তাঁহার মুখের হাসি আরও স্বর্গীয় সুষমাপূর্ণ হইয়া উঠিল।

* * *

অফিসে বড় সাহেবের শাশুড়ী মারা গিয়াছিল, এই আনন্দময় উপলক্ষে অর্দ্ধদিনের ছুটি পাইয়া দীননাথ দ্বিপ্রহরেই বাড়ী ফিরিলেন। পথে আসিতে একটি ডাব কিনিয়া লইলেন। অমলা ডাব খাইতে চাহিয়াছিল। অমলা চিনি দিয়া ডাবের কচি শাঁস খাইতে ভালবাসে; ডাবের জলটা দীননাথ পান করেন।

বাড়ী আসিয়া দীননাথ ধড়াচূড়া ছাড়িলেন, তারপর দা লইয়া ডাব কাটিতে বসিলেন। অমলা গেলাস চামচে প্রভৃতি লইয়া কাছে বসিল। দু'জনের মুখেই হাসি। অমলা বলিল,—'খুব কচি ডাব, না বাবা?'

দীননাথ ডাবের মাথায় এক কোপ বসাইয়া বলিলেন, 'হুঁ। তুলতুলে শাঁস বেরুবে। আমাকে একটু দিস।' অমলা বলিল, 'আচ্ছা। তুমিও আমাকে একটু জল দিও।'

এই সময় সদর দরজার কড়া নড়িল। ঝিয়ের এখনও আসিবার সময় হয় নাই, তবু ঝি আসিয়াছে মনে করিয়া অমলা দ্বার খুলিতে গেল।

মিনিট খানেক পরে অমলা ছুটিতে ছুটিতে ফিরিয়া আসিল; তাহার হাতে একটা দশ টাকার নোট ও গোলাপী রঙের একখানা চিঠি। সে কাঁপিতে কাঁপিতে বাপের পাশে বসিয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল,—'ও বাবা, এ সব কী দ্যাখো!'

দীননাথ চিঠি পড়িলেন এবং নোট দেখিলেন; তারপর দা তুলিয়া লইয়া তীরবেগে বাহির হইলেন। বলা বাহুল্য, চিঠিখানি নরেশবাবুর লেখা এবং নোট-খানিও তাঁহারই—বাঘা সিং লইয়া আসিয়াছিল।

নরেশ বাবু দ্বিতলের জানালায় দাঁড়াইয়া দীননাথের সদর দরজা লক্ষ্য করিতেছিলেন। হঠাৎ দেখিলেন, তাঁহার বাঘা সিং উঠিপড়ি

[ইহার পর ১৩৪ পৃষ্ঠায়]

মহামিলন

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন ছিল রবিবার। সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গবার পর বিছানা ছেড়ে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় মনে পড়ে গেল আজ ছুটি। আঃ—বিছানা ছাড়তে আর ইচ্ছা হলো না। পাশ বালিসটিকে খুব আদর করে জড়িয়ে চক্ষু বুজে পড়ে রইলুম, আর মনে মনে জপ করতে লাগলুম—আজ ছুটি, আজ ছুটি! অনেক রকম সুখ উপভোগ করে দেখেছি; কিন্তু রবিবারের ভোর বেলায় চক্ষু বুজে চিৎ হয়ে চুপ করে পড়ে থাকার মত শান্ত আনন্দ আর যে কিছুতে নেই, একথা আমি শপথ করে বলতে পারি। ভাগবতাচার্য্যরা যে বর্ণনা করেছেন ভগবান ক্ষীর সমুদ্রে চিৎ হয়ে চক্ষু বুজে শুয়ে আছেন, একথা আমি হাড়ে হাড়ে বিশ্বাস করি। অন্ততঃ আমি যদি ভগবান হতুম তা' হলে আমি যে তাই করতুম, তাতে আর সন্দেহ নেই। ভগবানের বুদ্ধিকে মনে মনে তারিফ করছি, এমন সময়—"কড়াং কড়াং কড়াং কট কট কট—দা, ও দাদা, বাড়ীতে আছো?"

লে বাবা! রবিবারে ছুটির দিন যে একটুখানি ভগবানের মহিমা ধ্যান করবো, তারও জো নেই। সকাল বেলা কোন পাষণ্ড এসে উপস্থিত! একবার মনে হলো চুপটি ক'রে পড়ে থাকি; বিপদ আপনা আপনি কেটে যাবে, কিন্তু তা হ'য়ে উঠলো না। ওদিকে আবার আরম্ভ হলো—খট খটাং খট খটাং খট খটাং; ও দাদা, দাদা গ!!

নাঃ—সংসার যে অনিত্য তাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। এই দুঃখেই বুদ্ধদেব বিবাগী হয়ে বেরিয়ে গিছলেন। আর এই ছোঁড়াগুলো—এগুলোই বা কি রকম পাজী! সকাল বেলা মানুষের ঘুম ভাঙ্গিয়ে বেড়াবে—একটু দয়া নেই, মায়া নেই। সরকার বাহাদুর যে এদের আনারকিষ্ট (anarchist) ব'লে জেলে পুরে দেন, তা ঠিকই করেন দেখতে পাচ্ছি। ভোর বেলা যারা লোকের ঘুম ভাঙ্গাতে পারে তারা নিশ্চয়ই খুন করতে পারে। তারা outlaw নয় ত কি?

দরজা খুলে দেখি পণ্টু দাঁত বের করে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার পিছনে আধ ডজন ফৌজ।

রাগে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলে গেল। আমি বললুম—হাঁ রে পণ্টু, তোদের কি একটা পরকালের ভয় নেই? ভোর বেলা মানুষ যে একটু ভগবানের নাম করবে, তোরা তাও করতে দিবিনে?

পণ্টু তেমনি দাঁত বের করে বললে—"তার জন্যে তাড়াতাড়ি কি? ভগবান ত আর পালিয়ে যাচ্ছেন না! আর শুধু শুধু তাঁকে ডেকে ডেকে ব্যস্ত করবারই বা দরকার কি? সময় নেই, অসময় নেই, যখন তখন ডাকাডাকি করলে তাঁরও তো যোগনিদ্রার ব্যাঘাত হতে পারে!"

আমি ভেবে দেখলুম—পণ্টু ছেলেটার বুদ্ধি শুদ্ধি আছে। ভোর বেলা ডাকাডাকি করে ঘুমন্ত ভগবানকে জাগিয়ে তুলে শেষে হয়ত পস্তাতে হবে। কাজ কি বাবা, গোলমালে?

পণ্টু বললে—"পণ্ডিতজীর ওখানে এখনি যেতে হবে, একটা মিটিং আছে। হিন্দু-মুসলমানে কি করে মিল হয়, তার আলোচনা হবে। জানেন ত ঐ মিলনটুকুর জন্যেই স্বরাজ আটকে আছে। পণ্ডিতজী বলে দিয়েছেন আপনার আসা চাই-ই-চাই।"

যখন চাই-ই-চাই তখন আর কথা কি? চটি জুতো জোড়া পায়ে দিয়ে আল্লা-শ্রীহরি স্মরণ করতে করতে ঠুক ঠুক করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। পণ্ডিতজীর আড্ডায় গিয়ে দেখি রামা, শ্যামা, যদো, মধো, ক্যাবলা সবাই উপস্থিত; আর তার মাঝখানে মিলন-সঙ্গীত গাইবার জন্য উন্মুখ হয়ে আমাদের খদ্দরপরিহিত রাইচরণ চক্ষু বুজে হারমোনিয়ম কোলে করে বসে আছে।

পণ্ডিতজী আমায় দেখে বললেন—"এসো ভায়া, এস। ছেলেরা আজ হিন্দু-মুসলমানের মিলন না করে ছাড়বে না। এখন বাংলাও তার পন্থা।"

আমি অত্যন্ত বিনীত কণ্ঠে নিবেদন করলুম—"পণ্ডিতজী এই গুরুভার আমার দুর্ব্বল স্কন্ধে চাপাচ্ছেন কেন? শুনেছি নাকি আকবর বাদশা এই কার্য্য করতে একবার চেষ্টা করেছিলেন। ফলে হয়েছিল আলমগীর বাদশার উৎপত্তি, আর কাশ্মীর থেকে কাশী পর্য্যন্ত হিন্দু-মন্দিরের মুসলমানী সংস্কার। মাঝে আমাদের পণ্ডিতেরা সত্য-পীরের সঙ্গে সত্যনারায়ণের অভিন্নতা প্রতিপন্ন ক'রে পীর সাহেবকে সিন্নি খাইয়ে তুষ্ট করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু এখন ত মনে হচ্ছে পীর সাহেব সিন্নিও খেয়েছেন, আর তরাও ডুবিয়েছেন। আর সেই দিন ত স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী খিলাফতী সূত্রে হিন্দু-মুসলমানকে গেঁথে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন ত দেখছি সেই মহা-মিলনের ফলে উৎপন্ন হয়েছেন—কায়েদে আজম মহম্মদ আলি জিন্না। where angels fear to tread সেখানে আমি গিয়ে কি করবো?"

রাইচরণ এইবার চক্ষু চেয়ে ব্যথিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—"তা'হলে কি হিন্দু-মুসলমানের মিল কখনো হবে না?"

বেচারার ম্লান মুখ দেখে আমার বড় কষ্ট হলো। আমি বললুম—"আচ্ছা রাইচরণ, এক ধর্ম্মপন্থার সঙ্গে অন্য ধর্ম্মপন্থার গরমিল ত চিরদিনই আছে। বেদান্তীর সঙ্গে বৈষ্ণবের গরমিল, শাক্তের বৈষ্ণবের গরমিল—এ সব ত অনেক কালের জিনিষ। এ সব গরমিল সত্ত্বেও কেউ ত মনে করে না যে, একটা মিটমাট না হলে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। তবে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্যেই বা তোমরা অত উঠে পড়ে লেগেছ কেন?"

রাইচরণ বললে—"দেখছেন না, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অভাবে কি সর্ব্বনাশ হচ্ছে—দাঙ্গা, মারামারি, রাজনৈতিক deadlock!"

আমি বললুম—"তা হলে ব্যাপারটা আসলে ধর্ম্মমতের ভেদ নয়; কে বড়, কে ছোট; কে মোড়লী করবে, কে তাঁবেদারী করবে, তাই নিয়ে মতভেদ। এ একটা অহঙ্কারের লড়াই। এই সব দলাদলির যাঁরা শিক্ষাগুরু, যাঁরা ইহকাল সম্বন্ধে নিরেট মুর্খ হলেও মনে করেন যে, পরকাল সম্বন্ধে সব বিদ্যা তাঁরা মেরে দিয়েছেন, যাঁদের বিশ্বাস যে, ভগবান সব তত্ত্বকথা একখানা পুঁথির ভিতর পুরে তাঁদের কাছে জিম্মা করে দিয়েছেন, যাঁরা ঠিক করে ফেলেছেন যে, তাঁদের যাঁরা জয়গান না করেন, ভগবান তাঁদের ভবিষ্যতে নরকে ফেলে ছেঁচকি-পোড়া করবেন, সেই সব মহাপুরুষদের অহঙ্কারের মাত্রা কমলেই আপাততঃ কাজ চালানো গোছের মিল হতে পারে।"

পণ্টু বললে—"তা ঠিক; কিন্তু এই অহঙ্কারের মাত্রা কমে কিসে?"

পণ্ডিতজী এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এইবার বললেন—"দেখ ভায়া, অহঙ্কার কমাবার একটা পেটাণ্ট মেশিন টেশিন যদি বার করতে পার, তা হলে শুধু হিন্দু-মুসলমান কেন, ইউরোপ আমেরিকার খৃষ্টান মহলেও তার খুব কাটতি হবে। যে সমস্ত বীরপুরুষেরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঘাড়ে চড়ে শান্তি ও সাম্যের বচন আওড়াচ্ছেন, তাঁদের একবার এই পেটাণ্ট মেশিনে ফেলে পরীক্ষা করা যেতে পারে।"

আমি জোড়করে নিবেদন করলুম—"না, পণ্ডিতজী, ও-সব বৃহৎ ব্যাপারের মধ্যে

[ইহার পর ১৩৪ পৃষ্ঠায়]

ব্যর্থ অভিযান

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

(শিকার কাহিনী)

আগুন। চতুর্দ্দিকে আগুন লাগিয়া গিয়াছে, আকাশে নীল দেখা যায় না, অগ্ন্যুত্তপ্ত ধূলিকণা বেগবান বায়ুর সহিত মিশিয়া দৃশ্যপট প্রায় কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। গাছে সবুজ নাই, মাটি দগ্ধ। পোড়া মাটি ফাটিয়া ফাটিয়া কঠিন পাথরের আকার ধারণ করিয়াছে।

সর্ব্বত্র লোহিত আর পিঙ্গলের সমাবেশ। ভয়াল গৈরিক বেশে প্রকৃতি যেন রুদ্ররূপ ধারণ করিয়াছে, অগ্নি বর্ষণে সব কিছু জ্বালাইয়া দিতেছে।

এই আবেষ্টনী ভেদ করিয়া আমাদের মোটরবাস হু হু শব্দে পাহাড়ের পথে ছুটিতেছিল।

বেলা তখন তিনটা হইবে, কাডাপ্পার ডি, এফ, ও মিঃ আমির পাতলার নিকট হইতে পরিচয়পত্র লইয়া স্থানীয় রেঞ্জারের নিকট উপস্থিত হইলাম। তখন বাহিরের মত ভিতরটাও জ্বলিতেছিল, আহার জোটে নাই। আত্মাভিমান দলিত করিয়া বলিয়া ফেলিলাম, শিকারের কথা পরে বলিব, এখন কিছু খাইতে দিন।

ভদ্রলোক আমার মতই সঙ্কোচহীন। নিষ্ঠাবান হিন্দুর যাবতীয় সাঙ্কেতিক চিহ্ন যথেষ্ট উজ্জ্বল থাকা সত্ত্বেও অতিথি সংকারের মহাপুণ্য বর্জ্জন করিয়া ফেলিলেন—জানাইয়া দিলেন, দিবার মত আহার তো কিছুই নাই। যাহার গূঢ় অর্থ বিশ্লেষণ করিলে দাঁড়ায়,—অবেলায় এইরূপ আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না—সুতরাং......।

বিদেশীপন্থী মার্জ্জিতদের নিকট অসময়ে ক্ষুধার কথা বলা বা সামান্য এক কাপ চায়ের উল্লেখও গর্হিত কর্ম্ম। প্রার্থীকে অসভ্য, ছোটলোক বা জঘন্য নিম্নস্তরের জীব ভাবিতে তাঁহাদের কিছু মাত্র অসুবিধা হয় না। কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্ম্মে অভুক্ত অতিথিকে ভগবান বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে। রেঞ্জার প্রাচীনপন্থী ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দু, তথাপি অবলীলাক্রমে ধর্ম্মকেই অগ্রাহ্য করিতে তাঁহার কিছুমাত্র কুণ্ঠা আসিল না। বুঝিলাম ভদ্রলোক হুঁসিয়ার মানুষ। পেনসন লইবার সময় আসিয়া পড়িয়াছে—ভবিষ্যতের সঞ্চয়টা সময় থাকিতে সুরু করিয়াছেন।

অপর দিকে জ্বলন্ত চিতার কাঠ ফাটার মতই উদরাভ্যন্তরে তখন দাহ ক্রিয়া ধুম ক্ষরিয়া চলিয়াছে। উত্তপ্ত পাকস্থলী মোচড় খাইতে খাইতে থাকিয়া থাকিয়া যে হুঙ্কার ছাড়িতেছিল, তাহা দূর হইতে শ্রুত ক্ষুধিত ও ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের রোষধ্বনির মত। ভিক্ষাদানে দাতা বিমুখ হওয়ায় চটিয়া উঠিয়াছিলাম। খুবই স্বাভাবিক, ভিতরকার জ্বালার বাহ্যিক প্রকাশ সহজেই দৃশ্য হইয়া উঠিল। রাগটা পিয়নের উপর চড়াইয়া দিলাম, কঠোরভাবে তাকাইলাম, দৃষ্টির দ্বারা বুঝাইতে চাহিলাম—উঠিবার আগেই আহারের ব্যবস্থা করা হয় নাই কেন? ইহা মেয়াদপির অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং শাস্তি হইবে না কেন? কঠোর দৃষ্টিতে পিয়নের কিছু হইল না—উপরন্তু দেখিলাম, ক্লান্তিতে তাহার ওষ্ঠপ্রান্ত বাণযোজিত ধনুকের ন্যায় নীচু দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। টঙ্কার পড়িলেই উভয় উভয়কে অন্তর্দাহের কথা শুনাইতে থাকিব। ফলে বাণে বাণ ক্ষয় হইবে মাত্র, জ্বালা থামিবে না। দৃষ্টি আপনা হইতে নরম হইয়া গেল। অনুসন্ধিৎসু চোখ অন্ন খুঁজিতেছিল—ভাজার গন্ধ পাইতেছিলাম।

রেঞ্জারের কোয়ার্টারসের সামনে সূর্য্যগামী



বাস থামে, যাত্রীরা লেমনেড খায়, পথের জন্য ভক্ষণীয়ও কিনিয়া লয়, সেই কারণে রাস্তার ধারেই বোড়ে দোষে কারাবুন্দী, আর নানা প্রকারের ভাজা-ভুজি জাতীয় ভক্ষণীয় পাওয়া যায়। আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল ঐ ভাজার দিকে। ইহার ভিতর দুই একজন বিক্রেতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ, তাহারা রেস্তোরের রোয়াকের নীচেই বসিবার অধিকার পাইয়াছে। রেস্তোর স্বয়ং নাকি তাহাদের ক্রেতা। বর্দ্ধিষ্ণু ব্যবসার কারণ খুব সম্ভবতঃ তাঁহার রোয়াক ঝাঁট দেয়া ধুলি ও রাস্তার যাবতীয় উড়ন্ত ময়লার সংমিশ্রণে ভক্ষণীয়গুলি উপাদেয় হইয়া থাকে। পাকপ্রণালীর বৈশিষ্ট্যও উল্লেখযোগ্য—ভাজা কখনও বাসি হয় না। এক সপ্তাহের পুরাতন খাদ্যকে সামনে ভাজিয়া দিলেই তাহা টাট্‌কা হইয়া যায়।

আমি ভাজার দিকে লোলুপ দৃষ্টিসহ অগ্রসর হইতেছি দেখিয়া পিয়ন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পাকপ্রণালীর খবরটি আমাকে দিয়াছিল। সবই শুনিলাম, স্বাস্থ্যবিধির নানা প্রশ্নও উঠিল, শেষ পর্য্যন্ত জঠরাগ্নির জ্বালা সহ্য করিতে পারিলাম না, যা থাকে কপালে হইবে ভাবিয়া কিনিয়া ফেলিলাম মোটা মোটা দোষে। রোয়াকে উঠিয়া আমি নিশ্চিন্ত মনে গ্রাসগুলি বৃহত্তর করিয়া ফেলিতেছি দেখিয়া পিয়নও আমার পথানুসরণ করিল। অন্য বাস-যাত্রীদের সহিত তাহার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার দৃঢ়সঙ্কল্প অকেজো হইয়া গেল।

আহারের পর পুরা দুই গেলাস জল নিঃশেষিত হইতে রেস্তোরের একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। নিকটে আসিয়া বলিলেন—ওরা রাঁধে ভাল। প্রকারান্তরে রাত্রের আহারটাও কিনিয়া লইতে বলিলেন কি না কে জানে।

এইবার গো-যান ব্যবহারের পালা, চৌদ্দ মাইল পথ পাড়ি দিতে হইবে। চাকা থামিলে আট মাইল হণ্টন—পথের শেষে জি, এল, ভাবীর ফরেষ্ট বাংলো। জঙ্গলের ভিতর দিয়া গো-যান যাইবার পথ নাই, ফরেষ্ট বাংলোয় পৌঁছাইতে রাত হইয়া যাইবার ভয়ে তখুনি গরুর গাড়ী ঠিক করিয়া মালসহ উঠিয়া পড়িলাম। রেস্তোর উপরআলায় পত্র ইতিমধ্যে আর একবার পড়িয়াছিলেন। অভয় দিলেন—জঙ্গলের আহারাদির ব্যবস্থার তিনি সুবন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। তখন রাখিলে আছি মারিলে গেছির উপর বেশ আস্থা আসিয়া গিয়াছে—প্রত্যুত্তরে জানাইলাম তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিয়াই বনবাসে চলিয়াছি।

সমস্ত পথটাই আগুনের মত হাওয়া ও তৎসহিত অবিশ্রান্ত ধুলার ঝাপটা ভোগ করিতে করিতে পায়ে হাঁটা পথের নিকট আসিয়া পড়িলাম, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।

মালবহনকারী লোক রেস্তোরের কৃপায় হটলী খাইবার জায়গা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। পিয়নকে বলিলাম, জঙ্গলে ঢুকিবার আগে দোনলাটা ছোট ছর্‌রা ও সিথেল বল ভরিয়া রাখিতে। এত মানুষের গোলমালে বাঘ বা হরিণ ত্রিসীমানায় আসিবে না, তবে ভালুক আর সরীসৃপকে বিশ্বাস নাই। প্রথমোক্তটি অকস্মাৎ কোন ঝোপ হইতে সামনে বাহির হইয়া পড়িলেই সোজা দাঁড়াইয়া আলিঙ্গন দ্বারা অভ্যর্থনা করিতে চাহিবে এবং সাপ পথ চলিতে যদি পায়ে জড়াইয়া মনের সাধে বিষ ঢালিতে চায় তো কিছুই বিচিত্র নয়। একটি নলে নয় নম্বর ছর্‌রা পুরিতে বলিলাম। উপযুক্ত দূরত্ব হইতে গুলী চালাইলে ঢুঁইসাপ হইতে পাইথন পর্য্যন্ত চলৎ শক্তি রহিত হইয়া যাইবে। ভরা বন্দুক হাতে উঠিতেই মেজাজটা ভিন্ন রকমের হইয়া গেল—মালবাহীদের পিছনে রাখিয়া আগে আগে চলিতে লাগিলাম। পায়ে চলা পথ যথেষ্ট স্পষ্ট নয়, কারণ এ রাস্তায় মানুষ একরকম চলে না। দুর্দ্দান্ত হাওয়ায় হ্যারিকেন আলো জ্বালা গেল না,—পথ দেখিবার শেষ অবলম্বন বৈদ্যুতিক টর্চ—তাহাও আট মাইল পথ একটানে জ্বালিয়া রাখিলে আলোর আয়ু শেষ হইয়া যাইবে। অনন্যোপায় হইয়া খানিকটা পথ টর্চ জ্বালিতেছি, খানিকটা অন্ধকারে চলিতেছি। ফরেষ্ট বাংলো ওয়াচায় পথপ্রদর্শক হিসাবে




হিরা মুক্তা পান্না
সেট করা নভেলটীর
জড়োয়া গহনা
সূর্য্যরশ্মির মতই
উজ্জ্বল ও সুন্দর।
নভেলটী জুয়েলারী
৮০-১ বউ বাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা

সামনে হাঁটিতেছে। হঠাৎ ঠিক আমার পিছন হইতে রব উঠিল, পান্থু পান্থু (সাপ), থমকাইয়া দাঁড়াইয়া গেলাম, এদিক ওদিক আলো ফেলিতে দেখি আমার ডান পাশে একটি ঝোপের ভিতর সাপের লেজ ঢুকিয়া যাইতেছে, দেহের শেষাংশ দেখিয়াই অনুমান করা চলে একটি পুষ্ট ও বয়ঃপ্রাপ্ত বিষধর। গতিশীল সরীসৃপকে দুইজনেই টর্চের আলো সত্ত্বেও ডিঙ্গাইয়া আসিয়াছি। ছোবল মারিলে ন' নম্বরের ছররা বাঁচাইতে পারিত না—ভাগ্যগুণে উভয়েই মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইলাম। পথ চলিতেছি, আট মাইল পথ আর শেষ হয় না। বাংলো ওয়াচারকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'আর কত দূর'? উত্তর আসিল, 'বেশী না, যতটা আসিয়াছি আরো ততটা যাইতে হইবে।' ইতিমধ্যে আমরা নিবিড় বনে ঢুকিয়া পড়িয়াছি। টর্চের তীব্র আলো নিবাইয়া দিলে অন্ধকার অকস্মাৎ যেন কালো ভারী ওজনের মত ঘাড়ে আসিয়া পড়িতেছে—গত্যন্তর নাই—সবটা পথ আলো জ্বালাইয়া রাখিলে আসল শিকারের সময় অসুবিধায় পড়িয়া যাইব।

ক্লান্তি শেষ পর্যন্ত অবসাদে আসিয়া পড়িল। কোন প্রকারে পা দুইটা হেঁচড়াইয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। একটা পাহাড় অতিক্রম করিতে জঙ্গলের আবেষ্টনী বদলাইতে আরম্ভ করিল, এদিকে বড় গাছ বিরল, সবই নাতিবৃহৎ ঝোপে পূর্ণ, মাঝে মাঝে বাঁশের ঝাড় দেখা যায়, খাড়াই ঘাস পর্যন্ত নাই। আকাশ হইতে অগ্নি বর্ষণে সব পুড়িয়া গিয়াছে—অধিকাংশ গাছই পল্লবহীন।

দূরে দেখিলাম—কালোর মাঝে সাদা—ওয়াচার বলিল ঐ আমাদের বাংলো। চলাটা আপনা হইতেই দ্রুত হইয়া উঠিল—আস্তানার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পৌঁছাইয়া প্রথমেই প্রাণ ভরিয়া খানিকটা জল খাইয়া লইব। দ্রুত চলিয়াছি, সাদা কিন্তু নিকটে আসিতেছে না—পাহাড়ের দূরত্ব অধিকাংশ স্থলে যে ভ্রমাত্মক তাহা প্রমাণ হইয়া গেল, তবু সান্ত্বনা—আস্তানা দৃষ্টির ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে। চলিতেছিলাম, সামনের মোড়টা ফিরিলেই আমরা বাংলোর অতি নিকটে আসিয়া পড়িব, ওয়াচার আমার অনেকটা আগে অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। মোড়ের কাছে আসিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। জঙ্গলীর দৃষ্টিশক্তি সাংঘাতিক প্রখর, তাহার আচরণ দেখিয়াই অনুমান করিলাম, একটা কিছু দেখিয়াছে। তাড়াতাড়ি টর্চটা বন্দুকে সংলগ্ন করিয়া দুইটা নলই বল দিয়া ভরিয়া লইলাম। তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া আলো ফেলিতে দেখি একটি বিশাল বন্য বরাহ, নিশ্চলভাবে ২৫, ৩০ গজের ভিতর ওয়াচারের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সন্দেহ কাটিলেই আক্রমণ করিবে। টর্চের আলো পড়িতেই ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করিয়া মাথা নীচু করিল, বন্দুক তুলিয়া ট্রিগার টিপিতে যাইব এমন সময় লোকটা হাউমাউ করিয়া বন্দুকের নলের সামনে আসিয়া পড়িল। বরাহ তখন বেগে ছুটিয়া আসিতেছে, ক্ষিপ্রতাসহ বন্দুকের মুখ সরাইয়া ওয়াচারের মাথায় সজোরে নল দিয়া আঘাত করিলাম। লোকটা ছিটকাইয়া পাশে পড়িয়া গেল, উহাই চাহিয়াছিলাম—ইতিমধ্যে জানোয়ার দশ গজের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে—ট্রিগার পড়িল, তাহার সহিত জন্তুও ধরাশায়ী হইল।

ওয়াচারের মাথাটা রীতিমত কাটিয়া গিয়াছিল, প্রায় বেহুঁসের মত মাটিতে পড়িয়াছিল, তাহাকে তুলিয়া পিঠে ঝুলাইলাম—কুস্তীর ওজন নেওয়া এখানে কাজে আসিয়া গেল।

বাংলোয় উঠিতে আর এক ফাঁপরে পড়িলাম। ওয়াচারকে অকারণ মার দিতে পিছনের মালবাহক দুইটি কুলী পালাইয়াছে। তাহাদের মধ্যে একজন জল বহন করিতেছিল। বন্দুকের বাক্সের কুলী পালাইতে পারে নাই, কারণ দুইজনে একটি ভারী বাক্স বহন করিতেছিল। ইচ্ছা করিলেই নামান যায় না। ওয়াচারকে পিয়ন ও অন্য কুলীর জিম্মায় রাখিয়া তৃতীয়টিকে লইয়া পলাতক কুলীর সন্ধানে বাহির হইলাম। কুলীদের পাওয়া গেল না, কিন্তু জলের বড় ফ্লাস্কের সন্ধান মিলিল। প্যাঁচ খুলিয়া সেইখানে বসিয়াই খানিকটা জল খাইয়া ফেলিলাম।

বাংলোয় ফিরিয়া ওয়াচারের ক্ষত স্থানটির first-aid-এর ব্যবস্থা করিয়া দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে জানাইলাম তাহাকে বন্দুকের নল দিয়া না পিটাইলে—নয় বরাহের দাঁত তাহাকে চিরিয়া দোফালা করিয়া ফেলিত অথবা তাহার পূর্ব্বে আমার বন্দুকের গুলীতেই সে মরিত। প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য বাহাদুরী লইবার চেষ্টা করিব না—কারণ ভবিতব্যের ফলে ঘটনাটি ঐরূপ ঘটিয়াছিল—নেহাৎ লোকটির এবং আমার কপাল জোর না থাকিলে কি হইত বলা শক্ত। দুর্ঘটনাগুলির ফাঁড়া কাটাইয়া উঠিতে পুনরায় জলের কথা মনে পড়িল, ক্ষতস্থান পরিষ্কার করিতে অর্দ্ধেকের উপর ফ্লাস্ক খালি হইয়া গিয়াছে, অপর দিকে ক্ষণে ক্ষণে তৃষ্ণায় ছাতি শুকাইয়া উঠিতেছে—জল চাই—রাত্রেই চাই।

ওয়াচার মারের কারণ সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে আমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। জলের কথা উঠিতে বলিল, জল তো কাছেই আছে কিন্তু রাত্রে ওখানে কে যাইবে? এ তল্লাটে ঝৈরণী ছাড়া আর কোথাও জল নাই, সব জানোয়ার ওইখানেই জল খাইতে আসিয়া থাকে—বাঘ, লেপার্ড, সম্বর, ভালুক সব।

ওয়াচার উঠিয়া বলিল, দাঁড়ান দেখি কি ব্যবস্থা হয়, কুলীদের নিকট গিয়া কি বলিল জানিনা—তাহারা দেখি হৃষ্টমনে আমার নিকট আসিয়া হাজির হইল। ওয়াচার আসিয়া জানাইল, বাংলো হইতে একটি কলসী ও সাহেবের ফ্লাস্ক করিয়া আনিতে কুলীরা রাজি আছে যদি আপনি বন্দুক লইয়া উহাদের সহিত যান! অন্ধকার রাত্রে মাটিতে হাঁটিয়া, শিকার যদি পাইয়া যাই মন্দ কি—বাংলোতে উঠিবার আগেই ভাগ্যগুণে একটি পাওয়া গেল বিরাট দাঁতাল

আণবিক

সুশীল রায়

অনবরতই পরমাণু ঝঙ্কার
ভেঙেচুরে দেয় আমাদের প্রত্যহ।
অনবরতই স্বর শুনি শঙ্কার—
হঠাৎ নিখোঁজ হ'লো বুঝি কোন্ গ্রহ॥

নেহাৎ নাচার কুটিল গ্রহের ফেরে
তাই হুঁসিয়ার মেপেজুকে চলি পথ।
না হ'লে কে কার! জয়ী হই, যাই হেরে
কে করে কেয়ার আঁধার ভবিষ্যৎ॥

তাঁবুতে যখন বসতি এবার বাঁধা
শিবির-নিবিড় নগরে যখন বাস,
হোক না তাহ'লে এবার সব সমাধা
ভোরের ভেঁপুতে বাজাবোনা অধিবাস॥

আমাদের প্রত্যহ দেবে রোজ আনি'
নতুন প্রভাত নতুন দখিনা বায়ু—
নাভি শ্বাস তাই অনবরতই টানি'
ভাবি, অর্জন করিলাম পরমায়ু॥

অথচ খেয়াল থাকে না একটুকুও
অণুতে অণুতে ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়,
দুনিয়ার দেনাপাওনা যে সব ভুয়ো!
সাধ যায় তাই হবই দিগ্বিজয়ী॥

রক্তকণিকা অণুর দ্বন্দ্বে ঠাসা
শিরায় শিরায় চলে রোষ আসুরিক।
শোনো অর্যমা, শোনো শেষ জিজ্ঞাসা
তুমি কি অস্ত যাবেই বাস্তবিক?

বরাহ—মাউণ্ট (mount) করিয়া রাখিবার মত ট্রোফি (trophy)। জলাশয় কাছেই, হঠাৎ 'কাছেই' কথাটার মানে আমাকে দমাইয়া দিল, পাহাড়ের বাসিন্দারা যাহাকে কাছে বলে, তাহা আমার নিকট কতটা দূর হইবে কে জানে। মন দ্বিধান্বিত হইয়া গিয়াছিল। পুনরায় ওয়াচারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কাছে মানে কোথায় কতদূর, সে অবলীলাক্রমে বলিল, বেশী নয় আড়াই মাইল। সঙ্গে সঙ্গে আমার তৃষ্ণা আরো বাড়িয়া গেল। ফ্লাস্কটা খুলিয়া দেখিলাম, জল বাড়ে নাই বরং তলার সামান্য ছিদ্র হইতে ফোটার পর ফোঁটা ঝরিতেছে।

বাংলো ওয়াচার ও পিয়ন বাদে চার জন কুলী বাঁশ আর দড়ি লইয়া বরাহ আনিতে গেল। ছাড়িয়া আসিলে হায়নায় খাইয়া ফেলিবে। জন্তুটিকে আনিল হেঁচড়াইয়া, মাত্র চারজনে ঝুলাইয়া আনিতে পারে নাই। পথের ঘষ্টানীতে পেটের খানিকটা অংশ হইতে নাড়ীভুঁড়ী বাহির হইয়া পড়িয়াছে। যাক, মাথাটা নষ্ট করে নাই রক্ষা।

ঘরের ভিতর হ্যারিকেন জ্বালা হইয়াছে—পিয়ন মেজের উপর বিছানা (বিছানা অর্থে মাত্র সাধুবাবার সরঞ্জাম—দুইটি মোটা কম্বল) পাতিয়া দিয়াছে—রাত্রে আহার নাই, ধূলা পায়েই তাহার উপর কাৎ হইলাম। সবে বালিসটা যুৎসইভাবে মাথার তলে রাখিয়াছি এমন সময় অনুভব করিলাম, কোন ক্ষুদ্রাকার দন্তী—হয়ত ছোট ইঁদুর আমার আঙ্গুলের ডগায় দাঁতের ধার পরীক্ষা করিয়া লইতেছে। মনের মত করিয়া শুইয়াছিলাম আর উঠিতে ইচ্ছা করিতেছিল না, অপর পা দিয়া ঝটকা দিলাম। দন্তী চলিয়া গেল, ঠিক এই সময় পিয়ন কি কাজে আর একটি আলো লইয়া ঘরের ভিতর ঢুকিতেছিল—চৌকাঠের বাহির হইতেই চীৎকার করিয়া উঠিল, সার, get up, get up

বাল্যকালে gymnastics-এর নানা কৌশল অভ্যাস করিয়াছিলাম—শুইয়া লাফ মারায় বিশেষ অসুবিধা হয় নাই। বিছানায় দাঁড়াইতে দেখি একটি অতিকায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ লোমশ কাঁকড়া বৃশ্চিক দাঁড়া খাড়া করিয়া আমার যেখানে পা ছিল, সেদিকে চলিয়া আসিতেছে—কি সর্ব্বনাশ আনু-মানিক বিতাড়িত দন্তী দাঁতের নয়, দাঁড়ার ধার পরীক্ষা করিতেছিল। বৃশ্চিক মারার পর মাপিলাম লম্বায় প্রায় ১০ ইঞ্চি। এতবড় জীবন্ত কাঁকড়াবিছার সহিত ঘনিষ্ঠতা ইতিপূর্ব্বে আমার হয় নাই। বিষাক্ত কীটকে খালি সিগারেটের টিনে পুরিতে বেশ সময় লাগিয়াছিল—পুটকায় ঢুকিতে চায় না। কীটটি সংগ্রহ করিয়াছিলাম বালক পুত্রকে উপহার দিব বলিয়া। বর্ত্তমানে সে ২২ বোর রাইফেল দিয়া সাপ মারার হাত পাকাইতেছে। বৃশ্চিক মারা তাহার নিত্যকর্ম্ম। বাবা যে তাহার অপেক্ষা বড় শিকারী প্রমাণ করিবার জন্যই কীটটি পাত্রস্থ করিতে হইল।

সকালের কথা, ঘুম ভাঙ্গিতেই নাড়ীর তল্লাটে দাঙ্গার খবর পাইলাম—হাইজীনের যাবতীয় বৈজ্ঞানিক মত অগ্রাহ্য করিয়া হটলী, কারাবুন্দী, বোড়ে সব হজম হইয়া গিয়াছে—ক্ষুধায় প্রাণ ওষ্ঠাগত—ভিতরে লাঠালাঠি চলিয়াছে। তখনও রেঞ্জারের প্রতিশ্রুতি সফল হইবার কোন লক্ষণ দেখিতেছি না। বাংলো ওয়াচারকে দুঃখের কথা জানাইলাম। সে বলিল—জঙ্গলী কুলীরা এখুনি শুয়োরটাকে পোড়াইবে,—লবণ লঙ্কা আনিতে ইতিমধ্যে দুইজন চলিয়া গিয়াছে—আপনার কি হারামের মাংস চলিবে? শুয়োর হারাম হইল কেন জানি না, কিন্তু পেটে যাইলে যে হারাম থাকিবে না তাহা জানিতাম। pork আমার নিকট একটি সুখাদ্য—কিন্তু মড়া মাংস সুখাদ্য হইয়া ওঠে পাকপ্রণালীর উপর। মসলার যাহা নাম শুনিলাম এবং যাহার অভিজ্ঞতা ইতিপূর্ব্বে লাভ করিয়া-ছিলাম, তাহাতে জঙ্গলীদের রান্না খাইতে সাহস হইল না।

পিয়ন ও প্রভু উভয়েই পাচক হিসাবে নামকরা মানুষ অর্থাৎ রাঁধিলে তাহা খাদ্য হয় না। তথাপি এক চাই পিছন দিককার মাংস লইয়া রাইফেল পরিষ্কার করা গজটা মাঝখানে ফুঁড়িয়া দিলাম। আগুনের ব্যবস্থা হইতে লবণ দিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া আচ্ছা করিয়া পুড়াইলাম, শিক-কাবাব রাঁধিতেছিলাম। সঙ্গে table salt ও টিনে পোড়া প্রাচীন টাটকা মাখন ছিল—মনের সাধে তাহা লেপন করিলাম। অধ্যবসায়ীর চেষ্টা বা আন্তরিকতা থাকিলে কি হইবে—মাখন মাংসের ভিতর ঢুকিল না—আগুনের আঁচে গলিয়া উনানের ভিতর পড়িয়া গেল। এক ধাক্কায় আধ টিন মাখন শেষ করিয়া ফেলিলাম। পিয়ন অভিজ্ঞের মত বলিল—আর বেশী ঝলসাইলে মাংসটা পুড়িয়া যাইবে, উপদেশ মানিলাম। এইবার খাইবার পালা, পিয়নের জন্য খানিকটা রাখিয়া প্রায় সমস্ত মাংসের চাইটাই নিজের করিয়া লইলাম। পিয়নের ভাগ যতটা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে একটি জোয়ান পুরুষের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবে কিনা ভাবিয়া দেখিবার সময় ছিল না—তখন 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' প্রবাদ বাক্যটির অন্তর্নিহিত সত্য উপলব্ধি করিতেছি। রোষ্টের বহিঃদৃশ্য বড় লোভনীয় হইয়াছিল—পিয়ন সামনে না থাকিলে হয়ত এক কামড় দিয়া ফেলিতাম। জীবনে এই প্রথম রান্না করিলাম—স্বপাক অন্নের প্রতি আকর্ষণ রীতিমত বাড়িয়া উঠিয়াছিল। পিয়নকে বলিলাম, তাড়াতাড়ি খাওয়ার পালা শেষ করিয়া ফেলিতে—এখুনি মাচান বাঁধানর বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

পিয়ন তাহার ভাগ লইয়া চলিয়া গেল, আমি তিন দিনের জমা দাড়ী গোঁফ কামাইতে উঠিলাম। একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হইলে আহারে তৃপ্তি আসে? গণ্ড মনোমত করিয়া মসৃণ করিবার জন্য উল্টা দিকে ক্ষুর ধরিয়াছি, এমন সময় বমনের শব্দ শুনিলাম। বাহিরে আসিয়া দেখি—পিয়ন সশব্দে দামী pork বাহির করিয়া ফেলিতেছে—নিকটে যাইবার প্রয়োজন হইল না—পাকপ্রণালীর বিভ্রাটই যে পিয়নের দুরবস্থার কারণ, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না—ঝলসান মাংসটার দিকে তাকাইলাম, তৎসহিত টিনের মাখনও দেখিলাম—হিসাবে ঠিক হইল আরেকটু ঝলসান প্রয়োজন ছিল। স্বপাক রান্না খাইতে আর সাহস পাইলাম না।

বেলা হু হু করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে—আহারের বন্দোবস্তের কোন শুভ লক্ষণ দেখিতেছি না। প্রথম দিনেই মন বিগড়াইয়া গেল—প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিলাম টাকা দিয়া স্বাচ্ছন্দ্য কিনিবার ক্ষমতা না আসিলে আর শিকারে আসিব না—এই আমার শেষ অভিযান। রুখিয়া দুর্ভাগ্যকে চোখ রাঙ্গাইতে পারিলে অনেক সময় ফল শুভই হইয়া থাকে। যে সময় ভাগ্যকে শাসন করিতেছিলাম, সেই সময় নিকটেই গরুর গাড়ীর চাকার আওয়াজ শুনিলাম।

যাক বাঁচা গেল, উদগ্রীব হইয়া উঠি-লাম—যদি রেঞ্জার 'ওরা বাঁধে ভাল'র নূতন দৃষ্টান্ত কিছু পাঠাইয়া থাকেন। অনুসন্ধানে জানা গেল, আমার কল্পনা ভিত্তিহীন। রেশন (Ration)এর সহিত ফরেষ্টার ও পাচক আসিয়াছিল। মনে বল পাইলাম—সময় হউক অসময় হউক আহার জুটিবে। জিজ্ঞাসা করিলাম—এ পথে গাড়ী চলিল কেমন করিয়া? উত্তর পাইলাম—দিনের বেলায় চলে। জঙ্গলের আবেষ্টনীতে মনটাও সামঞ্জস্য পূর্ণ হইয়াছিল। বলিতে ইচ্ছা করিল—লোকগুলা ছোটলোক। এতটা পথ অযথা হাঁটাইল।

ফরেষ্টারকে আদেশ করিলাম—'লোকদের আহারের ব্যবস্থা করিতে বল, ইতিমধ্যে আমরা বাঘের চলার পথ দেখিয়া আসি। শুনিলাম বৈরণীর জলাশয়ে নাকি প্রায় জল খাইতে আসে।'

ফরেষ্টার কাঁচুমাচু করিয়া জানাইল—বাঘ চলার পথ দেখাইবার কথা তো রেঞ্জারের আদেশপত্রে উল্লেখ নাই। আপনার স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা নিয়মাফিক করিয়া ফেলিয়াছি।

এইবার মনে পড়িয়া গেল ধর্ম্মের কথা, উহার নানা দিক আছে। ব্ল্যাক মার্কেটের মাল চালানর কথাটাই ভুলিয়াছিলাম—তীর্থে আসিয়া পুণ্যলোভী যাত্রীরা রেপরোয়া হইয়া স্বর্গদ্বারী পুরোহিতদের ঘুষ দিয়া থাকে পথ পরিষ্কারের জন্য। উৎকোচের ভদ্র নাম দক্ষিণা। আমি না হয় বখশিসকে দক্ষিণা ভাবিয়া আত্মসান্ত্বনা লাভ করিলাম। আহার, পানীয় ও শিকারের

যাবতীয় ব্যবস্থার জন্য—এইখান হইতে উপরি দক্ষিণা সুরু হইল—স্বাচ্ছন্দ্যের লিষ্ট ছাপাইয়া অনেক উপরি কাজ আপনা হইতে হইয়া যাইতে লাগিল।

বাঘ আসার জায়গা দেখিয়া আসিলাম। টাটকা পদচিহ্ন কোথাও নাই। গভীর অরণ্যে বাঘের প্রধান খাদ্য সাম্বার, তাহারও পায়ের দাগ দেখিলাম না। এক জায়গায় লেপার্ডের দাগ পাওয়া গেল, খুব স্পষ্ট নয়, বরাহ সেইখানটা শুইয়াছিল। তবু জায়গাটা বেশ বাঘা বাঘা লাগিল। মাচান বাঁধিবার ব্যবস্থা করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। মাচানে বসিবার আকর্ষণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল—পাঁচটা বাজিতেই তোড়জোড় করিয়া যথা-স্থানে হাজির হইলাম—মাচানের রূপ দেখিয়া পিত্তি পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল—ঐ মাচান দেখিলে বাঘ এদিকে আসা দূরের কথা, আধ মাইল দূর হইতে ভড়কাইয়া পলাইবে। গাছের উপর একটি ছোটখাট ঘর বাঁধা হইয়াছে। মাচান বাঁধিবার আগে ফরেষ্টারকে বলিয়া আসিয়াছিলাম—রাত্রে আমি মাচানেই ঘুমাই—একটু পা ছড়ানর মত জায়গা রাখিতে। বকশিষের তাড়ায় সে এমন করিয়া স্বাচ্ছন্দ্য দিবে ভাবিতে পারি নাই। তখনো যেটুকু বেলা ছিল তাহাতে মাচান ভাঙ্গিয়া ফেলা চলে। তাড়াতাড়ি মাচান ভাঙ্গিয়া ফেলার আদেশ দিয়া জলাশয়ের নিকটেই বাঘ চলার নির্দ্দিষ্ট পথে ঝোপ খুঁজিতে লাগিলাম। একটু দূরে বুচকাঁটার ঝোপ পাওয়া গেল। ভিতরটা পরিষ্কার করিতে পারিলে মওড়ার কাছেই বসিবার সুযোগ পাওয়া যায়। একটু দূরে দাঁড়াইয়া ঝোপের ভিতর সব দিক লাঠি দিয়া আঘাত করিতে বলিলাম। চতুর্দ্দিকে অগ্নি বর্ষণের মাঝে শীতল স্থানটি যে সাপের আড্ডা হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না—অভিজ্ঞতা-নির্দ্দিষ্ট আশঙ্কা ভুল হয় নাই। দুই এক ঘা লাঠি ঝোপের উপর পড়িতেই একটি বাঁটফুল (viper) বাহির হইয়া আসিল, চারিদিক খোঁচাইতে বলিলাম, আরো একটা যে নাই তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? লোমশ কাঁকড়া বিছার বংশধররা যে এখানে কলোনী বসায় নাই, তাতাই বা কে বলিতে পারে? যথেষ্ট ঠোকাঠুকিতেও আর কিছু বাহির হইল না। উই-এর গর্ত্ত যে কয়টা দেখা যাইতেছিল, তাহাও পাথরের কুঁচী দিয়া বন্ধ করাইয়া ভিতরে ঢুকিলাম। ঢুকিবার পথেই মাথার টাক ও ঘাড়ের কিয়দংশ কাঁটায় ছিঁড়িয়া গেল। সময়ের অভাবে সামনেটাই অর্থাৎ বাঘ চলার দিকটা কোন প্রকারে আড়াল দিতে পারিয়াছিলাম—পিছনটা একেবারে খোলা থাকিয়া গেল—অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়াই চলিলাম—জানিতাম বাঘ বিপথে কখনও চলিবে না।

শিকারের উত্তেজনা Maximum degree-তে উঠিয়া পড়িয়াছিল। অনেক শিকারীর নিকট শুনিয়াছি, কত সময় ওৎ-পাতা বাঘ নিকটে মানুষ নাই জানিতে পারিলেই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। ভাবিলাম আমার বেলাতেও ঐরূপটি ঘটিবে না কেন। দিনের আলোয় বড় বাঘ কখন মারি নাই—বন্দুকের ঘোড়া টিপিবার জন্য হাত নিসপিস করিতেছিল। বাঁধা মহিষটার দিকে তাকাইয়া শিকার আসিলে কিভাবে বন্দুক চালাইব কল্পনায় তাগমারির কসরৎ শেষ করিয়া লোকগুলিকে কথা বলিতে বলিতে চলিয়া যাইতে বলিলাম। ফকিরুদ্দিনকে কাশি, হাঁচি, সশব্দে হাই-তোলা সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া কম্বলের উপর বসিলাম।

মানুষের কথা দূরে ধীরে মিলাইয়া গেল। মহিষটা নরকণ্ঠস্বর অনুসরণ করিয়া একদৃষ্টে মানুষের গতির দিকে তাকাইয়া আছে কান খাড়া করিয়া। মাঝে মাঝে পদতলে ঘাস খাইতেছে, আবার সকর্ণে উদ্‌গ্রীব হইয়া মানুষের গলা শুনিবার জন্য একই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে,—দৃশ্যটি করুণ—অনেক সময় শিকারীর মন দমাইয়া দেয়।

হঠাৎ উপর হইতে পিছনে দুই তিনটি নুড়ী স্থানচ্যুত হইয়া নীচে গড়াইয়া পড়িল, তৎক্ষণাৎ বন্দুক তুলিয়া বগলে বসাইলাম—বুক দুরু দুরু করিতেছে—প্রশ্ন উঠিল বাঘ পিছন দিক হইতে আসিতেছে কেন—তবে কি আমাকে দেখিয়াছে? এখন বন্দুক ঘোরাই কেমন করিয়া? শিকার করিতে পারি বা না পারি প্রাণ রক্ষার জন্যই ঘুরিয়া বসার প্রয়োজন ছিল। নড়িয়া বসিবার স্থান নাই। জোর করিয়া ঘুরিলাম এবং বন্দুকের নলও ঘুরাইলাম। নল শুকনা কাঠে ঠেকিয়া খটাং খট করিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে আরো নিকটে একরাশ নুড়ীর পতনধ্বনি শুনিলাম।

মুহূর্ত্তে একটা কিছু ঘটিয়া যাইবার সম্ভাবনা সুনিশ্চিত হইয়া উঠিল। যে দিক হইতে নুড়ী পড়ার শব্দ আসিল, ঠিক সেই স্থানটি দেখিবার উপায় নাই। ঝুঁকিয়া দেখিবারও সাহস পাইতেছি না—একটু নড়িলেই দিনের আলোয় বাঘকে আমার দিকে আকৃষ্ট করিয়া ফেলিব। প্রতিটি মুহূর্ত্ত দারুণ উদ্বেগের ভিতর দিয়া কাটিতেছিল—এমন সময় হু উ প শব্দের সহিত নিকটেই উপরিস্থিত ডাল সাংঘাতিক ঝাঁকুনি খাইল—বাঘ নয়, হনুমান আমাকে দেখিয়া-ছিল—কাছে আসিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া পলাইয়াছে। সব উত্তেজনা স্তিমিত হইয়া গেল। হনুমানরা যেরূপ সহজ চিত্তে মাটির উপর লাফালাফি করিতেছে, তাহাতে বুঝিলাম বাঘ বা লেপার্ড এ অঞ্চলে নাই। উত্তেজনা স্তিমিত হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে মহিষটার প্রতি দয়া অন্তর্দ্ধান করিল—আবেষ্টনীর সামঞ্জস্য হিসাবে নিজের দুর্ব্বলতাকে ধিক্কার দিলাম।

ফকিরুদ্দিনকে পালা করিয়া রাত জাগার জন্য আনিয়াছিলাম, তাহাকে বলিলাম—বড় বাঘ বা লেপার্ড এদিকে নাই। বেলা থাকিতে থাকিতে পিছনটা ঢাকিয়া ফেলিতে পারিলে ভাল হয়—গাছে উঠিয়া কিছু পাতা সমেত ডাল ভাঙ্গিয়া আন, আমি নীচেই বন্দুক লইয়া দাঁড়াইব। সে অসন্তুষ্ট চিত্তেই উঠিল—ঝোপটা তবু আড়াল ছিল—খোলায় দাঁড়ান কেই বা জঙ্গলে ভালবাসে।

গাছে ওঠার আর্ট সে পুরা মাত্রায় দখল করিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে আগডালে উঠিয়া গিয়া দ্রুত ডাল ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল। আড়ালের ব্যবস্থা হইতে আমরা ঝোপের নিকট ফিরিয়া আসিলাম এবং যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতাসহ পিছনটা ঢাকিয়া দিলাম। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পাইলাম। দিনের আলো তখন শেষ হইয়া যাইতেছে—অন্ধকারের আবরু আমাদের রহস্যময় অবগুণ্ঠনের ভিতর টানিতে সুরু করিয়াছে। আঁধারের আড়ালে পর্দানশীন হইয়া নিশ্চলভাবে বসিয়া আছি। বাঘ আসিবার পথের দিকে চলন্ত শব্দের প্রতীক্ষায় কান খাড়া হইয়া আছে। যথা-সময় বনানী ঘোর কালোর আবরণে ঢাকিয়া গেল—ক্রমে আবেষ্টনী নিঝুম হইয়া আসিতে লাগিল।

উত্তেজনা পুনরায় ফিরিয়া আসিতে-ছিল। এই সময় হইতে বাঘের প্রথম অভিসার সুরু হয়। শিকারের নেশার ঘোর লাগিতে আরম্ভ করিয়াছে এমনি সময় চেনা চলার শব্দ শুনিলাম ঠিক যে দিক হইতে আশা করিয়াছিলাম। সন্তর্পিত পদক্ষেপে একটি, দুইটি নুড়ী নড়িতেছে—পরক্ষণেই শব্দ থামিয়া যাইতেছে।

হাওয়া বাঘের আসার বিপরীত দিক হইতে বহিতেছিল, মহিষটা ভয়ঙ্করের আগমন সঙ্কেত পায় নাই।

অনেকক্ষণ আর কোন শব্দ নাই, মনে হইল বাঘ নিশ্চয় আমাদের গন্ধ পাইয়াছে—মাটিতে অত নিকটে বসিয়া আছি—সুতরাং আমার সন্দেহ অমূলক হইতে পারে না; তোলা বন্দুক নামাইয়া রাখিলাম,—হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম—কিন্তু কপাল ফিরিল—দেখিলাম অনতিদূরে সমতল জমির ফ্যাকাসে রং-এর উপর একটি কালো ছায়ার ন্যায় কায়া চলিয়া আসিতেছে মহিষটার দিকে। মহিষ তখন ভিন্ন দিকে মুখ রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে জাবর কাটিয়া চলিয়াছে। অন্ধকারে বাঘের আয়তন বেশ বড়ই মনে হইতেছিল।—বাঘ খোলা জায়গা হইতে ঝোপের আড়ালে যাইবার চেষ্টা করিতেছে—খানিকটা হামাগুড়ি দিয়া চলে—পদস্খলিত নুড়ীর শব্দ হইলেই আবার থামিয়া যায়। মহিষকে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বেই বাঘ মারিতে পারিলে একটা বাহাদুরীর ব্যবস্থা হইয়া যায়—শিকারীর পক্ষে যতটা লজ্জাজনক নয়। বন্দুক সংযোজিত টর্চ টিপিলাম—

[ইহার পর ১৬৩ পৃষ্ঠায়]

মহামিলন

[১২৩ পৃষ্ঠার পর]

আমি নেই তবে কি জানেন, এক আধটা ফন্দি মাঝে মাঝে আমার মাথার ভিতর গজায়, ছেলেরা সেগুলি যদি কাজে লাগিয়ে নিতে পারে, তা হলে কিছুটা ফল হয় ত হতেও পারে।"

পল্টু লাফিয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করলে—"কি ফন্দি, দাদা ?"

আমি বললুম—"দেখ, প্রকাণ্ড একটা বাড়ী ভাড়া করো, আর দেশের হাজার পাঁচ ছয় বড় বড় মৌলভী, মোলানা আর পীর সাহেবদের সেখানে নিমন্ত্রণ করে পাঠাও। সঙ্গে সঙ্গে কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড়, নবদ্বীপ, বিক্রমপুর, ভট্টপল্লী থেকে বাছা বাছা স্মৃতিরত্ন, ন্যায়চঞ্চু, বিদ্যাবাগীশ, সার্ব্বভৌম প্রভৃতিকে বিদায়ের লোভ দেখিয়ে পত্র পাঠাও। আর এই দুই দলকে প্রকাণ্ড সেই বাড়ীটার ভিতর পুরে দাও বাহির থেকে তালা বন্ধ ক'রে।"

পল্টু দন্তবিকাশ করে বললে—"বাঃ প্লটটা যে বেশ জমে উঠছে। তার পর ?"

আমি বললুম—"তার পর আর কি ? দরজার পাশে জনকয়েক বর্কাসং-লড়া ছেলেকে খেঁটে লাঠি হাতে দিয়ে দাঁড় করিয়ে দাও, আর ভট্টাচার্য্য মশায় আর মৌলভী সাহেবদের বলে দাও যে, হিন্দু-মুসলমান মিলনের একটা সম্মিলিত ফতোয়া দেবার পূর্ব্বে যিনি পালাতে চেষ্টা করবেন, তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হবে।"

পল্টু স্ফূর্ত্তিতে লাফিয়ে উঠে বললে—"এ ব্যবস্থায় আমি খুব রাজী। কিন্তু ভিতরে শাস্ত্রীয় বিচারটা কি রকম চলবে তা উঁকি মেরে দেখবার কি কোন উপায় থাকবে না।"

আমি বললুম, "সেটা কল্পনা করে নিতে ত বেশী কষ্ট হবার কথা নয়। প্রথমেই দেওবন্দের বড় মোলানা সাহেব আবু বক্কর জালালুদ্দিন কাঞ্চীর বিদ্যাবাচস্পতিকে বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় বুঝিয়ে দেবেন যে, যেহেতু বিদ্যাবাচস্পতি কলমাও পরেননি, সুন্নতও করেননি সেহেতু তিনি 'নাপাক' ও কাফের। বলা বাহুল্য বাচস্পতি ঠাকুর তার এক বর্ণও বুঝবেন না। তিনি তাড়াতাড়ি এক টিপ নস্য নিয়ে তখনি প্রমাণ করতে লেগে গেলেন যে, মোলানা সাহেবের কথা অত্যন্ত অশাস্ত্রীয়, অমনি সঙ্গে সঙ্গেই ক্রোধে তাঁর কাছাটি খুলে গেল। কাছা আঁটতে আঁটতে তিনি চীৎকার করে বলতে লাগলেন—'আবু বক্করেন যদুক্তং তদ্ধেয়ং, তদ্ধেয়ং।"

পল্টু বললে—"বাঃ বাঃ, তার পর ?"

আমি বললুম—"তার পর আর কি ? মোলানা সাহেব লাফিয়ে গিয়ে ধরলেন বাচস্পতি ঠাকুরের টিকি, আর বাচস্পতি ঠাকুর ধরলেন মোলানা সাহেবের দাড়ী। এ শাস্ত্রীয় যুদ্ধটা অবশ্য বেশীক্ষণ চলবে না, কেন না তিন মিনিটের মধ্যেই মোলানা সাহেব বাচস্পতি ঠাকুরকে চিৎ করে ফেলে তাঁর বুকের উপর বসে আল্লা হো আকবর করতে থাকবেন। তখন ভাটপাড়া, বিক্রমপুর আর কাঞ্চীর ভট্টাচার্য্য মশায়েরা চোচা লম্বা দিয়ে 'দারোমোচন' করবার জন্যে আর্ত্তনাদ করতে থাকবেন। কিন্তু দোহাই দাদারা, ও কার্য্যটি কোরো না।"

পণ্ডিতজী হাসতে হাসতে বললেন—"ঠিক, ঠিক ; কিন্তু এহ বাহ্য রাম রায় আগে কহ আর।"

আমি বিনীত কণ্ঠে বললুম—"পণ্ডিতজী, আরও কিছু আগে বলতে গেলে আইনের প্যাচে জড়িয়ে পড়তে হবে। তবে দেখে শুনে মনে হয় ভাটপাড়া আর দ্রাবিড়ের পণ্ডিতেরা রণে ভঙ্গ দিলেও কাশীর ভট্টাচার্য্য মশায়েরা তা করবেন না। তাঁরা বেদ-চর্চ্চা যত করুন আর নাই করুন, ডন বৈঠক চর্চ্চা বিলক্ষণ করেন, সুতরাং এই দাড়ী ও টিকির যুদ্ধে কতকগুলো দাড়ী যে নির্ম্মূল হয়ে শুদ্ধিকার্য্য এগিয়ে দেবে, তা ধরে নেওয়া যেতে পারে। তবে টিকি একটাও বাঁচবে না।"

পল্টু হাতজোড় করে বললে—"দোহাই দাদা, আমাকে ঐ বাড়ীতে একটা ঘরের ভিতর লুকিয়ে রেখে দিও। এই ধর্ম্মক্ষেত্রে যদি উপস্থিত থাকতে না পারি, তা হলে আমার জন্মই বৃথা।"

আমি গম্ভীরভাবে বললুম—"না পল্টু, তা হয় না। এ রকম শাস্ত্রীয় বিচারের মধ্যে তোমার মত গোঁয়ার ছেলের স্থান নেই। এটা অতি সাত্ত্বিকভাবে মোলানা আর খাঁটি ভট্টাচার্য্য মশায়দের মধ্যেই হওয়া উচিত।"

রাইচরণ ম্লানমুখে জিজ্ঞাসা করলে—"কিন্তু এ রকম শাস্ত্রীয় বিচার বেশী দিন চললে একজনও বেঁচে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসবে বলে মনে হয় না।"

পণ্ডিতজী একটু মুচকি হেসে বললেন—"তাই যদি হয়, ত তাদের বিরহে যে সারা দেশটা কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে যাবে তা মনে করবার ত কারণ নেই। আমার মনে হয় বেলা দুপুর আন্দাজ যখন মাথার উপর সূর্য্য আর পেটের মধ্যে অগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকবে, তখন উভয় পক্ষের একটা মিটমাটের সম্ভাবনা হলেও হতে পারে কিন্তু খুব হুঁসিয়ার। যতক্ষণ না সবাই একটু unanimous verdict দিচ্ছেন ততক্ষণ না দরজা খোলা, না খাটের ব্যবস্থা করা। দুই একজন ভট্টাচার্য্যকে হয়ত মোলানা সাহেবেরা শিক কাবাব করেই মেরে দেবেন, কিন্তু তা দিন। এ দারুণ গ্রীষ্মে অতি বড় গাজী বা সহীদেরও নরমাংস হজম হবে না। সুতরাং হত ও হন্তা উভয়েরই যে এক গতি হবে তাতে সন্দেহ নেই।"

আমি বললুম—"ঠিক বলেছেন, পণ্ডিতজী। আমারও সেই কথাই মনে হয়। এই রকম ভাবে দিন দু'তিন তালা বন্ধ করে রেখে দিলে উপরের অগ্নি যে সমস্ত মনের গ্লানি ভস্মীভূত করে দেবে তাতে আমার সন্দেহ নেই। সবাই হিন্দু-মুসলমান মিলনের ফতোয়ায় সই করেন। তার পর সবাইকে ভক্তিভাবে প্রণাম করে বলে দিও যে, আবার যদি কখনও গণ্ডগোল বাধে, তা হলে পাকা সাতদিন আবার শাস্ত্রীয় বিচারের ব্যবস্থা করা হবে।"

মুখোশ

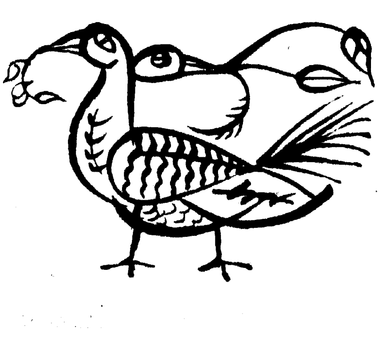
[১২১ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

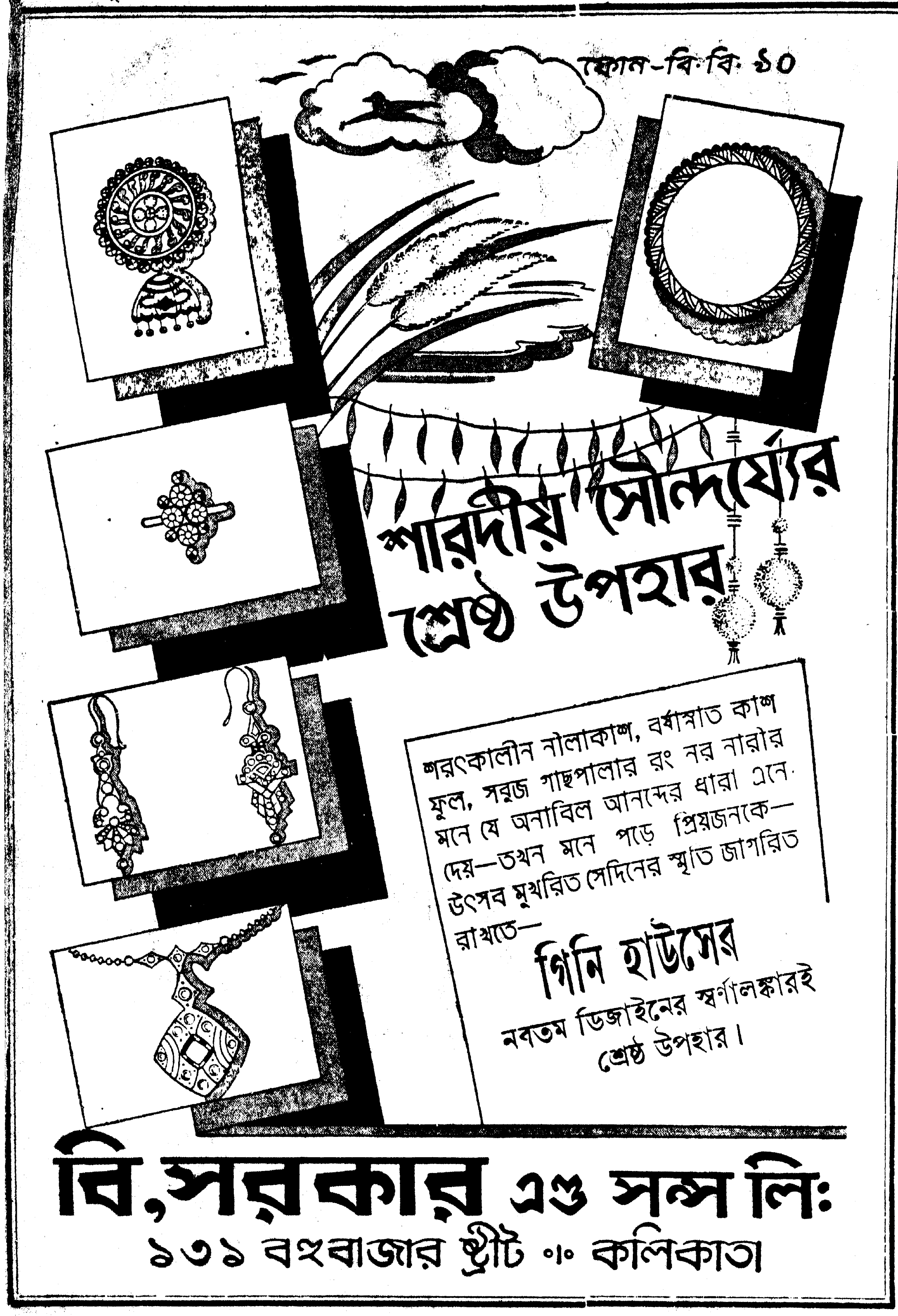
করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, পিছনে দা হস্তে দীননাথবাবু। বাঘা সিং বেশী দূর পালাইতে পারিল না, চৌকাঠে হোঁচট খাইয়া ফুটপাথের উপর পড়িয়া গেল ; দীননাথ ডালকুত্তার মত তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িলেন।

হৈ হৈ কাণ্ড ; লোক জমিয়া গেল। দীননাথ বাঘা সিংয়ের বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া এলোপাথাড়ি দা চালাইতেছেন। দুঃখের বিষয় তিনি ক্রোধান্ধ অবস্থায় দা'-টি উল্টা করিয়া ধরিয়াছিলেন, ধারের দিকটা বাঘা সিংয়ের গায়ে পড়িতেছিল না। সে কিন্তু পরিত্রাহি চীৎকার করিয়া চলিয়াছিল—'বাপ রে! জান্ গিয়া! পুলিশ! মার ডালা!—'

নরেশবাবু পাংশুমুখে জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন। কী দুর্দ্দৈব! মেয়েটা তো রাজিই ছিল ; কে জানিত মরা-খেকো বাপটা ইতিমধ্যে বাড়ী ফিরিয়াছে এবং তার এত বিক্রম।

ওদিকে অমলা বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতেছিল, বালিশে মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। এত নোংরা মানুষের মন! তাহার সতেরো বছরের নিষ্পাপ জীবনে এমন জঘন্য ব্যাপার কখনও ঘটে নাই। আজ এ কি হইল! মানুষের সঙ্গে চোখাচোখি হইলে সে না হাসিয়া থাকিতে পারে না। ইহা কি মন্দ? তবে কেন লোকে তাহার সম্বন্ধে যা-তা ভাবিবে!




ফোন-বি.বি. ১০
শারদীয় সৌন্দর্য্যের
শ্রেষ্ঠ উপহার
শরৎকালীন নীলাকাশ, বর্ষাস্নাত কাশ ফুল, সবুজ গাছপালার রং নর নারীর মনে যে অনাবিল আনন্দের ধারা এনে দেয়—তখন মনে পড়ে প্রিয়জনকে—উৎসব মুখরিত সেদিনের স্মৃতি জাগরিত রাখতে—
গিনি হাউসের
নবতম ডিজাইনের স্বর্ণালঙ্কারই
শ্রেষ্ঠ উপহার।
বি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ
১৩১ বহুবাজার ষ্ট্রীট ০।০ কলিকাতা



নিরবয়ব



জগদীশ গুপ্ত

"দি গ্রেট-ইণ্ডিয়ান
ওয়ার্কশপ কে
খানার নাম ঐ,
তৈরী হয় টিনের মগ, কুপী,
আর রাংঝাল দিয়া ছি
হয় লণ্ঠনের। কিন্তু নাম
ভারত মহাপ্রদেশব্যাপী
পাশেই কুপী কৌটার র
ঝুলিতে দেখিয়া বাহ
একদিন আমার হাসি প

কিন্তু সত্য কথা ব
নিজেই ঐ রকম—মহা
গোষ্ঠীগত নামের ভিতর
আমি কবি। "দি গ্রে
নেন্ট্যাল ওয়ার্কশপ কো
আপনি দেখেন নাই ; কি
যে, বাহাদুরখালীর বাজা
কারখানা আছে ; তখন কি
তা' বলুন দেখি! চিমনি
বয়লার, বড়সাহেব, বড়ব

ম কন্টিনেনট্যাল
নর পানী"—কার-
দেখে কিন্তু কারখানায়
বদনা, কৌটা,
দ মেরামত করা
ঐ। সাইনবোর্ডে
ঐ নাম এবং তাহার
াশি তারের সঙ্গে
দুরখালীর বাজারে
ইয়াছিল—

লিতে কি, আমি
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপক
ক্ষুদ্র, একটুখানি।
ট-ইণ্ডিয়ান কন্টি-
পানী"র কারখানা
ন্তু ধরুন, শুনিলেন
র ঐ নামের একটি
ক ধারণা জন্মিল
, ধোঁয়া, ইঞ্জিন,
বু, কেরাণীবর্গ,

শ্রমিক দল, ঠেলাগাড়ী ইত্যাদির একটা ভূপৃষ্ঠব্যাপী আর আকাশচুম্বী গর্জ্জনশীল বিরাট মূর্ত্তি আপনার মনে উদিত হইল না কি?

তেমনি যদি দৈবাৎ আপনার কানে আসে এই খবরটা যে, বিমল গুপ্ত 'কবি'—কি ধারণা আপনার তখনি জন্মে! তৎক্ষণাৎ আপনার মনে হইবে না কি, আমার, কবি বিমল গুপ্তের, একটি মানসী আছে, চোখে ধ্যানের অর্থাৎ নেশার ভাব আছে, মনে অবিরাম অনাহত নিষ্ঠার সহিত একটা অহেতুক স্পন্দন আর গুঞ্জন অনবচ্ছভাবে চলিতেছে; লেখনীর টানে রেখায়িত আর ... পা রি ত হইতেছে অসীম হইতে আহরণ করা অপরূপ রহস্যমালা—ইত্যাদি। আরো মনে হইবে, উহা পরম উপভোগ্য, উহার চাহিদার অন্ত নাই—এবং কাব্যামোদীর আর পত্রিকা পরিচালকগণের ধন্নায় আমি যত বিরক্ত, তত বিব্রত, তত পুলকিত......

কিন্তু তা' নয়। বাহাদুরখালীর বাজারে আমার যেমন হাসি পাইয়াছিল, ঠিক তেমনি হাসি আপনার পাইবে যদি আমার কবিতা আপনি পড়েন।

কবিতা আমি লিখি এবং তা' ছাপা হয়। সাপ্তাহিক একখানা পত্রিকা আছে, 'সপ্তপর্ণী' তার নাম—উহার সম্পাদক নৃপতি মজুমদার মহাশয়। মজুমদার মহাশয়ের খেয়াল এই যে, তাঁর সপ্তপর্ণীর প্রতি সংখ্যায় সাতটি রচনা ছাপা হবে—তার বেশী নয়, তার ক নয়। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, ধারাবাহিক উপন্যাস আর 'রস' লইয়া সাতটি রচনা ... সপ্তপর্ণীর প্রতি সংখ্যার ...



বাহাদুরখালীর বাজার

চাই-ই; কিন্তু প্রতিবারেই তা' মেলে না; যেবার কিছুতেই মেলে না সেইবার আমি খবর পাই: "বিমলবাবু, আপনার কবিতাটি এই সপ্তাহের সপ্তপর্ণীতে যাচ্ছে। ধন্যবাদ।"

শুনিয়া আমার বোন নীরি লাফায়, আর প্রশ্ন করে: "দাদা, আর কোনো কাগজে তোমার কবিতা ছাপা হয় না যে?"

আমি বলি: "তারা নেয় না।"

—কেন?

—পছন্দ হয় না।

আমার কবিতা যারা পছন্দ করেন না, অর্থাৎ পাইয়াই ছিঁড়িয়া ফেলেন, তাঁদের উদ্দেশে নীরি বলে: "তারা লক্ষীছাড়া।"

শুনিয়া আমি হাসিয়া উঠি, আর মনে মনে ভাবি, তারা লক্ষীছাড়া নয়—লক্ষীছাড়া ঐ সপ্তপর্ণী।

ঐ গেল আমার নিজকথা, অর্থাৎ আমার কাব্যজগতের প্রথম পরিচয়; গার্হস্থ্য পরিচয় এইরূপ। সেটাও ফেলনা নয়। মফঃস্বলের লোকের কাছে কলিকাতাবাসের একটা গৌরব আছে—যেন মহাসমারোহেই আছি, আর কত কি-ই না বাগাইয়া লইতেছি! এদিকেও আমাদের অসাধারণত্ব কেবল উহাই।

যে গলিতে বাস করি সেটা দেড় ফুটের বেশী চওড়া নয়—ঝাঁকা মুটের ঝাঁকা তার ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না। এই সুদ্ধ গলি পথটার উপর পাঁচ সাতটা বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলাধূলা করে, চীৎকার করে, কাঁদে। ফেরি-ওয়ালার অগত্যা স্থান নাই—এ পথেও সে আসে—বিবিধ সামগ্রী বিচিত্র সুরে হাঁকিয়া যায়……

তথাপি আমার অনুভূতি এই যে, এই গলি চিরনিদ্রিতেরই সামিল। বড় বড় রাজপথের উপর দিয়া যখন অনবসর কর্ম-প্রবাহ সশব্দে প্রধাবিত হইতে থাকে, তখন পথটিও যেন সেই কর্ম্মেরই দিকে ছুটিয়া চলে—তার বিশ্রাম করিবার সময় থাকে না—এক মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া নিঃশ্বাস গ্রহণ করিবার কথা তার মনেই হয় না। কিন্তু আমাদের এই ৩৩ ও ১৭ নম্বরের মধ্যবর্ত্তী গলিটার করিবার মতো কাজ কিছু নাই—দিনের পর দিন তার শীর্ণ অচল দেহ ঊর্দ্ধমুখে পড়িয়া দিনে রৌদ্রালোকিত এবং রাত্রে নক্ষত্রখচিত আকাশের একটুখানি দেখিয়া বোধ করি নিঃশ্বাস ছাড়িতেই থাকে।

আমাদের ৩৩ নম্বরের ঠিক সামনের বাড়ীটাতে বাস করেন উকিল যাদববাবু। তাঁহার বাড়ীর নম্বর ১৭।

১৭ নম্বর যাদববাবুর বাড়ীর নীচের তলা হইতে উপরের তলায় সিঁড়ির ঠিক সম্মুখেই ৩৩ নম্বরের বাড়ীর 'আমার ঘরের' একটি জানালা বসানো আছে। জানালার নীচেকার পাল্লাজোড়া খুলিয়া দিলে সিঁড়ির খানিকটা কয়েক ধাপ দেখা যায়; কিন্তু সেগুলো পাল্লা বন্ধই থাকে—খুলিবার দরকার হয় না বলিয়াই খুলি না। এই জানালার ধারেই চৌকি টেবিল পাতিয়া আমি পড়ি এবং যে সমস্ত জিনিষ আছে বলিয়া জানি, কিন্তু কখনো চক্ষে দেখি নাই তাহাদেরই সম্বন্ধে কবিতা লিখি—যা' নৃপতি মজুমদারের সপ্তপর্ণীর একটি পর্ণরূপে বিজ্ঞাপনদাতাদের চোখে পড়ে না, ঠিকানায় যায়। সমুদ্র দেখি নাই, পর্ব্বত দেখি নাই; সূর্য্যোদয়, সূর্য্যাস্ত, শস্যক্ষেত্র, তাহার উপর বায়ুর লীলা, নদীবক্ষে ছায়া-তরঙ্গ ইত্যাদি—স্বচক্ষে ইহাদের কোনোটাই দেখিবার সুযোগ হয় নাই; তবে প্রচুর পরিমাণে কবিতা পড়ার একটা সুফল ইহাই হইয়াছে যে, না দেখিলেও দৃশ্য যেন অনায়াসেই চোখের সম্মুখে ভাসাইয়া দিতে পারি। প্রত্যাখ্যানের দরুণ নিষ্ফল এবং প্র ত্যদানের ফলে সার্থক প্রেমের দুঃখ ও সুখও বুঝি; অবসাদ শ্রান্তি ভ্রান্তি প্রভৃতি অন্তর্গত উৎপাত ও আনন্দ উপলব্ধি করিতে না পারি এমন নয়।

ঐ জানালাটির ধারে বসিয়া নির্জ্জনে আমি ঐ গুরুতর কাজ, অর্থাৎ কাব্য সাধনা করি, অন্যদিকে কান বা চোখ দিবার কারণ প্রায়ই ঘটে না। ছেলেমেয়েদের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ আমার ধ্যান ভাঙিতে পারে না। দ্বিতীয় প্রকারের শব্দ আসে ১৭ নম্বরের সিঁড়ি হইতে; নরপদের ওঠা-নামার খস্‌খস শব্দ, চটির চটপট, শক্ত গোড়ালি জুতার খটখট, খড়মের খটাস্ খটাস্, ছোটদের দ্রুত পদের দুপদাপ শব্দ, শিস ও মৃদু গানের গুনগুন শব্দ, কত যে ওঠে তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে তাহারা অক্ষম—আমার ভাব-প্রবাহ তাতে নাড়া খাইয়া ঘুলাইয়া ওঠে না, শব্দ হারায় না, বরং একহিসাবে সাহায্যই করে—যখন মিলের শব্দটি মাথায় আসিয়াও আসে না, আর বেকায়দা লাগে, তখন অন্যমনস্ক হইয়া শ্রান্ত মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দিবার অভিপ্রায়ে ঐ পদশব্দগুলির দিকে আমি কান পাতিয়া থাকি—নিতান্ত পরিচিত বলিয়াই তাহারা মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করে না, কিছুকালের জন্য ভিন্ন পথে বিচরণ করাইয়া তাহাকে কল্পনা রাজ্যের দিকে নূতন একটা বেগ দেয় যেন…

নৃপতি মজুমদারের ভাগ্য ভাল যে, ১৭ নম্বরের বাড়ীর সিঁড়িতে অত শব্দ আছে।

বৎসরের একটা দিনে আমাদের ঘরগুলি ভালো করিয়া ঝাড়িয়া মুছিয়া তকতকে এবং স্বাস্থ্যকর করিবার চেষ্টা লক্ষ্য করি। সেই দিনটাতে সমস্ত জানালা দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়—উদ্দেশ্য, পরিষ্কার করিবার ছলে যে ধূলারাশিকে ঝাঁটার প্রহারে স্থানচ্যুত করিয়া ছাদের দিকে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, সেগুলিকে ঘরের বাহিরে পাঠানো; কিন্তু গৃহকর্ত্তার সে উদ্দেশ্য যে নিষ্ফল হয় তাহার অন্য কোনই কারণ নাই—একটীমাত্র কারণ ইহাই যে, যে বায়ুপ্রবাহ ধূলা উড়াইয়া বাহিরে লইয়া যাইবে সেই বায়ুরই ঘরে প্রবেশ করিবার পথ নাই। আমাদের গরীব ৩৩ নম্বর চতুর্দ্দিকস্থ বড় বড়দের প্রাণসংশয়কর আলিঙ্গনের মধ্যে এমনভাবে দাঁড়াইয়া আছে, যেন সে মনে করে দাঁড়াইয়া তার না থাকাই উচিত।…ধূলা দ্রুতবেগে ছাদের দিকে উঠিয়া ধীরে ধীরে মেঝের দিকে নামিতে থাকে এবং অবশেষে ঘরের যাবতীয় জিনিষের উপর স্তরে স্তরে পতিত হইয়া আবার তাড়া খায়—এবার তাড়া খাইয়া এক বৎসরের মেয়াদে স্বস্থানে যাইয়া বসে।

ধূলা তাড়াইবার এমনি একটা দিনে আমার টেবিলের ধারের জানালার নীচেকার পাটি দুটাও খুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং আমি সেই খোলা জানালা দিয়া অকারণেই চাহিয়া বসিয়াছিলাম ১৭ নম্বরের সিঁড়ির দিকে…

সহসা সিঁড়িতে, অদৃশ্য ধাপে একটা খসখস্ শব্দ উঠিল—দেখিতে দেখিতে এক-পিঠ আর্দ্র এলায়িত দীর্ঘ কেশ, শ্বেতাম্বরের খুব চওড়া রক্তবর্ণ খানিকটা পাড় এবং টুকটুকে আলতাপরা দুখানি পা উঠিয়া আসিয়া দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল, অর্থাৎ সিঁড়ির তিন চারিটি ধাপে আমি যাহা দেখিলাম তাহা ঐ।

এ আবির্ভাবটি একেবারে নূতন। যাদব বাবুর গৃহিণী প্রবীণা, ৩৩ নম্বরে তাঁর যাতায়াত, অর্থাৎ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ আছে। চোখে দেখা দূরের কথা, সর্ব্বসংবাদবাহিকা নীরির মুখেও অ-প্রবীণা আদ্রকুন্তলার অস্তিত্বের সংবাদ পাই নাই।

সেই দিনই দুপুর বেলায় দেখিলাম, নীরি যেন একটু বেশি মাত্রায় ব্যস্ত। "আমার সেফটিপিনের মুখটা থেঁতলে দিলে কে," "এ-পাড় আমার পছন্দ হয় না," "শুধু সেমিজ পরে' আমি যাবোনা"—ইত্যাদি বিদ্রোহ-সূচক এবং ক্রোধব্যঞ্জক কথা সে পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করিয়া বেড়াইতেছে শুনিয়া তাহাকে ডাকিলাম—

"কোথায় যাচ্ছিস নীরি, এত ঘটা করে?"

নীরি বলিল,—"ও-বাড়ীর বউ দেখতে যাচ্ছি; নরেনবাবুর বউ এসেছে যে।"

—বিয়ে হ'ল কবে তার!

—হয়েছে কবে যেন; তুমি তখন এখানে ছিলে না, গরমের ছুটিতে রাঁচি গিয়েছিলে বন্ধুর সাথে। উনি দেশে গেল, বিয়ে করে' বউ নিয়ে এল। আমি যাই—বলিয়াই সে উধাও হইল।

আমি ভাবিলাম, তাই বলো, নরেনবাবুর স্ত্রীকেই তখন দেখেছি!

জানালার নীচেকার পাল্লা দুটা বন্ধ রাখাই সাধারণ নিয়ম ছিল; কি ভাবিয়া সেদিন হইতে নিয়ম উল্টাইয়া দিলাম—


অবগাহনেই আনন্দ
আলোবাতাসের মতনই দেহ ও মনের পক্ষে পরিচ্ছন্ন স্নানের অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা আছে। নিত্য অবগাহনেই দেহের পরিপূর্ণ তৃপ্তি এবং আনন্দ। আর এই তৃপ্তি ও আনন্দ তখনই স্থায়ী হয়, যখন আপনি স্নানের সময় "লক্ষ্মীবিলাস" তৈল ব্যবহার করেন। স্বকীয় বৈশিষ্টে এই তৈল সকলের কাছেই সমাদৃত।
লক্ষ্মীবিলাস
কেশ তৈল
এম্, এল্, বসু এণ্ড কোং লিঃ, কলিকাতা
COMARTS
NIP

খোলা থাকাই সাধারণ নিয়ম দাঁড়াইয়া গেল…

পূর্ব্ববৎ পড়াশুনা করি—

নৃপতি মজুমদার মহাশয়ের সপ্তপর্ণীর জন্য মিলের শব্দ খুঁজিয়া খুঁজিয়া কবিতা লিখি; কিন্তু ১৭ নম্বরের সিঁড়ির উপর পদশব্দ জাগিয়া আমাকে সাহায্য করা বন্ধ করিয়া দিয়া শব্দানুসন্ধানে ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। বুঝিলাম, চিরদিনকার একটানা অভ্যাসের মাঝখানে একটা স্থান ভাঙিয়া গেছে। সেই খস্‌খস্‌, খটখট, চটাপট, দুপদাপ শব্দ—শব্দগুলি সবই এক পর্দ্দায় বাঁধা; হাজারো মোটা গলার মধ্যে একই পর্দ্দার একটা সরু সুরের মতো, পায়ের একটা খস্‌খস্‌ শব্দ ভারী স্বতন্ত্র এবং চিহ্নিত হইয়া উঠিল। শব্দ যত উচ্চ হয়, তত বেশী জোরে সে কর্ণে প্রবেশ করে, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম, কিন্তু অবস্থা বিশেষে উচ্চতর শব্দকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া মৃদুতর শব্দ প্রবলতর হইয়া ওঠে, এই অস্বাভাবিক ঘটনা আমি প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। উৎকর্ণ হইয়া চেষ্টা করিয়া সে-শব্দ কানে আনিবার প্রয়োজন আমার একদিনের তরেও হয় নাই—দ্বিতীয় দিনেই না দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, এ শব্দ সেই বউটির পায়ের এবং তখন ভুল করি নাই।

সে ওঠে, নামে, তাহার পায়ের শব্দে কবিতা রচনার মাঝেই আমি হঠাৎ উদ্যমহীন হইয়া তাকাইয়া থাকি, দেখিতে পাই, শুধু দীর্ঘ অবগুণ্ঠন বা এলায়িত আর্দ্র কেশ, সিক্ত বসন, পাড়ের উপর রঙের ছটা, আর পা দু'খানি। সুন্দর পা দু'খানি যেন চাঁপার পাপড়ি দু'টি, আর সেই পাপড়ি দু'টিকে বেষ্টন করিয়া তাহার বিকশিত রক্তিম যৌবনের লোহিতরাগ অলক্তকে বিচ্ছুরিত হইতেছে—অস্বচ্ছ ঐ অবগুণ্ঠনের অন্তরালে মুখপদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া আছে; জানি না, যৌবনশ্রী সেখানে, তার নয়নে, অধরে, ত্বকে, বর্ণে, ভ্রূযুগে, কি অপরূপ অতুল মূর্ত্তিতে পুষ্পিত হইয়া আছে! কল্পনাকে প্রাণবান করিবার গুপ্ত অভিপ্রায়ে নীরিকে ডাকিলাম—

—নরেনবাবুর বৌকে দেখেছিস্‌?

শুনিয়াই নীরির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিল,—দেখেচি। সেই সেদিন গেলুম, দেখে এলুম। দিব্যি বউটি!

প্রতিবাদ করিয়া বিস্তৃততর বর্ণনা পাইবার গুপ্ত উদ্দেশ্যে হাসিয়া পুনরায় বলিলাম,—নরেনবাবু যে বল্‌লেন তাঁর স্ত্রী দেখতে অতি বিশ্রী!

—মিছে কথা। বেশ মুখখানি, হাসি হাসি। আমার সঙ্গে কত গল্প করলে।

—কি গল্প করলি তোরা?

—আমি তোমার গল্প করলুম, নিজের গল্প করলুম, সে তার বাপের বাড়ীর, ভাই বোনদের গল্প করলে…

—আমার গল্প কি করলি?

—গল্প করলুম, তুমি পদ্য লেখ—কাগজে তা' ছাপা হয়—খুব ভালো ভালো পদ্য।

—পদ্য লেখার গল্প করে' এসেছিস? তুই আমার পদ্য—

আমার কথার সমাপ্তি পর্য্যন্ত নীরির ধৈর্য্য রহিল না, "শুনবো পরে" বলিয়া সে চলিয়া গেল। আমার পদ্য সে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া কখনো শেষ পর্য্যন্ত শোনে নাই, ইহাই ছিল আমার বক্তব্য।

নীরি বলিয়া গেল, "বেশ মুখখানি"—

"বেশ মুখখানি"—রূপবর্ণনার ঐ অংশটুকুকে অবলম্বন করতঃ ভাবকে উদ্দীপ্ত এবং বিস্ফারিত করিয়া একটি চতুর্দ্দশপদী খাড়া করা যাইতে পারে মনে হইল—মনে হইতেই কাগজ পেনসিল টানিয়া লইয়া চতুর্দ্দশপদীর প্রথম পদটা প্রাণপণে চিন্তা করিতেছি এমন সময়, বোধ হয় নৃপতি মজুমদারের অদৃষ্টবশতঃই চিন্তায় বাধা পড়িয়া গেল!

কবিতা রচনা সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, সব কাজের মতো তাহারও আরম্ভটা বড় কঠিন। যাহারা ভাবকে জমাট করিয়া লইয়া লিখিতে বসেন আমি সে শ্রেণীর, অন্য শব্দের অভাববশতঃই বলি, কবি নহি। আমার ভাবগুলি মনের আকাশে অতনু শৃঙ্খলাহীন কুজ্ঝটিকার মতো ব্যাপ্ত হইয়া যায় এবং রচনা অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব্ব শৃঙ্খলায় রূপ গ্রহণ করিয়া আর রসসম্ভারে পরিপূর্ণ হইয়া ধীরে ধীরে নিঃসৃত হইতে থাকে। সুতরাং শুরুটা জমাইতে আমার অশেষ প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়—মৃত্তিকার স্তর ভেদ করিতে বীজোদ্গত অঙ্কুরের যেমন, তেমনি আমার মনের একটি সহজ শক্তি প্রয়োগের অশ্রান্ত ব্যাপার চলিতে থাকে…

এখনও একটা চতুর্দ্দশপদীর সর্ব্বপ্রথম লাইনটা জমাইবার অসাধারণ প্রচেষ্টায় শব্দ সংগ্রহ পুনঃ পুনঃ নামঞ্জুর নাকচ করিতে করিতে খোলা জানালা দিয়া আমার আত্মবিস্মৃত দৃষ্টি চলিয়া গেল ১৭ নম্বরের সিঁড়ির উপর এবং দেখিতে পাইলাম, সেই তরুণী অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া আমাকেই দেখিতেছে! আত্মবিস্মৃতির ঘোর কাটিয়া মুহূর্ত্তেই আমার মুখ আর কান উত্তপ্ত হইয়া উঠিল এবং তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া সজোরে করিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিলাম—জানালার পাল্লা আর শব্দ যেন তার দৃষ্টির উপর লাফাইয়া পড়িল…

কেন এ কাণ্ড করিলাম তাহা জানি না; এ যে কি করিলাম তাহাও হৃদয়ঙ্গম করিতে আমার যতটা বিলম্ব হইল তাহাকে অসুচিত বিলম্ব বলা যাইতে পারে। জানালা বন্ধ করিতেই তরুণী উঠিল কি নামিয়া গেল তাহা আমি জানি না—পদশব্দ শুনিতে পাই নাই। কিন্তু হুঁস যখন হইল তখন আবার আমার মুখ আর কান উত্তপ্ত হইয়া উঠিল—জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিলাম। এ কি গভীর লজ্জার বোঝা অতর্কিতে ঐ নিরপরাধিনীর মাথায় চাপাইয়া দিয়াছি!

সে ত' জানে না, কেন এ কাজ আমি করিয়াছি তাহা আমি নিজেই জানি না। তার কাজটা ভাল কি মন্দ, এ তর্কের উদয় আমার মনে হয় নাই—নির্লজ্জতাকে আঘাত করিয়া শাস্তি প্রদানই আমার উদ্দেশ্য, আমার ব্যবহারের একমাত্র অর্থ, ইহা ছাড়া আর সে কি মনে করিতে পারে!…নিজের অপরাধকে নির্ব্বিষ হাল্‌কা করিবার জন্য ভাবিতে চেষ্টা করিলাম, বোধ হয় এতটা সে বুঝিতেই পারে নাই, অতো বুদ্ধিই তার নাই—হয়তো কিছুই মনে করে নাই—পাগল মনে করিয়াছে; তা যদি মনে করিয়া থাকে, সে-ও ভালো।…

কিন্তু ঐ মনগড়া কথায় জোর মোটেই পাইলাম না।…দৃষ্টিতে তরুণীসুলভ কৌতূহল ছাড়া আর কিছু ছিল না; কারণ, আর কিছু থাকা স্বভাবতঃ সম্ভব নহে। নরেন এবং নীরি দু'জনায় মিলিয়া আমার সম্বন্ধে অর্থাৎ আমার কবিত্ব সম্বন্ধে, তাহার চঞ্চল অপরিপক্ক মনে একটা বিস্ময় এবং অতিরঞ্জিত অলৌকিক ধারণার সৃষ্টি করিয়া দেওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। অমন করিয়া তাকাইয়া থাকার মূলে ছিল সেই কথাটাই। অথচ অকালকুষ্মাণ্ড আমি সেই সহজ সরল নিষ্পাপ দৃষ্টির কি একটা অচিন্তনীয় কদর্থই না তাহার সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছি! লজ্জার আঘাতে তার মুখখানি বোধ হয় বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল…

চতুর্দ্দশপদী লিখিব বলিয়া যে কাগজখানা টানিয়া লইয়াছিলাম, হাত ছড়াইয়া দিয়া তাহারই উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িলাম—ভাবিয়া দিশা পাইলাম না, এই জঘন্য অপরাধের মার্জ্জনা সে কখনো করিতে পারিবে কি না।

যাহা সুন্দর তাহাকে নিপুণ কবিচক্ষে চাহিয়া চাহিয়া দেখিবার যে একটা বিধিদত্ত প্রলোভন জ্ঞানসঞ্চারের সময় হইতে উত্তরোত্তর অধিকতর লেলিহান্ হইতে থাকে তাহার পরিতৃপ্তির দিক দিয়াও আমার যে ক্ষতি হইল তাহা সামান্য নয়। মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকিতে থাকিতে সেই ক্ষতির অসামান্যতা অনুভব করিয়া মুখ তুলিবার ক্ষমতা আর ইচ্ছা আরো লুপ্ত হইয়া গেল। কবির সম্বন্ধে রমণীর কল্পনায় একটি অতি স্নিগ্ধ পরম সুন্দর মধুর মুখশ্রী সৃষ্টি করিয়া লইয়া বাক্যে তাহার স্তুতি করিবার উপক্রমে যখন সত্বর উদয়ে কল্পনা অগ্রগামী হইয়া আসিতেছিল ঠিক তখনই বস্তুকে চিরদিনের জন্য বিমুখ করিয়া দিয়াছি। কল্পনায় যাহাকে রূপ লাবণ্য আকার সুষমা দিয়া, অর্থাৎ স্বপ্নমণ্ডিত করিয়া মনে মনে লালন করিতে আমার লালসার অন্ত ছিল না, চক্ষুর ঠিক সম্মুখেই সে কল্পনা মূর্ত্তিমতী হইয়া আর আবরণ উদ্ঘাটিত করিয়া উদিত হইবামাত্র, ভালো করিয়া সুন্দরকে দেখিয়া তৃপ্তিলাভের পূর্ব্বেই নিজের হাতে ধাক্কা দিয়া তাহার আর আমার মাঝখানে রূঢ় যবনিকা

[ইহার পর ১৪৮ পৃষ্ঠায়]

নট ও দেহপট

শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য



অনেক দিন আগে করিন্থিয়ান থিয়েটারে একটি হিন্দুস্থানী অভিনয়ে এক জনতার দৃশ্যে একজন সত্যিকারের বামন আর একজন সত্যিকারের খঞ্জ অভিনেতা অবতীর্ণ হয়েছিলেন। দৃশ্যটি ছিল হাস্যরসোদ্দীপক। দৈহিক ত্রুটি সত্ত্বেও উক্ত অভিনেতা দুজন চরিত্রাভিনয় শক্তিতে জনতার অন্যান্যের অপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূন ছিলেন না। দৃশ্যটি বেশ জমাটিই হ'য়ে উঠেছিল, কিন্তু আমার পক্ষে পুরাপুরি হাস্যরস উপভোগের কোথায় যেন ব্যাঘাত লাগছিল। অভিনেতার দৈহিক ত্রুটিকে জ্ঞাতসারে হাস্যরস সৃষ্টির উপাদান হিসাবে ব্যবহার করার মধ্যে যে নিষ্ঠুরতা বর্তমান, তা থেকে মন কিছুতেই যেন সরছিল না। অজানিত করুণা হাসির উৎস রোধ করছিল। নাট্যশাস্ত্রেও তাই বলে। হাস্যরস করুণ-রসের একেবারে বিপরীত। করুণ-রসের মূলে রয়েছে অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে দর্শকের সহানুভূতি বা একাত্মবোধ, এই একাত্মবোধের ঐকান্তিক অভাব না ঘটলে হাস্যরস জমে না। একেবারে পর না ভাবতে পারলে কারো দুরবস্থায় হাসি আসে না। কলার খোসায় পা পিছলে কেউ ফুটপাথে হঠাৎ পড়ে গেলে আমরা হেসে উঠি, কারণ, একাত্মবোধ জন্মাবার সময় পাওয়া যায় না। পড়ে কিছুক্ষণ সে না উঠলে হাসি মিলিয়ে যায়, সহানুভূতি জাগে, ছুটে গিয়ে তাকে সাহায্য করতে মন চায়। বাস্তব জীবনে চিত্তে ভাব সঞ্জাত হবার সঙ্গে সঙ্গে এরূপ কর্ম্ম-প্রবৃত্তি জাগে। অভিনয় দেখবার সময় কর্ম্মপ্রবৃত্তির তাগিদ থাকে না ব'লে ভাব উপভোগ্য হ'য়ে ওঠে রস হিসাবে।

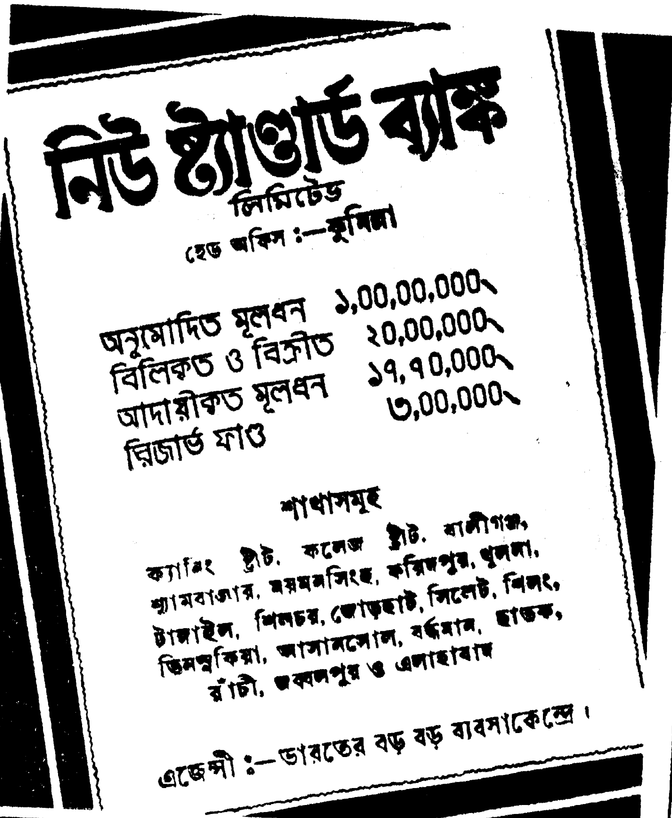
সত্যিকারের পঙ্গু বা বামন অভিনয়ের অবাস্তব ভাবরাজ্য থেকে রূঢ় ভাবে মনকে বাস্তবে টেনে রেখে রসোপভোগে ব্যাঘাত ঘটায়। রসোপভোগের আর একটি উপাদান প্রশংসা। চরিত্রাভিনয় যত বেশী নিখুঁত হয়, তত রস জমে ওঠে। এর কারণ, অভিনেতার কৃতিত্বে দর্শক মনে প্রশংসা ও বিস্ময় জমে ওঠে ব'লে। পূর্ণাবয়ব নট যদি পঙ্গু কিম্বা বামনের ভূমিকায় নামতে পারেন, তবে রসসৃষ্টির সম্পূর্ণ উপাদান বর্তমান থাকত, বিপরীত রস সমাবেশেরও আশঙ্কা থাকত না।

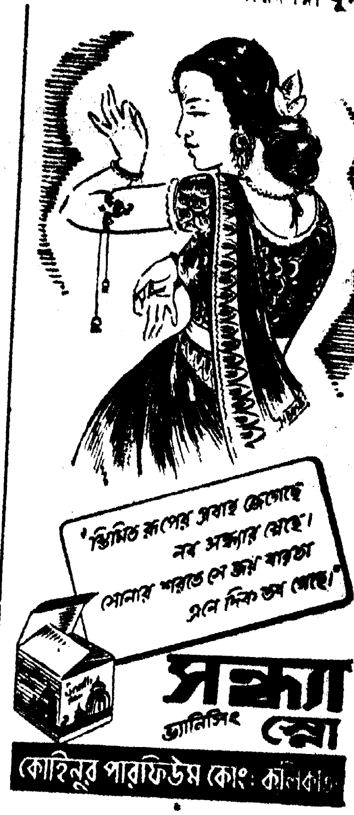
এধরণের বিচার অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দের অভিনয়ের বেলা ক'রতে গিয়ে লক্ষ্য করেছি, তিনি যেখানে নিজের অভাবকে অতিক্রম ক'রে চক্ষুষ্মানের অভিনয় করেছেন সেখানে আমার বেশী ভাল লেগেছে। বেশীর ভাগ অভিনয়েই দৃষ্টির প্রশ্নই ওঠেনি, যেমন সীতায় বৈতালিক, বসন্তলীলায় বসন্তদূত। আর যেখানে তাঁকে দৃষ্টিহীন সাজানো হয়েছে, যেমন চন্দ্রগুপ্তে ভিক্ষুক, ভাগ্যচক্র ছবিতে 'দ্যুমৎ সেন' সেখানে করুণ অভিনয় করুণ বাস্তবে বৈপরীত্য ঘটেনি ঠিকই। কিন্তু দৃষ্টি থেকে, অন্ধের অভিনয় হ'লে আরও ভাল লাগত নিশ্চয়ই। কিন্তু তাঁকে দিয়ে কেউ যদি 'রাতকাণা'র মত হাস্যরস সৃষ্টি করাতে চাইত তাকে বলতাম নিষ্ঠুর।

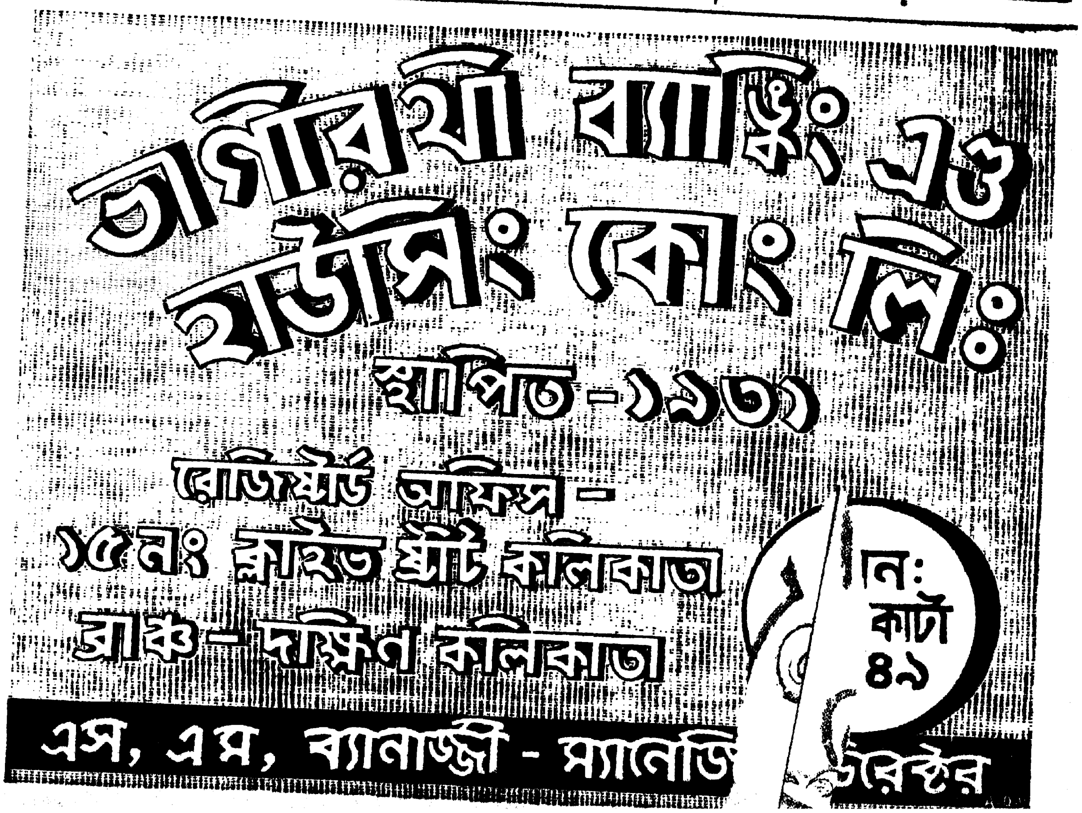
এ প্রসঙ্গে দেহের স্বাভাবিক অপটুতার কথা ওঠে। নটের জীবনে দুঃখ এই যে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যেমন অভিনয়ে আত্মপ্রত্যয় জন্মে আসে, দেহ তেমনি ভাঙতে সুরু করে। কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয়ে আমার প্রথম অভিনয় বৃদ্ধ ঋষি বাল্মীকি। ভাদুড়ী মহাশয়ের সাধারণ রঙ্গাবতরণ বৃদ্ধ আলমগীরের ভূমিকায়। তখন আমাদের বয়সকাল। সে বয়সে অঙ্গরাগে, বলনে চলনে বৃদ্ধের ভূমিকা অভিনয়ে যে কৃতিত্ব তা সমস্তই অভিনেতার প্রাপ্য। আজ বৃদ্ধত্বের সীমানায়, অনেকখানি প্রাপ্য কালের। প্রশংসার ভাগে কিছু খামতি থাকবারই কথা, সুতরাং রসোপ-ভোগও কিছু ন্যূন হয়। আজ আমরা তরুণের ভূমিকা অভিনয় ক'রতে সমর্থ হ'লে দর্শকচিত্তে বিস্ময়রস জন্মাতে পারি বেশী। শুনেছি মুস্তফী সাহেব আবুহোসেনের ভূমিকায় নাকি এরূপ তাক লাগাতেন। জগু ঘুরু অথবা দানীবাবুকে শ্রীগৌরাঙ্গে চাপাল গোপালের ভূমিকায় বার্দ্ধক্যের জড়তা বর্জন করতে দেখেছি, পোষ্যপুত্রে শ্যামাকান্তের ভূমিকায় কাল তাঁকে সাহায্য করেছিলেন অনেকখানি। গিরিশচন্দ্রের শেষ বয়সে রাম ও রবীন্দ্রনাথের জয়সিংহও স্মরণীয়। অভিনেতার চরিত্রোপযোগী চরিত্র অভিনয় অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু বিপরীত চরিত্র অভিনয়ে কৃতিত্ব বেশী।

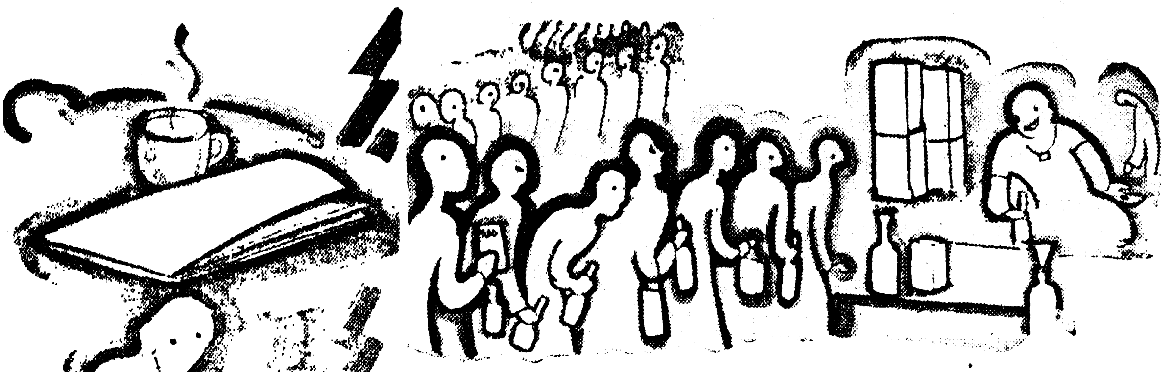
সাধারণভাবে এ সূত্র মানতে গেলে, মেয়ে চরিত্র মেয়েদের দ্বারা অভিনয় অপেক্ষা পুরুষ

[ইহার পর ১৪৮ পৃষ্ঠায়]


নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
হেড অফিস :—কুমিল্লা
অনুমোদিত মূলধন ১,০০,০০,০০০৲
বিলিকৃত ও বিক্রীত ২০,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত মূলধন ১৭,৭০,০০০৲
রিজার্ভ ফাণ্ড ৩,০০,০০০৲
শাখাসমূহ
ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, খুলনা, টাঙ্গাইল, শিলচর, জোড়হাট, সিলেট, শিলং, তিনসুকিয়া, আসানসোল, বর্দ্ধমান, ছাতক, রাঁচী, জব্বলপুর ও এলাহাবাদ
এজেন্সী :—ভারতের বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে।


"স্তিমিত রূপের প্রবাহ জেগেছে
নব সন্ধ্যার স্নেহে।
সোনার শরতে সে জয় বারতা
এনে দিক তব দেহে।"
সন্ধ্যা
ভ্যানিসিং স্নো
কোহিনূর পারফিউম কোং: কলিকাতা


ভাগীরথী ব্যাঙ্কিং এণ্ড হাউসিং কোং লিঃ
স্থাপিত-১৯৩১
রেজিষ্টার্ড অফিস -
১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাতা
ব্রাঞ্চ - দক্ষিণ কলিকাতা
নঃ
কার্টা
৪১
এস, এম, ব্যানার্জ্জী - ম্যানেজি
ডিরেক্টর





ঘুমোবার আগে প্রতিদিন এই কামনাই করি—ঘুম যেন না ভাঙ্গে। ঘুম ভাঙ্গলেই যে দাবী নিয়ে জীবন এসে সামনে দাঁড়ায় তা মিটাবার পথ আর খুঁজে পাই না আজকাল। তাই নিরুপায়ভাবে অর্থহীন কামনা করি—ঘুম যেন আর না ভাঙ্গে।

তবু ঘুম ভাঙ্গে। শক্তিশালী বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনের মত দুরন্তবেগে এসে ধাক্কা দেয় দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি। ঘুম ভাঙ্গতেই দেখি আমি সেই অনিবার্য আঘাতে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছি।

এককাপ চা আসে। যুদ্ধের বাজারে এই বিলাসিতাটিকে কিন্তু বজায় রেখেছি। পেটে ভাত না জুটলেও যে কারণে লোকে নেশা করে সেই কারণে অর্থাৎ নেশা বলে'।

আর আসে একখানা 'দৈনিক বসুমতী'। এটা বিলাসিতা নয়। আমি যে শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত ও আধুনিক—এই কারণে। আমার প্রপিতামহের পাণ্ডিত্যালোক চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, আমার পিতামহের গৃহ-প্রাঙ্গণে শত শত ভিক্ষুক পেট ভরে আহার পেয়েছে, আমার পিতাও রুচি ও সমাজ সেবার জন্য খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন,—এইসব কীর্ত্তিমানদের বংশধর আমি, অবস্থান্তর ঘটলেও বি, এ, পাশ করেছি সসম্মানে, সরকারের অধীনে পঁয়ষট্টি টাকা বেতন ও আঠারো টাকা মাগ্‌গি ভাতা পেয়ে স্থায়ী-ভাবে চাকরী করছি বহুলোকের ঈর্ষানলকে প্রজ্জ্বলিত করে। এহেন ব্যক্তি দেশ-বিদেশের খবর রাখবে না, একথা ভাবলেও লজ্জাবোধ হয়। বেশী দামের কাগজ পোষালে রাখতাম—তার ক্ষমতা নেই, অতএব 'দৈনিক বসুমতী'ই লজ্জা নিবারণ করছে।

খবরের কাগজটা তুলে নিলাম। সিমলা সম্মেলন। এখনও মিমাংসা হয়নি। ফলাফল দু'একদিনের মধ্যেই জানা যাবে। কে বলে আমরা নিরাশাবাদী? আশা-মরীচিকার পেছনে আমরা সারা জাত ছুটে বেড়াচ্ছি। দেবে—ইংরেজ প্রভুরাই একদিন আমাদের দেশ আমাদের হাতে তুলে দেবে।

চায়ের পেয়ালাটা ধোঁয়া ছেড়ে ডাকছে। বাইরে ধোঁয়ার মত মেঘ উড়ে চলেছে আকাশ-পথ দিয়ে। চায়ের কাপে চুমুক দিতে গিয়ে বাধা পেলাম।

"কবচ ধুয়ে জল খেয়েছ?" নিরুপমা কাছেই দাঁড়িয়েছিল।

"এ্যাঁ! তাইত—"

এক গ্লাস জল এল। বসলাম পদ্মাসনে। রাহুর দশায় বড় কষ্ট পাচ্ছি—তাই এক প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক জ্যোতিষীকে এক বন্ধু মারফৎ পাকড়াও করে নগদ দশটি টাকা খরচ করে পঞ্চাশ টাকা দামের এক কবচ সংগ্রহ করেছি। নিত্য শয্যাত্যাগের পর একটি মন্ত্র তিনবার জপ করে কবচ ধুয়ে জল খেতে হয় তিনবার। নিয়মিত বিশ্বাসের সঙ্গে তা করলে নাকি দুষ্ট রাহু প্রসন্ন হবে, দুঃখ দূরে যাবে, অভাব রূপান্তরিত হবে প্রাচুর্য্যে আর ঐশ্বর্য্যে। কুসংস্কারকে জয় করার জন্য যে শিক্ষালাভ করেছিলাম তা আমার নিষ্ফল হয়েছে। বুঝি সব। কিন্তু সান্ত্বনা এই যে, দশচক্রে ভগবানও নাকি ভূত হয়।

কবচ ধোয়া জল তাড়াতাড়ি পান করে চা-পর্ব্ব সমাধা করলাম। আবার কাগজে মনোনিবেশ করব ভাবছি কিন্তু দুর্ভাগ্যের ইঞ্জিন এবার সশব্দে আমার উপর এসে পড়ল।

নিরুপমা বলল, "আজ কেরোসিন তেল আনার দিন।

হাসলাম। বাইরের মেঘলা আকাশের দিকে দৃষ্টি পড়ল। মুখ ফিরিয়ে নিরুপমার দিকে তাকালাম।

"হাসছ যে! কথাটা কানে গেল ত? বারে, আমার দিকে অত করে তাকাচ্ছ কেন?"

বেঁচে আছি

নরেন্দু ঘোষ





বললাম, "হে নিরুপমা,
আঁখি যদি আজ করে অপরাধ,
করিয়ো ক্ষমা।
হেরো আকাশের দূর কোণে কোণে
বিজলি চমকি উঠে খনে খনে,
দ্রুত কৌতুকে তব বাতায়নে কী
দেখে চেয়ে
অধীর পবন কিসের লাগিয়া
আসিছে ধেয়ে।"

সংসারকে চিনেছি, বাস্তবের রূঢ়তায় অবাস্তব কল্পনা-কুয়াশা বহুদিন আগেই দুঃস্বপ্নের মত মিলিয়ে গেছে, তবু ভুল করি। ইচ্ছে করেই করি।

"মানে কি এসবের ?" নিরুপমা প্রশ্ন করল।

উঠে দাঁড়ালাম, "মানে মস্তিষ্ক-বিকৃতি।"

"ভাল কথা নয়।"

"জানি আর মানি।"

জামা পরলাম।

"মিণ্টুকে নিয়ে যাও। তেলটা ওকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়ে বাজারে যেও একবার — যদি মাছ পাও কিছু। নীলাটার যা শরীর হয়েছে"—

"আচ্ছা।"

যুদ্ধে না গেলেও যুদ্ধের সময় সকলকেই কুচকাওয়াজ শিখতে হচ্ছে। আমরা যুদ্ধে যাইনি, তাই জিনিষ কিনতে, সিনেমা দেখতে, রেলের টিকিট কাটতে কুচ-কাওয়াজের অভ্যাস করছি। কিউ।

ইতিমধ্যেই জনপঞ্চাশেক কিউ করে সরীসৃপের মত এঁকে বেঁকে দাঁড়িয়েছে ফুটপাথের উপর।

মিণ্টুকে দাঁড় করিয়ে বল্লাম, "খবরদার, নড়িস না কিন্তু"—

"না বাবা।"

ভিতরে গেলাম।

মহাজন ঘনশ্যাম আগরওয়ালা হিসেব মেলাতে ব্যস্ত।

"রাম রাম শেঠজী।"

"হাঁ হাঁ—রাম রাম। কি বেয়াপার ?"

"তেল নিতে এলাম।"

"হাঁ হাঁ—লেন না।"

"বড় ভীড় যে। এদিকে অফিসের টাইম হয়ে এল, একটু তাড়াতাড়ি দিয়ে দিন না আমায় ঘনশ্যামজী"—

"কি যে বোলেন বাবুমোশায় ! আপনারা লেখাপড়হা শিখিয়েছেন, আপনারাই যদি এই রোকম করিয়ে রুল ভাঙ্গেন তবে আর লোব কি বোলবে ?"

পুলিশের রুলের গুঁতো খেলাম যেন, "হবে না ?"

"যখন আপনার বার আসবে—লিবেন, কিউতে দাঁড়ান গিয়ে।"

উঠলাম। কিন্তু এক বোতল কেরাসিন তেলের জন্য দু'ঘণ্টা দাঁড়াতে গেলে হয় মিণ্টুকে ইস্কুল কামাই করতে হয়, নতুবা আমায় অফিসে লেট যেতে হয়।

একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে যে লোকটা তেল বিতরণ করছিল তার কাছে গেলাম। লোকটা আমায় চেনে।

"রাম সিং—"

"জী"—

"একটা কথা বোলেগা ?"

"বলুন।"

"বাড়ীতে বড় অসুখ—দেরী করনেকো উপায় নেই হ্যায় কারণ ডাক্তার ডাকতে যায়েগা। অথচ তেল চাই। কি কারেগা ভাই ?"

রাম সিং কোদালের মত দাঁত


মডেল
Model
মন্ডল ইলেক্ট্রিক ওয়ার্কস
কলিকাতা


PHONE: B.B. 1952
পাম্প ইক্যান
তাল মিছরী
REGISTERED
KCNLD
TRADE MARK
সর্দ্দি কাসিজনিত শ্বাস কাসের ঔষধ, পথ্য ও অনুপান।
চিকিৎসক কর্ত্তৃক পরীক্ষিত ও অনুমোদিত।
প্রস্তুতকারক—
কৈলাস চন্দ্র দাস · নন্দ লাল দাস
২০৩/২ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড (ব্রাঞ্চ)
কলিকাতা


প্রসাধনে শ্রেষ্ঠ
শুভ্রা
স্নো
হেয়ার অয়েল
এবং রুমালের এসেন্স
লক্ষ্মী পারফিউমস

মেলে হাসল, "ছ'আনা পয়সা বেশী দেবেন পান খেতে।"

ছ'আনা! কম নয়। কিন্তু উপায় কি? অগত্যা তাই সই। ছোট মাছের ছোট খোরাক।

মাছ চাই। আমার আট বছরের মেয়ে নীলা এই দিন সাতেক জ্বরে ভুগে উঠেছে।

প্রচণ্ড ভীড়। কোলাহল। ধাক্কাধাক্কি। ঘাম। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভায় বিষ্ণুচক্রে আচ্ছাদিত মৎস্যের মত কোথায় যে মাছ রয়েছে তা দেখা যায় না, কেবল দেখছি যে, অনেকগুলো মাথা একসঙ্গে বৃত্তাকারে ঝুঁকে পড়েছে কিছুর উপর। তার থেকেই বুঝি যে, মাছ আছে।

হঠাৎ দেখি সেই ঝুঁকে-পড়া মাথাগুলো চঞ্চল হয়ে নিজেদের বাঁচাতে হুড়মুড় করে পেছু হটে এলো।

মেছুনী বটি হাতে উঠে দাঁড়িয়েছে মৎস্য-খাদকদের বিরক্তিকর ব্যবহারে উত্তাক্ত হয়ে। শ্রমের মর্য্যাদা সম্বন্ধে সেও আজকাল সম্পূর্ণভাবে নিঃসন্দেহ হয়েছে বলেই তার আজ আর সাহসের অভাব নেই।

বঁটির চেহারাটি দেখে ভাল লাগল না। বেশ ধারালো। তাই দূরেই রইলাম। অন্যেরও একই অবস্থা।

পাশ দিয়ে একজন ভদ্রলোক যাচ্ছিল।

তার সিল্কের পাঞ্জাবী ঘামে ভিজে বিশ্রী হয়ে গেছে, পায়ের তালতলার চটিটা বহু-পদ-কর্দমে লাঞ্ছিত।

তবু ভদ্রলোকের ছ'তিনটে দাঁত দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ তিনি হাসছেন। কারণ তাঁর হাতে একটি হাত-খানেক লম্বা ইলিশ মাছ।

প্রশ্ন করলাম, "কত হল মশাই?"

"কি বলছেন? মাছটার দাম? আর বলবেন না দাদা—কি ভীড় ঠেলে যে একে হরণ করে নিয়ে এসেছি—উঃ"—

"কত দাম?"

"হাঁ বলছি—তা খুব বেশী নয় অন্য দিনের চেয়ে। আজকে তিন টাকা করে গেল। এটার ওজন দেড় সের। বেশ ডিসেণ্ট হয়েছে মাছটা—কি বলেন, এ্যাঁ?"

মাথা নেড়ে, শুষ্ক হাসি হেসে বললাম, "কিছু মনে করবেন না, মশায়ের কি করা হয়?"

"আমি?" ভদ্রলোক দক্ষিণ হস্ত বুকে রেখে বলল, "আমি? আমি একজন মিলিটারী কনট্রাক্টর—"

"আচ্ছা—নমস্কার"—

"এ্যাঁ? ওঃ—নমস্কার নমস্কার"—

ভদ্রলোক শিষ দিতে দিতে চলে গেল।

মাছ কেনা আর হলো না। একটা বিড়ি টানতে টানতে বাড়ী ফিরলাম।

নতুন খবর ছিল বাড়ীতে।

নীলার আবার জ্বর এসেছে। নিরুপমা কাজ করতে করতে একবার মাথা ঘুরে পড়ে যেতে যেতে সামলে নিয়েছে। অনেক দিন ধরেই তাকে অবহেলা করে এসেছি, এবার বিচলিত হলাম। নিরুপমা কেরাণী-গৃহিণী, ব্রহ্মচারীর হাতে পড়েনি। আমাদের জীবনের বিলাসোপকরণ অতি অল্প-সংখ্যক। খাওয়া, ঘুমানো আর দাম্পত্য-জীবন। তাই ছাড়ি না কোনটাই। তাই সামর্থ্যের অঙ্ক দেখেও ভয় পাই না, সংযমী হই না, 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা:'—এই শাস্ত্রোক্তিকেই সাগ্রহে মেনে আত্ম-প্রতারণা করি।

নিরুপমা ছ'মাস ধরে অন্তঃসত্বা। তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে। ডাক্তারকে এবার দেখাতেই হবে।

কিন্তু টাকা?

সে ভাবনা আপাততঃ স্থগিত থাক। ঘড়ির কাঁটা অফিসের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করছে।

শেয়ালদা'র ট্রাম ডিপোতে গিয়ে রোজ ট্রামে চড়ি। বাড়ী থেকে শেয়ালদা'র মোড়ে যেতে প্রায় মিনিট দশেক লাগে—তবু ইচ্ছে করেই এগিয়ে যাই, কারণ ট্রাম ডিপোতেই তা ভয়াবহভাবে ভরে ওঠে, অন্যত্র কা কথা।

ট্রামে উঠলাম কোনমতে। সে কি ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুঁতি! বাপ! বসবার জায়গা আর পেলাম না, ফ্যানের ঢাকনিটার একপাশ ছুটো, মাত্র ছুটো আঙুল দিয়ে আঁকড়ে ধরে নিজেকে সামলাতে লাগলাম। পাঁজরার হাড়ে একটা চোট খেলাম। কিন্তু উপায় কি? নিরুপায় হয়ে চলতে চলতে মনে পড়ল পরিমল গোস্বামীর লেখা ট্রামের সেই লোকটির কথা। আজ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করলাম যে, ট্রামের সেই লোকটি আমিই। অর্থাত, অবজ্ঞাত কেরাণী-মধ্যবিত্তের বিয়োগান্ত ছবিটার মধ্যে নিজেকে দেখতে পেয়ে নিজেই নিজের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে উঠলাম।

ইতিমধ্যে এককাণ্ড হলো। ট্রাম তখন চলছে। চলন্ত ট্রামে একজন রুগ্নকায় লোক হন্তদন্ত হয়ে উঠে কিছু ধরবার মত না পেয়ে একজন মোটা সোটা ভদ্রলোকের কোমর জড়িয়ে ধরে নিজেকে সামলে নিল।

স্থূলকায় ভদ্রলোক দাঁত খিঁচিয়ে উঠল, "একি করছেন মশাই, আমি হ্যাণ্ডল্ নই—আর যেভাবে ধরেছেন মনে হচ্ছে যেন পকেট মারবেন।"

"কি যে বলেন স্যার"—বলেই রুগ্নকায় লোকটি ভদ্রলোকটির কোমর ছেড়ে হাতলের একটা অংশ ধরে সরে গেল। সরে যাবার সময় তার বহু-সোল-যুক্ত মোটা জুতোটা ভদ্রলোকটির পায়ের উপরে বেশ সজোরে একটি চাপ দিয়ে গেল।

মুহূর্ত্তে স্থূলকায় ভদ্রলোক খেপে গেল, "কি রকম ষ্টুপিড মশাই, পা মাড়াচ্ছেন কেন, এ্যাঁ!"

লোকটি বলল, "স্যরি"—

"হঃ—স্যরি বল্লেই যেন সব ফুরিয়ে গেল—যত সব ষ্টুপিড"—

"গাল দেবেন না মশাই।"

"দেবই তো"—

"ভাল হবে না কিন্তু"—

"ভাল হবে না তো করবে কি হে তুমি, অভদ্র জানোয়ার কোথাকার?"

"তবেরে শালা"—

ছ'জনে মারামারি বেধে গেল। চড়, কিল ও ঘুষোঘুষির ফলে যে আবর্ত্ত ও আলোড়নের সৃষ্টি হল তার আঘাতে প্রাণ যায় আর কি! সেই চাপ থেকে বাঁচবার জন্য একবার এদিক একবার ওদিক মাথা আর শরীরকে সরিয়ে সরিয়ে আত্মরক্ষা করলাম।

ডালহাউসি স্কোয়ারে নেমে দেখি পায়ে একপাটি জুতো নেই। মাত্র এগার মাস জুতোটা পরেছি—আরও মাস ছয়েক চালাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু গেল।

সান্ত্বনা দিলাম নিজেকে। জুতো গেলেই বা, চাকরি তো বজায় আছে।

কিন্তু তবু মনটা খারাপ হয়ে গেল। রাগে, দুঃখে অন্য পাটিটাকে সজোরে ছুঁড়ে ফেললাম রাস্তার মাঝখানে।

বৃষ্টি নেমেছে। আকাশ অন্ধকার।

অর্দ্ধ-সিক্ত হয়ে বাড়ী ফিরলাম। জল খাবার খেয়েই ডাক্তার ডাকতে বেরোলাম। নীলার জ্বর বেড়েছে।

ডাক্তার এলেন।

ভিজিট নিয়ে বিদায়ও হলেন।

ওষুধ আনার জন্য আবার বেরুবো ভাবছিলাম।

নিরুপমা বলল, "এই বৃষ্টিতে আর বেরিয়ো না, কাল যেয়ো—"

"পাগল"—

কথা বলতে বলতে তার দিকে নজর পড়ল। ছেঁড়া শাড়ী।

"ভাল শাড়ী নেই?"

"কটা আছে যে থাকবে?"

"এই যেটা সেদিন এনে দিলাম?"

"ভাল শাড়ী বলতে ঐ একটিই—ধোপা বাড়ী গেছে।"

নিষেধ সত্বেও বেরুলাম। বেরুবার আগে নিরুপমার অজ্ঞাতসারে বাক্স খুলে আরও গোটা কয়েক টাকা নিলাম। বাক্সে মাত্র গোটা দুই টাকা রইল। মাস শেষ হতে এখনো দেরী আছে। তা হোক্। র‍্যাশন কার্ডে গত মাসে একটি শাড়ী ও একটি ধুতি পেয়েছি, এ মাসে পাইনি। আবার কবে শক্তিমান কর্ত্তাদের ও শক্তির অবতার ব্যবসায়ীদের সদিচ্ছা হবে কে জানে! তার অপেক্ষায় থাকলে নিরুপমার নির্লজ্জ মূর্ত্তি দেখে হয়ত আমার পৌরুষকে লজ্জা পেতে হবে।

ডাক্তারের ডিসপেনসারী।

কম্পাউণ্ডার বলল, "এই টনিক নেই।"

"কোন উপায়েই কি পাওয়া যাবে না?"

[ইহার পর ১৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

নট ও দেহপট

[১৪২ পৃষ্ঠার পর]

দ্বারা অভিনয়কে বেশী ভাল বলতে হয়। চীনা থিয়েটার, জাপানী থিয়েটারে তাই রীতি ছিল। ম্যায় ল্যাং ফ্যাংএর মেয়ে চরিত্র অভিনয়েই পৃথিবী জোড়া খ্যাতি। 'রক্তকরবী' প'ড়ে শোনাবার সময় রবীন্দ্রনাথ শিশিরকুমারকে পরামর্শ দিয়েছিলেন নন্দিনীর ভূমিকা বিশ্বনাথকে দিয়ে অভিনয় করাবার জন্যে। সৌখীন থিয়েটারে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ছেলেরা মেয়ের ভূমিকা অভিনয় করে। বেশীর ভাগই অথচ ব্যর্থ হয়। কারণ, মেয়ে চরিত্র পুরুষদের দ্বারা নিখুঁত-ভাবে অভিনয় করান খুবই শক্ত। আর, এতটুকু খুঁত থেকে গেলে, অভিনয় মেয়েরও হয় না পুরুষেরও হয় না, হয় মাঝামাঝি এমন জীবের, যাদের প্রতি সাধারণের মন বিরূপ। শীতপ্রধান দেশের পক্ষে দেহ বেশীর ভাগ াবৃত থাকায় অনেক সুবিধা। ম্যায় ল্যাং ্যাং চলন বলন চোস্ত ক'রে মুখখানাকে েয়েলি ক'রেই সারতে পারতেন। কিন্তু ামাদের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পক্ষে ুরুষের নিখুঁতভাবে মেয়ের অভিনয় করতে ালে আরও বেশী কিছু দরকার। তা প্রায়ই য় না। তবুও, এ কলকাতা সহরে কতিপয় ামকরা সৌখীন পুরুষ অভিনেতা রয়েছেন. েয়ে ভূমিকা অভিনয়ের জন্যই যাদের ্যাতি।

নাটকের চরিত্রের অপর নাম 'পাত্র'। পাত্র' যখন গঠনে দৃঢ় হয়, তখন অভিনেতার বহুমনের নমনীয়তাকে, ছাঁচে ঢালার মত ্রে পাত্রে ঢেলে, পূর্ণপাত্র দর্শক সম্মুখে িবেশন্ন। এই নমনীয়তা বয়সের সঙ্গে ঙ্গে কমে আসে। নানা প্রকার মুদ্রাদোষ ায়ী হ'তে সুরু করে। "দেহপট সনে নট কলি হারায়।" কিন্তু, সব হারাবার ্বেই পটকে কাল মলিন ক'ত্তে সুরু ক'রে ায়। কালকলঙ্কিত পট বিশেষ ক্ষেত্রে চিত্রের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির কারণ হ'তে পারে, কন্তু, অমলিন শুভ্রশ্বেত পটই চিত্রকরের ্শিতত্ব ফলাবার আসল জমি।

অনেক সময় নটের অনমনীয়তা, তাঁর ্যক্তিত্বের মহিমাই অভিনয় সাফল্যের কারণ হ'য়ে ওঠে। 'পাত্র' যেখানে অদৃঢ়, কুগঠিত, সেখানে অভিনেতার আয়োজনপ্রাচুর্য্যে চরিত্রের ত্রুটী আচ্ছাদিত হ'য়ে যায়। অভি-নেতার সুদর্শন মূর্ত্তি, সুমিষ্ট কণ্ঠ, সুচারু চলন প্রভৃতি পূর্ব্ব সঞ্চিত প্রশংসার মূলধন রসোপ-ভোক্তাকে যেন ঘুষ দিয়ে তুষ্ট করে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভিনয়ের খ্যাতিও এই প্রশংসার মূলধনে চক্রবৃদ্ধি হারে যুক্ত হয়। বড় অভিনেতার দর্শনানন্দে দর্শক অভিনয় বিচার ক'ত্তে ভুলে যায়। চুলচেরা বিচারে এ ব্যাপারের আমরা নিন্দা করতে পারি। কিন্তু এ পর্যান্ত সর্ব্ব-দেশের সর্ব্বকালের থিয়েটারের ইতিহাসে এরূপ উদাহরণই বেশী। বেশীর ভাগ টি ব্রাই বেশী স্থিতিস্থাপক। শক্তিমান্ অভিনেতা আপন ব্যক্তিত্ব প্রভাবে চরিত্রকে ইচ্ছামত গড়ে নেন। কিম্বা, চরিত্রকে উত্তরীয়ের মত কাঁধে ক'রে নিয়ে আপন ব্যক্তিত্ব জাহির করেই মাত করেন। দর্শক নিয়ে থিয়েটার, দর্শকের প্রবৃত্তি ও সহানুভূতি পূর্ব্বে যাঁর অর্জ্জন করা রয়েছে, তিনি ইচ্ছা করলে তার অনেক রকম সুবিধা নিতে পারেন। কিন্তু দর্শকের রসবুদ্ধির শুদ্ধি সাধনও নেতৃস্থানীয় নটদের কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম। অরক্ষিত পটভূমিকার ওপর নতুন নতুন চিত্রাঙ্কনে নটের সে ধর্ম্ম পালন হয়। আর নাট্যকাররাও সুসজ্জ পাত্র গঠনে বেশী ক'রে অবহিত হন।

নিরবয়ব

[১৪১ পৃষ্ঠার পর]

নিক্ষেপ করিয়াছি—সে যবনিকা তুলিয়া ধরিবার সাধ্য কাহারো নাই।

পদধ্বনি, চিহ্নিত সুস্পষ্ট পদধ্বনি, সিঁড়ি বাহিয়া আরোহণ ও অবতরণ করে; অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া স্নানার্থে সে নামে, স্নানান্তে উঠিয়া যায়—আমি খুঁজিয়া মরি তার সেই অবমানিত চাহনিটি—আর একবার সে যদি তার আয়ত উজ্জ্বল নয়ন দু'টি ঘোমটার আড়ালে মেলিয়া রাখিয়া আমার পানে চাহিয়া থাকে!...কিন্তু আমার সেই নির্মমতা সে ক্ষমা করে নাই—অকারণে অত বড়ো আঘাত খাইয়া নারীর সহজ আভিজাত্যবশতঃ আমাকে সে পশু মনে করে নিশ্চয়ই।

সাত মাস পরে শীতের এক মধ্যাহ্নে গায়ে আলোয়ান জড়াইয়া আমি আমার নিজের সেই স্থানটিতে বসিয়া আছি—না শুইয়া যে বসিয়া আছি, ইহার হেতু অবশ্যই আছে।

নৃপতি মজুমদার মহাশয় সপ্তপর্ণীর জন্য একটি গল্প চান আমার কাছে, অবশ্য পরীক্ষা-মূলকভাবেই চান। চাহিবার সময় তিনি হাসেন নাই—আমিও হাসি নাই। সুতরাং ব্যাপার অকপট এবং উল্লাস আর উদ্বেগজনক একই সঙ্গে। উল্লাস দমন এবং উদ্বেগ সহ্য করিতে করিতে শেষটা সাব্যস্ত করিয়া লইয়া গল্পই শুরু করিয়া দিয়াছি:

"গাড়ীতে ভিড় ছিল না।

"তৃতীয় শ্রেণীর একটি 'ডাবায়' বসিয়া প্রাকৃতিক শোভা, অর্থাৎ রেলপথের দু' ধারের বাবলা গাছ, বাঁশের ঝাড়, আম কাঁঠালের বাগান, তালবৃক্ষশ্রেণী, কুল গাছের ঝোপ, জলপূর্ণ খাল আর ডোবা, দিগন্তবর্ত্তী চলন্ত বনানীরেখার ঘূর্ণন, সহগামী খণ্ড মেঘ প্রভৃতি সন্দর্শন করিতে করিতে আলস্য বোধ হওয়ায় হাত পা ছড়াইতে ছড়াইতে ক্রমশঃ শুইয়া পড়িলাম।"

পড়িয়া মনে হইল, ভালই হইতেছে।

তারপর লিখিয়া চলিলাম: "চক্ষু মুদ্রিত করিতেই মনে পড়িয়া গেল সেই চিঠিখানার কথা—ঠিক সেই চিঠিখানার কথা নয়, পুনশ্চ দিয়া চিঠির শেষে যে সংক্ষিপ্ত ছত্রটি জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল সেই ছত্রটির কথা—

ছত্রটি এই: 'এখানে দুইদিন ধরিয়া দিনরাত বৃষ্টি হইতেছে'...

সংবাদবহুল পত্রের এই শেষ সংবাদ—পাঠাইয়াছিল আমার স্ত্রী আন্না।"

পড়িয়া আবারও মনে হইল, বেশ হইতেছে। আরো মনে হইল, নৃপতি মজুমদার মহাশয় টেবিলে বারকতক মুষ্ট্যাঘাত করিবেন।

লিখিতে লাগিলাম:

"'আর না' বলিয়া কালীর উদ্দেশে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেও আমার শাশুড়ীর সপ্তমগর্ভে যে-সন্তানটি জন্মগ্রহণ করিল, সে-ও কন্যা। কিন্তু আন্নার নিজের নামের জন্য ক্ষোভ নাই এবং পুনশ্চ দিয়া অবিরাম বৃষ্টিপতনের সংবাদ প্রবাসগত স্বামীকে সে কেন দিয়াছে তাহা সে-ই জানে।

"আন্নার বয়স একুশ—

"একুশ বছরের আন্না কি অকারণেই এই মহাবর্ষার সংবাদটি আমাকে দিয়াছে!... আলস্যভরে চোখ বুজিয়া ভাবিতেছিলাম বিরামহীন বর্ষার খবরটা কি শুধু খবরই! মনোবেদনার একটু স্পন্দন, আহ্বানের একটু ইঙ্গিত, ২১ বছরের একটু উত্তাপ কি উহার ভিতর নাই!"

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া আবার পড়িলাম—

আবারও মনে হইল, বেশ হইতেছে। আরো মনে হইল, নৃপতি মজুমদার মহাশয় আমার নমস্য দীক্ষাগুরু এবং আমি 'দি গ্রেট ইণ্ডিয়ান কন্টিনেন্ট্যাল ওয়ার্কশপ কোম্পানী'কে উচ্চতায় সত্যই হার মানাইয়াছি...

দম্ভভরে লাফাইয়া না উঠিয়া সুখভরে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে আমার শিরদাঁড়া খাড়া হইয়া উঠিল। এদিক ওদিকের মধ্যে বাঁ দিকটাও পড়ে—বাঁ দিকে চোখ ফিরাইতেই খোলা জানালা দিয়া আমার দৃষ্টি চলিয়া গেল ১৭ নম্বরের সিঁড়ির উপর; আর দেখিলাম ঠিক সেই দিনের মতো অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া তরুণী আমাকেই দেখিতেছে......

মুহূর্ত্তেকের জন্য দৃষ্টির মিলন হইল; তরুণী অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া উঠিয়া গেল—এত-দিন পরে ক্ষমা পাইয়া আমি ক্ষমালাভের আনন্দে অধীর হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম, যেন শাপমুক্ত রাক্ষসের মতো সহসা দিব্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া।

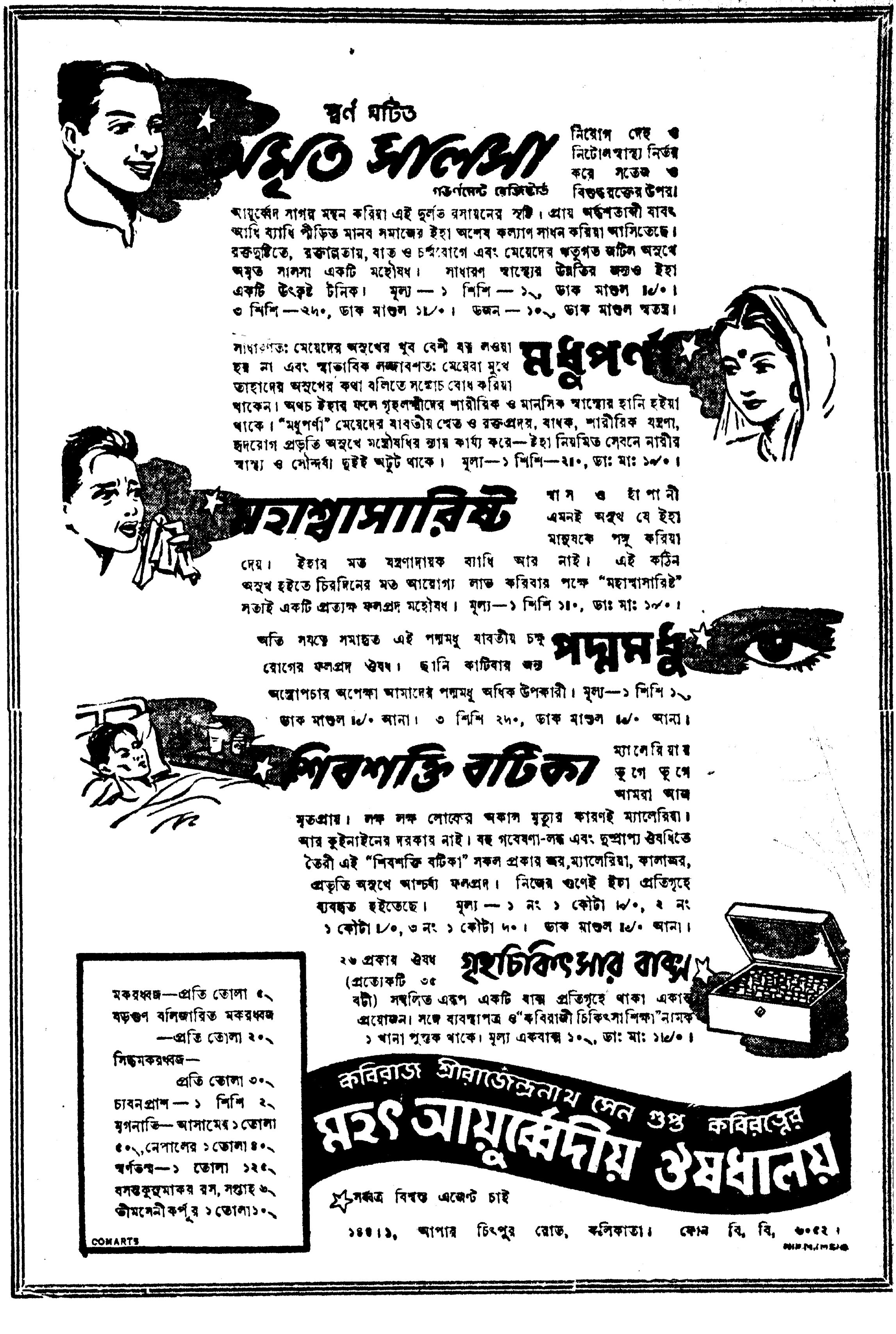
পরদিন বেলা সাতটার সময় উড়ে বেহারার হুম্‌হুম্‌ শব্দে কৌতূহলী হইয়া জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া দেখিলাম একখানা পাল্‌কি চলিয়াছে। পাল্‌কি চলিয়া গেল। মুখ ফিরাইতেই দেখি, নীরি আমার পাশেই জানালায় মুখ দিয়া দাঁড়াইয়া আছে; মুখ বিষণ্ণ—

জিজ্ঞাসা করিলাম, কে গেল রে?

নীরি বলিল, নরেনবাবুর বউ গেল।

—কোথায়?

—তার বাপের বাড়ী।


স্বর্ণ ঘটিত
অমৃত সালসা
গভর্ণমেন্ট রেজিষ্টার্ড
নিরোগ দেহ ও নিটোল স্বাস্থ্য নির্ভর করে সতেজ ও বিশুদ্ধ রক্তের উপর।
আয়ুর্ব্বেদ সাগর মন্থন করিয়া এই দুর্লভ রসায়নের সৃষ্টি। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী যাবৎ আধি ব্যাধি পীড়িত মানব সমাজের ইহা অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া আসিতেছে। রক্তদুষ্টিতে, রক্তাল্পতায়, বাত ও চর্ম্মরোগে এবং মেয়েদের ঋতুগত জটিল অসুখে অমৃত সালসা একটি মহৌষধ। সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যও ইহা একটি উৎকৃষ্ট টনিক। মূল্য — ১ শিশি — ১৲, ডাক মাশুল ।৶০। ৩ শিশি — ২৸০, ডাক মাশুল ১।৵০। ডজন — ১০৲, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।
মধুপর্ণা
সাধারণতঃ মেয়েদের অসুখের খুব বেশী যত্ন লওয়া হয় না এবং স্বাভাবিক লজ্জাবশতঃ মেয়েরা মুখে তাহাদের অসুখের কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়া থাকেন। অথচ ইহার ফলে গৃহলক্ষ্মীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের হানি হইয়া থাকে। "মধুপর্ণা" মেয়েদের যাবতীয় শ্বেত ও রক্তপ্রদর, বাধক, শারীরিক যন্ত্রণা, হৃদরোগ প্রভৃতি অসুখে মন্ত্রৌষধির ন্যায় কার্য্য করে—ইহা নিয়মিত সেবনে নারীর স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য দুইই অটুট থাকে। মূল্য—১ শিশি—২।০, ডাঃ মাঃ ১৵০।
মহাশ্বাসারিষ্ট
শ্বাস ও হাঁপানী এমনই অসুখ যে ইহা মানুষকে পঙ্গু করিয়া দেয়। ইহার মত যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি আর নাই। এই কঠিন অসুখ হইতে চিরদিনের মত আরোগ্য লাভ করিবার পক্ষে "মহাশ্বাসারিষ্ট" সত্যই একটি প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ। মূল্য—১ শিশি ১।০, ডাঃ মাঃ ১৵০।
পদ্মমধু
অতি সযত্নে সমাহৃত এই পদ্মমধু যাবতীয় চক্ষু রোগের ফলপ্রদ ঔষধ। ছানি কাটিবার জন্য অস্ত্রোপচার অপেক্ষা আমাদের পদ্মমধু অধিক উপকারী। মূল্য—১ শিশি ১৲ ডাক মাশুল ।৶০ আনা। ৩ শিশি ২৸০, ডাক মাশুল ।৶০ আনা।
শিবশক্তি বটিকা
ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে আমরা আজ মৃতপ্রায়। লক্ষ লক্ষ লোকের অকাল মৃত্যুর কারণই ম্যালেরিয়া। আর কুইনাইনের দরকার নাই। বহু গবেষণা-লব্ধ এবং দুষ্প্রাপ্য ঔষধিতে তৈরী এই "শিবশক্তি বটিকা" সকল প্রকার জ্বর, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, প্রভৃতি অসুখে আশ্চর্য্য ফলপ্রদ। নিজের গুণেই ইহা প্রতিগৃহে ব্যবহৃত হইতেছে। মূল্য — ১ নং ১ কৌটা ।৶০, ২ নং ১ কৌটা ৷/০, ৩ নং ১ কৌটা ৸০। ডাক মাশুল ।৶০ আনা।
গৃহচিকিৎসার বাক্স
২৬ প্রকার ঔষধ (প্রত্যেকটি ৩৫ বটী) সম্বলিত এরূপ একটি বাক্স প্রতিগৃহে থাকা একান্ত প্রয়োজন। সঙ্গে ব্যবস্থাপত্র ও "কবিরাজী চিকিৎসা শিক্ষা" নামক ১ খানা পুস্তক থাকে। মূল্য একবাক্স ১০৲, ডাঃ মাঃ ১।৶০।
মকরধ্বজ—প্রতি তোলা ৫৲
ষড়গুণ বলিজারিত মকরধ্বজ —প্রতি তোলা ২০৲
সিদ্ধমকরধ্বজ— প্রতি তোলা ৩০৲
চ্যবনপ্রাশ — ১ শিশি ২৲
মৃগনাভি— আসামের ১ তোলা ৫০৲, নেপালের ১ তোলা ৪০৲
স্বর্ণভস্ম—১ তোলা ১২৫৲
বসন্তকুসুমাকর রস, সপ্তাহ ৬৲
ভীমসেনী কর্পূর ১ তোলা ১০৲
COMARTS
কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরত্নের
মহৎ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়
সর্ব্বত্র বিশ্বস্ত এজেন্ট চাই
১৪৩।১, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। ফোন বি, বি, ৬০৫২।

ভারত ভুলোনা তুমি—

শ্রীনরেন্দ্র বসু

শুধু কি গৌরব বহ, অতীতের জীর্ণ ইতিহাসে
বিছায়ে বিমুগ্ধ মনে আভিজাত্যে রহিবে অধীর ?
ঢাকিতে দীনতা হায়, এ অক্ষম চঞ্চল প্রয়াসে
ভারত, তোমার নতে গ্লানি আর লজ্জাই নিবিড় !
কী তব সঞ্চয় হলো ? নষ্ট শক্তি ? লুপ্ত পৌরুষ ?
স্তিমিত যৌবন-বহ্নি আবার কি জ্বলেছে মাটির ?
নীরব নৈরাশ্যে দোলে নির্বিকার বন্ধ্যা-অমানিশা :
ভারত, তোমার চোখে ব্যর্থতার চিহ্ন সুগভীর !
করেছে বিস্মিত তোমা প্রতীচ্যের বৈচিত্র্য বিলাস,
হয়েছো আচ্ছন্ন বুঝি আশ্চর্য্য আলোকে মায়াবীর ?
এ তব সভ্যতা নয়, জীবনের কৃত্রিম উচ্ছ্বাস
ভারত, তোমার বুকে বিঁধিয়াছে বঞ্চনার তীর !
আপনা-বিস্মৃত তুমি,—তাই ব্যথা বাজেনা তোমায়,
জর্জ্জর বন্ধন মাঝে ঝরে যায় রক্তিম-রুধির ;
তোমারি উপেক্ষা তব ক্ষুব্ধ আর ক্ষুধিত ধূলায়
ভারত, তোমার নামে কলঙ্কের লেখা শতাব্দীর !

সন্ধ্যা-আবির

রঞ্জিত সিংহ

যেখানে আকাশবনে আবিরের রং,
যেখানে মনের পাখী ডানা-মেলা দিগন্ত রঙীন,
যেখানে মনের বনে অনেক ভ্রমর, নীল তারা, বুনো মৌমাছি,—
আশ্বিনের ভরা মাঠ, জ্যোনাকীর ক্ষণিকার মায়া,
সোনালি ভোরের পর জ্যোছনার রাত,
নিঝুম রাতের পর পৃথিবীর ভোর :
আমার মনের পাখী সেইসব দেশে
পার হয়ে যাবে সব মাঠ-বন-নদী।

এখানে আকাশ নেই। অন্ধকার নদীর বনের
মৃত্যুর স্মৃতির মতো অতীতের নির্জন প্রান্তর,
এখানে সাগর-পাখী ঘুমায় রাতের ;
সূর্যের ইশারা শোনে বনের শিশির—
ডেকে যায় তারপর সঞ্চারিত উদয়ের পথে।
ঘুমের শহর ছেড়ে মেঘের হাওয়ায়
মৌমাছি-ডানার হাওয়ায়
আমার মনের পাখী খুঁজে নেবে শেষে
সেইসব জীবনের নদী।

গুরু-শিষ্য

অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

'শোনো অধ্যাপক'—

শুধু শাস্ত্র-বুলি নয়, শুধু নয় জ্ঞানী-অভিনয়
বাগ্‌দীপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ; সুন্দরের অভ্যুদয়
শুধু নয় রঙ্গমঞ্চে নাটকীয় বক্তৃতা-বিলাসে।

শোনো অধ্যাপক, আজ দূরে রাখি' মিথ্যা গর্ব চয়
তোমারে নামিতে হবে যেথা ধরা ছাত্রে ছাত্রময়,
যেথা ধরা প্রাণদীপ্ত তারুণ্যের দৃপ্ত বক্ষোচ্ছ্বাসে

পূর্য যথা স্নেহমৌন আলোকের দিব্যতা প্রকাশে।
বিশ্বপৃথিবীতে, বন্ধু, এসো তুমি নিশ্চিন্ত নির্ভয়
তেমনি শিষ্যের বিশ্বে বিকশিতে আনন্দ উল্লাসে
বাস্তব জ্ঞানের সৌমস্নেহ। আজ, এসেছে সময়।
ভাঙো কুঞ্জ ধ্যানবিলাসের ; গুরু, ভাবের আকাশে
মেলো না অলস পাখা আর ; যদি পেতে চাও জয়
আপন জীবনে, শোনো, কবিবাণী করো প্রত্যয়
বাস্তব-চরিত্রে তব ; কালের অব্যর্থ বাণী আসে।

'ছাত্র আধুনিক'—

এতদিন চক্ষে মোর ছিল যেন অবিদ্যার ঠুলি,
তুমি, ছাত্র আধুনিক, সানন্দে আমারে নিলে তুলি'
সত্যকার বিদ্যালোকে ; সস্নেহে পরালে জয়-মালা।

অজ্ঞতার অন্ধকারে আবৃত্তিয়া ভ্রান্ত শাস্ত্র-বুলি
এতদিন ছিনু অন্ধ ; অকস্মাৎ চক্ষু দিলে খুলি'
হেরিনু সূর্যের রশ্মি ; দূরে গেল অজ্ঞতার জ্বালা।

কারা যেন ভেবেছিল—পৃথিবীর বিশ্ব-পাঠশালা
রবে কারাগার সম ; অন্ধকারে তন্দ্রালসে ঢুলি'
পড়িবে শাস্ত্রের শ্লোক বন্দী তুমি। (যেন পল্লীবালা
বিষাদিতা বধূ, হায় শ্রমরতা, সর্ব শান্তি ভুলি' !)

ছাত্র আধুনিক, তব বিচিত্র বীর্য্যে বিশ্ব আলা,
বৈচিত্র্যের সাধনায় বিদূরিছ বিশ্ব মিথ্যাগুলি
শতবিধ কর্মস্বপ্নে বক্ষ তব উঠে নিত্য দুলি'
আনন্দের ছন্দে,—সহ মৃগ্ধপ্রীতি-সনেট, অকাটালা।

বরষার পাখী

শ্রীশুভেন্দুভূষণ বসু

আমি যেন এই ধূলার ধরায় কুলায় হারাণ পাখী,
কবে আষাঢ়ের সে কোন অতীতে সহসা উঠেছে ডাকি।
কবে বরষার আঁখিজলে ওর,
মিশায়ে আকুল নয়নের লোর,
কুলায় খুঁজিয়া কূল-হারা মোর হিয়ার বেদনা মাখি,
ঝড় বাদলের সে অতীত হ'তে আজো আকুলিয়া ডাকি।

আমার আঁখির সম্মুখে এই ধরণীর খেলা ঘরে
আসি কত' পাখী পক্ষ বিছায়ে নৃত্য ও গীত করে ;
বনে বনে দেখি কুসুমের মালা,
নিরজনে ভাবি জীবনের খেলা,
জীবন-মরণ চ'লেছে দুবেলা, জীবন মৃত্যু রাখি—
আমার আঁখির সম্মুখে আসি অনন্ত ডাকাডাকি।

আমার আকুল দৃষ্টিতে পড়ে পৃথ্বীর যৌবন,
চঞ্চল দুটি চক্ষুতে সদা মিলনের চুম্বন !
আমি অপলক চাহিয়া চাহিয়া
নব ফাল্গুনে উঠি আকুলিয়া—
বিফল দিনের বেদনা ভুলিয়া আশার আলোক মাখি
নব জীবনের আহ্বানে ডাকি চির বরষার পাখী।

মূর্চ্ছিতা বসুধা

প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়

নামিল সন্ধ্যার ছায়া, লয়ে মায়ামোহাঞ্জন ফাঁদ,
দিকপ্রান্তে উঁকি দেয় চুপে চুপে পঞ্চদশী চাঁদ,
জ্যোৎস্না ঝরে নভ হতে তৃষাতপ্ত ধরণীর শিরে,
ক্লান্ত তরু স্তব্ধ হয়ে করে ভোগ মধুযামিনীরে।

আদিকাল হতে মন সভ্যতারে আনিয়াছে বয়ে
তারি মৃত্যু হ'ল আজ নত শির হল পরাজয়ে।
অন্তরালে মানবাত্মা কাঁদে বসি' লয়ে মনক্ষোভ,
মানবতা সিংহাসনে বসিয়াছে লজ্জাহীন লোভ।

লোভ লোল-রসনায় লেহি' নিল সভ্যতার রস,
বিপুলা এ পৃথ্বী তাই পঙ্গুসম হয়েছে অবশ।
পুনঃ এরে সঞ্জীবিয়া তুলিবে যে সঞ্জীবনী সুধা
তারি লাগি' উৎকণ্ঠিয়া চেয়ে আছে মূর্চ্ছিতা বসুধা।

বিশ্ব তো হয় নি নিঃস্ব—রূপ রস পূর্ণ দিকে দিকে
মানুষ মনস্ হায় আজ শুধু হয়ে গেছে ফিকে।



এক দিনে দুই শিকার - রাজা রাও শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

শিকারের নামে যাঁরা উৎফুল্লিত হ'য়ে ওঠেন, তাঁরা জানেন ভাল করেই যে, এর সময় অসময় নেই কিছু। আমি শিকারীদের কথাই বলছি, ভাল শিকারী খারাপ শিকারী সবাই সমান উৎসাহী। আমি নিজে খুব ছেলেবেলা থেকেই শিকার-প্রিয়। এর জন্য গুরুজন অভিভাবকদের কাছে মাঝে মাঝে তিরস্কার সহ্য করতে হোত। কিন্তু আমার সদাসঞ্চরণশীল মনকে দমিয়ে দিবার মত কিছু সংসারে ছিল না। খুব অল্প বয়সে যখন সবে শিকার আরম্ভ করেছি, সেই সময়কারই একটা কাহিনী ব'লব। আরও কিছু বড় হ'য়ে কত বাঘ মেরেছি—প্রায় মরতেও বসেছিলাম একবার বাঘের মুখে, কিন্তু সে সব বিপদের দিনেও আমার যে উত্তেজনা হয়নি সে উত্তেজনার দিন একবার এসেছিল আমার সেই অপরিণত বয়সের শিকারের ভিতর দিয়েই। আমার সেদিনকার অভিজ্ঞতা এমনি গাঢ় আর বৈচিত্র্যপূর্ণ যে, এখনও তা সবুজ হ'য়ে আমার মনে জেগে আছে।

তখন কেবল স্কুলের পড়া শেষ হয়েছে—নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রামের দ্বিপ্রহরগুলি একে একে অলসতার মধ্য দিয়ে কেমন কেটে যেত। সবে ফাল্গুন মাস সুরু হয়েছে—শীতের বেশ এখনও আছেই শুধু শীতান্তের জীর্ণপাতা খসে পড়ে বনে বনে শাল-পিয়ালে নূতন পাতার মুদ্রগুঞ্জরণ এনে দিয়েছে। এমনই এক অলস মধ্যাহ্নে, আর কোনো কাজ না থাকায় আমার পুরাতন চাকরটিকে দিয়ে বন্দুকটা পরিষ্কার করাচ্ছি এমন সময় পাড়ার এক সহপাঠী এসে বললে,—"গাঁয়ে শুয়োর বেরিয়েছে, যাবে শিকার করতে?" শুয়োরের কথা শুনেই আমার বুক ফুলে উঠল—ভাবলাম, এইবার যোগ্যমত শিকার পেয়েছি বটে। কিন্তু অনুমতি না নিয়ে তো যাবার উপায় নেই। অনেক কষ্ট করে অনুমতি পেলাম অবশ্য আমার সঙ্গে এক আত্মীয় আমার অভিভাবক হ'য়ে যাবেন। তা'তেই রাজী হ'লাম। বন্দুকটা তাড়াতাড়ি মুছে নিয়ে তখনই শিকারে বেরবার উদ্যোগ করতে লাগলাম। আমার শিকারের পোষাক তৈরীই ছিল, সেটা প'রে নিয়ে কিছু টোটা একটা বেল্টে নিয়ে কোমরে বেঁধে বন্দুক হাতে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে আমার সেই আত্মীয়টিও চললেন। এখান থেকে শিকারের জায়গাটা প্রায় তিন মাইল সাড়ে তিন মাইল হ'বে। সেদিনই কাছারীতে মফস্বল থেকে একটা হাতী এসেছিল। আমরা দুজন সেই হাতীতে চড়েই রওনা হলাম। প্রায় তিন মাইল যাবার পর ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের একটা লম্বা পুল; তার নীচে খানিকটা ঝোপ, তারই ওপারে একটা বনের মত। আমাদের সঙ্গে যে কয়েকজন সেপাই ভল্ল ও তরবারী নিয়ে আসছিল, তারা খানিকটা পেছিয়ে পড়েছে দেখে আমরা আমাদের গজেন্দ্রগমন শ্লথ করে দিলাম। ক্রমে, তারা এসে পৌঁছল। দেখি, রাস্তায় গ্রামের কয়েকজন লোক, যে যার ভল্ল, লাঠী প্রভৃতি নিয়ে মহা উৎসাহে তাদের সঙ্গে যোগদান করেছে। আমরা সেই পুলের কাছাকাছি গিয়ে হাতী থেকে নেমে পড়লাম। মাহুতকে বলে দিলাম, সে হাতীটাকে উল্টোদিকের জঙ্গল তাড়িয়ে আমাদের দিকে নিয়ে আসবে।

আমি আমার বন্দুকটাতে টোটা পুরে নিলাম। তারপর এদিক ওদিক পায়চারী করে বেড়িয়ে দেখতে লাগলাম—কেমন করে বেশ লাগসই ভাবে শিকার করা যাবে। সঙ্গে যারা ভল্ল, তরবারী, লাঠি প্রভৃতি নিয়ে আসছিল, তাদের সব ঠিক ঠিক জায়গা দেখিয়ে দিলাম। আমার আত্মীয়টিকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কি আমার সঙ্গেই থাকবেন?" তিনি বললেন, না বাবা, শিকার আমার সহ্য হয় না, আমি বললাম, "তবে এলেন কেন?" তিনি বেশ মুরুব্বিয়ানার চালে বললেন, "তোমাকে দেখতে হ'বে ত। বিপদ আপদ ত' এ সবে কম নেই!"

সামনের জঙ্গলটার মধ্যে কি একটা নড়ে উঠল না? হাঁ, তাইত বটে! আমার মাহুতটাও কি এক প্রচলিত অবোধ্য ভাষায় হাতীটাকে তাড়া ক'রে নিয়ে আসছে। আমি নিজেকে সজাগ করে রইলাম। চক্ষের নিমেষে কয়েকটা শুয়োর জঙ্গল থেকে বেড়িয়ে আমার দিকেই তীরের মত ধেয়ে এল—তাদের সামনেরটা একটা প্রকাণ্ড দাঁতাল—তীরবেগে ছুটে আসছে—বাতাসে একটা শন্‌শন্ আওয়াজ করে—আমি আর কালবিলম্ব না ক'রে গুলী ছুঁড়লাম একটা, দুটো; কিন্তু দাঁতালটা তবু তীরের মতই আসতে লাগল আমি প্রমাদ গণলাম এবার আর রক্ষে নেই। আমার এই কথাগুলি বলতে যে সময়টুকু লাগল তার এক ভগ্নাংশের মধ্যেই এই কাণ্ডটা ঘটল। কিন্তু দাঁতালটা যখন আমার থেকে প্রায় দশ বারো গজের মধ্যে এসে পড়েছে তখন হঠাৎ সে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল—আর নিজেকে রগড়াতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে সব স্থির। কাছে গিয়ে দেখি, আমার একটা গুলী দাঁতালটার বক্ষপঞ্জর বিদীর্ণ করেছে। একটা তার গায়ে লাগেনি। শুয়োরটা সেখানেই পড়ে রইল, আমি চললাম সঙ্গীদের ডেকে আনতে। কিন্তু কোথায় সব? কেউ নেই ভল্ল, তরবারী, লাঠি সব এলোমেলো ভাবে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে, তাদের মালিকদের কোনো পাত্তাই নেই। একজনের নাম ধরে ডাকতেই সে সামনের একটা ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। তার অন্তর্দ্ধানের কৈফিয়ৎ তলব করবার পূর্ব্বেই সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল যে আমার সেই আত্মীয়টি পুলের উপর থেকে নীচে

নব্য ভারত ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৬ গ্রাম—ব্যাঙ্কনব্য

৪৬, স্ট্র্যাণ্ড রোড ঃ কলিকাতা

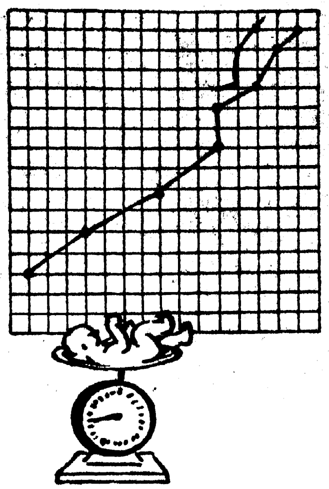
●

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

●

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ঃ

এন, জি, দত্ত রায়



বৰ্দ্ধিষ্ণু শিশুকে বাড়তেই হবে

পরিমিত খাদ্য প্রাণের অভাব হইলেই শিশুর সময়োচিত বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। বিজনস্ তাল মিছরী বর্দ্ধিষ্ণু শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিপোষক খাদ্য। বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ বলেন ইহা ভিটামিন "ডি" সংযুক্ত গ্লুকোজের পরিবর্ত্তে ব্যবহারের উপযোগী। এই তাল মিছরী শরীরের স্নিগ্ধতা সম্পাদন করে।"



বিজন'স্ তাল মিছরী

সোল ডিষ্ট্রিবিউটর :—
প্রসিদ্ধ মিছরী বিক্রেতা = **ভূত নাথ গরাই**
১১৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা

জয়-দুর্গা ভাণ্ডার

স্থাপিত—১৮৯০ সাল

২১১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্যামবাজার মোড়—গোল বাড়ী

উত্তর কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ সিগারেট বিক্রেতা। গত ৫৪ বৎসর যাবৎ জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত আছে। আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পৃষ্ঠপোষকবর্গকে

৺পূজার অভিনন্দন জানাইতেছি।

আপনাদের সহানুভূতি সর্ব্বদাই প্রার্থনীয়।

প্রোঃ—শ্রীশান্তিলাল ঘোষাল

গড়িয়ে পড়ে গেছে। এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, আমার উপরে পুলের একপ্রান্তে আমার সেই আত্মীয়টিকে নিরাপদ জায়গায় রেখে এসেছিলাম বটে, কিন্তু তিনি আর সেখানে নেই। তাঁকে ডাকতেই তিনি সাড়া দিলেন, "এই যে আমি এখানে।" ছুটে তাঁর কাছে গেলুম। দেখি, তিনি চোখ বুঁজে একমনে সজোরে জপের মালা ফিরাচ্ছেন। যেন পরকাল সন্নিকট। এখানে বলে রাখা ভাল, একটা কৌটায় তাঁর জপের মালা সব সময়েই তাঁর কাছে থাকত। ব্যস্ত হ'লেই তিনি জোরে জোরে মালা ঘোরাতেন। আমি কাছে যেতেই সাড়া পেয়ে তিনি চোখ খুলেই প্রথম কথা বললেন, "আমার চশমা ?" সত্যিই ত', তাঁর সর্ব্বক্ষণের সঙ্গী চশমাজোড়া আর তাঁর নাসিকার উপরে নেই। তাঁর এরকম অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বললেন, "কি জানি কেমন করে হোল ওই শুয়োরগুলো তোমার দিকে তেড়ে আসতেই আমি ভয়ে চীৎকার ক'রে উঠলাম কিন্তু গলায় স্বর ফুটল না, তোমার বন্দুকের শব্দ শুনলাম কিন্তু তার পরেও যখন শুয়োরটা তোমার দিকেই ছুটল আমি সব ভুলে গেলাম। মাথাটা বন্ বন্ ক'রে উঠল। আমি পুল থেকে গড়িয়ে নীচে চলে এলাম।" আমি ব'ল্লাম, "আপনি ত' চশমা না হ'লে দেখতেই পান্না—আপনার চশমা পাখী হ'য়ে উড়ে গেছে।" তিনি গম্ভীর হ'য়ে ব'ল্লেন "বাবুর ঠাট্টা হচ্ছে!" তাঁকে হাত ধরে তুলতেই, আর একটা দৃশ্য দেখে সত্যিই অবাক হ'য়ে গেলাম। একটি লোক এক গাছের অনতিউচ্চ একটা ডাল ধ'রে পা গুটীয়ে ঝুলছে। বোধ করি গাছের ডাল ধরে ঝুলে সে নামতে গিয়েছিল,—কিন্তু তিন তিনটে শুয়োর তেড়ে আসছে দেখে তার আর নামা হয়নি! পা দুটো গুটীয়ে এখনও অমনিই ঝুলছে। আমি সঙ্গীদের ডেকে নিয়ে দাঁতালটার কাছে গেলাম। বাপ! জায়গাটায় যেন আগ্নেয় গিরির একটা বিস্ফোরণ হ'য়ে গিয়েছে—প্রায় আধ হাত প্রমাণ মাটী কে যেন খুঁড়ে দিয়েছে! রক্তে সেই মাটী মেটে-লাল রংয়ের হ'য়ে গিয়েছে—দাঁতালটা তার বড় বড় দুটো দাঁত দিয়ে মাটী খুঁড়তে খুঁড়তেই বোধ হয় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে! কি অপরূপ বীভৎস দৃশ্য! এর পরে আরও কত দৃশ্য দেখেছি বীভৎসতায় তার সঙ্গে আর কিছুর তুলনা হয় না। কত ভীষণতর অবস্থার সম্মুখীন হ'তে হ'য়েছে, কত করুণ আর্ত্তনাদও শুনতে পেয়েছি কিন্তু আমার সেই অপরিণত বয়সের শিকারী জীবনে এই অনুভূতি অত্যন্ত মর্ম্ম-স্পর্শী হ'য়েছিল। তাই আজো তাকে ভুলতে পারিনি।

আমার শিকারের নেশা তখনও কাটেনি। মাহুতকে ব'ল্লাম, "আমাদের ঠিক বিপরীত দিকে যে খানিকটা ঘন জঙ্গল আছে, সেখানেই সম্ভবতঃ শুয়োরগুলির আড্ডা—তুমি হাতীটাকে নিয়ে ওপার থেকে জঙ্গল তাড়িয়ে নিয়ে এস।" মাহুত "বহুৎ আচ্ছা" বলে হাতী নিয়ে চ'লে গেল। আমি আরও শিকার ক'র্ব শুনে আমার সেই আত্মীয়টি অভিভাবকের সুরে আমাকে বল্লেন, "আর শিকার করতে হবে না—এবার বাড়ী চল।" আমি প্রথমে মৃদু প্রতিবাদ, শেষে আমার দৃঢ়সঙ্কল্পের কথা জানালাম। তিনিও নাছোড়-বান্দা, অগত্যা আমাকে বলতে হোল, "সাবধান, সাবধান, ঐ দেখুন হাতীটা কিরকম চীৎকার ক'রে এদিকেই আসছে—নিশ্চয়ই শুয়োর বেরিয়েছে।" আমার কথা শেষও হয়নি—আমার আত্মীয়টি উপায়ান্তর না দেখে সামনের একটা ঝাওড়া গাছের ডালেই আশ্রয় নিলেন।

সত্যিই তখন সেই ঘন জঙ্গলটার মধ্যে তুমুল আলোড়নের শব্দ শোনা যেতে লাগ্‌লো—হাতীটা বিকট চীৎকার করছে—! আমি বন্দুকটা তৈরী করে নিয়ে শিকারের অপেক্ষায় রইলাম। হঠাৎ তিনটে শুয়োর একযোগে আমার দিকে তীরের মত ছুটে এল,—সে কি তীব্রগতি!—আমার মনে হ'ল আর রক্ষা নেই! শুয়োরগুলি প্রায় হাত চারেক দূরে—আমি তখনই লাফ মেরে তাদের পথ থেকে তিন চার পা' হ'টে গিয়ে একেবারে পর পর দুটো গুলী ছুঁড়লাম। আমি জানতাম, শুয়োরের গতি একমুখী, ওরা দিক পরিবর্ত্তন করতে একটুখানি সময় নেয়; সেই অভিজ্ঞতাই আমাকে সেবার বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিল। গুলী খেয়ে একটা শুয়োর একেবারে ডিগবাজী খেয়ে প্রায় তিন চার হাত দূরে উল্টে পড়ল আর একটা তারও কিছু দূরে যেয়েই ছিটকে পড়ল। এদিকে হাতীটা তখন বিকট চীৎকার আরম্ভ করে ছুট দিয়েছে—! পরম বৈষ্ণব এই হাতীটা শিকারে তখনও একে-বারেই অভ্যস্ত হয় নি।

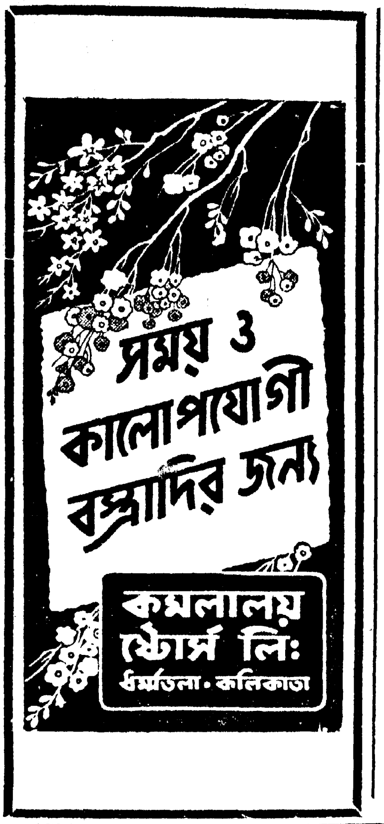
বেলা প্রায় শেষ হ'তে চ'লেছে—আমার আত্মীয়টি ক্রমাগত তাগিদ সুরু করেছেন। শুয়োর তিনটিকে একটা লম্বা বাঁশে ঝুলিয়ে দু'টো সাঁওতালের ঘাড়ে দিয়ে আমরা বিজয়-গর্ব্বে চলেছি। আমি আর আমার আত্মীয়টী হাতীর উপরে। আর সবাই পিছনে কলরব করতে করতে আসছে। হাতীতে উঠেই আমার আত্মীয়টি তাঁর কর্ণ বিমর্দ্দন ক'রে বললেন, "আর কখনও তোমার অভিভাবক হ'য়ে আসবোনা বাবা।" সেদিন কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে আমার শৌর্য্যবৃত্তি পরিতৃপ্ত হয়নি—অতো বড় বড় তিনটে শুয়োর মেরেও মনে হ'ল আজ শিকারে আসা সম্পূর্ণ সার্থক হোল না! মন তখন আমার আরও বিপদসঙ্কুল অবস্থার মধ্যে পড়বার জন্যে আগ্রহশীল! প্রথম যেদিন বন্দুক ধরেছিলাম সেদিন হয়ত একটা পাখী মেরেই আর আত্মপ্রসাদের সীমা থাকতো না—কিন্তু আমার এই বয়ঃ-সন্ধিক্ষণের কল্পনাপ্রবণ দুর্দ্দান্ত মন কেবলই নূতনতর উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে চায়—যেখানে শৌর্য্য মিশেছে প্রাণ-শক্তির সঙ্গে, যেখানে নির্ভীকতা মিশেছে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে, যেখানে শিক্ষা আর কৌশল আমাকে অগ্রগতির পথে ঠেলে দিচ্ছে।

ফিরে আসবার পথে আমার কেবলই মনে হ'তে লাগল একটা বাঘ যদি না মারতে পারলাম তবে আর কিসের শিকার? ব্যাঘ্র শিকারের পিপাসাই আমাকে তখন আকুল ক'রে তুলেছে।

ভগবান বোধহয় কান পেতে আমার অন্তরের আকুলতার কথা শুনেছিলেন আর মনোরথ পূর্ণ হ'বার আশীর্ব্বাদও করেছিলেন। আমরা তখন প্রায় দুই মাইল পথ চলে এসেছি। আমরা হাতীতে; পেছনে শুয়োর তিনটা বাঁশের সঙ্গে ঝুলিয়ে নিয়ে অন্যান্য লোকজন সব আসছে। এমন সময় দূরথেকে একটি লোক হাত উঁচু করে আমাদের দিকে ছুটে এল। আমার সামনে এসে সে আভূমি প্রণত হ'য়ে বলল—"হুজুর এ ধারে বাঘ বেরিয়েছে।" আমার আশা পূর্ণ হ'বার সম্ভাবনা দেখেই মনটা নেচে উঠল। আমি সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায়? কোনদিকে?" সে বলল, "ঐ সামনের জঙ্গলটার মধ্যে ঢুকেছে হুজুর!" "তোমরা এখানে কি করছ?" সে বলল, "আমরা? আমরা এই জঙ্গলটাকে ঘিরে আছি। বাঘ বের হবে কি দেব এক খোঁচায় শেষ করে" বলে সে তার হাতের বল্লমটাকে বাগিয়ে এমন ভাবে ধরল যেন বাঘটা তার সামনেই র'য়েছে। আমার আত্মীয়টি কিছুতেই আর থাকতে চান না—তিনি বাড়ী ফিরবেনই—তাঁর অভিভাবকত্ব খাটিয়ে তিনি পুনঃ পুনঃ আমাকে বাড়ী ফেরবার তাগিদ দিতে লাগলেন। আমি বললাম, "এই যে এখুনি নিজের কান মলে বল্লেন আর কখনও আমার অভিভাবকত্ব করবেন না—আবার সুরু ক'ল্লেন? আমি যাবই বাঘ মারতে— আপনি আসুন আর নাই আসুন।" তিনি বল্লেন, "যা ইচ্ছে কর বাবা, আমি আর ওতে নেই—শুয়োরের পাল্লায় পড়ে আমার চশমা গিয়েছে—বাঘের পাল্লায় পড়লে প্রাণটাও থাকবে না। আমায় এখানেই নামিয়ে দাও।" তাঁকে নামিয়ে দিয়ে আমি আর সেই লোকটি এগিয়ে চল্লাম। পূর্ব্বেই বলেছি, হাতীটা পরম বৈষ্ণব, শিকারে একেবারেই অনভ্যস্ত। তাই তাকে বেশী দূরে না নিয়ে আমি হাতী থেকে নেমে পড়লাম—সেই লোকটিও আমার সঙ্গে পথ দেখিয়ে নিয়ে চ'লল।

একটা প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যে ছোট একটা জঙ্গল—তাকেই ঘিরে অনেকগুলি লোক বল্লম, লাঠি প্রভৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের কাছে পৌঁছেই জিজ্ঞাসা করলাম—"বাঘ কোথায়?" তারা বল্‌ল—"এই জঙ্গলের মধ্যেই আছে হুজুর। একটা বাছুর নিয়ে ঢুকেছে।" আমি বল্লাম, "বাঘ কি এখনও আছে? কোথায় পালিয়ে গেছে এতক্ষণ।" আমার সঙ্গীটি বল্‌ল—"না হুজুর, এর মধ্যেই আছে— আমি দেখেছি।"

[ইহার পর ১৩৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]


সময় ও
কালোপযোগী
বস্ত্রাদির জন্য
কমলালয়
ষ্টোর্স লিঃ
ধর্ম্মতলা · কলিকাতা


মায়ের অর্চ্চনায়
পবিত্র অঞ্জলি
দিতে চাই ধূপ ধুনো সুরভিত পবিত্র আবেষ্টনী ও গন্ধ-মধুর প্রসাধন। আরতী সেণ্ট, স্নো, ক্রীম ও আরতী কেশতৈল আপনার দেহ-মন পবিত্র সুষমা-মণ্ডিত করিয়া তুলিতে।
বরানগর পাইওনীয়ার
কেমিক্যাল ওয়ার্কস · কলিকাতা


Miracle-check
অভিজাত সম্প্রদায়ের অধুনাতম ফ্যাসান:
★ টেনিস্ সার্ট
★ স্পোর্ট সার্ট
★ ব্লাউজ
HINDUSTHAN
HOSIERY MILLS

বেঁচে আছি

[১৪৭ পৃষ্ঠার পর]

"উপায় কি আর নেই ?" কম্পাউণ্ডার হাসল, "আছে—ব্ল্যাক মার্কেট।"

"কত পড়বে দাম ?"

"বারো টাকা।"

"তিন টাকার অযুধ বারো টাকায় ?"

"ব্ল্যাক-মার্কেটে যে পাওয়া যাচ্ছে এই ভাগ্য বলুন। বিলিতী ওষুধ কি আর ইচ্ছে মত পাওয়া যায়, না আসে ?"

কথার যুক্তি আছে—খণ্ডন করতে না পেরে ডাক্তারের কাছে গেলাম।

"কি ব্যাপার ?" ডাক্তার প্রশ্ন করল।

"এই টনিক ব্ল্যাক-মার্কেট ছাড়া ত' পাওয়া যাচ্ছে না, অন্য ওষুধ কি চলবে না ?"

ডাক্তার মৃদু হাসল, "হয়ত আছে কিন্তু দেখুন আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্যের দায়িত্ব যখন আমার হাতে দিয়েছেন তখন একটা খারাপ ওষুধ প্রেসক্রাইব করে কি কেস খারাপ কর্ব্ব ?"

তা'ত নিশ্চয়ই। সব বুঝলাম। এও বুঝলাম যে, অন্যান্য দোকানে গিয়ে খোঁজ নিলেও একই অবস্থা হবে। হয়ত বারো টাকা ষোল টাকা হয়ে যাবে।

কম্পাউণ্ডারকে গিয়ে বারোটা টাকা দিলাম। সে ভিতরে চলে গেল। আবার মিনিট দশেক পরে ফিরে এল।

"একটি মাত্র ফাইলই ছিল যতীন বাবু।"

হাসলাম। আমি ভাগ্যবান।

কাপড়ের দোকান।

নিম্নকণ্ঠে বললাম, "একটা শাড়ী দেবেন ?'

"তাঁতের, না মিলের ?"

"মিলের।"

"মিলের শাড়ী কি আর পাওয়া যায় যতীনবাবু ? হেঁ হেঁ—"

"তা যায়। আমি আপনার এতদিনকার পুরোনো খদ্দের দিন না একটা—"

"ছিঃ ছিঃ কি যে বলেন। সত্যি, আমাদের দোকানে নেই, তবে আপনার কথায় ঝুনঝুনওয়ালার কাছ থেকে আনিয়ে দিতে চেষ্টা করতে পারি"—

"কত দাম পড়বে—আন্দাজ ?"

"তিরিশ টাকা।"

দমে গেলাম।

"কি ? নেবেন ?"

"না—আমি তাঁতের শাড়ী নেব।"

"বেশত"—দোকানদার একটু করুণার হাসি হাসল আমার অক্ষমতা বুঝে, "আসুন, দেখুন"—

দেখলাম। দশ টাকার নীচে অতি সাধারণ তাঁতের শাড়ীও নেই। কিন্তু পকেটে আছে মাত্র আট টাকা চার আনা।

শাড়ী কেনা আর হলো না।

বৃষ্টি থেমেছে। আকাশের ছিন্নভিন্ন মেঘের আড়ালে দু'একটা তারাও দেখা যায়।

বাড়ী। ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছে।

খেতে বসলাম।

দিনের বেলায় তাড়া থাকে তাই খেয়াল হয় না। রাতের বেলা বুঝি কি খাচ্ছি।

মাড়িতে কাঁকরগুলো কড়মড় শব্দে চুর হয়ে যায়।

"কাঁকর—না ?" নিরুপমা প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ।"

"ওমা—এই সারা দুপুর এত করে চাল কটাকে বাছলাম তবু।"

"তাতে কি নিরুপমা ? সরকারের কৃপায় দাঁতের গোড়াগুলো শক্ত হচ্ছে এতো কম কথা নয়।"

নিরুপমা আমার ব্যঙ্গোক্তির মর্ম্ম গ্রহণ করতে পারল না। নিরুত্তরে সে আমার পাতে তরকারী দিল।

তরকারীতে সর্ষের তেল নামে প্রচারিত এক অজানা তেলের বিশ্রী গন্ধ ও স্বাদ। বমি আসতে চায়। উদ্গারের সঙ্গে সেই তেলের গন্ধ বারংবার ঠেলে ঠেলে উপরে উঠতে লাগল।

খাওয়া হলো। হ্যাঁ, শুধু ডাল, ভাত, ভাজা আর একটা নিরামিষ তরকারী। দুধ ? হাসি পায়। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা দুধের সখ পিটুলি গোলা খেয়ে মিটিয়েছিল—আমার সন্তানেরাও সেই জাতীয়ই একটি জলের মত তরল পদার্থ দুধ মনে করে খায়। অথচ প্রতিদিন আধসের করে দুধ বাবদ চার আনা খরচ পড়ছে। দ্রোণপুত্রেরই যেখানে দুধ জোটে না, সেখানে গুরু দ্রোণের কথা উঠ্‌তেই পারে না। সুতরাং আমার কথাও উঠ্‌বে না।

নিরুপমা বলল—"কাল কয়লা আনতে হবে—আজ ফুরোল।"

নিত্য নূতন নূতন ট্যাক্স চালু করে সরকার যেমন ভীতির সঞ্চার কচ্ছে প্রজার মনে, তেমনি ভাবে নিরুপমাও রোজ রোজ এটা ওটা সংগ্রহ করার নোটিশ দিয়ে আমায় ভীতিবিহ্বল করে তোলে।

"কালই ?" প্রশ্ন করলাম :

"হ্যাঁ।"

"কালকেই তারিখ নাকি ?"

"না—পরশু—"

"তবে ?"

"কালকে চলবে কি করে ? কালকের জন্য সের পাঁচেক—না, দশ সেরই নিয়ে এসো ব্ল্যাক-মার্কেট থেকে।"

ব্ল্যাক-মার্কেট! বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকালাম।

হ্যারিকেনের আলোতে গতকল্যকার 'অমৃতবাজার পত্রিকা' খুলে বসলাম। সিমলা সম্মেলনের ফলাফল তাতে বেরিয়েছে জেনে আগ্রহাতিশয্যে এক কপি কিনে এনে-ছিলাম।

পড়লাম। সিমলা সম্মেলন ব্যর্থ হয়েছে। বেড়াল ইঁদুরদের নিয়ে খেলে, খেলিয়ে আবার ছেড়ে দিয়েছে। আমাদের দেশের নেতারা দর-কষাকষির কামড়াকামড়িতেই ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। দুঃখ বোধ হয়। কিন্তু কেন এ দুঃখ ? আমি সরকারের অনুগ্রহে তাঁদের কেনা গোলাম হয়ে খেয়ে দেয়ে বেঁচেই আছি। তবু—তবু দুঃখ হয়। আবরণটাই ক্রীতদাসের। কিন্তু আমার এই ক্রীতদাসত্বের অন্তরালে, কিছু একটা আছে—যার ফলে আমার অন্তরের এক প্রচ্ছন্ন কোণে এই কামনায় শিখাই অহরহঃ জ্বলছে যে, আমার এই অমানুষের দেশ স্বাধীন হোক, আমার মত অমানুষেরা মানুষের পংক্তিতে আসনলাভ করুক। কিন্তু তা হোল না।

তবু আশা রাখি। সিমলা সম্মেলন ব্যর্থ হয়েছে, হোক। কিন্তু দিল্লী সম্মেলন, বোম্বাই সম্মেলন কিংবা অন্য কোনও সম্মেলন হয়ত ব্যর্থ হবে না। যাদের আমরা চাই না, তাদের সঙ্গে আপোষ করেই হয়ত একদিন আমাদের দুঃখনিশার অবসান ঘটবে, কিন্তু যেখানে স্বদেশবাসী মুসলমানদের সঙ্গেই সন্ধি হয় না, সেখানে বিদেশী শাসনকর্ত্তাদের সঙ্গে কি সন্ধি হতে পারে ?

কাগজ বন্ধ করে রেখে দিলাম। বাতি নেভালাম।

অন্ধকার। তন্দ্রা আসে।

হঠাৎ কখন রাস্তায় একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠে। সে ডাকে তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল।

নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে আমি ভাবি, আমি কে ? আমি কে ? আমার নাম কি ?

কিছুই মনে পড়ে না। নিজের দেহের উপর হাত বুলোই আমি। আমি একটা দেহ। নিজের বুকের উপর হাত রেখে অনুভব করি। সযত্নে গঠিত দেহযন্ত্রের মাঝে আমার প্রাণপাখীটি সাধারণ একটা টাইম-পিসের মত অনবরত একটা একঘেয়ে শব্দ করে চলেছে—টিক্ টিক্। ধুক্ ধুক্। আমি বেঁচে আছি।

শুধুই বেঁচে আছি। মানুষের মত নয়, যন্ত্রের মত, শেকলে বাঁধা পশুর মত।

আমি মানুষ হতে চাই।



একদিনে দুই শিকার

[১৫৪ পৃষ্ঠার পর]

"তুমি দেখেছো? চলত' দেখিয়ে দেবে আমায়!" সে লোকটা সাহসী বটে। কোমরের কাপড়টা ভাল করে বেঁধে নিয়ে মাথায় গামছা বেঁধে সে ভল্লটা হাতে বাগিয়ে ধরে আমার সঙ্গে সঙ্গে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। আমি দেখলুম—তার চোখ দুটো জ্বলে উঠেছে। জঙ্গলের ভেতর ঢুকে সে আমাকে ইসারা করে নিয়ে চলল। একটা কষাড়ের ঝোপের পাশে খানিকটা জায়গা জুড়ে একটা প্রকাণ্ড গর্ত; গর্তের উপর দিয়ে গুঁড়ি মেরে আমরা যাচ্ছিলাম। লোকটা আস্তে আস্তে গর্তের উপর থেকেই ইঙ্গিত করে আমার গা টিপল। তাকিয়ে দেখি গর্তের ভিতরে বাঘটা সামনে একটা বাছুর রেখে থাবা গেড়ে চুপ করে বসে আছে। পড়ন্ত বেলার রোদ পাতার ফাঁকে ফাঁকে তার গায়ে গিয়ে পড়েছে—ঈষৎ পিঙ্গল চোখদুটো জ্বল জ্বল করছে—কি সুন্দর ভয়াবহ দৃশ্য! বাঘটা চুপ করে বসে বোধহয় ঐ বাছুরটার রক্তধারায় তার শোণিত পিপাসা নিবৃত্তির স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে আছে। এই সুযোগ দেখে আমি ধাঁ ক'রে বন্দুক তুলেই উপর্যুপরি দুটো গুলী ছুঁড়লাম। আশ্চর্য্যের বিষয়, বাঘটা একটা মরণগর্জ্জন করে সেখানেই নেতিয়ে পড়ল। যখন বুঝলাম যে বাঘটা সত্যিই মরেছে, তখন তার কাছে যেয়ে দেখি, আমার অব্যর্থ গুলী তার ঘাড়ে লেগেছে এবং তাতেই সে শেষ হ'য়ে গিয়েছে। অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হ'য়ে সে একটা লাফ পর্য্যন্ত দিতে পারেনি। আক্রমণ করবার সুযোগও পায়নি। আমার সাহসী সঙ্গীটী চীৎকার করে বলে উঠল—"শের খতম হো-গিয়া"—সেই চীৎকার শুনে গ্রামের যারা জঙ্গলে পাহারা দিচ্ছিল, তারা সবাই ছুটে এল। যে কৃষকটার বাছুর বাঘটা নিয়েছিল—সে এসেই সেই মরা বাঘটার গায়ে দু'তিন ঘা লাঠি বসিয়ে দিল; যেন তার ক্ষোভ আর মিটে না! তাদের বল্লাম, "এবার এসো ত বাঘটাকে হাতীর উপর তুলে দাও।" তারা তখন আমাকে তাদের কাঁধের উপর তুলে নিয়ে বিজয়োল্লাস করতে লাগল—আমার কাছে তাদের কৃতজ্ঞতার আর শেষ নেই! আমি আমার এই সাফল্যে ভগবানের চরণে অসংখ্য প্রণতি জানালাম—বালকের প্রাণের গোপন বাসনা তিনি পূর্ণ করেছেন!

অনুভূতি

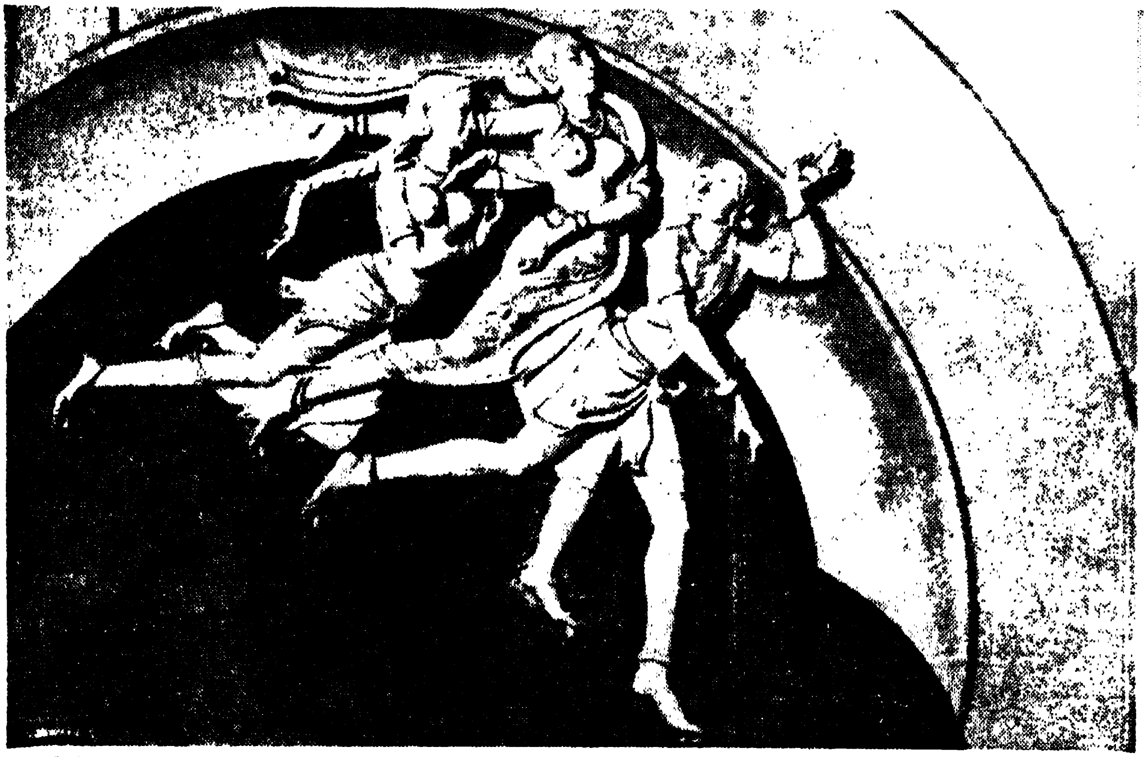
হরেন্দ্রনাথ সিংহ

সাধনায় মগ্ন ধ্যানে আছে এ জীবন
অনুভবে নিশিদিন প্রেমের গরিমা
এ নহে কী আমাদের প্রাক্তন মিলন
বুঝিতে পারি না আজো—রহস্য মহিমা।
প্রেরণা পরশ লভি' দেহ প্রাণ-মনে,
চিরদিন দু'জনায় নয়নে নয়নে।

একটি সনেট

মণীন্দ্র রায়

এস তুমি দীপ্ত চোখে পূর্ণিমার রাতে
স্তব্ধতার বিল্লীরবে, লঘু স্পর্শহীন
জ্যোৎস্নাধারায়, এস আবেগসম্পাতে
প্রেমের দুর্জ্জয় স্বপ্নে। লাঞ্ছিত তুহিন
ছিঁড়ে যাক, ভেঙে যাক বর্ণগোত্রভেদ,
সীমান্তের কাঁটাতার, প্রভুত্বের ফাঁকি।
রক্তস্নাত জীবনের আশার সংকেত
যুক্ত করে দেশে দেশে একসূত্র রাখী।
আনো সে ঐক্যের স্বপ্নে প্রেমের পূর্ণিমা।
দূরদেশে সঙ্গী খুঁজে রাহুগ্রস্ত দেশ
জানে না জ্যোৎস্নার সাম্য গ্রহণের পারে।
বিস্তৃত ভূগোলে টেনে ভাঙো তার সীমা,
মুছে দাও মৃত্তিকার কলঙ্কিত রেশ।
এস দৃপ্ত জীবনের মুক্ত স্বাধিকারে॥



জীবনের জয়যাত্রা — সুনীল পাল


নব শক্তি ঔষধালয়
কয়েকটি প্রয়োজনীয় ঔষধ
শক্তিসিন্ধুরসায়ন
(Regd.)
জীবন যুদ্ধে চাই শক্তি, বুদ্ধি, তেজ। অনিয়মিত অত্যাচার ও উশৃঙ্খলতার ফলে শরীরের সপ্ত ধাতু (রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র) বিকৃত ও দূষিত হইয়া মানুষকে যখন ধ্বংসের পথে লইয়া যায়, তখন "শক্তি সিন্ধু রসায়নই" তার একমাত্র নির্ভরযোগ্য বন্ধু। মূল্য ১ শিশি ২৲ টাকা।
পদ্মমধু
ছানি রোগে অস্ত্রের প্রয়োজন নাই। চক্ষু রোগে আমাদের "পদ্মমধুই" অব্যর্থ ঔষধ। মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা।
অমৃতবিন্দুসালসা
স্বর্ণঘটিত (Regd.)
রক্তে দূষিত বীজাণু প্রবেশ করিলেই রক্তের তেজ কমিয়া যায় এবং শরীর নির্জ্জীব হইয়া পড়ে। সে তেজ আর জ্যোতি থাকে না। কিন্তু "অমৃত বিন্দু সালসা" সেবনের সঙ্গে সঙ্গেই আবার রক্ত বিশুদ্ধ হইয়া সেই তেজ ও জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়। নিয়মিত সেবনে রক্তদুষ্টি, রক্তাল্পতা, চর্ম্মরোগ, বাত, মহিলাদের ঋতুগত দোষ ও অকাল বার্দ্ধক্য চিরতরে বিদায় গ্রহণ করে। মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা।
মহাশক্তি সুধা
আজ ম্যালেরিয়ায় বাঙ্গলাদেশ নিপীড়িত। কুইনাইন সেবনের প্রয়োজন নাই। "মহাশক্তি সুধা" ম্যালেরিয়া, প্লীহা-যকৃত সংযুক্ত জ্বর ও সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অমোঘ অস্ত্র। মূল্য এক কৌটা ।৹ আনা।
গৃহ চিকিৎসা বাক্স
সুনির্ব্বাচিত ২৬ প্রকার ঔষধ সমন্বিত একটি বাক্স গৃহে থাকিলে চিকিৎসকের সাহায্যের দরকার হয় না। প্রতি গৃহে ইহা রাখা কর্ত্তব্য। মূল্য ১ বাক্স ১০৲ টাকা।
মহাসোমেশ্বর রসায়ন
অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে বা অতিরিক্ত অধ্যয়নে আপনার শরীর অবসাদগ্রস্ত হইলেই "মহাসোমেশ্বর রসায়ন" সেবন করিবেন, তবেই আপনার স্মৃতিশক্তি, মেধা, বলবীর্য্য ও মস্তিষ্কের কার্য্যশক্তি উদ্ভাসিত হইবে। ইহা ধাতু পুষ্টিকারক এবং ছাত্র জীবনের পরম বন্ধু। মূল্য ১ শিশি ২৲ টাকা।
কবিরাজ
শ্রী শিশির কুমার সেনগুপ্ত, কবিরত্ন
২১৬এ, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা





মৌসুমী তখনও নামেনি। শুধু তার জানানি হিসেবে যেন দু-এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে কয়েক দিন আগে। তাতেই বৈশাখের ঘাসপোড়া ফাটা মাঠের রিক্ততায় চেহারা যেন বদলে যায় হঠাৎ। একটা ফিকে সবুজ রং মাঠের পর মাঠ জুড়ে হেসে উঠে ঝিল মিল ক'রে—আর গ্রামের কিষাণ-দের মধ্যে আসে একটা কাজের জোয়ার। বিশীর্ণ মানুষের কাঠামো-গুলো অন্তিম গ্রীষ্মের কড়া রোদ্দুর মাথায় ক'রে কপালের ঘাম ঝেড়ে ফেলে এক হাতে, আর এক হাতে চেপে ধরে লাঙল।

দিনের এই চষা মাঠে পায়ের দাগ পড়ে রাত্রিতে—অসংখ্য মানুষের পথচলার দাগ। ছোট ছোট দলে রাত্রির ঠাণ্ডায় পথ চলে স্ত্রী আর পুরুষের সারি, পিঠে বোঁচকা একটি ক'রে অথবা কচি ছেলে। বহু দূর থেকে হেঁটে হেঁটে আসে তারা—বহু দূরের গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে। যতো ভূমিহীন নিঃস্ব কৃষিমজুরের দল—সুন্দরবনের নতুন আবাদী জমির জোত-দার আর মাঝারি কৃষকেরা এসে নিয়ে যায় তাদের গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে যোগাড় ক'রে। পথে দেখা হয় নতুন নতুন দলের সঙ্গে। মিশে যায়, আলাপ করে, আত্মীয়তা খোঁজে কয়েক ঘণ্টার জন্যে। আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলা চালাক-চতুর মানুষগুলি আলাপ করে ডাক দিয়ে:

কুন লাটের লোক গো?

সুন্দরবনকে বলে এরা লাট। উত্তর আসে:

মন্দিরতলা। তুমরা?

আই পালট।

তারপর মন্দিরতলা আর আই প্লট মিশে যায় ফিকে অন্ধকারে। মাথার ওপরে আধ-খানা মলিন চাঁদ বার বার ঢাকা পড়ে যায় আসন্ন বর্ষার খণ্ড খণ্ড মেঘে। পাশাপাশি অনেকগুলি স্ত্রী আর পুরুষ নিঃশব্দে পথ হেঁটে আর কান খাড়া ক'রে শোনে আগের চালাক মানুষগুলির কথা। জোরে জোরে কথা বলে তারা—জমির বন্দোবস্ত, সেলামী, খাজনা, ফসল।...

মাটি তো নয়—সোনা। এত ধানও ফলে সে দেশে—অভাব নেই—দুঃখ নেই। গ্রামের মানুষ তবু কেন যেতে চায় না সে দেশে? নিন্দে করে। বলে—জঙ্গল জাল-পাই। গ্রাম ছেড়ে এ পথে যে যায় সে কৃপার পাত্র। সোনার দেশ—শুধু ধান ধান ধান। কেমন দেশ সে গো!

নিঃশব্দ মূর্তিগুলি হাঁটে রিক্ত মাঠের ওপর দিয়ে ভূতের মতো—আর মনে মনে কাঁপে ধানে ভরা এক অচেনা দেশের মাঠ। পেছনে—বহু দূর কোন্ গ্রামে যেন একটা কুকুর ডাকছে টেনে টেনে।

হঠাৎ পেছনের লোকগুলির মধ্যে একটা আলোড়ন ওঠে। থমকে দাঁড়ায় আগের হুঁসিয়ার লোকগুলি।

একটি নারীকণ্ঠ ফুঁসে উঠলো পেছনের লোকগুলির ভেতর থেকে—আ মর, চোখ নাই না-কি!

আঁধারে দিশেনি—ঠাউর পাইনি। একটি মোলায়েম পুরুষ কণ্ঠ।

মেয়েটি মুখ ভেঙিয়ে ব'ললো, আহা—ঠাউর পাইনি।



সুশীল জানা

আই প্রটের দলপতি জিজ্ঞেস ক'রলো, কে রে কামিনী?

কে জানে কে!

মন্দিরতলার দলপতি চিনেছে পুরুষটির গলা। ডাক দিল, কি হ'লরে সদা?

কিছু না বাবু। আগাও তুমরা—আগাও।

এবার হুঁসিয়ার হয়ে চলে মেয়েটির পেছনে পেছনে সদানন্দ। পাশের পুরুষ সঙ্গীটিকে অস্ফুট কণ্ঠে ব'ললো, খুব তেজি। গেরামের মেয়েমানুষ নয় বোধ হয়—লাট খাটা।

কানখাড়া ক'রে শোনে মেয়েটি আর পথ চলে আগে আগে।

সদানন্দ পাশের সঙ্গীটিকে আবার ব'ললো, বছর আঠারো বয়স হবে বোধ হয়।

খুশি হয় আগে চলা মেয়েটি। কিন্তু সদানন্দের পাশের লোকটি যেন বোবা। এক গাল দাড়ি লোকটার, মাথায় বড় বড় রুক্ষ চুল উড়ছে বাতাসে—কতদিন যেন খেউরি হয়নি। বিরাট চওড়া কাঁধের ওপরে একটা কচি ছেলে—পিঠে একটি বোঁচকা। সদানন্দের কোনো কথাতেই যেন তার উৎসাহ নেই—ভয়ে ভয়ে সব কথাতেই হুঁ দিয়ে যায়।

সদানন্দ ব'লে চলে, কত দেখলি—লাট-বেলাট আমার পুকুরঘাট।

তারপর বকে বকে থেমে যায় সদানন্দ।

নিঃশব্দে দীর্ঘ একটি নর-নারীর বাহিনী মুখ নীচু ক'রে অনুসরণ করে আগের লোকগুলিকে। বহুদূর থেকে হেঁটে আসছে তারা—ভারী হ'য়ে আসছে পা। ভারী হ'য়ে আসে মন। অসংখ্য খুঁটিনাটি কথা—গ্রামের কথা, প্রাতিবেশীর কথা—হঠাৎ যেন সব মনে পড়ে যায়। অনেক দিনের অনেক কথা যেন পেছন টান মারে অদৃশ্য দুই হাতে। তবু এগোয় তারা পায়ে পায়ে—সুমুখের পরিব্যাপ্ত অন্ধকারে কোন এক অচেনা স্বর্ণভূমির ধানে ভরা মাঠের পর মাঠ হেমন্তের হাওয়ায় যেন ঝিলমিল করে।

আগের লোক হুঁসিয়ারী দেয়: পা চালা—পা চালা ভাই সব। আর আধ-কোশ আগে ঘোলপুকুরের হাট—সেইখানে তামুক খাবো।

মন্দিরতলার দলপতি নীচু গলায় বৌকে বোঝায়—হাটে গিয়েই কেশবকে যেন তামাক দেয়, খোঁজ নেয় যেন তার ছেলেটার। ভারী কাজের লোক কেশব—গতরের জোরে জমি-জায়গা, ঘর-দোর, গরু-বাছুর সব ক'রেছিল একা, তারপর সব হারিয়েছে আকালের টানে। লোকটাকে হাতে রাখতে পারলে ভাবনা নেই আর নব হাজরার।

ক্লান্ত পা ফেলে ফেলে মুখ নীচু ক'রে আধক্রোশ পথ পার হ'য়ে এলো দীর্ঘ বাহিনীটি—তারপর এক ক্রোশ, দেড় ক্রোশ। দু-ক্রোশের শেষে ঘোলপুকুরের হাট। বোঁচকা-বুঁচকি মাটিতে নামিয়ে ধপ্ ধপ্ ব'সে পড়ে সকলে, কেউ কেউ সোজা শুয়ে পড়ে মাটিতে। মেয়েরা ছেলে নামিয়ে কোমর সোজা করে।

সদানন্দ তার বোবা সঙ্গীটিকে চুপি চুপি বলে, গাঁজা খাবে—চল একটু তফাতে যাই।

গোঁফদাড়ি ভরা মুখে হাঁ ক'রে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকে লোকটা সদানন্দের দিকে। তারপর বলে, ও আমি খাইনি।

খাওনি তাতে কি! একটান খাও—হাঁটা মানিবেনি। এখনও অনেক পথ।

না ভাই।

ছেলেটা তার কাঁধের ওপরে ঢুলছে। কাঁধ থেকে নামিয়ে কোলে নিতেই ছেলেটা

[ইহার পর ১৯৬ পৃষ্ঠায়]

ব্যর্থ অভিযান

[১৩৩ পৃষ্ঠার পর]

তীব্র আলো গিয়া পড়িল আক্রমণরত জানোয়ারের উপর—মন দমিয়া গেল—বড় বাঘ নয়, লেপার্ড তাহার উঞ্ছবৃত্তি লইয়া বাঘের আহার খাইতে আসিয়াছে। অযাচিত আগন্তুকের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিলাম, আমাদের গন্ধ পাইয়াও লোভ সামলাইতে পারে নাই, মরা বাঘ পরীক্ষার জন্য দুই চারিটি গুড়ী ঝোপের ভিতরেই হাতের নাগালে রাখিয়াছিলাম—বন্দুক নামাইয়া ছুঁড়িলাম লেপার্ডের দিকে—ঝোপ হইতে হাত বাহির করিয়াই ছুঁড়িতে হইয়াছিল। গুড়ীর আওয়াজে মহিষটা ঘুরিয়া দাঁড়াইল, তাহার সহিত লেপার্ডও আমার দিকে তাড়া করিয়া আসিল—কিন্তু ঝোপের অতি নিকটেই বিকট আলো ও বন্দুকের নল দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। লেপার্ড পালাইতে রাজি নয়—নিরুপায় হইয়া কাশিলাম—মানুষের কাশি ফলপ্রদ হইল—অনাহুত লাফ দিয়া পাশের ঝোপে গা-ঢাকা দিল। টর্চ নিবাইবার আগে ফকিরুদ্দিনকে খাবার জল দিতে বলিলাম, মাটি হইতে বিক্ষিপ্ত আলোক রশ্মি তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল দেখিলাম—ভয়ে তাহার মুখশ্রীর অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়াছে—কথা বলিতে পারিতেছে না—জিহ্বা আড়ষ্ট। আধা পাগলের মত হাত আমাকে অগ্রসর করিয়া দিল। জল খাইয়া বলিলাম—বাঘ আর আসিবে না, তবে তোমাদের চিতাখাঁল (Leopard) আবার ফিরিতে পারে।

লেপার্ড চলিয়া যাইতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল, জঙ্গলে আর কোন সাড়া শব্দ নাই। রাত্রি ক্রমান্বয় গভীর হইয়া চলিয়াছে, তাহার সহিত ঘুমের ঘোরও বাড়িয়া উঠিতেছে—শিকারের আশা ছাড়িয়া দিলাম। ফকিরুদ্দিনকে জাগিতে বলিয়া বসিয়া বসিয়াই ঘুমাইবার ব্যবস্থা করিয়া লইলাম। চোখ বুঁজিতেই ঘুমের অতল গহ্বরে তলাইয়া গেলাম। অভ্যাসটি শিকারের সখেই আয়ত্ত হইয়াছিল।

ভোরের দিকে ময়ূরের কেকা রবে ঘুম ভাঙিয়া গেল। রেষ্ট হাউসে ফিরিয়া নানা জেরার দ্বারা বাহির করিলাম বৈরনীর পাহাড়ে আজ মাসাবধিকাল কেহ বাঘের খবর পায় নাই।

সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্প তুলিয়া কাডাপ্পায় ফিরিবার বন্দোবস্ত করিলাম—ফিরতি পথে আট নয় মাইল অতিক্রম করিতে লামবাড়ি (বেদুইন জাতীয় গোয়ালা)-দের গ্রামে আসিয়া পড়িলাম।

পথেই লামবাড়িদের মোড়ল মিনতি করিয়া জানাইল—সাহেব একবন্দু গাড় (অতিকায় লেপার্ড) আমাদের ছাগল আর গরু মারিয়া মারিয়া নাজেহাল করিয়া ফেলিয়াছে—সাহেব না রক্ষা করিলে আমরা গেলাম। কালকেই একটি বৃহৎ ছাগল ঘর হইতে টানিয়া লইয়া গিয়াছে।

যে লেপার্ডকে ঢিল মারিয়া তাড়াইয়াছিলাম তাহাই মারিবার ইচ্ছা ফিরিয়া আসিল। পাইলে শুধু হাতে ফেরা অপেক্ষা ভাল হইবে। গাড়ী হইতে নামিলাম স্থানটি পরীক্ষার জন্য। অত্যন্ত নীচু কুটীর প্রায় হামা দিয়া ঢুকিতে হয়। ভিতরে রক্তের উপর লেপার্ডের পদচিহ্ন দেখিলাম। থাবা এত বড় যে, লেপার্ড না বলিলে Stripes ভাবিতে আমার কিছুমাত্র দ্বিধা আসিত না—অবশ্য লেপার্ড যত বড়ই হোক, পায়ের তলার Pad-এর আকৃতির টাটকা দাগ ভিজা বালীতে পড়িলে বাঘের সহিত প্রভেদ বাহির করা যায়—কিন্তু রক্তে যে দাগ পড়িয়াছিল তাহা একই স্থানে ঘটাপটিতে জাবড়াইয়া গিয়াছে। ঘরের বাহিরেও টাটির দেয়াল দেখিলাম—অনেকটা জায়গা ফাঁক হইয়া আছে। মাটি খটখটে শুকনা—তাহার উপর জোর হাওয়া থাকায় তাহার যাইবার পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলাম না। মাটিতে কোন দাগ দেখা যায় না। পাশেই আর একটি গোয়াল ঘর ছিল, তাহার বাহিরে বেট (bait) রাখিয়া বসিব ঠিক করিলাম।

শিকারের স্থানটিতে নতুনত্ব ছিল, স্বল্প-পরিসর ঘর—মেজে গোবর ও গোচোনায় কর্দমাক্ত হইয়া আছে। এক কোণে স্তূপীকৃত পচা গোবর চাষের সারের জন্য যত্ন করিয়া সঞ্চয় করা হইয়াছে—ইহারই মাঝে খড় বিছাইয়া কম্বল পাতিলাম। প্রথমটা দুর্গন্ধে নাড়ী ওলট পালট খাইতেছিল কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে আতর ব্যবহার করিতে ক্রমান্বয় গোবর পচা গন্ধ সহনীয় হইয়া গেল। কীট-যুক্ত পচা মাংসের সামনে যে লোক আতরের আশ্রয় লইয়া বাঘের আশায় দুই দিন অষ্ট-প্রহর বসিয়া থাকিতে পারে, তাহার পক্ষে পচা গোবরের গন্ধ ভয়ঙ্কর পরীক্ষা নয়।

একদিন, দুই দিন, তিন দিন, দিবারাত্র গোয়াল ঘরে কাটাইলাম, লেপার্ড আসিল না। এখানে হতাশা হইতে রক্ষা পাইয়াছিলাম—ভিন্ন প্রকারের শিকার খেলিয়া, ছবির শিকার অর্থাৎ মডেল, নানা রকমের জুটিয়াছিল—রঙীন ছবি ও কলমের খসড়া গল্পের সহিত দিলাম। আশা করি, পাঠক শিকারের প্রধান আকর্ষণ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইবেন না।

সুবিধাটি পাইতাম না যদি তাহারা আমাকে ডাক্তার সাহেব ধরিয়া না লইত। একজনকে Mild Laxative দিয়াছিলাম; পরের দিন সে বিশেষ উপকার পাওয়ায় গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল সাহেব একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক; ফলে দেখিতে দেখিতে শিশি বড়ী শূন্য হইয়া গেল—সকলেরই ধারণা, সব রোগেরই সেরা দাওয়াই হইল ঐ বড়ী। যাক, অনেকের উপকার ও অপকার করিয়া লামবাড়িদের গ্রাম ছাড়িলাম।

কাডাপ্পায় পৌঁছাইতেই স্থানীয় পুলিশ ইন্সপেকটার রহমান সাহেব খবর দিলেন, নিকটেই রায়চুটিতে বড় বাঘ আসিয়াছে; একবার চেষ্টা করিয়া দেখুন—আমাদের দেশে আসিয়াছেন, শুধু হাতে ফিরিতে দিব না। মাত্র চার দিন ছুটি, তাহার ভিতর অন্ততঃ একদিন না জিরাইলে উপায় নাই। মোটমাট ৮।১০ দিন আহার জোটে নাই—তার উপর রাত্রে নিদ্রা নাই। জিরাইবার জন্য উৎসুক হইতাম না। আমার ধারণা জন্মাইয়াছিল ডি এফ ও হইতে রহমান সাহেব পর্য্যন্ত—আমাকে শিশুর মত লাড্ডুর লোভ দেখাইতেছেন, ভদ্রতাজড়িত আতিথি সেবা, লোকটা এতদূর আসিয়াছে যখন—তখন জঙ্গলটা দেখাইয়া দেওয়া ভাল। শিকার আমার নিকট যে কতবড় রোমান্স তাহা জানিলে নিশ্চয়ই কেহ আমাকে অনাহারে, অনিদ্রায় ঘুরাইতেন না।

শিকারে আমার উৎসাহ স্তিমিত হইয়াছে দেখিয়া রহমান সাহেব খুসী হইলেন; D. F. O. সাহেব রাত্রে খানাই খাওয়াইয়া দিলেন। অনেক দিন পর মুসলমানের জাত-খোলাও খাইতে রোমান্সের (Romance) কথাই ভুলিতে বসিয়াছিলাম। কোপ্তা কাবাব, কোর্মা খাইয়া চাঙ্গা হইয়া উঠিলাম। পরের দিন মাদ্রাজে ফিরিবার বন্দোবস্ত করিতেছি এখন সময় রহমান সাহেব কাহার মোটর সংগ্রহ করিয়া আমার 7. B. তে আসিয়া হাজির। রীতিমত ব্যস্তভাব—ঘরে ঢুকিয়াই বলিলেন, চৌধুরী সাব, আপ কো সের মিল গিয়া—১২ মাইল কি অন্দর বয়েল মার দিয়া, এভি চলিয়ে, মোটর তেয়ার হায়।

যতই ব্যর্থতা আসুক, শিকারীর নিকট বাঘের নতুন খবর সাংঘাতিক লোভনীয় সংবাদ। মাত্র দোনলাটা আর কিছু কার্তুজ লইয়া, রহমান সাহেবের গাড়ীতে উঠিলাম, Natural Kill—সুতরাং বাঘ যায় কোথায়।

এখানেও আশ্রয় জুটিল লামবাড়িদের গোয়াল ঘরে। গরুটার পিছন দিক সব খাইয়া ফেলিয়াছে। মারিয়াছিল খোলা মাঠে, লোক সাক্ষী রাখিয়া, দুর্দ্দান্ত সাহসী বাঘ। যেখানে বসিয়া খাইয়াছিল সেইখানে খাবার চিহ্ন পড়িয়াছে—বিরাট ব্যাপার কিন্তু মাচান বাঁধি কোথায়! অধিকাংশ ঝোপই হাঁটুর উপর উঁচু নয়, আসসেওড়ার আগাছা।

মরা গরু হইতে বেশ খানিকটা দূরে বন্দুকের পাল্লার প্রায় শেষ সীমানার কাছাকাছি একটি হাত তিনেক উঁচু অতি ছোট ঝোপ পাওয়া গেল, তাহা বহু কষ্টে মাত্র একজনের আড়াল হইতে পারে—জায়গাটা মনঃপূত হইল না। লোকদের জানাইলাম, কিসে বসিব না কাছাকাছি বাঘের ফিরিবার

পথে বসিব। টাক ধরিয়া বাহির করিলাম, আহারের শেষে বাঘ কোন্ দিক গিয়াছিল। ভাগ্যগুণে পথেই একটি আম গাছ পাইয়া গেলাম। স্থানীয় শিকারীকে জানাইলাম, এই পথেই বাঘ ফিরিবে, তাড়াতাড়ি মাচান বাঁধ। শিকারী তাচ্ছিল্যের সহিত নিজের অভিজ্ঞতা জাহির করিয়া বলিল, বাঘের চলার পথ কি একটি? অযথা তর্ক করিতে ভাল লাগিল না। এরূপ ক্ষেত্রে বিরুদ্ধ মত বেশী প্রকাশ হইতে থাকিলে, তর্কের মীমাংসা আমি হাত দিয়া সারিয়া থাকি এবং বক্তার প্রতিক্রিয়া সামলাইতে অনেক সময় বকশিসের অজুহাতে মোটা টাকা ট্যাঁক হইতে খসিয়া যায়। বেলা তখন পড়িয়া আসিতেছে—শিকারী বলিল, আহার শেষ করিয়াই সন্ধ্যায় আগে ফিরিয়া আসিবে। তাহার পর আমার উত্তর না শুনিয়াই সেলাম ঠুকিয়া চলিয়া গেল। সেলামটায় Good-bye-এর স্পষ্ট আভাস ছিল। শিকারে এইরূপ অবাধ্যতা আমি কচিৎ সহ্য করিয়াছি, তখন আর শিকারের Discipline শিখাইবার সময় ছিল না। জলের ফ্লাক আর বন্দুক পিঠে ঝুলাইয়া গাছে উঠিয়া পড়িলাম। সমস্ত রাত কাটাইতে হইবে—ঠেস দিবার মত ডাল খুঁজিয়া বাহির করিতে খানিকটা সময় কাটিয়া গেল; যেখানে বসিলাম সেখান হইতে গরুটা স্পষ্ট দেখা যায়—বাঘ আসিবার পথটিও দৃশ্য—। সামনের কয়েকটি ছোট ডাল ভাঙ্গিয়া ফেলিতে সব কিছুই ভাল লাগিল, কেবল মাচানটা পাইলেই সোনায় সোহাগা হইত।

নামবার্ডিয়া তখন গরু লইয়া ঘরে ফিরিতেছিল। দূর হইতে গোপালকের ডাক নিকটে চলিয়া আসিতেছে—গ্রামের কাছ বরাবর হইতেই হৈ হৈ আওয়াজ উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে গরুর পালের বিশৃঙ্খলা ছুটাছুটির ক্ষুরধ্বনি শুনিলাম, অনুমানে ঠিক করিলাম আর একটা গরু মরিল।

একই বাঘ যদি উপরি উপরি দুইটি গরু মারিয়া থাকে তো টাটকা ছাড়িয়া এদিকে আসিবে না, আর যদি দুইটি বাঘ হয় তো আমার অত্যন্ত কপাল সুপ্রসন্ন—জোড়া বাঘ আমার ফোটো তুলিতে পারিব।

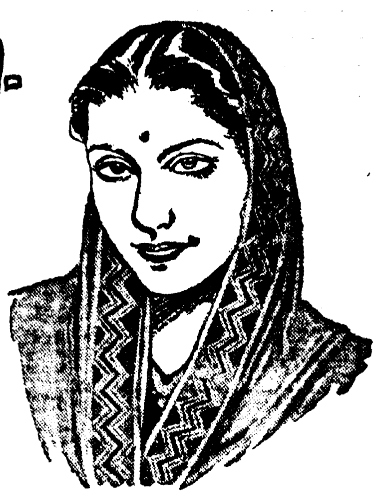
দীর্ঘকাল একই ভাবে বসিয়া থাকায় পায়ে ঝিমঝিম ধরিয়া গিয়াছিল, একটু নড়িয়া না বসিলে আর চলে না। আসনটা গুছাইয়া বসিয়াছি অমনি শুনিলাম একটি শুকনা ডাল ভাঙ্গিয়া গেল, আওয়াজ আসিল মরা গরুটার দিক হইতে—ও-আওয়াজ ভুল করিবার নয়—বন্দুক তুলিয়া বগলে বসাইতে যাইব এমন সময় শব্দ গতিশীল হইয়া উঠিল—পট পট পট করিয়া নামবার্ডিদের পরিত্যক্ত জ্বালানি কাঠের টুকরা ভারী ওজনের চাপে ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। শিরে করাঘাত করিলাম—বাঘ আসিয়াছিল—আমাকে নড়িতে দেখিয়া পালাইয়াছে। দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিয়া নিজের প্রতিই আক্রোশ আসিয়া পড়িল, পাগলামী মাথায় চাপিল—ঝোঁকের মাথায় গাছ হইতে নামিয়া পড়িলাম; বৃক্ষারূঢ় অবস্থায় আর রাত্রি কাটাইব না—আস্তানায় ফিরিয়া যাই অথবা যাহোক একটা হেস্তনেস্ত হইয়া যাক—লোকদের বলিতে দিব না—আমি জঙ্গলে আসি কেবল ছবির মডেল শিকারের জন্য।

গাছে বসিয়া পাতার আড়াল হইতে দেখিতে পাই নাই, নীচে নামিতেই ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে দেখিলাম কিলের নিকটেই আমার আবিষ্কৃত আসসেওড়া ঝোপের পিছনে বাঘ বসিয়া আছে—তিন ফুটের উপরে বাঘের মাথাটা দেখা যাইতেছে। আহারে বসিবার পূর্ব্বে একবার গরুটার চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিয়া লইয়াছিল। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নার আলোয় অনেক সময় ঝোপের অংশ মনগড়া জন্তুর মত দেখিতে লাগে। নিশ্চিত না হইয়া গুলী চালাইলে কেবল ঝোপের খানিকটা অংশ উড়িয়া যাইবে—বাঘকেও এ তল্লাটে পাওয়া যাইবে না।

অতি সন্তর্পণে পিছাইতে লাগিলাম গাছটার আড়াল লইব বলিয়া, ট্রিগারে আঙ্গুল রাখিয়া নড়িতেছিলাম। অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া ফেলিলাম, বাঘ আমার ধীর গতি লক্ষ্য করে নাই, এক দৃষ্টে গরুটার দিকে তাকাইয়াছিল। পায়ের তলায় একটি সামান্য কুটা ভাঙ্গিয়া যাইলে কিরূপ অবস্থাটি দাঁড়াইত, অভিজ্ঞ শিকারী মাত্রেই অনুমান করিতে পারিবেন। উত্তেজনা চরমে উঠিয়াছে, বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস আওয়াজ শুনিতেছি, আর দেরী করিলে হয়ত নিশানের সময় হাত কাঁপিয়া যাইবে—সতর্কতা অবলম্বন করিয়া সুইচ টিপিলাম,...বিরাট বয়ঃপ্রাপ্ত বাঘ, আলো পড়িতে চোখ তাহার ঝলসাইয়া গিয়াছিল, টর্চের দিকে তাকাইয়াছিল—বেশ ভাল করিয়া টিপ করিবার সময় পাইলাম। বাঁচা মরার মাঝখানে পড়িয়া গিয়াছিলাম—আমাদের মাঝে যে ব্যবধান ছিল—তাহাতে এক গুলীতে বাঘ না পড়িলে শিকারীর মৃত্যু সুনিশ্চিত। ট্রিগার টিপিলাম, ঘোড়া পড়িল না—বেশ জোর দিয়া আর একবার টানিতে যাইব, এমন সময় বাঘ লাফ মারিতে মারিতে দূরের ঝোপের দিকে পলাইতে লাগিল; আলোও তাহার পিছু ধাওয়া করিয়াছিল কিন্তু ঘোড়া কিছুতেই পড়িল না—সেফটি ক্যাচের (Safty catch) কথা মনেপ ড়িতে ঠেলা মারিলাম, কচ করিয়া আওয়াজের সহিত বন্দুক ready হইয়া গেল। বাঘ তখন ঝোপের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়াছে—উত্তেজনায় বন্দুককে অপ্রস্তুত অবস্থায় রাখিয়া দিয়াছিলাম। এইরূপ অবস্থায় দুইজন জানা শিকারীকে মরিতে শুনিয়াছি—এখন আলো নিভাইলেই বাঘ আমাকে দেখিয়া ফেলিবে। আহার হইতে বিতাড়িত শার্দ্দূল, জঙ্গলে মানুষকে একলা পাইলে ছাড়িয়া দেয় না। ভাবিলাম দূরপাল্লাতেই গুলী চালাইব—গায়ে না লাগিলেও কাজ হইবে—আমার নিকট হইতে পলাইয়া যাইবে। তখন আত্মরক্ষার চিন্তা পাইয়া বসিয়াছে—আত্মমর্য্যাদা ভুলিয়াছি। Ready trigger লইয়া দূরের ঝোপে আলো ফেলিতে লাগিলাম, যদি দুইটি জ্বলন্ত চোখ দেখিতে পাওয়া যায়—অনেকক্ষণ এইভাবে কাটিতে নিশ্চিন্ত হইলাম, বাঘ নিকটে নাই—থাকিলে নিশ্চয় একবার আলোর দিকে ফিরিয়া তাকাইত।

সামনের বাঘ পলাইতে ভয় আরো বেশী করিয়া চাপিয়া ধরিল, আস্তানায় ফিরিবার পথেই আর একটি গরু মারা খাইয়াছে। গো-খাদক নিশ্চয় আহার ছাড়িয়া নড়ে নাই। উত্তেজনায় দিকভ্রম হইয়া গিয়াছে—কোন দিক হইতে হৈ হৈ শব্দ শুনিলাম, ঠিক নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিতেছিলাম না। আস্তানায় চলিবার পথে অকস্মাৎ আহাররত বাঘের সামনে পড়িয়া যাইলে বগলে বন্দুক তুলিবারও সময় পাইব না। মনে পড়িল রাজপথের কথা, আমি যে গাছে বসিয়াছিলাম তাহার অতি নিকটেই পূব দিকে অর্থাৎ চাঁদকে পিছনে রাখিয়া চলিতে পারিলে সড়কে গিয়া উঠিতে পারি। কোন প্রকারে বোর্ডের রাস্তার উপর আসিতে পারিলে সাড়ে নয়টায় বাস পাইয়া যাইব—অথবা দলবদ্ধ পথিকের সহিত দেখা হইয়া যাইবে।

মতি স্থির হইতেই পূব দিকে মুখ ফিরাইলাম, তাহার পর চলা সুরু হইল—ক্রমান্বয়ে ঘন কাঁটা বনের ভিতর ঢুকিয়া পড়িতেছি, বাধা সামনে আসিলে বন্দুকের ডগা দিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া লইতেছি। কুচ ঝাড়ের বন কত আর পরিষ্কার করা যায়, চলার পথে সমস্ত দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইতেছে। তুচ্ছ আঁচড়ে গতি থামে নাই, অনেকটা পথ আসিয়া পড়িয়াছি। মনে হইল ঠিক রাস্তায় চলিতেছি না, আম গাছ হইতে সড়ক তো এত দূরে নয়। আলো জ্বালাইলাম—সঙ্গে সঙ্গে বাঘের বিরক্তিপূর্ণ বড় বড় আওয়াজ শুনা গেল একটু দূরে। প্রমাদ গণিলাম—যেরূপ ঘন ঝোপের মধ্যে দিয়া চলিয়াছি তাহাতে বাঘ তাড়িয়া আসিলে ইচ্ছামত বন্দুকও ঘুরাইতে পারিব না; তবু আন্দাজমত বন্দুক যথাসম্ভব শব্দের দিকে রাখিয়া পুনরায় সুইচ টিপিলাম, সামনা সামনি আক্রমণ মানিতে রাজি আছি—কিন্তু পিছন হইতে লাফাইলে ভবিষ্যতে শিকারের গল্প লেখা আর সম্ভব হইবে না। বাঘ একই জায়গা হইতে বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। নিশ্চিন্ত হইলাম, আহার ছাড়িয়া বনের রাজা উঠিতেছে না—কিন্তু এখনও নিশ্চিত হইতে পারি নাই, বাঘ একটি না দুইটি। এখন করি কি? স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে এবং একের জায়গায় দুইটি বাঘ হইলে পলাতকটি যদি ফিরিয়া আসা মনস্থ করে তো কোন্ দিক দিয়া ফিরিবে, নিশ্চয়তা নাই। যাবজ্জান বাঘ চলা-পথে লক্ষ্যহীন ফিরিয়া আসে না—বিশেষ



কেন্দ্র করিয়া দূর হইতে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে শিকারের নিকটস্থ হয়। চিন্তার মাঝে বহু দূরে মোটরের হর্ণ শুনিতে পাইলাম, কাডাপ্পা যাইবার শেষ বাস আসিতেছে—এবার রাস্তা কোন দিকে নজান পাইয়াছি। মোড় ঘুরিলাম—কাঁটা বনের মধ্য দিয়াই একটু দ্রুত পা চালাইয়া দিলাম, তাড়াতাড়ি চলিবার পথে মাথা ও মুখ কাঁটার ক্ষত হইতে বাঁচাইতে গিয়া হঠাৎ আলগা শুকনা কণ্টকপূর্ণ ঝোপে পায়জামা আটকাইয়া গেল। আলগা শুকনা ঝোপগুলি ঝড়ের বেগে তালগোল পাকাইয়া অতি বৃহৎ ফুটবলের আকারে বাধাপ্রাপ্ত স্থানে আটকাইয়া থাকে। এই জাতীয় একাধিক গোলাকার ঝোপের মাঝে পড়িয়া যাইলে অনেক সময় বাঘ পর্য্যন্ত মাকড়সার লালায় জড়ান কীটের অবস্থায় পড়িয়া যায়। কিছুতেই উহাদের বেষ্টন হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই। একটার কাঁটা ছাড়াইলে আর একটি গড়াইয়া গায়ে আসিয়া পড়ে। আমি কাঁটার ব্যূহে পড়িয়া গেলাম, মোটা খাকির পাঞ্জাবী ও পায়জামার সর্ব্বত্র জড়াইয়া গিয়াছে—বাস্তবিক মৃত উদ্ভিদ যেন আমাকে বাঁধিয়া বাঘকে ডাকিতেছিল।

শেষ পর্য্যন্ত মরিয়া হইয়া টর্চ জ্বালাইয়া পরিচ্ছদ হইতে কাঁটা খুলিতে লাগিলাম। অনেকটা সময় অতিবাহিত হইলে মুক্তি পাইলাম—কতকগুলি কুচের কাঁটা দেহে আমূল বিদ্ধ হইয়া রহিয়া গেল।

শুকনা কাঁটা হইতে রক্ষা পাইয়া সবে খানিকটা পথ অগ্রসর হইয়াছি—অকস্মাৎ বাঘ বেশ জোরে ডাকিয়া উঠিল—আওয়াজটা বিরক্তির নয়, আক্রমণের, বেজায় মোটা গলায় শ্লেষ্মাজড়িত কাশির মত। মুখ ঘুরাইয়া আলো জ্বালিলাম—নিকটের কোন ঝোপ নড়িতে দেখিলাম না। অনুমান করিলাম, বাঘ মরা গরুটা হইতে দূরে অথবা নিকটে হায়নাকে দেখিয়া থাকিবে। এবার আর আলো নিভাইলাম না। যে দিক হইতে বাঘের আওয়াজ আসিতেছিল, সেই দিকে প্রজ্জ্বলিত আলো ও ভরা বন্দুক ঠিক রাখিয়াই পিছাইতে লাগিলাম, আশসেওড়ার ঝোপ ভাঙ্গিয়া চলিতেছিলাম—খানিকটা এই ভাবে চলিতে পায়ের তলায় সড়কের অনুভূতি পাইলাম। যাক ফাঁকায় আসিয়া পড়িয়াছি, রাস্তার অপর ধারে আসিতে অনেকটা নিরাপদ বোধ করিলাম—প্রায় ৩০ ফুট চওড়া রাস্তা—জঙ্গলের ওপাশ হইতে এতটা খালি জায়গা অতিক্রম করিয়া আক্রমণ করিতে বাঘেরও বুকের পাটার দরকার হইবে।

অনেক আগে বাসের হর্ণ শুনিয়াছি, এখন গাড়ী এদিকে আসিতেছে কেন, অবশেষে কল বিগড়াইল নাকি?

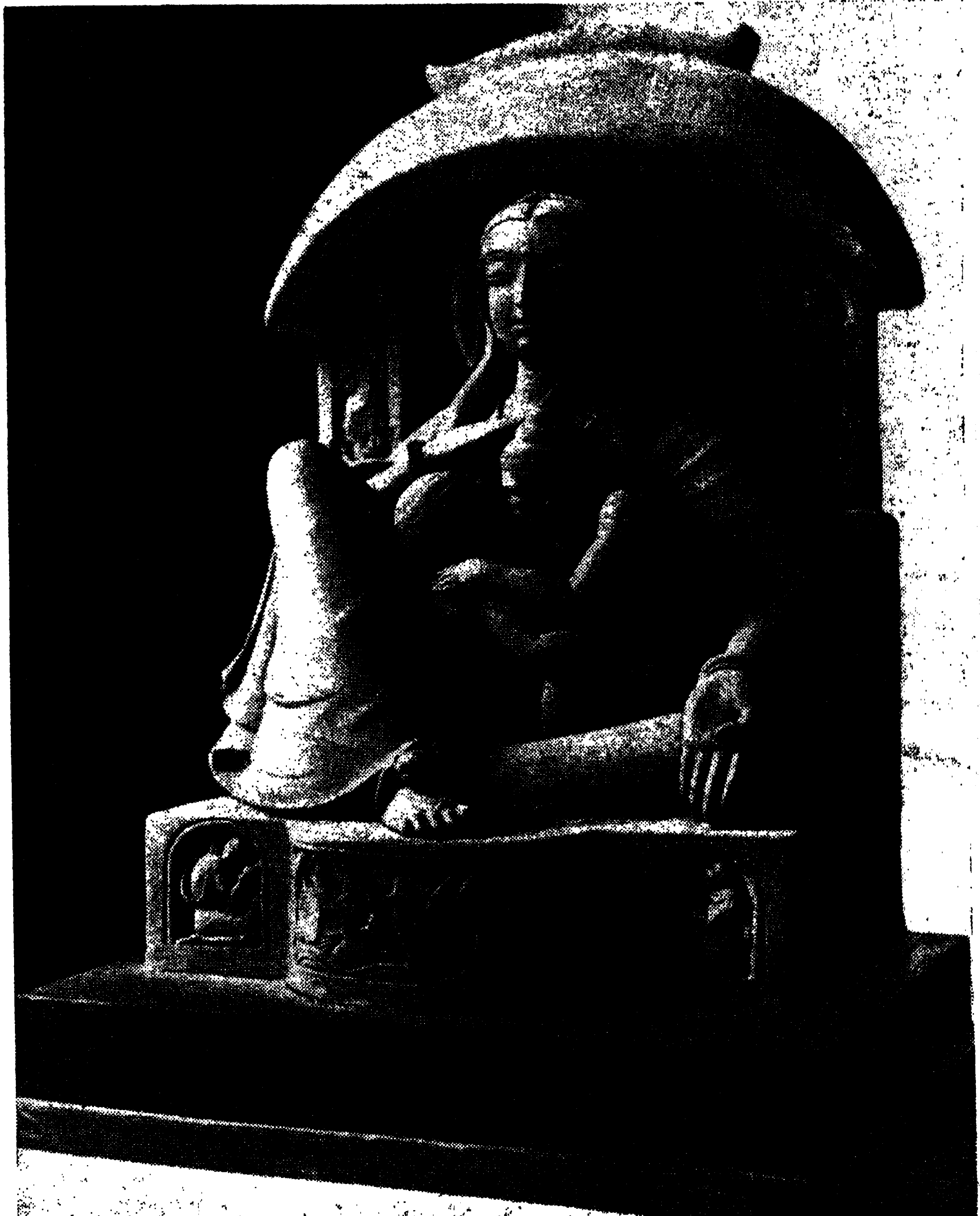
ভাগ্য সুপ্রসন্ন, অনতিবিলম্বে বাসের আলো দেখিলাম—আমিও সেই দিকে আলো ফেলিয়া জানাইলাম—মানুষ অপেক্ষা করিতেছে। আলোটা উপরে নীচে ইচ্ছা করিয়াই ফেলিয়াছিলাম, তাহা না হইলে মোটর সাইকেল বা গাড়ী ভাবিয়া আমাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইত।

গাড়ী নিকটবর্ত্তী হইতে একেলা মানুষকে দেখিয়া ড্রাইভার গতি থামাইল। গাড়ীতে একটি মানুষেরও স্থান নাই। মাডগার্ডে উঠিয়া বসিলাম, সঙ্গে একটি কপর্দ্দকও ছিল না, কণ্ডাক্টারকে তাহা জানাইয়া দিলাম। লোকটা আমাকে দয়া করিয়া নিজের সিটে বসাইয়া বাকি পথটার জন্য মাডগার্ডেই স্থান করিয়া লইল। কৌতূহলী হইয়াছিলাম—মাঝপথে বাস থামাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় শোনা গেল বাঘ রাস্তায় বসিয়াছিল। অর্থাৎ জঙ্গলে দুইটা বাঘই ঢুকিয়াছিল—পথেরটি আমার আলো দ্বারা বিতাড়িত শার্দ্দুল। সামান্য সহিষ্ণুতার অভাবে হাতে পাওয়া শিকার ছাড়িয়া আসিলাম—এ আক্ষেপ যেমন সারাটা জীবনই আমাকে জ্বালাইবে—তেমনি শিকারে আসিয়া এবার যে শিক্ষা লাভ করিলাম, তাহাও সারাটা জীবন মনে থাকিবে—হৃদয়বান কণ্ডাক্টারের দয়া এবং পেনসন লোভী মিতব্যয়ীর সঙ্কর।



কাজের শেষে — সুনীল পাল


"শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও...
জননী এসেছে দ্বারে" ...
বাতায়ন পথে শরতের সোনালি আলো। কাশের বনে ঢেউ তুলে উড়ে যায় বলাকা-শ্রেণী। উৎসবের আমন্ত্রণ লিপি বয়ে নিয়ে আসে প্রস্ফুটিত কুমুদ কহ্লার। হাসিভরা মুখে উদ্বেল হয়ে ওঠে নতুন জীবনের আলো আর আকাশে বাতাসে উচ্চকিত হয়ে ওঠে শরতের আগমনী। শ্রীকল্যাণ ও ভৃঙ্গসার তৈলে দেহমন স্নিগ্ধ ও সুরভিত করবার এই ত সময়।
শ্রীকল্যাণ এবং ভৃঙ্গসার
কেশ তৈল
COMARTS
জেম কেমিক্যাল ৪৪ কলিকাতা



জননী

শিল্পী—সুনীল পাল।

পাবলিসিটি স্টুডিও কর্তৃক মুদ্রিত।

সত্তর বৎসর পূর্ব্বেকার শারদীয়া সংখ্যা

শ্রীযোগেশ বাগল

আজ কয়েক বৎসর যাবৎ দুর্গাপূজার পূর্ব্বে শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। ছোট বড় মাঝারি সব রকম কাগজই (এখানে দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের কথাই বলিতেছি) নিজ নিজ সাধ্যমত বিবিধ রচনা-সম্ভারে সজ্জিত করিয়া এই বিশেষ সংখ্যাটি



বাহির করিতেছে। পূর্ব্বে এইরূপ কোন বিশেষ সংখ্যা—বিশেষ করিয়া শারদীয়ার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশিত হইত কিনা জানিতে অনেকের কৌতূহল হইতে পারে।

বাংলা সংবাদপত্রের আরম্ভ শ্রীরামপুর ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশন কর্ত্তৃক শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণ' এবং গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক কলিকাতা চোরবাগান হইতে প্রকাশিত "বাঙ্গলা গেজেট" হইতে। এই উভয় পত্রিকা ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে প্রায় পক্ষ কাল ব্যবধানে বাহির হইয়াছিল। বাংলা প্রথম দৈনিকপত্র "সংবাদ প্রভাকর" কয়েক বৎসর সাপ্তাহিক ও বারত্রয়িকরূপে বাহির হইয়া ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুন দৈনিকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। কাজেই বাংলা সাপ্তাহিকের আয়ুষ্কাল একশত সাতাশ এবং বাংলা দৈনিকের আয়ুষ্কাল একশত ছয় বৎসর মাত্র। যতদূর জানা যায়, বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের গৌরব "সংবাদ প্রভাকরের"ই প্রাপ্য। কেননা ১২৬০ সালের বৈশাখ (১৮৫৩) হইতে প্রতি মাসের পয়লা তারিখে এক একটি বিশেষ সংখ্যা বাহির হইত। এই সব বিশেষ সংখ্যায় 'সর্ব্বাগ্রে জগদীশ্বরের মহিমা বর্ণনা, নীতি-কাব্য ও বিখ্যাত মহাত্মাদিগের জীবনবৃত্তান্ত প্রভৃতি গদ্য পদ্য পরিপূরিত উত্তম উত্তম প্রবন্ধ এবং সর্ব্বশেষ—মাসের সমুদয় ঘটনা অর্থাৎ মাসিক সংবাদের সারমর্ম্ম' প্রকাশিত হইত। প্রধানতঃ ১৮৫৪-৫৫ সালের বিশেষ সংখ্যাগুলিতে ইহার সম্পাদক কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত বহু আয়াসে সংগৃহীত প্রাচীন কবিদিগের জীবনবৃত্তান্ত ও রচনা প্রকাশিত করিতেন।

সে সময় কিন্তু শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশের রেওয়াজ ছিল না। ইহা প্রথম প্রকাশিত হইতে দেখি গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে। কি দৈনিক, কি সাপ্তাহিক গত শতাব্দীর প্রায় সমুদয় সংবাদপত্রের ফাইলই এখন আর ধারাবাহিকভাবে পাইবার উপায় নাই। এই সকল পাওয়া গেলে শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশের জন্মকোষ্ঠী ঠিক করা যাইত। এ পর্য্যন্ত যে-সব কাগজ দেখিবার সুবিধা হইয়াছে, তাহার মধ্যে কলিকাতাস্থ সাপ্তাহিক "সুলভ সমাচারে"র একখানি মাত্র শারদীয়া সংখ্যা আমার হস্তগত হইয়াছে। ১৮৭৯ সালের ১৪ই অক্টোবর (২৯শে আশ্বিন, ১২৮৬) এই বিশেষ সংখ্যাখানি বাহির হয়। প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বেকার এই বিশেষ সংখ্যাখানির কথা এখানে একটু বিশদভাবে বলিব।



"সুলভ সমাচারের" এই বিশেষ সংখ্যাখানির নাম দেওয়া হইয়াছে "ছুটির সুলভ"। ইহাতে দুইটি এবং পরবর্ত্তী ২রা তারিখের 'সুলভে' একটি ব্যঙ্গচিত্র আছে। এ সবের প্রতিলিপিও এখানে দেওয়া হইল। ইদানীং পূজার সময় যে-সব বিশেষ সংখ্যা বাহির হইতেছে তাহা রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ বটে, কিন্তু তাহাতে একটি জিনিষের অভাব বড়ই লক্ষিত হয়। ব্যঙ্গকৌতুক বা পরিহাসচ্ছলে সমাজের বিভিন্ন সমস্যার কথা এখন আর তেমন করিয়া আলোচিত হয় না। কিন্তু তখন এমনটি ছিল না। সমাজের তৎকালীন বিভিন্ন সমস্যা লইয়াই ঐ সময়কার শারদীয়া সংখ্যায় আলোচনা হইত। আমি যে সংখ্যাটির কথা এখানে বলিতে যাইতেছি তাহাতে এই সব বিষয়ের বিশদ আলোচনা ছিল। "ছুটির সুলভে" প্রথমেই চিত্র ও কথা সহযোগে 'ঘোর কলি' আবির্ভূত হইয়াছেন :

"ঘোর কলির আবির্ভাব, ভয়ঙ্কর চতুর্ভুজ রূপ, এক হস্তে খড়্গ, দয়া ধর্ম্ম বিনাশ করিতে উদ্যত। এক হস্তে সুরার বোতল,

হস্তে পুঁথি বা ছারখার করিবার জন্য প্রস্তুত আর এক হস্তে একখানি পুস্তক, জ্ঞানের অভিমানে মত্ত। অপর হস্তে টাকার তোড়া, অর্থ দ্বারা জগৎকে পাপে ডুবাইতে ঘোর কলি অবতীর্ণ। পদতলে কে? পাঠক তুমি কি উহাকে চেনো? উনি ধর্ম্ম, ব্যাঘ্র চর্ম্মের উপর শয়ান, মুখে ভক্তি ও বৈরাগ্যের লক্ষণ, মূর্ত্তি প্রশান্ত ও গম্ভীর। আহা! দেখ ঐ পাষণ্ড কলি দন্ত কিড়িমিড়ি করিয়া ধর্ম্মকে পদদ্বারা দলন করিতেছে। বোধ হয় যেন রাগের আস্ফালনে ধর্ম্মকে মারিয়াই ফেলিল। বাস্তবিক কলির দৌরাত্ম্যে ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলই গেল, বঙ্গদেশ শ্রীভ্রষ্ট হইল এবং ভারত-ভূমি মলিন হইল।"

এই সময়ে শিক্ষিত সমাজে জ্ঞানের অভিমান, ধর্ম্মে অনাস্থা এবং সুরাপানে আসক্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। এই তিনে মিলিয়া বঙ্গ-সমাজ যেন রসাতলে যাইতে চলিয়াছে—এখানে তাহাই সুব্যক্ত। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতায় স্ত্রী-স্বাধীনতা আন্দোলনও সুরু হইয়াছিল। ব্রাহ্ম সমাজের একদল উগ্রপন্থী ব্রাহ্ম এ বিষয়ে অগ্রণী হন। ইহা লইয়া কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁহাদের মতান্তর ঘটে। সত্য কথা বলিতে কি, কেশবচন্দ্র স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী না হইলেও ইহা লইয়া অতিরিক্ত মাতামাতি পছন্দ করিতেন না। স্ত্রী-স্বাধীনতার স্বপক্ষীয়দের নিকট ইংরেজ মেয়েরাও নিতান্ত সেকেলে বলিয়া গণ্য হইত। কেশব-প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত 'সুলভ' উগ্র স্ত্রী-স্বাধীনতা যে সমর্থন করিবে না তাহা বলাই বাহুল্য। উক্ত সংখ্যা 'ছুটির সুলভে' "স্ত্রী স্বাধীনতা" শীর্ষক এই সচিত্র শ্লেষাত্মক রচনাটি বাহির হইয়াছিল:

"শ্রীমতী গদাধরী স্বাধীন হইয়াছেন। তিনি আর এখন কটকী পেড়ে সাড়ী পরিধান করেন না, দিনকতক সাড়ী ছাড়িয়া গাউন ধরিয়াছিলেন এবং ধোপানী মেম সাহেব বলিয়া না ডাকিলে মনে মনে বড় রাগ করিতেন। তারপর তিনি শ্রবণ করিলেন যে, ইংরাজদিগের ভিতর স্ত্রী-স্বাধীনতারূপ বিকাশম ষোল আনা স্ফূর্তি পায় নাই। মেমদিগকে আজও সাহেবদের বশীভূত হইয়া চলিতে হয়; মেয়েরা যেখানে ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা, যার নিকট ইচ্ছা গমনাগমন করিতে পারেন না। গদাধরী এই সকল অসহ্য সংবাদ শুনিয়া যারপরনাই চটিয়া গেলেন। বলিলেন, কি এখনও ঊনবিংশতি শতাব্দীতে স্ত্রী-পুরুষের ভেদ বিচার? ইংরাজ হইয়া স্ত্রীজাতির উপর অত্যাচার! ইংরাজ জাতিটা বয়ে গিয়াছে। কেন, মেয়ে-পুরুষ কি সমান নহে? মেয়েরা কি মানুষ নহে? সাহেবেরা পেণ্টুলান পরিবে, মেয়েরা গাউন পরিবে; সাহেবেরা এক রকমের টুপী পরিবে, মেয়েরা অন্য রকমের টুপী পরিবে; সাহেবেরা মুখে চুরট ফুঁকিতে ফুঁকিতে আফিসে যাইবে, আর মেয়েরা ঘরে বসিয়া সন্তান পালন করিয়া সোনার জীবনকে সুখহীন করিবে, ইহা কেবল পূর্ব্বকালীন কুসংস্কার ও অত্যাচারের অবশিষ্ট মাত্র। যত শীঘ্র এই সকল কুসংস্কার ও অত্যাচার লোপপ্রাপ্ত হয় ততই ভাল। এইজন্য গদাধরী প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আর আমি গাউন পরিব না, ইহা দ্বারা স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যাচারকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, স্ত্রী-স্বাধীনতা নষ্ট করা হয়। গদাধরী বলিলেন, আমি পেণ্টুলান পরিব, পৃষ্ঠে কোট ঝুলাইব, মস্তকে হ্যাট সংলগ্ন করিব। তিনি যাহা বলিলেন তাহাই করিলেন। পাঠক মহাশয় উপরে দৃষ্টি করুন; গদাধরী স্বাধীনতার রণসজ্জায় সাজিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, একবার চুরট টানিতে গিয়া নখে বাঁধিয়া মুখ পুড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল; তামাকের ধূম মস্তিষ্কের ভিতর



চাড়িয়া মাথা ঘুরিয়া আসিয়াছে, কণ্ঠের ভিতর প্রবেশ করিয়া দারুণ কাসিকে উত্তেজিত করিয়াছে। এখন চুরট টানিতেও সাহস করিতেছেন না, ফেলিতেও সাহস করিতেছেন না। টানিলে বমি করিয়া মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া মরিবেন, ফেলিলে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা ও পুরুষের সঙ্গে সমতুল্যতার ব্যাঘাত হইবে। এখন পাঠক শ্রীমতী গদাধরীকে কি পরামর্শ দেন? আমরা তাঁহাকে এই পরামর্শ দিই তিনি একটি পূর্ণ কলস নূতন পোষাকের সঙ্গে কণ্ঠে সংলগ্নকরতঃ ভাগীরথী স্রোতে অন্তর্দ্ধান হউন। এতদ্বারা তাঁহারও উপকার হইবে এবং সমস্ত বঙ্গজাতীয় নারীরও উপকার হইবে।"

এ সময়ের আর এক সমস্যা ছিল বিলাত-ফেরতদের লইয়া। তাহারা স্বদেশবাসীদের নেটিভ বলিয়া অবজ্ঞা করিত, তাঁহারা উহাদের সঙ্গে বাস করিতেও নারাজ ছিল। নিম্নলিখিত পত্রখানিতে তাহারা নিজেদের জন্য একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার নিমিত্ত সহরের কর্ত্তৃপক্ষকে এই আবেদন করিতেছেন। ইহার ইঙ্গ-বঙ্গ ভাষাও লক্ষণীয়:

"মহিমাসাগর শ্রীল শ্রীযুক্ত মেষ্টর ডবলিউ এম সুটার সাহেব প্রবল প্রতাপেষু—

হুজুর বাহাদুর।

হুজুর দরখাস্ত মজুর অধীন ত্রে। মোরা বেলাট ফেরত লোগ। সাড়ে ষোল আনা সাহেব হইয়াছি। হ্যাট বুট ভিন্ন কিছু ভাল লাগে না। তবে পয়সা নাই, ছেঁড়া পেণ্টলুন, বগি নাই, পায়দল চলি। কিন্তু পুরো সাহেব। আওর নিগার লোক যে সকল জায়গায় নিবাস কর্টা সে হামাদের নাশিকা বেপসন্দ করে। যথা, দৃষ্টান্ত, পাঁচি ধোপানি গলি, মেচোবাজার পাথুরেঘাটা, শাঁখারিভাঙ্গা। আমরা নাপছন্দ করি, যেহেতু দুর্গন্ধ কালা লোগ ড্যাম ডার্টি, আর রাস্তাভি বহুৎ ময়লা, মোদের পেণ্টেলুন গর্দ্দা লাগিয়া বড় অপঙ্কার হয়। আর এক পাকা যুক্তি আছে তাহাও বলিতে (বিষ্ণু বিষ্ণু) লিখিতে হইলাম বাধ্য। তাহা হয় যেমত নীচে লেখা। পচা কচুরি ও মুড়ি ভোজন করিয়া উদর দংশন করে অর্থাৎ পেট কামড় দেয়। খানার ওয়াস্তে চিজ ভাল মেলে না নেটিভ শহরে। এ সকল কারণে আমরা দরখাস্ত করিতেছি যে, মিউনিসিপালটী হইতে আমাদের স্থাপনের জন্য এক লম্বা স্থান চুনাগলির কাছে প্রস্তুত করা হয়। সেখানে হামলোগ ফেমিলি লইয়া বসবাস করিবে। চুনাগলি বড় উৎকট (বিষ্ণু) উৎকৃষ্ট স্থান, ওখানে বহুত পছন্দ। কারণ আমরা গুরুভাজা নিকটে প্রাপ্ত হইব, আবার যদ্যাপি লাউ চিংড়ি খাবার রুচি হয় তাহাও মাধব ডট্ট কোম্পানির বাজার হইতে হামেসা পাইব। আর হামলোগকা রং প্রতিবাসীর রং বরাবর হোগা। সুতরাং দিলকা মিল আর ঘরাও বনিবনাওভি খুব সম্ভাবনা। আর মাদার গঙ্গাকে মুই কেয়ার করি না। মুইবা গোরাকে প্রেম করি। যেহেতু গোরই সিভিলিজেশন, গঙ্গা নহে, যেমত আপনি হুজুর বিদিত আছেন। মোদের লেড়কা লেড়কির সাদিরও সুবিধা হইতে পারে, যে বিষয় করিয়াছে আমাদিগকে অতীব উদ্বেগ। কোন্ আড়মি সাদি করবে মোদের ডিয়ার মিসি বাবা, ওহো হোহো! বাপরে মারে! বড় কান্না পাচ্চে, হুজুর! দোহাই মেষ্টর সুটার মেরো না কুঠার। গরীব কিন্তু সম্ভ্রান্ত বিলাত ফেরতদিগকে লাট সাহেবকে বলিয়া চুনাগলি পরাস্তে কিঞ্চিৎ হাত জায়গা দান করা হউক। আশীর্ব্বাদ করিবে মোদের মেম সাহেব লোগ আর ছেলে লোগ আর তোমার বোলবালা হবে।

স্বাক্ষরকারী
ড্যানিয়েল রামচাঁদ
ডিসিলভা কালাচাঁদ
মেষ্টর হটয়ুট
তেমেরুকা ভজহরি"

[ইহার পর ১৮৬ পৃষ্ঠায়]


শ্রেষ্ঠ ও
পুষ্টিকর
খাদ্য
VITOL
ভাইটল
বার্লি
পিওর ফুড প্রডাক্টস (ইণ্ডিয়া) কলিকাতা


নূতন রেকর্ডের খবর নিন
গ্রামোফোনের পিন
কন্ট্রোল দরে পাবেন
সুদক্ষ এইচ, এম, ভি'র ইঞ্জিনিয়ারের
দ্বারায় রেডিও, মাইক্রোফোন, এম-
প্লি ফায়ার, গ্রামোফোন বিক্রয়
ও মেরামত হয়!
ছয় মাসের গ্যারান্টি দিয়া
কাজ লওয়া হয়!
রেডিও কর্পোরেশন
অফ বেঙ্গল
১২৪-২ডি, রসা রোড - ফোন সাউথ ২৭৩
রাসবিহারী এভিনিউ ক্রসিং


উৎসবে আনন্দে
দেহের লাবণ্য বৃদ্ধি করে
আমাদের ক্যাষ্টর অয়েলের বিশেষত্ব
এই যে, ইহাতে মাথা ঠাণ্ডা রাখে ও
চুল উঠা বন্ধ করে।
সিনকোজ
টয়লেট প্রডাক্টস
৮৯বি, ধর্ম্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা



জটাধারী

শ্রীবিমল মিত্র

সকাল বেলা ডাক্তারখানা খুলে বসেছি—একটা রুগী-পত্তর নেই। রাস্তার ওপরেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটলো! আর দেখতে দেখতে ঘটনার ঢেউ এসে পৌঁছুলো একেবারে আমার ঘরে—আমার ডাক্তারখানার ভেতর।

সদ্য ঝাঁট দেওয়া ঘর—রোগীর ভীড় নেই, তাই ধুলোও জমে না, নোংরাও হয় না। ফিটফাট সাজান সব জিনিষ। আলমারীর শিশিগুলো পর্য্যন্ত ঝকঝকে তকতকে—টেবিলটার ওপর দোয়াতদানি, পেন্সিল, কলম, ব্লটিং প্যাড, ক্যালেণ্ডার ষ্ট্যাণ্ড থরে থরে সাজান। হঠাৎ এতগুলো লোকের ভীড়ে একেবারে চেয়ার ছেড়ে উঠে হাঁ-হাঁ-হাঁ-হাঁ করে' উঠলাম।

সকলের আগে আগে একটা লোক একেবারে আমার ঘরে ঢুকে চেয়ার টেবিল টপ্‌কে পেছনের পর্দ্দা টাঙ্গান কম্পাউণ্ডিং রুমের ভেতরে ঢোকে আর কি। নোংরা চেহারা—একমুখ দাড়ি গোঁফ—মাথায় এককাঁড়ি জটার বোঝা—গায়ে হাত দিতে ঘেন্না করে।

আর তা'র পেছনে পেছনে আসছিল একটা রোগা মড়্‌কে গোছের চেহারার রিক্সাওয়ালা—খালি রিক্সাটা দু'হাত দিয়ে টানতে টানতে এসে ডাক্তারখানার সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গেল। আমার ভয়ে বোধ হয় আর ভেতরে ঢুকতে সাহস হোল না।

আর তা'রও পেছনে অসংখ্য লোক—ছোটলোক ভদ্রলোক ব্যাটাছেলে মেয়েছেলে একপাল।

জটাধারী লোকটাকে ডান হাতে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম—কী? ব্যাপার কী?

তারপর রিক্সাওয়ালাটার দিকে তাকালাম। দেখলাম রিক্সাওয়ালা কাঁদছে।—দু'হাতে রিক্সাটা তখনও ধরা—কিন্তু চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়ছে—আমার দিকে আশায় ভয়ে আর আনন্দে মেশান এক অদ্ভুত দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগলো।

আর পেছনের লোকজন যেন এক অপূর্ব্ব কৌতুক পেয়ে বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে আমার দিকে চেয়ে আছে। পাড়ার, বেপাড়ার আর অলস পথচারীর দল—একটা কিছু কৌতুক পেলেই যারা সব কাজকর্ম্ম ভুলে পথে, ঘাটে, বাজারে ভীড় জমায় সেই তারা। ওদের দিকে এক পলক চেয়ে নিয়েই রিক্সাওয়ালাটাকে বললাম—কী, হয়েছে কী?

রিক্সাওয়ালাটা কাঁদতে কাঁদতে বললে—আজ্ঞে ও আমার কাকা।

রিক্সার ভাড়া নিয়ে একটা কিছু গোলমাল অনুমান করেছিলাম, কিন্তু কাকা শুনে হঠাৎ চমকে গেলাম। তা' ছাড়া কাকার পেছন পেছন ভাইপো'র দৌড়োনো কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগলো। ভাইপোকে শাসন করতে কাকার দৌড়োদৌড়িটাই আমাদের দেশে স্বাভাবিক। বললাম—তোমার আপন কাকা?

—আজ্ঞে আপন বৈকি—আমার একমাত্র আপন কাকা—রিক্সাওয়ালা বললে।

আমি জটাধারী লোকটাকে তখনও ডান হাত দিয়ে সজোরে ধরেছিলাম—ভয় ছিল হয়ত পালিয়েও যেতে পারে। তার দিকে চাইতেই সে বললে—আজ্ঞে সব মিথ্যে কথা, আমি আপন কাকা তো দূরের কথা—দূর সম্পর্কের কাকাও নই—আমি ওকে চিনিই নে, আজ্ঞে—ও হোল গিয়ে আপনার ছোট জাত—আমি হলুম আজ্ঞে বামুন—এই দেখুন, পৈতে দেখুন।

ব'লে ময়লা গেরুয়া রংএর জামাটা তুলে লোমশ বুকের ওপর একগোছা পৈতে দেখালে।

রিক্সাওয়ালাটা বলে উঠলো—আজ্ঞে আমি কি ছোট জাত নাকি—আমিও বামুন, এই দেখুন।

সেও কোমরে জড়ানো পৈতেটা দেখিয়ে দিলে। আমি তো অবাক। জটাধারীর হাতটা ছেড়ে দিয়ে সে একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। রিক্সাওয়ালা রিক্সাটাকে একপাশে রেখে আমার ঘরে উঠে এলো। নাটকটা বেশ জমে উঠলো দেখছি। এবার পেছনের লোকজন আরও মজা পেয়ে একেবারে আমার ডাক্তারখানার সিঁড়ির ওপর উঠে ঘরের ভেতর উঁকি মারতে লাগলো। আমি যেন এক মহা-সমস্যায় পড়লাম।

জটাধারীকে বললাম—তোমার নাম কী?

জটাধারী বললে—আজ্ঞে আমাকে সবাই 'পাগলা সন্ন্যেসী' ব'লে ডাকতো—আমি পাগলও নই, সন্ন্যেসীও নই।

বললাম—বাপ মায়ের দেওয়া তোমার একটা নাম আছে তো?

—আজ্ঞে সে নাম হোল গিয়ে আপনার শ্রীপতিতপাবন চক্রবর্ত্তী—আমরা হলুম সপ্তগ্রামের চক্রবর্ত্তী—ওখানকার রাজারা অপ্মাদের আনিয়েছিলেন যশোর থেকে—যশোরের শ্যামকুঁড়ে আমাদের আদি বাস।

রিক্সাওয়ালার কান্নাটা এতক্ষণে শুকিয়ে

এসেছিল। হঠাৎ বলে উঠলো—কথখনো না ডাক্তারবাবু, ও মিথ্যে কথা বলছে—ওর নাম কোনওকালে পতিতপাবন চক্রবর্ত্তী নয়—ওর বাড়ীও সপ্তগেরামে নয়।

রিক্সাওয়ালাটা হঠাৎ ছিট কে এসে একেবারে জটাধারীর পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়লো। বললে—কাকা, তুমি আমাকে চিনতে পারছো না, এখনও ছলনা করছ? আমাকে যে কত আদর করতে আমি কাছে না বসলে যে তোমার খাওয়া হোত না—সব ভুলে গেলে? আমার বাপ ছিল না ব'লে তুমিই যে আমাকে কোলে পিঠে করে' মানুষ করেছিলে গো। সেই মল্লিকদের পেয়ারা গাছে পেয়ারা পাড়তে গিয়ে ঠোঁটে কাঠপিঁপড়ে কামড়ে দিয়েছিল—তুমি সন্দেশ দিলে, পয়সা দিলে—হাট থেকে বাঁশি কিনে দিলে—তখন আমি ব্যথা ভুললুম, আর সেবার গাজনের মেলায় আমাকে নিয়ে তুমি গিয়েছিলে সৈরভপুরের বাবুদের বাড়ী—পাঁপড় ভাজা, বাইনাচ একটা লোকের দু'টো মাথা, আস্ত মুণ্ডুটা কেটে আবার জুড়ে' দিলে—সব ভুলে গেলে কাকা—তুমি ছাড়া আমার যে কেউ নেই—দুর্ভিক্ষে যে সব মরে ঝরে গেল—মা গেল আগের বছর, পরের বছরে দুর্ভিক্ষে মারা গেল খ্যাড়া আর তিনকাড়ি—আমি একলা এই সহরে এসে রিক্সা টানি—তোমার একটু মায়াও হয় না? সন্ন্যেসী হয়েছ বলে' কি একবার আমাদের দিক ফিরেও দেখবে না?

রিক্সাওয়ালাটা হাউ হাউ করে' কাঁদতে লাগলো—তা'র দু'চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে' জল ঝরছে—আর মাথাটা জটাধারীর দুই পায়ের ওপর ঘষছে।

জটাধারী কেমন যেন বিব্রত হয়ে উঠলো—আমার দিকে চেয়ে সাহায্যের প্রার্থনায় বললে—এ কি বিপদ দেখুন তো ডাক্তারবাবু? আজ এক মাস ধরে' আমার পেছনে লেগে পড়ে' আছে—যেখানেই যাই দেখতে পেলেই রিক্সা নিয়ে পেছনে পেছনে ছোটে—সোয়ারী থাকলে নামিয়ে দেয়—। বালিগঞ্জ ষ্টেশনের কাছে কিছুদিন ছিলাম—ওর ভয়ে সেখান থেকে চিৎপুরে গেলুম—কিছুদিন পরে সেখানে দেখতে পেয়ে এই কাণ্ড—শেষকালে পালিয়ে এই বরানগরে এসেছি—এখানে এসেও নিস্তার নেই—আপনি আমাকে বাঁচান ডাক্তারবাবু—কোনও জায়গায় গিয়ে নিশ্চিন্দি নেই—

আমি রিক্সাওয়ালাকে হাত ধরে টেনে তুললুম।

বললাম—ওর নাম তো পতিতপাবন চক্রবর্ত্তী, আর তোমার কাকার নাম কী?

রিক্সাওয়ালা বললে—আজ্ঞে ওই তো আমার কাকা, ওরই নাম শ্রীগোবিন্দসুন্দর ভট চাষ্যি—তা গাঁয়ের লোক ওকে গোবিন্দ মহারাজ বলে ডাকতো!—মস্ত সাধুপুরুষ উনি আজ্ঞে—কত ওষুধ বিষুধ জানে—কত লোকের কত আধি-ব্যাধি সারিয়ে দেয়—ওঁ কি সামান্য মানুষ—গাঁয়ের লোক বলতো গোবিন্দ মহারাজ মানুষ নয়—দেবতা—যা'র কাকা দেবতা সে আজ রিক্সা টানছে—একটু ভাইপো বলে' মায়াও হয় না—দেবতা হ'লেই একেবারে পাথর হ'তে হয়? জিগ্যেস করুন না আজ্ঞে—সামনেই তো দাঁড়িয়ে আছে।

এ এক কী সমস্যায় পড়লাম! বাইরে ভীড় যেন আরো বেড়েছে—কয়েকটা লোক একেবারে ঘরের মধ্যে এসে আমার টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে—কেউ কেউ চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে' পাখার হাওয়াও খাচ্ছে রীতিমত।

জটাধারী হাঁফিয়ে উঠেছিল। বললে—এক গ্লাস জল আন্—খাই।

চাকরটাকে রেশন আনতে পাঠানো হয়েছিল। নিজেই বাড়ীর ভেতরে গেলাম, দেখি গিন্নি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছেন। বললাম—দেখ দিকিনি কী গেরো।

গিন্নি জল এনে দিয়ে বললেন—তোমার যেমন বুদ্ধি, আসল নামটা বার করা কী এমন শক্ত! ওর ঠিকানাটা জেনে নাও না, তারপর সেখানে আশেপাশের লোককে জিগ্যেস করলেই সব বেরিয়ে পড়বে

তা' বটে। জল নিয়ে দিলাম জটাধারীকে। ঢক্ ঢক্ করে' সব জলটাই খেয়ে ফেললে।

জটাধারীকে বললাম—তুমি থাকো এখানে কোথায়? তোমার বাড়ীতে লোকজন আছে তো, তা'দের জিগ্যেস করলেই সন্দেহভঞ্জন হয়ে যাবে—বেরিয়ে পড়বে তোমার নাম পতিতপাবন চক্রবর্ত্তী, না গোবিন্দসুন্দর ভট চাষ্যি।

যেন অত্যন্ত সোজা একটা সমাধান ক'রে দিয়েছি এইভাবে রিক্সাওয়ালার দিকে মুখ ফেরালাম—তারপর জনতার দিকেও চোখটা ঘুরিয়ে নিলাম।

জটাধারী বললে—আজ্ঞে থাকবার আমার কোনও আশ্রয় নেই—যখন যেখানে থাকি—সেই আমার আশ্রয়—রাস্তায় বাজারে ইষ্টিশানেই আমার দিন কাটে—আমি একরকম নিরাশ্রয়ই বলতে পারেন—একমাত্র তাঁরই চরণ আমার আশ্রয়।

রিক্সাওয়ালা চোখ দু'টো বড় করে আমার দিকে ফিরে বললে—বলিনি আমি, মস্ত সাধুপুরুষ উনি আজ্ঞে—দেবতা উনি—এতটুকু লোভ কি হিংসে কি সংসারের টান কিছুই ছিল না কোনদিন—তা' হ'লে কি ভাইপোর এই দুর্দ্দশা—সে কি না রিক্সা টানে!

কথা শেষ করতে না দিয়ে জটাধারীকে আবার বললাম—তবে যে তুমি একটু আগেই বলছিলে সপ্তগ্রামের চক্রবর্ত্তী তোমরা—সেখানে তোমার কেউ নেই—যা'রা তোমায় চিনবে—তোমায় নাম জানবে—?

এবার জটাধারী বিপদে পড়লো সত্যি সত্যিই। জনতার মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল—রিক্সাওয়ালাও যেন একটু আশান্বিত হ'য়েছে মনে হোল। বিব্রত হ'য়ে জটাধারী বললে—সে অনেক কথা ডাক্তার বাবু, সকলের সামনে বলা যায় না—সবাইকে যেতে বলুন—রিক্সাওয়ালাকেও যেতে বলুন—আমি আপনাকে আড়ালে সব বলবো।

সকলকে আমি যেতেই ইঙ্গিত করলাম। একান্ত নিরাশ মনেই যেন সকলে ঘর থেকে বিদায় নিলে। রিক্সাওয়ালাকে বললাম—তুমি এখন যাও—আমার কাছে তো রইল—সত্যিই যদি তোমার কাকা হয় তো বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলবো—তুমি যাও—বিকেলে কিম্বা কাল সকালে আমার কাছে এসো—ও আর যাবে কোথায়, আমার কাছেই থাকবে আজ—

চোখ মুছতে মুছতে রিক্সাওয়ালাও চলে' গেল। দূরে রিক্সার ঠুন ঠুন আওয়াজ ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে গেল। আমি দরজা বন্ধ করে' দিলাম।

দুপুরবেলা জটাধারীকে ভাত খেতে দিলাম। স্নান সেরে খেয়ে দেয়ে যখন ওকে দেখলাম তখন চেহারা দেখে রীতিমত শ্রদ্ধা হোল। ফরসা রং—লম্বায় ছ'ফুট চেহারা, দাড়ি গোঁফ, জটায় সমাচ্ছন্ন মুখ—বুকে অজস্র চুল—'পাগলা সন্ন্যাসী' যা'রা নাম দিয়েছিল, তা'রা কিছু অন্যায় করেনি।

চেয়ারে বসে বললাম—এইবার তোমার পরিচয় বল—জটাধারী—

জটাধারী বললে—বড় তৃপ্তি পেলাম আজ অনেক দিন পরে খেয়ে! এমন খাওয়া দু' বছর খাইনি ডাক্তারবাবু—কিন্তু আমি আজ্ঞে জেলের কয়েদী—

চমকে ওঠবারই কথা। সামনে একঘরের মধ্যে মুখোমুখি বসে' আছি জেলের কয়েদীর সঙ্গে।

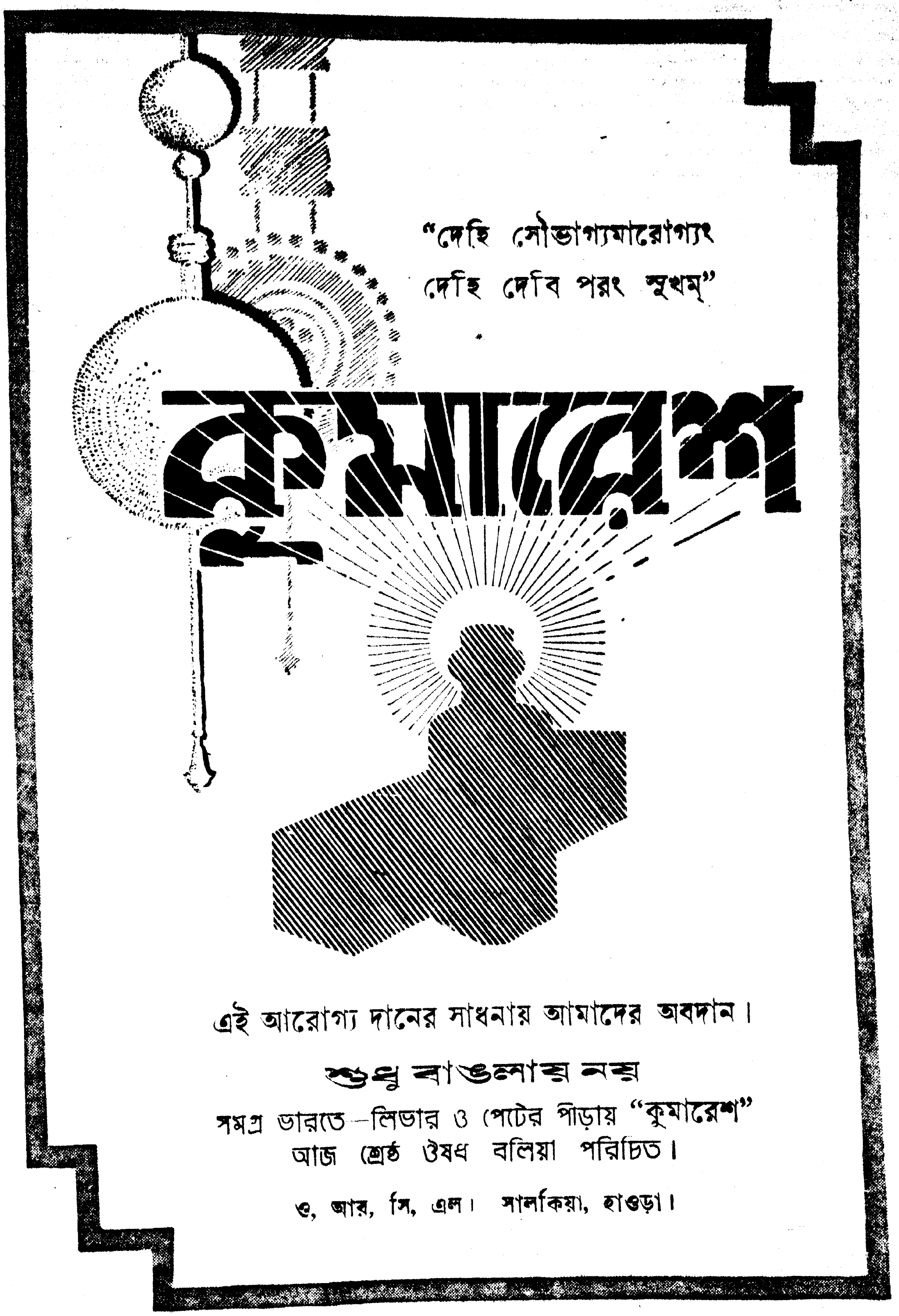
—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি জেলের কয়েদী, আপনি চমকে উঠবেন না—আজ দু'মাস হোল ছাড়া পেয়েছি। কয়েদখানার খাতায় আমার নাম লেখা আছে শ্রীপতিতপাবন চক্রবর্ত্তী। বিশ্বাস না হয় দেখে আসতে পারেন—আমি এতটুকু মিথ্যে বলছিনে হুজুর—

বললাম—জেলে? জেলে গিয়েছিলে কেন?

বলছি—আমি সবই বলছি! সপ্তগ্রামে আমার দেশ! আমি হলাম বাবার সবচেয়ে ছোট ছেলে। বাবা পুজো আচ্ছা করেন—কয়েক বিঘে জমিও ছিল, কিন্তু আমরা সব ভাইরা কোনও কাজ করতাম না। করবোই বা কী কাজ বলুন? সকাল বেলা দু'টো মুড়ি চিবিয়ে যেতুম তাস খেলতে—ফিরতুম দুপুর গড়িয়ে গেলে, চারটি নাকে মুখে গুঁজে আবার বেরুতাম আড্ডায়। এখন মনে হয় দিনগুলো কিন্তু বেশ কাটছিল!

রাখাল সাপুই'এর চণ্ডীমণ্ডপটা আমরাই কাজে লাগাতাম। যত বেকার ছেলের দল হাটে যেতাম, বাজারে যেতাম, ঘাটে যেতাম—মরদ মরদ জোয়ান ছেলের দল করবার কিছু

[ইহার পর ১৭৯ পৃষ্ঠায়]


"দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং
দেহি দেবি পরং সুখম্"
কুমারেশ
এই আরোগ্য দানের সাধনায় আমাদের অবদান।
শুধু বাঙলায় নয়
সমগ্র ভারতে—লিভার ও পেটের পীড়ায় "কুমারেশ"
আজ শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া পরিচিত।
ও, আর, সি, এল। সালকিয়া, হাওড়া।



ঢেউ

শোভা



ব্যাগ পাইপের সঙ্গে পোঁ পোঁ করিয়া শব্দ বাজিয়া উঠিল। বর আসছে, বর আসছে বলিয়া আবাল-বৃদ্ধ বনিতা যে যেখানে ছিল, এমন কি পাচক, চাকর, ঝি সকলেই কাজ ফেলিয়া ছুটিল; ছুটিল না কেবল কুন্তলা, সে যেমন লুচি বেলিতেছিল, বেলিয়াই চলিল।

বরকে এবং বরের বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনকে অভ্যর্থনা করিয়া নাবান হইল। বাড়ীর কুমারীরা গোলাপজল ও আতর তাহাদের গায়ে ছিটাইয়া দিল, চাকররা চা, খাবার, পান, সিগারেট, দিয়েশলাই ট্রে ভর্ত্তি করিয়া রাখিয়া গেল। সাঁওতাল নৃত্যের ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহারা মোটা লাল পাড় শাড়ী ও মাথায় ফুল গুঁজিয়া তাহাদের পুরুষদের সহিত নাচিতে আরম্ভ করিল। সাঁওতালী গান, মাদল, বাঁশী, ব্যাগ-পাইপ ও বাদ্য সকলের ঐকতান এক অপূর্ব্ব সুরলহরীর সৃষ্টি করিল। কনের বাড়ীর ও বরের বাড়ীর ছেলে মেয়েরা আনন্দে অস্থির হইয়া গ্রামোফোন জুড়িয়া দিল। মাঘের শীত-কাতর নিস্তব্ধ রাত্রিতে বহুদূর পর্য্যন্ত ঐ শব্দ দেওঘরকে মুখরিত করিয়া তুলিল।

সাঁওতাল নৃত্য দেখিতে দেখিতে হঠাৎ কনের মায়ের খেয়াল হইল কুন্তল তো এখানে আসে নাই। কোথায় সে? এখানে তো বাড়ীসুদ্ধ লোক জমা হইয়াছে কিন্তু সে তো নাই। কনের মা অর্থাৎ এ বাড়ীর বড় বৌ মেজ মেয়ে কনককে বলিলেন, "দেখ্ তো কনক, তোর কুন্তলাদি কোথায়? লজ্জায় এখানে আসে নি, তুই ডেকে আন।" বরের মা সেখানেই ছিলেন, বৈবাহিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুন্তল কে ভাই?"—"ওঁর বন্ধুর মেয়ে, এখানে দিন তিনেক আছে।"—"এখন বুঝি থাকবে?"—"হাঁ মাস তিনেক।" বিস্ময়ে চক্ষু দুটি বড় করিয়া বরের মা বলিলেন—"তোমার বাড়ীতে মাস তিনেক!" "—না না, ওর মা-বাপও এসেছে। বিলাসীতে বাড়ীভাড়া করেছে। কি কাজে ওর বাপ দু'চার দিনের জন্যে রাজগীরে গেছেন—সঙ্গে মাও গেছেন। ঠাকুর চাকরের

কাছে অত বড় মেয়েকে রেখে যাবেন কি করে, তাই এখানে আছে।"—"কত বড় মেয়ে তাই ?"—"তা বড় বৈকী, বছর দুয়েক আগে এম এ পাস করেছে।"—"মেয়ের বিয়ে দেবে না ?"—"শুনি তো মেয়ে বিয়ে করতে চায় না, খুব স্বদেশী, আর তাই কিছু জানি না। আমার সঙ্গে ওর মায়ের ভাব নেই, কেবল আলাপ মাত্র।"

কনক ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "মা, কুন্তলদি এলো না, রান্না ঘরে একা একা আপন মনে লুচি বেলেই চলেছে। বললাম, কুন্তলদি এসো, নাচ দেখবে, বর দেখলে না এখনও, মা তোমায় ডাকছে—তাতে উত্তর দিলে—'বিয়ের সময় যাবো মাসীমাকে বলগে যাও'—তাও আমি হাত ধরে টেনে বললাম, 'চল না কুন্তলদি ওখানে কি মজা হচ্ছে দেখবে এসো'—তাতে কোন উত্তরই দিল না।" নিকটে কনের ঠাকুমা দাঁড়াইয়া ছিলেন, মুখ বেঁকাইয়া উত্তর দিলেন, "তোরই বা অত সাধাসাধির কি দরকার ছিল। ওসব বিদ্বান্ মেয়ে মানুষ, আমাদের সাধ্য কি ওদের মনের কথা বোঝে।"

কনের মা এবাড়ীর অর্থাৎ বোসেদের বড় বৌ, বরের মা ওবাড়ীর অর্থাৎ চৌধুরীদের ছোট বৌ। দু'পক্ষই ধনী, কাজেই বিবাহে ত্রুটী হইবার উপায় নাই, তবে কন্যাপক্ষ যত বড় লোকই হোক না কেন, মাথা বরপক্ষের নিকট একটু নামাইতেই হয়, কিন্তু এখানে সে বালাই নাই। বরপক্ষ আনিলেন ব্যাগ-পাইপ, কন্যাপক্ষ অনেক টাকা খরচ করিয়া কলিকাতা হইতে আনিলেন ব্যাণ্ড। বরপক্ষ কন্যা আশীর্ব্বাদে দিলেন দুইখান গহনা, কন্যাপক্ষ বরকে দিলেন অধিকতর মূল্যবান ঘড়ি, আংটি, বোতাম ইত্যাদি। আশীর্ব্বাদিতে বরপক্ষ খাবার আয়োজন যাহা করিয়াছিলেন, কন্যাপক্ষ করিলেন তাহার চারগুণ বেশী। বিবাহ রাত্রিতেও আয়োজন হইয়াছে প্রচুর। বরের পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ছাড়াও ঠাকুমা, খুড়ী, মাসী, পিসি, বোন এমনকি মাতাও আসিয়াছেন। ছেলের বিবাহে মাতার কনার বাড়ী গমন আমাদের সমাজ রীতির বহির্ভূত কার্য্য, কিন্তু সমাজকে ভয় পায় গরীব, বড়লোক নয়।

"দিদিমণি উঠুন, কেন এ গরমে কষ্ট পাচ্ছেন" বলিয়া ঠাকুর তাহার নির্দ্দিষ্ট টুলে লুচি ভাজিতে বসিল। আট দশ খানা লুচি কড়ায় ফেলিয়া দিয়া ঠাকুর আবার বলিল, "এখন বিয়ে হচ্ছে দেখবেন না ?" কুন্তলার মনে হইল কাহারা যেন তাহার পিঠের কাছে দাঁড়াইয়া আছে, ঘাড় ফিরাইতেই দেখিল, চারজন চাকর লুচি বেলিবার জন্য তাহার উঠিবার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। কাজেই কোন ছলে আর রান্নাঘরে থাকা উচিত নয় ভাবিয়া কুন্তলা উঠিয়া গেল।

কুন্তলা সবার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া বিবাহ দেখিতেছিল, কনের ঠাকুমার নজরে পড়িল। "ওমা সবার পেছনে কেন গো দিদি, সামনে এসো, ভাল করে বিয়ে দেখ," তাহার পর নিকটে আসিয়া চিবুক ধরিয়া বলিলেন, "মুখটি এত শুকনো কেন ? মায়ের জন্যে মন কেমন করছে বুঝি ?" কুন্তলা ঘাড় নাড়িয়া সংক্ষেপে জবাব দিল, "না।"

বিবাহ শেষ হইতে বর-কনেকে বাসর-ঘরে লইয়া যাওয়া হইল, কনের মা কুন্তলার হাত ধরিয়া বাসরে লইয়া গেলেন। একত্রে কতকগুলি কৌতূহলী দৃষ্টি তাহার উপর কয়েক মিনিটের জন্য নিবদ্ধ হইল। কুন্তলা কুণ্ঠিতভাবে একধারে বসিল। কনের দিদিমা অলঙ্কারভরা মেদবহুল হাত তাহার সামনে নাড়িয়া ঠাটার সুরে বলিলেন—"কিগো দিদি, রান্নাঘরে ধোঁয়ায় বসে কার ধ্যানে মগ্ন ছিলে, এত ডাকাডাকি, তা আর ধ্যান ভঙ্গই হয় না।" বরের মাসী পিক-দানীতে পিচ্ ফেলিয়া বলিলেন, "কেন দিদিমা, উনি বুঝি এসব পছন্দ করেন না ?" আর একজন দিদিমার হইয়া উত্তর দিলেন, "নাচ গান অনেকে পছন্দ করে না, কিন্তু ওঁর কি আমাদিগকেও পছন্দ নয়!" আর একজন বলিলেন, "হয়তো উনি বেশী মানুষই পছন্দ করেন না।" অন্য একজন ঠোঁট ঈষৎ বাঁকাইয়া বলিলেন,—"কি জানি মানুষ মানুষকে পছন্দ করে না এ নূতন শুনলাম, আমি তো একদণ্ড মানুষ না হলে থাকতে পারি না। কারুর মুখ না দেখলে প্রাণ যেন ছট্ ফট্ করে।" তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী জবাব দিলেন, "তোর কথা আলাদা, কত বড় বনেদি বংশের মেয়ে, বনেদি বংশের বউ, জন্মেছিস্ মানুষের গাদায়, রয়েছিস মানুষের গাদায়, তোদের বাড়ীতে এক এক বেলায় পাতই পড়ে একশ করে। তোর সঙ্গে আজকালকার হালফ্যাশানের একটি মানুষের তুলনা!" কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যাহাকে উদ্দেশ করিয়া এতগুলি চোখা চোখা বাক্য বর্ষিত হইতে লাগিল তাহার মুখ দিয়া একটা জবাব তো বাহির হইলই না উপরন্তু সে তাহাদের দিকে একবার ফিরিয়াও তাকাইল না। অতগুলি মহিলার মধ্যে সে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গভাবে জানালার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল।

বাসরে বর-কনের খাবার আসিল, কনের ঠাকুমা এতক্ষণ বাসরে ছিলেন না। তিনি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন, বাসরে আসিয়া বলিলেন, 'তোমরা শাঁখ বাজাও, আর কুন্তল দিদি আমাদের ঢাকার মেয়ে, উলু দিক।' বরের দিদিমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন "তুমি ভাই নাত জামাই, নাত বৌকে খাইয়ে দাও।"

কুন্তল যেমন বসিয়াছিল, তেমনি বসিয়াই রহিল। আবার ঠাকুমা বলিলেন, "দাওনা ভাই উলু, এরা কেউ জানে না দিতে।" কুন্তলা জবাব দিল, "আমিও জানি না।"—"ওমা সেকিগো, বাঙ্গাল দেশের মেয়ে উলু দিতে জান না, তোমাদের উলু না হলে তো কোন শুভ কাজই হবে না।" কনের মামাতো বোন বলিয়া উঠিল—"উলু দিতে জানে না, একথা বিশ্বাস হয় না, প্রত্যেক বাঙ্গাল মেয়েই উলু দিতে জানে, আপনি শুনিলাম স্বদেশী—আপনি কি কোন নেতাকে কখনও উলু দিয়ে মালা পরিয়ে দেন নি ?" কুন্তলার ইচ্ছা হইল মেয়েটির গালে সজোরে দুটি চড় মারিয়া উঠিয়া যায়। কনের দিদিমা ধমকের ছলে বলিলেন—"তুই থাম তো, সবটাতে কর-করানি, মালা পরায় বেশ করে। তোর আমার কি ?" তারা দেশমান্য নেতা ওরা ভক্ত, ওদের সঙ্গে তাদের প্রাণের যোগ। তোর এখানে কি ? তবু যদি সত্যিকারের বর হোত, নাতনীর হয়তো প্রাণ টলত।" কুন্তলা আর বসিয়া থাকিতে সেখানে পারিল না, উঠিয়া বাহির হইয়া গেল, কিন্তু যাইবেই বা কোথায় ? দালানে, ঘরে, ছাদে সব খাইতে বসিয়াছে, কনের মা-খুড়ীরা তাহাদের তদারকে ব্যস্ত। 'ওরে এখানে ২খানা লুচি, এই ঠাকুর, এই পাতে একহাতা গরম পোলাও। আপনি একটু মাংস নিন, আর দুটো মিষ্টি' ইত্যাদি—ইহাদের মধ্যে সে থাকিবে কোথায় ? বেচারা দরজার বাহিরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, ঘরে তখন তুমুল আলোচনা চলিতেছে, 'বাব্বা মেয়ের কি অহঙ্কার, কি রাগ—যেন মাটিতে পা পড়ছে না, এই জন্যেই মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে নেই।' বরের খুড়ী বলিলেন, "যতক্ষণ এখানে ছিল জানলার দিকে চেয়ে। আমাদের কাপড় গয়নার দিকে একবার ভুলেও তাকাল না। সর্ব্বদা মেয়ের এই ভাব যে, ওরকম আমি অনেক দেখেছি—ও কিছু নয়।" বরের মাসীমা বলিলেন, "শুনলাম নাকি ওর বাবা আলীপুরের বেশ বড় উকিল।" খুড়ীমা নাক সিঁটকাইয়া বলিলেন, "হাঁ, আলীপুরের কোর্টই ভারী—তার আবার বড় উকিল! হাঁ বলতে পারতে বটে হাইকোর্ট হলে, যেমন আমার দাদা বড় উকিল হাইকোর্টের। একে বলে এডভোকেট। বৌদিকে দেখলে পরিচয় দিতে হবে না সে বড়লোক কি না, পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত হীরে মুক্তাতে মোড়া। এর গায়ে এক তিল সোনা আছে ? শুধুই ঘুরিয়ে কাপড় আর চটি ফটর্ ফটর্।" বরের ঠাকুমা পাকা গিন্নী, বলিলেন, "তোমরা চুপ কর, বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে, যদি এসব শুনতে পায় কুরুক্ষেত্তর হবে।"

ঠাকুমা যা আন্দাজ করিয়াছিলেন হইলও তাই। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কানে তাহার সবই পৌঁছিল, নিরুপায় হইয়াই বেচারী ওখানে দাঁড়াইয়াছিল কিন্তু অচিরেই অনুভব করিল কয়েকটি ভোজনরত যুবকের চক্ষু তাহাকে লেহন করিতেছে। অগত্যা কুন্তলাকে আবার সেই বাসর ঘরেই প্রবেশ করিতে হইল।

এক মুখ হাসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন,

[ইহার পর ১৯৪ পৃষ্ঠায়]

জটাধারী

[১৭৪ পৃষ্ঠার পর]

নেই! জমি-জমা সে একরকম চলে' যেত। কেরষাণ দেখতো বলদ গরু আর জনমজুররা দেখতো ক্ষেত—গায়ে জামারও দরকার ছিল না, পায়ে জুতোর দরকার ছিল না, বছরে দু'খানা কাপড় তাই যথেষ্ট—এমনি করেই কাটিয়েছি দিন—কখন বয়স বেড়েছে—কিছু খেয়াল নেই। বন্ধুরা যা'রা বিয়ে থা' করলে—তা'রা আরো বেশী করে' জমলো রাখাল সাপুইএর চণ্ডীমণ্ডপে। দিনগুলো যেন এক-ঘণ্টার মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছি…কবে চুল একটা দু'টো পাকতে সুরু করেছে—টের পাইনি—বাবা মারা গেছে—বাঁধা যজমানের ঘরে ভাত আমাদের বাঁধা। কাপড়ও কিনতে হয় না—চালও অফুরন্ত। অন্ন আর বস্ত্র—দু'টোরই অভাব নেই আজ্ঞে। তাই অভাব কোনও দিন বুঝিনি—

গাজনের মেলায় গিয়ে ঢাকীর কাছ থেকে ঢাক কেড়ে নিয়ে নিজেরা বাজিয়েছি—দুর্গাপুজোর বিসর্জনের সময় মাঝিদের কাছ থেকে দাঁড় কেড়ে নিয়ে নিজেরা নৌকো ভাসিয়েছি—বনভোজন করেছি—কালী-পুজোয় জুয়ো খেলেছি সারারাত—বিজয়া দশমীর দিন সিদ্ধি খেয়ে প্রাণ যায় যায় হয়েছে—ভিনগাঁয়ে গিয়ে যাত্রাগান গেয়ে এসেছি—ধান ক্ষেতের ওপর কই মাছ ধরেছি—দু'মাইল গঙ্গা বাজি রেখে পার হয়েছি—

লোকে আমায় ডাকতো 'পাগলা সন্নেসী' ব'লে—ওই আমার খামখেয়ালীপনার জন্যে; কিন্তু সব গোলমাল সুরু হোল গেল দুর্ভিক্ষে—পঞ্চাশ সনের দুর্ভিক্ষে সব ওলট পালট হ'য়ে গেল। প্রথমে মরতে লাগলো সবাই না খেতে পেয়ে—শেষের দিকে মরতে লাগলো যা'তা' খেয়ে। জীবনে কোনও দিন কিছু করিনি—করবার কিছু ছিল না বলে'; বুড়ো হয়ে এসেছি—এখন আর কী-ই বা করতে পারবো! তবু চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু কাজ আর জুটলো না। গাঁয়ের সব যে যেদিকে পারলো ছিটকে পালাল।

কেষ্টগঞ্জের মাঠে হয়েছিল উড়োজাহাজের আস্তানা। সেইখানে গেলাম। সৈন্যরা সেখানে দলে দলে আসতো যেতো। আমরা গিয়ে তারই চারপাশে আস্তানা করলুম। সৈন্যরা কতরকম খাবার যে সেখানে ফেলে দিতো তা'র ঠিক নেই। ইঁদুরে খাওয়া পাঁউরুটি—কলা—মাছ—মাংস—সব কি খেতে পারে? জাত জন্ম আর রইল না হুজুর—যা' পাই তা' খাই. আমিতো বামুনের ছেলে, হিন্দু বিধবারা পর্যান্ত তাঁদের এঁটো খেয়ে বেঁচে রইল—তা' বেঁচে আর রইল কই—? জাতও গেল প্রাণও গেল। যা'রা সহরে গিয়েছিল প্রথম দিকে—তাদের আবার একদিন লরী বোঝাই করে' পুলিশের দল ধ'রে নিয়ে এল। গাঁয়ে রিলিফ ক্যাম্প হোল, ডাক্তার এল, কম্পাউণ্ডার এল—বিরাট ছাউনি তৈরী হোল—প্রাণের ভয়ে সেইখানে গিয়ে আশ্রয় নিলাম।

গায়ে আমার জোর ছিল বরাবরই—বোধহয় দেখতেও ভাল—কেন জানিনে আমার ওপর ডাক্তার সন্তুষ্ট হোল। ডাক্তার আমায় বিশ্বাস করতে লাগলো। তারপর কত জিনিষ যে এল—কম্বল, ওষুধ, চাল, ডাল, জামা, কাপড়—আর সে কি চুরি—ডাক্তারবাবু—

আমি বললাম—তুমি চুরি করলে?

—আজ্ঞে আমি করবো কেন? যত বড় বড় লোক—ভদ্রলোক—ওখানকার এস-ডি-ও, ডাক্তার-কম্পাউণ্ডার, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান—ফুড কমিটির প্রেসিডেন্ট—কনট্রাক্টার, হিন্দু, মোছলমান, সাহেব কেউ আর বাকী রইল না আজ্ঞে—

—চুরি?

—আজ্ঞে সব চুরি। 'রিলিফ ক্যাম্পের' লোক ওষুধের অভাবে মরে' যায়—শীতে কাপড়ের অভাবে হি হি করে' কাঁপে—বাজরা মিশিয়ে খিচুড়ী খেয়ে খেয়ে লোকের আমাশা হ'য়ে যায়—আর সেই ওষুধ, কম্বল, চাল, চিনি, ময়দা কলকাতায় নিয়ে এসে বেচে দিই—। সব ষড় ছিল আজ্ঞে ভেতরে ভেতরে—সবাই জানতো কিন্তু কেউ কিছু বলতো না। আমার ছোট ভাইটা মর মর—ডাক্তারকে বললাম—একটা ইনজেকশন দাও ডাক্তারবাবু, কিন্তু ডাক্তার বলে—ওষুধ নেই—তা' আমি তো জানি সব। কিন্তু কী করবো, পেটের দায়ে সব সহ্য করতুম। লাভের মধ্যে আমাকে একটু ভাল খেতে দিত—দুধটা পেতাম, কিছু ফল ফুলুরী—ওইটুকুই লাভ।

কিন্তু শেষে ধরা পড়লাম আমি। চারটে ট্রাক বোঝাই ক'রে বড়বাজারে কম্বল আনছিলাম—ধরলে পুলিশে। ডাক্তারবাবু, এস-ডি-ও, সবাই বললে—কেউ নাকি কিছু জানে না। দোষটা আমার ঘাড়েই পড়লো। আমি গরীব লোক—আমার জেল হোল—এক বছর জেল।

আমি বললাম—আর কারু কিছু হোল না?

আজ্ঞে না, আমি গরীব আমারই জেল হোল। কী হাড়ভাঙা খাটুনী খেটেছি জেলে—খাটাতে কখনও অভ্যেস নেই। কিন্তু জেলে গিয়ে শরীরটা আমার ভাল হ'য়ে গেল হুজুর—এক বছর জেল খেটে আজ দু'মাস হোল ছাড়া পেয়েছি। কিন্তু জেল থেকে বেরিয়েই খবর পেয়েছি—আপন বলতে গাঁয়ে আর আমার কেউ নেই—কোথায় আর যাব—তাই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই।… কিন্তু আজ একমাস হোল ওই রিক্সাওয়ালাটা আমার পেছনে পেছনে ঘুরছে…কোথাও গিয়ে শান্তি নেই হুজুর…এখন আপনি আমায় বাঁচান—আমি ওর তিনকুলে কেউ নই—আমার নাম শ্রীপতিতপাবন চক্রবর্ত্তী—জেলখানার খাতায় আমার নাম লেখা আছে আজ্ঞে।

মনে ভাবলাম—তা' বটে। অবিশ্বাস করবার কিছুই তো নেই। রিক্সাওয়ালাটাই পাগল—মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে—লোক চিনতে পারে না।

গিন্নিকেও জিগেস করলাম—তারও তাই মত। জটাধারী পায়ের ধুলো নিয়ে বিদায় নিলে।

বললাম—তুমি যাও—আমি রিক্সাওয়ালাকে বুঝিয়ে বলবো এখন—তোমাকে আর জ্বালাতন করবে না।

জটাধারী আরেকবার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে' চলে' গেল।

বিকেল বেলা পাড়ায় একটা রুগী দেখে ফিরে আসছি। দেখি রিক্সাটা বাইরে রাস্তায় রেখে রিক্সাওয়ালা ঘরের ভেতর বসে' আছে।

বললাম—বোস, আমি হাত মুখ ধুয়ে আসছি।

ঘরে আসতেই রিক্সাওয়ালা বললে—আপনি তা'কে ছেড়ে দিলেন হুজুর—

চেয়ারে বসলাম। বললাম—ও তোমার কাকা-টাকা কেউ নয়—আমি সব ওর মুখে শুনেছি—মিছি মিছি তুমি ওর পেছনে ঘুরছো—আমাকে হাতে পায়ে ধরে' দিব্যি করে' বলে' গেল—ওর নাম পতিতপাবন—

রিক্সাওয়ালার চোখ ছল ছল করে' উঠলো—আপনিও ওর ছলনায় ভুললেন—উনি যে ছলনাময়—আপনি আজ নতুন দেখলেন ওকে—আমি তো কাকাকে ছোট-বেলা থেকে দেখে আসছি—লীলাময়, ওর লীলা বোঝা ভার।

বললাম—তোমার মাথা খারাপ হয়েছে—ও তোমার কাকা হতেই পারে না, ও তো বললে কোনওকালে ও সাধু-সন্নেসী ছিল না, লোকেই কেবল ওকে পাগলা সন্নেসী বলে' ডাকতো। সারা জীবন শুধু তাস খেলে—ঘুমিয়ে আড্ডা দিয়ে কাটিয়েছে—

রিক্সাওয়ালা বললে—ঠিকই বলেছে—আমরা তো কাকাকে কিছুই করতে দেখিনি—কেবল দিনরাত চণ্ডীমণ্ডপে বসে' তাস, দাবা, সন্ধোবেলা যাত্রাগান, দুর্গা-পুজোয় নৌকো বাচ খেলা, কালী পুজোয় ঢাক বাজান—ধানের ক্ষেতে কই মাছ ধরা—এই সব করে' বেড়াতো, বাড়ীর একটা কোনও কাজ করতো না—কিন্তু—

আমি বললাম—ও বললে 'রিলিফ ক্যাম্পে' থাকতে নাকি কম্বল চুরির অপরাধে—

রিক্সাওয়ালা আমার কথা লুফে নিয়ে বললে—কম্বল চুরির অপরাধে জেল হোল—এই তো? কাকা ঠিকই বলেছে—জেল কাকার হয়েছিল। কিন্তু সে ক'দিন? পুলিশের মতিচ্ছন্ন হয়েছিল—তাই কাকাকে ধরেছিল। কাকার এক বছর জেলের হুকুম হোল—তা' পুলিশের লোক, ওরা ঠাকুর

দেবতার মহিমে কী বুঝবে বলুন—তিন রাত্তির না যেতেই ছেড়ে দিতে হোল কাকাকে—

বললাম—কেন?

—কেন আর, কাকার খুব রাগ হয়েছিল—দারোগাকে বলেছিল—দেখে নেব। তারপর দু'রাত জেলে কাটাবার পরই জেলখানার সাহেবের একমাত্র ছেলে একদিন জ্বরে ভুগেই মারা গেল। গোবিন্দ মহারাজের মাহাত্ম্য তো জানতো না তারা—আর হাকিমের হোল জ্বর—পালা জ্বর আজ্ঞে—পালা করে আসে আর পালা করে ছাড়ে—শেষে তিন দিনের দিন কাকাকে ছেড়ে গাড়ী ক'রে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গেল—তবে নিশ্চিন্তি। তারপর ধরলে আমাদের গাঁয়ের ছিধর সামন্তকে—ছিধর সামন্ত ছিল আপনার গিয়ে ফুড কমিটির প্রেসিডেন্—তা' কাকা চুরি করতে যাবে কেন বলুন—ভগবানের কৃপা যাঁর ওপর হয়েছিল তাঁকে আর চুরি করতে হয় কখনও—

মহা সমস্যায় পড়লাম। এখন কা'র কথা বিশ্বাস করি!

রিক্সাওয়ালা বললে—দেবতার কৃপা কেমন ক'রে হোল শুনুন—কাকা তো বিয়ে থা করেনি—আমরাই ছিলাম তা'র সব—দিনরাত কেবল আড্ডা দিয়েই কাটতো। হঠাৎ একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে কাকা বললে—ঠাকুর স্বপ্ন দিয়েছে, মাটির তলায় বাঁধা পড়ে' আছেন—তাঁকে মুক্ত করতে হবে—মাটির তলায় তাঁর নাকি নিঃশ্বেস বন্ধ হ'য়ে আসছে—অন্ধকার থেকে বের করে' আনতে হবে—এনে তাঁর মন্দির প্রতিষ্ঠে করতে হবে—তাঁকে পুজো দিতে হবে—না খেয়ে ঠাকুর শুকিয়ে আছেন—

গাঁয়ের লোক শুনে তো চমকে উঠলো! কথাটা ছড়িয়ে গেল অনেক দূর। কাকা বাড়ী থেকে আর সেদিন বেরুল না। লোকজন এসে কাকাকে জিগ্যেস করেন—কোথায় আছেন ঠাকুর।

অনেক পীড়াপীড়ির পর কাকা বললে—রায়চৌধুরী বাড়ীর ভিটেয়।

রায়চৌধুরীরা আমাদের গাঁয়ের বড় পুরুষের জমীদার। কথাটা বড়বাবুর কানেও গেল। একদিন তিনিও এলেন আমাদের বাড়ীতে—কোথায় আছেন ঠাকুর—দেখিয়ে দাও—

কাকা বললে—এখন নয়—অমাবস্যের রাতে যাগ করতে হবে—তখন বার করতে হবে—

অমাবস্যের রাত এল। সারা গাঁয়ের লোক এসে একেবারে ভীড় ক'রে ফেললে বাবুদের বাড়ীতে। কাকা যাগ হোম পুজো করতে লাগলো। কাঁসর ঘণ্টা বাজতে লাগলো তারপর রাত তখন দু'টোর সময় কাকা বললে—এইখানে ঠাকুর আছেন—মেঝে খুঁড়তে হবে—

বলে' যে-জায়গাটা কাকা দেখিয়ে দিলে, সেখানে বড়বাবুর মা-ঠাকরুণ পা রেখে শুতো! ভয়ে তো মা-ঠাকরুণের হৃদ্‌কম্প হতে লাগলো। বললেন—কত পাপ করেছি গোবিন্দ মহারাজ—আমার কী হবে?

সেই রাতেই মেঝে খোঁড়া হোল। এক রাত দু'হাত করে' দশ হাত খুঁড়ে তখন বেরুল—বিগ্রহ—রাজরাজেশ্বর বিগ্রহ! লোকের সে কী ভীড়! শাঁখ বেজে উঠলো—কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠলো—সমস্ত রাত আর কারু ঘুম হোল না।

তার পরদিন থেকে কাকার সে এক অদ্ভুত মূর্ত্তি। অত কথা বলতো—আর কথা বলে না, চোখ প্রায় বুঁজে থাকে। আর সে কী ভীড়—তিন গাঁ থেকে, তিন দেশ থেকে লোক আসে দেখতে। কত রকম সিদে নিয়ে আসে—চাল, ডাল, ফল ফুলুরী, টাকা পয়সা—সে এক কাণ্ড আজ্ঞে। কেউ বলে—ছেলে পাগল হয়েছে, সারাতে হবে—বৌ মর মর, সারিয়ে দাও—ছেলে হ'য়ে বাঁচে না, বাঁচিয়ে দাও—বাঁজা বউএর ছেলে দাও কোলে, চাকরী হয় না চাকরী করে' দাও, মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না বিয়ে দিয়ে দাও···অবস্থা আমাদের ফিরে গেল হুজুর। আমরা খেয়ে বাঁচলুম, কাপড় পরে' বাঁচলুম—কাকার দৌলতে সুখের মুখ দেখলুম—দেশ দেশান্তরে নাম ছড়িয়ে গেল কাকার—

কিন্তু সব্বনাশ হোল আপনার পঞ্চাশ সনের দুভিক্ষ এসে। সে আপনাকে কী বলবো হুজুর—কলকাতায় আপনারা থাকেন—কী আর দেখেছেন—এই কলকাতা ছিল বলেই তবু এখনও রিক্সা টেনে বেঁচে আছি, পেটটা কোনরকমে চালাচ্ছি—! যে-দুঃখে আমরা ছিলাম—

সেই দুভিক্ষে রোগ আর মড়ক এমন বেড়ে গেল হুজুর—! প্রথমে সব না খেয়ে মরতে লাগলো—শেষে সব বাড়ী বাড়ী মরতে লাগলো—সবাই এসে গোবিন্দ মহারাজের কাছে ধন্না দেয়—রাজরাজেশ্বরকে পুজো দেয়—শেষে আর পুজোই বা কে দেয়—নৈবেদ্যের চালই জোগাড় হয় না; কাকা ওষুধ দেয়—রোগ আর সারে না—কাকার ওষুধে আর কোনও ফল হয় না। কাকা বললে—দেবতার কোপ হয়েছে—পুজো চায়—! পুজো কে দেবে? বড়বাবুরা দেশ ছেড়ে পশ্চিমে চলে' গেছে—দেশে লোকজন নেই—দেখতে দেখতে দেশ একেবারে খাঁ খাঁ করতে লাগলো—

আবার সেই অভাব! কেউ সিদে দেয় না—ভোগ দেয় না—আমরাও উপোস করি। কাকাও খেতে পায় না—তারপর কাকা একদিন নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেল। কত খুঁজি—কোথাও পাওয়া গেল না। আমার ভাই বোন সব মরে' ঝরে' গেল—মা গিয়েছিল আগের বছরে—হাঁটতে হাঁটতে কলকাতায় চলে এলাম—

এবার দেশে গিয়েছিলাম। দেখি বড়বাবুরা ফিরে এসেছে। গাঁয়ে আস্তে আস্তে আবার একটা দু'টো করে লোক ফিরে আসছে; বড়বাবুর মা-ঠাকরুণ এক মস্ত মন্দির প্রতিষ্ঠে করবেন বললেন—রাজরাজেশ্বরের! বউরাণীর ছেলে ছিল না—গোবিন্দ মহারাজ নাকি কী ওষুধ দিয়েছিল—তাইতে নাকি এবার পুজোর সময় তা'র কোলে ছেলে এসেছে···দেশে দেশে লোক গিয়েছে কাকাকে খুঁজতে; মন্দির ক'রে কাকাকে নাকি আবার সেখানে আনবেন—

তা' এতদিন ধরে' আমিও খুঁজছিলাম আজ্ঞে—শেষে এখন দেখা পেয়েছি—কিন্তু ধরতে আর পারিনে। কাকাকে যদি নিয়ে যেতে পারি—তবে আবার খেতে পাবো! সে এক মস্ত বড় মন্দির হবে—সদাব্রত হবে—নিত্যসেবা হবে—একটা গাঁ-ই নাকি রাজরাজেশ্বরের নামে দেবোত্তর করেদেবেন বউঠাকরুণ—গোবিন্দ মহারাজকে খুব ভক্তি করেন কি না—

আমি বললাম—কিন্তু তোমার কাকা এ নয়—এ আমার হাতে পায়ে ছুঁয়ে দিব্যি করে' বললে—ওর নাম পতিতপাবন।

রিক্সাওয়ালা উঠলো। বললে—ও আমার কাকা না হ'য়ে যায় না, আমার কাকাকে আমি চিনিনে?—তা' আবার আমি বার করবো ওকে দেখে নেবেন—আমি তো আজ্ঞে সব জায়গাতেই ঘুরি—

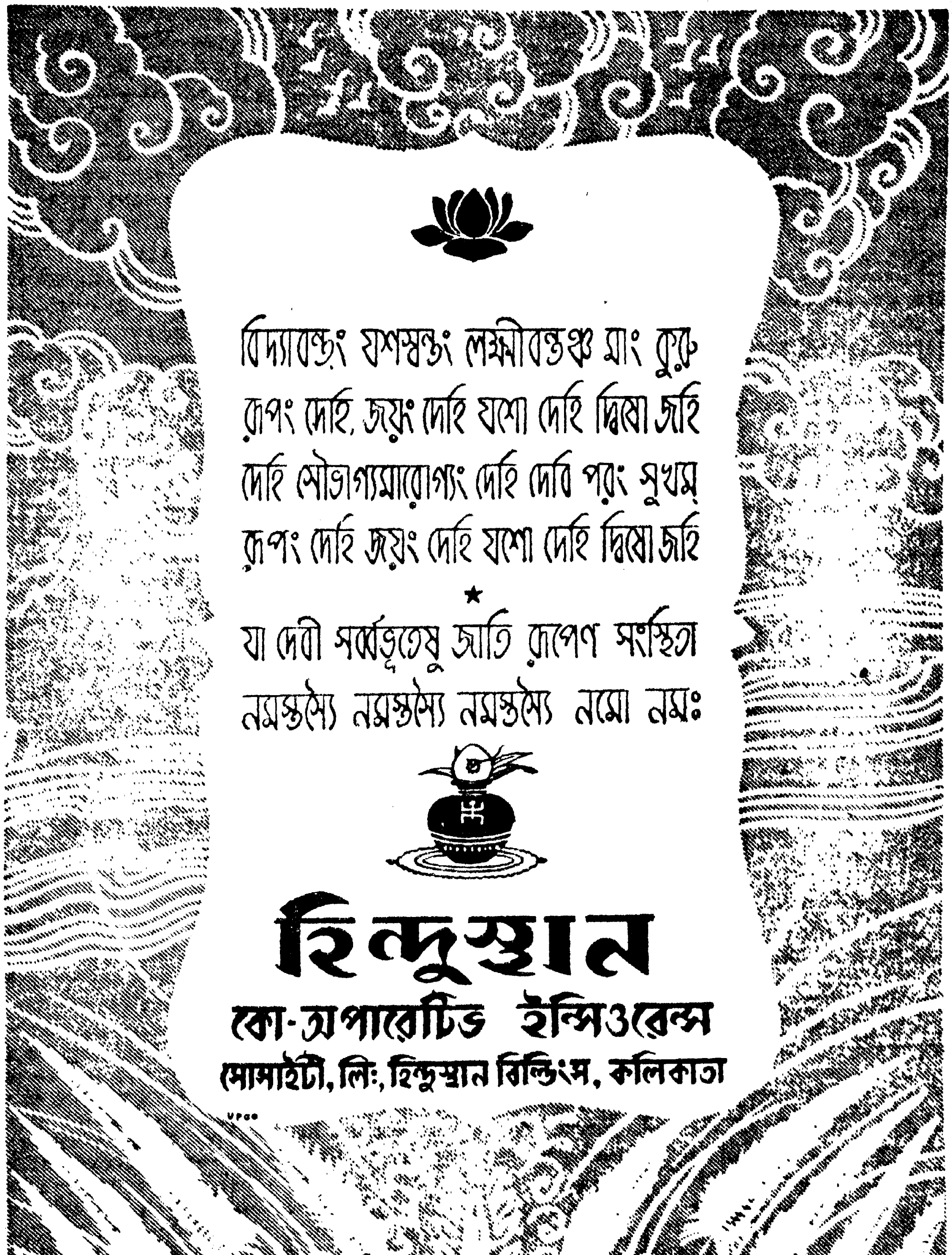
চলে গেল রিক্সাওয়ালা।

বহুদিন আর ওদের দেখা পাইনি। একদিন শুধু দেখেছিলাম একটুখানি আবার ওদের দু'জনকেই এক সঙ্গে। শ্যামবাজারে ট্রামে চড়ে' যাচ্ছি—হঠাৎ দেখি সেই রিক্সাওয়ালা রিক্সা টানছে আর রিক্সায় চেপে বসে' আছে এক মুখ দাড়ি গোঁফ নিয়ে জটাধারী! এক মিনিটের দেখা—কিন্তু চিনতে পারলাম। অবাকও হলাম কম নয়! অবাক হবারই কথা!

কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার দেখা হোল অনেকক্ষণ ধরে'! এক ট্রেনের কামরায়। আড়বেলে যাচ্ছিলাম গিন্নীকে নিয়ে। শ্যামবাজার থেকে ছোট লাইনের গাড়ী ছেড়েছে। ভীড়ের ঠেলায় অস্থির হ'য়ে যে-যেখানে পেরেছে উঠেছে; থার্ড ক্লাশের লম্বা কামরা। বাইরে-ভেতরে লোকে লোকারণ্য! হঠাৎ গিন্নী বললেন—তোমার জটাধারী নয়? দেখলাম একেবারে কামরার শেষ প্রান্তে জটাধারীই বটে—আর পাশেই সেই রিক্সাওয়ালা! জটাধারীর পোষাক পরিচ্ছদের অঙ্গে খুব বাহার! গেরুয়ার আলখাল্লা—গলায় রুদ্রাক্ষ, আরও কত রকম মালা—কপালে লম্বা করে' একটা সিঁদুরের টিপ—মাথায় জটার বাহার—মুখে গোঁফ দাড়ি—কপালে যেন ছাই মাখা, হাতে চিমটে আর লম্বা ত্রিশূল! হঠাৎ ট্রেনের কামরায় ওই বেশে রিক্সাওয়ালার পাশে জটাধারীকে দেখে আরও বিস্মিত হলাম।

লোকের ভীড়ে ডাকতেও পারলাম না, কাছে যেতেও পারলাম না।

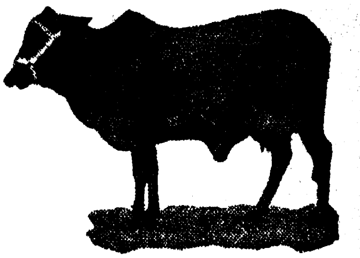
[ইহার পর ১৯৯ পৃষ্ঠায়]



বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং লক্ষ্মীবন্তঞ্চ মাং কুরু
রূপং দেহি, জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি
দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখম্
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতি রূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ
হিন্দুস্থান
কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স
সোসাইটী, লিঃ, হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

দুধের কথা

শ্রীপরিতোষকুমার চন্দ্র



পাঞ্জাবের মণ্টগোমারী জাতীয় গরু

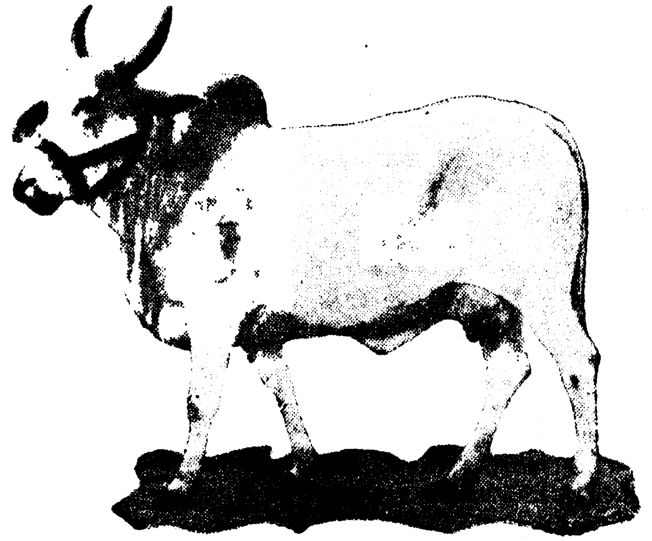
ছেলেবেলাতে প্রায়ই শুনতাম এবং এখনও সেকেলে বুড়ো বুড়িদের মুখে মাঝে মাঝে শুনতে পাই যে, পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পাপের বিচার সেই জন্মেই শেষ না হোলে তারই জের হিসাবে মানুষ পরজন্মে নানা রকম রোগে ভোগে। কোনও শাস্ত্রে এই বিষয়ে কোন উল্লেখ আছে কি না, বা থাকলেও তা কি, সে সম্বন্ধে আমার কোনই জ্ঞান নেই। তবে বর্ত্তমানকালের চিকিৎসাবিজ্ঞানের মানদণ্ডে এই উক্তির সত্যাসত্য সম্বন্ধে বিচার করলে দেখা যাবে যে, এর কোন মূল্যই নেই, কারণ, এই বিজ্ঞান দেখিয়ে দিয়েছে যে জীবের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই নানা কারণে নানাবিধ রোগ জীবদেহেতেই জন্মাতে শুরু করে। এমন কি খুব অল্প দু'একটি বিশিষ্ট রোগ ছাড়া কোন জীবশিশুই মাতৃগর্ভ হ'তেও রোগ নিয়ে জন্মায় না। বরঞ্চ দেখা যায় যে, সুস্থ ও সবল জননীর স্তনদুগ্ধে এমন কতকগুলি বিশিষ্ট উপাদান থাকে যা পান করার ফলে জীবশিশুর শৈশবাবস্থায় অধিকাংশ সংক্রামক রোগের প্রতিষেধকের কাজ করে, আর এই স্তনদুগ্ধ-পান বন্ধ হবার পর থেকেই তাদের দেহ সংক্রমণপ্রবণ হয়।

এ সত্ত্বেও কেউ যদি আজীবন কিছুটা ক'রে খাঁটি দুধ খেয়ে যায় তবে তার শরীরের যে পরিমাণে বৃদ্ধি ঘটে, সে যে পরিমাণে স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভ করে এবং তার রোগ প্রতিরোধ করবার এমন একটা বিশেষ ক্ষমতা জন্মায় যা অন্য কারো পক্ষে,—অর্থাৎ যারা দুধ খায়ই না, তাদের পক্ষে—সম্ভবপর হয় না। এতে হয়তো কথা উঠতে পারে যে, এমন লোক অনেক আছে যারা স্তন্যত্যাগ করার পর থেকে জীবনে মোটেই দুধ খায়নি, অথচ তারা আজীবন-দুধ-খাওয়া-লোকের চেয়ে অনেক বেশী স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী। এর উত্তরে বলা যায় যে, যে সব লোক দুধ খায়নি তারা যদি বরাবরই দুধ খেয়ে যেতো তবে তারা আরো স্বাস্থ্যবান ও আরো বেশী শক্তিশালী হোতো,—আর যারা দুধ খাওয়া সত্ত্বেও এদের থেকে নিকৃষ্ট, তারা যদি এই ভাবে দুধ খাওয়ার অভ্যাস না রাখতো তাহলে তারা যতদিন বাঁচতো ততদিন চিররুগ্ন হয়ে দিন কাটাতো, অথবা যতদিন বেঁচে আছে ততদিন হয়তো বাঁচতো না; কারণ, পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে দুধের স্থান অন্যান্য খাদ্যের তুলনায় অনেক ওপরে। একক খাদ্য হিসাবে দুধই একমাত্র খাদ্য যাতে শরীরের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদানগুলি যথোপযুক্ত মাত্রায় বর্ত্তমান এবং সে সব এমন এক বিশেষ অবস্থায় থাকে যাতে ক'রে দেহ তার প্রয়োজন অনুযায়ী এবং খুব সহজেই তা গ্রহণ করতে পারে। শরীরের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে সব খাদ্যপ্রাণ (Vitamins) ও ক্যালসিয়ামের (Calcium) কথা আজকাল প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় (আজকালকার ডাক্তাররা প্রায় কথায় কথায় এই দু'টি ব্যবহার করতে রোগীদের উপদেশ দিয়ে থাকেন), তা এই দুধে প্রচুর মাত্রায় পাওয়া যায় এবং দেহ সেগুলির,—বিশেষ ক'রে ক্যালসিয়ামের, সবটুকুই পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে।

শিশুদের পক্ষে দুধই যে একমাত্র খাদ্য তা হয়তো না বললেও চলে। এই দুধ খেয়েই প্রথমতঃ তারা বেঁচে থাকে, তারপর এর দ্বারাই তাদের দেহের গঠনকার্য্য সম্পাদিত হয়, ওজন ও বল বৃদ্ধি পায়, তাদের মস্তিষ্কের পরিপূর্ণতা ঘটে এবং তারা বড় হয়ে ভবিষ্যতে নিজেদের মানুষ বলে পরিচয় দিতে পারে। বিদ্যানুরাগী ছাত্রদের পক্ষেও এই দুধ অপরিহার্য্য। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এবং আমাদের এই ভারতবর্ষেও কোন কোন প্রদেশে, বিদ্যালয়ের কয়েকটি ক'রে ছাত্রকে কিছু কাল ধ'রে পরীক্ষামূলকভাবে নিয়মমত দুধ খাইয়ে দেখা গেছে যে, অন্য ছাত্রদের তুলনায় তাদের ওজন ও উচ্চতা অনেক বেশী হয়েছিল এবং তাদের স্মৃতিশক্তিরও প্রখরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাছাড়া এও দেখা গেছে যে, যে সব ছাত্ররা মোটামুটি সাধারণ খাদ্য খেতো তাদের তুলনায় দুগ্ধপুষ্ট ছাত্রদের ভেতর রোগের প্রাদুর্ভাব খুব কম এবং মৃত্যুহারও সেই পরিমাণে খুবই অল্প ছিল। এই সব কারণে দুধ যে শিশু ও ছাত্রদের পক্ষে একরূপ 'আদর্শ খাদ্য' এ কথা বললে অত্যুক্তি করা হয় না।

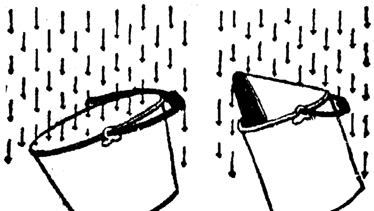
এইখানে একটা কথার উল্লেখ প্রয়োজন। জনসাধারণের মধ্যে অধিকাংশের ধারণা যে, মাখন তোলা দুধের কোনই গুণ নেই। এটা ভুল ধারণা। দুধ যদি যথার্থই খাঁটি হয় তবে তা থেকে মাখন তুলে নিলেও যা থাকে খাদ্য হিসাবে তার দামও নেহাৎ কম নয়; কারণ তাতে একমাত্র স্নেহজাতীয় পদার্থ ছাড়া অন্য সব উপাদানগুলিই পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান থাকে, উপরন্তু এই দুধে স্নেহজাতীয় পদার্থ না থাকাতে আরো সহজপাচ্য হয় এবং সেইজন্য যাদের খাঁটি দুধ সহ্য হয় না অথবা যাদের দেহ মেদবহুল, বিশেষ ক'রে তাদের পক্ষে এই দুধই উপযুক্ত।

বর্ত্তমান যুদ্ধপরিস্থিতির জন্য অন্যান্য নানা কারণে ভারতের প্রত্যেকটি নগর ও সহরে, বিশেষ ক'রে কলিকাতায় লোকসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে, অথচ সেই সব স্থানে লোকসংখ্যার অনুপাতে দুধের পরিমাণের কোনই বৃদ্ধি হয়নি, বরঞ্চ যুদ্ধকালীন নানাবিধ চাহিদা মেটাতে অত্যধিক সংখ্যায় গবাদি পশু হত্যার জন্য দুধের পরিমাণ কমেই গেছে।



সিন্ধু প্রদেশের থারপার্কার জাতীয় গরু

ফলে 'দিও কিঞ্চিৎ—কোরো না বঞ্চিত' কথাটাকে যেন ষোল আনা ভাবে কার্য্যকরী করবার প্রয়াসে ঐ সামান্য পরিমাণ দুধকেই নানা উপায়ে বাড়িয়ে এবং যুদ্ধপূর্ব্বকালের দামের চেয়ে অনেক বেশী দামে, লোকের চাহিদা মেটানো হচ্ছে। জনসাধারণের অধিকাংশই দুধের নামে যে কি পাচ্ছে তা ভেবে দেখছে না বলেই নিঃসন্দেহে ধরে নেওয়া যেতে পারে ; কারণ, তারা যদি সত্য সত্যই তা ভাবতো তাহলে এত বেশী দাম দিয়ে দুধ-নাম-ধারী এই অদ্ভুত জলীয় পদার্থ কিনে পয়সা জলে ফেলতো না ও নিজেদের স্বাস্থ্যহানি করতো না। এই দুধ স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী তো নয়ই, উপরন্তু এটা না খেলে যে সব রোগ হবার সম্ভাবনা হোতো না, এই দুধ খাওয়াতে সে সব রোগের



কিভাবে ধুলা নিবারণ করা যায়

সম্ভাবনা হচ্ছে এবং তার চিকিৎসা বাবদ পুনশ্চ অর্থহানি ঘটছে।

দুধে যে পরিমাণে এবং যেরূপ বেমালুম ভাবে ভেজাল মেশানো যায়, এমন বোধহয় আর অন্য কোন জিনিষেই পারা যায় না। তাই দুধ হাজার পরিষ্কার বা খাঁটি দেখতে হোক না কেন, সেটা খাঁটি কি না তা দুধ দোওয়া থেকে খাওয়া পর্য্যন্ত আগাগোড়া সব অবস্থাটাই যে দেখেছে একমাত্র তার প্রমাণ ছাড়া আর অন্য কোন প্রমাণই গ্রহণযোগ্য বা বিশ্বাসযোগ্য নয়। দুধ ভেজাল করতে গোয়ালারা সাধারণতঃ যা ক'রে থাকে তা এই :—

(১) দুধ থেকে মাখন তুলে নেয়।
(২) দুধে জল মিশিয়ে পরিমাণ বাড়ায়।
(৩) উপরোক্ত দু'টি প্রক্রিয়াই করে।

উপরোক্ত তিনটি কারণের জন্য দুধে স্নেহ-জাতীয় পদার্থের মাত্রা কমে যায় বা একেবারেই থাকে না।

(৪) উপরোক্ত কারণগুলির জন্য দুধ পাৎলা হয়ে যায়, তাই তার গাঢ়ত্ব বা ঘনত্ব ফিরিয়ে আনবার জন্য দুধে তারা চালের গুঁড়ো, ময়দা, পালো বা শটি, চিনি, বাবলা বা গঁদের আঠা প্রভৃতি মেশায়। এ সবের জন্য দুধ গুরুপাক বা দুষ্পাচ্য হয় এবং অনেক দিন ধ'রে খেয়ে গেলে পেটের নানা রকম গোলমাল হতে আরম্ভ করে।

(৫) দুধ পাৎলা হোলে তার রঙও ফিকে মেরে যায় ও তার মিষ্টতা কমে যায়। এর প্রতিকারের জন্য তারা দুধে গুড়ের বাতাসা গুলে দেয়। এটা অবশ্য তত মারাত্মক নয়।

(৬) অনেক দূরের গ্রাহকদের বাড়ী দুধ পৌঁছাতে অনেকখানি সময় লাগে। এতে যা দেরী হয় তার জন্য ঋতুবিশেষে দুধ নষ্ট হয়ে যায়। এর প্রতিকারকল্পে তারা দুধ জ্বাল দেয় বা নানা প্রকার রাসায়নিক পদার্থ মেশায়। দুধ আগেই জ্বাল দেওয়া হয়েছে কি না গ্রাহকরা তা জানতে পারে না,—সময় মত তারাও সেই দুধ জ্বাল দেয়, ফলে বারবার জ্বাল দেওয়ার জন্য দুধের খাদ্যগুণ নষ্ট হয়ে যায়। আর যে সব রাসায়নিক পদার্থ মেশায়, তাতেও অনেক ক্ষেত্রে দুধের খাদ্যগুণ নষ্ট হয়ে যায়, অথবা সরাসরিভাবে শরীরের ক্ষতি করে।

আরো কয়েকটি কারণে দুধে খাদ্যগুণ থাকে না। এর মধ্যে একটি হচ্ছে ভগ্নস্বাস্থ্য, রুগ্ন, অনুপযুক্ত-খাদ্য-পুষ্ট বা অল্পাহারী গরুর দুধ। আর একটি হচ্ছে অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া দ্বারা দোওয়া দুধ,—যথা, ফুকা দিয়ে দোওয়া দুধ এবং সারাদিন বা সারারাত গরুকে তৃষ্ণার্ত্ত রেখে দুবেলা দোওয়ার কিছু পূর্ব্বে আকণ্ঠ জল খাইয়ে দোওয়া দুধ। এ দু'টি ছাড়া আর যে সব অস্বাভাবিক প্রক্রিয়াতে দুধ দোওয়া হয়, সেগুলি খুব সচরাচর ঘটে না বলে এখানে তার উল্লেখ করা হোলো না।

এই বাঙ্গলা দেশে স্বাস্থ্যবতী বা নীরোগ গরু প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় না। এদের দুধ স্বাভাবিক অবস্থাতেই নিকৃষ্ট। এই দুধে আবার ভেজাল মেশানোর অপচেষ্টা অসংযতভাবেই বেড়ে যাচ্ছে এবং এর জন্য সেই দুধের দুধত্ব কতখানি থাকছে তা একমাত্র জগদীশ্বরই জানছেন। এ সবের ওপর যদি অসাবধানতা, অপরিচ্ছন্নতা বা অন্যান্য কারণে সেই দুধ নানা জাতীয় রোগোৎপাদক জীবাণুদ্বারা দূষিত হয়ে যায় তবে তা খেলে অবস্থাটা যে কি দাঁড়াবে তা বোধ হয় আজকালকার দিনে কাউকেই বুঝিয়ে বলতে হবে না ; কারণ প্রগতিশীল



পাঞ্জাবের হরিয়ানা জাতীয় গরু

চিকিৎসাবিজ্ঞানের কৃপায় ক্রমেই জানা যাচ্ছে যে, জীবদেহের অধিকাংশ রোগেরই উৎস হচ্ছে এই জীবাণু। বিশিষ্ট কয়েকটি রোগের জীবাণু ছাড়া অধিকাংশ জীবাণু সর্ব্ব অবস্থাতেই জীবদেহ আশ্রয় ক'রে রোগ সৃষ্টি করতে পারে না। যে সব দেহ আগে থেকেই নানা কারণে দুর্ব্বল বা নির্জীব (ভেজাল দুধ ও ভেজাল খাদ্য একটি বিশেষ কারণ), সেই সব দেহেই এই সব শ্রেণীর জীবাণুর রোগ সৃষ্টি করবার ক্ষমতা দেখা যায়। এদের অধিকাংশই কোন না কোন কিছুর মারফত একস্থান হতে আর একস্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং এইভাবে সুস্থ এলাকার মানুষ বা অন্যান্য জীবের দেহে সংক্রামিত হয়। যে সব জিনিষের মারফত জীবাণু চলাফেরা করে বা করতে পারে তা মোটামুটি এই :—

(১) দুধ, (২) জল, (৩) ধুলা, (৪) রোগীর মল, মূত্র, কফ, বমি প্রভৃতি, (৫) রোগীর ব্যবহৃত জামা, কাপড়, বিছানার চাদর প্রভৃতি এবং (৬) মাছি, পিঁপড়ে, আরশুলা প্রভৃতি পতঙ্গ। এ সব ছাড়াও রোগীর সংস্পর্শে যারা আসে, তারা যদি

[ইহার পর ১৮৯ পৃষ্ঠায়]



নাগোরী জাতীয় গরু



আনবিক বোমার ঘায়ে..
আণবিক বোমার
ঘায়ে জাপানের শিল্পশক্তি লুপ্ত হয়েছে, আর সেখান থেকে সুন্দর ও নূতন ধরণের গেঞ্জী আস্‌বে না।
যুদ্ধান্তে এরজন্য আপনি অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু আপনি হতাশ হবেন না।
ডাক হোয়াইটের শক্তি ক্রমবর্দ্ধিত হইতেছে
নূতন পরিকল্পনার সাহায্যে আমরা আপনাদের সম্মুখে "Duckwhite" উপস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছি
ডাকহোয়াইট
গাত্রের সুখাবরণ
ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ কর্পোরেশন অফ্ বেঙ্গল লিমিটেড
৬০/১ হাজরা রোড, বালীগঞ্জ
ডাক হোয়াইট আপনার সৌখীন পছন্দ মিটাইবে

সত্তর বৎসর পূর্ব্বেকার শারদীয়া সংখ্যা

[১৭০ পৃষ্ঠার পর]

মাতাল নিধিরাম বাবুর বাড়ীতে দুর্গোৎসব পূজার আয়োজন যতটা না হউক, মদ্য মাংসের আয়োজন অত্যধিক। "ছুটির সুলভ" 'নিধিরাম বাবুর কি নিষ্ঠা' নিবন্ধে ইহার বর্ণনা করিতেছেন:

নিধিরাম বাবু সহরের একজন নামদার লোক, কিন্তু ডাকসাইটে মাতাল। এবার মায়ের পূজা হইবে বলিয়া দেশশুদ্ধ রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। অথচ প্রতিমাদির কোন আয়োজন নাই। এদিকে সামিয়ানা উঠিয়াছে, ঢুলিরা ডাক ডাকদিন বাজাইতেছে, মা কৈ, মা কৈ বলিয়া পাড়ার মেয়েরা সব দেখিতে আসিতেছে। কিন্তু সব ফক্কিকা। নিধিরাম চতুর্থীর দিনে প্রকাণ্ড দুই মদের পিপে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। আর যতরকম ভাল ভাল বিলিতী মদ আছে, হরেক রকম ও নানা রঙ্গের আনাইয়া পূজার দালান সাজাইলেন। দেখতে মন্দ নয়। মদের জার ঘট করিয়া তাহার উপর ঝলসান গরুর একটি মুড়ো রাখিয়া দিলেন। কতকগুলি লাল জবা ফুলের মালা দিয়া তাহা ঢাকিলেন। চারিদিকে নৈবেদ্যের কি ঘটা, কাউল কারি মটন চপ পচা পোকা পড়া শুয়োরের মাংস ডিসের উপর কেমন বিরাজমান। পুরুত ঠাকুর কোশাকুশীতে মদ ঢালিয়া দিয়া অগ্রে আচমন করিতে বলিলেন ইয়ারের দলও ক্রমে উপস্থিত হইতে লাগিল লাল চেলির কাপড় পরিয়া কপালে এক রক্ত চন্দনের ফোটা কাটিয়া বাবু পূজাতে বসিলেন। তাঁর গুরু ঠাকুর ও পুরুত ঠাকুর এয়ারের দলে ছিলেন। সকলে আচ্ছা রকমে দুচার গেলাস টানিয়াছেন। বাড়ীর ঢুলিগুলো মদে ভর হইয়া আর ঢোল বাজাইতে পারিতেছে না সব ঢ্যাব ঢ্যাব করিতে লাগিল। নিধিরাম বাবুর কেমন সক হইল। কৈ বাবা পুরুত ঠাকুর চণ্ডী পড় ?

পুরুত। আজ্ঞে হাঁ এই পড়ি আর কি

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।
যা দেবী ভদ্রলোকেষু বোতলরূপেন
সমস্থিতা।

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।
যা দেবী ভদ্রলোকেষু খানারূপেন সমস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।
যা দেবী ভদ্রলোকেষু জন্তুরূপেন সমস্থিতা।
অথদেবী মাহাত্ম্য বর্ণনং নাম দশমোধ্যায়।

স্তব।

গৌরাঙ্গা রক্তবর্ণা ভগবতী মাংস পাচিকা
তেজস্বিনী ভীমরূপা দুর্গন্ধ জলরূপিনী
শিক্ষিতানাং প্রিয়তমা শুণ্ডিকালয়শোভিনী
যকৃৎ পরিবর্দ্ধিনীচৈব জাতিভেদ বিনাশিনী
যে ভজন্তি তব পদং ছুছুন্দর সমাং গতিং
দিনে দিনে প্রাপ্ত বন্তি নরকে যান্তি তে নরাঃ।

বাড়ীর ভোলা চাকরটা কেবল বিয়াছিল। মায়ের বলি না হইলে কি পূজা হয় ? বাবুরা তাহাকেই ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন, সে ত কোনরূপে অব্যাহতি পাইল।…"

পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসীদের মধ্যে কথাবার্ত্তায় অনেক প্রভেদ। ইহার একটি চমৎকার নমুনা 'কেবল দীর্ঘ ইকারের প্রভেদ' এ দেওয়া হইয়াছে:

"রাস্তার মধ্যে দুইজনে ভয়ানক ঝগড়া। একজন বাঙ্গাল আর একজন বাঙ্গালী। একজন মহা রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল,—

"তুই যে বড় আমাকে হালা বললি ? হালা কিরে ? ব্যাকরণের ভুল ! শালা বললিনে কেন ? গালাগালি দিশ তো শুদ্ধ বাঙ্গলায় গালি দিশ। তুই ব্যাটা বাঙ্গালের মতন হালা হালা করিস নে।

"ইস কি পণ্ডিত হইচেন ! ব্যাটা বলেন ক্যান ? মুগ্ধবোধ ব্যাটা কইসে ? ওরে হালা, কোন্ শাস্ত্রে ব্যাটা লেকসে বোলতো। বেটা বল। বয়ে দিল একার, ব্যা হইল ক্যামনে ? মুক্ষু বাঙ্গালী তুই আবার পণ্ডিত হইতে চাস, তোর বাতন কত, কোন্ স্থানে থাকিস্ ? হালা বড় পণ্ডিত হইছেন !

"হা হা হা হা ! ব্যাতন, ব্যাতন দ্যাশ দ্যাশ ! ওরে হাসিয়ে মারলে রে। ঘাট হয়েচে। ও ভাই ব্যাতন ! নমস্কার। বাঙ্গাল আর বাঙ্গালীতে আমি মনে করিয়াছিলাম কেবল ঈকারের প্রভেদ। এখন দেখচি তা নয়। ঢের প্রভেদ।"

পরবর্ত্তী ২রা কার্ত্তিকের (১৮ই অক্টোবর, ১৮৭৯) "সুলভে" "ছুটির সুলভের" জের টানা হয়। ইহাতে 'পেটুক ব্রাহ্মণ' সম্বন্ধে একটি ব্যঙ্গ চিত্র ও রচনা আছে। এইটি উদ্ধৃত করিয়া অগুবার প্রসঙ্গ শেষ করিব:

"নৃত্যন্তি ভোজনে বিপ্রাঃ ময়ূরা মেঘদর্শনে। ময়ূরগুলো যেমন মেঘ দেখিলে নাচিয়া উঠে, ফলারে বামনগুলি সেইরূপ আহারের কথা শুনিলে আনন্দে নাচিয়া থাকে। নসি রাম ভাঙ্গী ভারী পেটুক, একে বৈদিক তাতে দয়েহাটায় ঘুরিয়া বেড়ায়। ঐ দেখনা পূজাবাড়ীতে হাবড়ে পড়ে পাতাখুবড়ে খাচ্চে ও দই ! এদিকে এস, এই বলিয়া হাঁড়ি হাঁড়ি দই খাইতেছে, চোয়াল বয়ে একেবারে গড়িয়ে পড়িতেছে। হাঁ করিয়া সন্দেশ গিলিতেছে ও কোঁচড়ে বাঁধিতেছে। দাঁতগুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে, পাত ছেড়ে উঠিতে চায় না, খেয়ে ভারি ফুর্ত্তি, হু হু করিয়া গান গাইতেছে।

বাউলে সুর।

আহার বিনা কি সুখ আছে সংসারে
আহার সকল দুঃখ দূর করে।"

সিগ্ন্যাল

শ্রীপ্রমথ গঙ্গোপাধ্যায়

লাল সিগ ন্যাল বিজলী রেখাতে ঝল্কায়—
গাড়ী এলো কদ্দুর ?
শুধালো অনেকে উৎসুক কালো জনতা,—
অদ্ভুতনামা দ্বীপত্যকা ও অনেক অজানা
গ্রাম থেকে,
অনেক খেয়ায় মাশুল যুগিয়ে এলো যারা সব
কোণ থেকে,
রক্ত ও ঘামে রাখি আলিপনা,—
ভাঙ্গি নিঃসীম রোদ্দুর।
টেলিগ্রাফ তারে বাজে শুধু ঝন্ঝনা,—
অদৃশ্য-হাত ইস্পাত
নিশীথ বায়ুতে ছোঁয় তারে কোন্ ক্ষণে,—
ছড়ায় কঠিন সজ্জাত।
যাত্রীরা নেয় নিজেদের পরিচয়,
ষ্টেশন-ঘড়িতে রাত্রি অনেক হয়,—
ক্ষণগুলি যেন মহাসমুদ্র—
ঈসারাকঠিন চাপা শ্বাসে ভরা রাত ;
ক্লান্ত জনতা শুধায় নিজেরে,
অন্ধ প্রহর কী আনিছে সওগাত।
কতো দিন থেকে বসে আছে তারা ভাই,
দুঃখ দহনে যাত্রীরা পথ চলে,—
ঋতু সৌরভে মধুর আকাশ কতো,
নিষ্প্রভ তারা তাদের চক্রবালে।
রাত্রির স্রোতে সিগ ন্যাল ঝল্কায়,—
পুরানো কালের পালক কি উড়ে যায় ?
মাটীর লোহাতে ঝলক কি মারে
নূতন জীবন বিকিরণ ?—
গাড়ী আসে না কি ?—সিগ ন্যাল কাঁপে,
প্রহরেরা বাজে অগণন।

স্মরণ গৌরব গীতি

শ্রীমতী উষারাণী দত্ত

বর্ষারাতের কাজল মেঘের দুরন্ত আহ্লাদ
চিহ্নটুকু রেখেই যাবে এমনি ছিল সাধ।
তমাল বনের ছায়ায় ছায়ায়
কেয়া বনের গন্ধ মায়ায়
সাজালো তাই স্মরণটুকু
সজল কালিমায়,
আপন মনের আভাষ দিল
পুবেরি হাওয়ায়।
দুঃসাহসের লক্ষ্য নিয়ে উচ্ছলতার নাচে
চিহ্ন রাখার গর্ব্ব ক'রে তাইসে ওরা বাঁচে
না-ই যদি গো থাকে সে চিন্
আসেই যদি আলোরি দিন
তবুও তার স্মরণ রবে
গগন নীলিমায়,
কালোর স্মৃতি ধন্য হবে
আলোর মহিমায়।


আপনার রুচির তারিফ করি
পুজার আনন্দের দিনে নতুন জুতো না পরলে মানায় না। মজবুত ও সুন্দর জুতো কিনতে হলে আমাদের দোকানে আসবেন
বেঙ্গল সু মিউজিয়ম
৭৬নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড
কলিকাতা


পাগলের জন্য
বহুপরীক্ষিত
শান্তিধারা
২ দিনে ফল দেয়
নালন্দা ঔষধালয়
পৃথিবী বিখ্যাত পণ্ডিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, প্রধান শিক্ষক, মাননীয় বিচারপতি, দেশবরেণ্য নেতা, মন্ত্রী, রাজা ও চিকিৎসকগণ নালন্দা ঔষধালয়ের
ভূয়সী প্রশংসা করেন।
আরোগ্যের গ্যারাণ্টিযুক্ত ও বহুপরীক্ষিত কয়েকটি ঔষধ:
বহুমূত্রে—সৌম্যধারা
সর্ব্বজ্বরে—ম্যালোধারা
স্ত্রীরোগে—কান্তিধারা
বাতরোগে—বিজলাধারা
দুর্ব্বলতায়—শক্তিধারা
নালন্দা ঔষধালয়
আয়ুর্বেদীয় শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান
অধ্যক্ষ—রাজবৈদ্য শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রী ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা


চন্দ্র এণ্ড সন্স
জুয়েলার্স
শুভ শরতে জগজ্জননীর আগমন হবে। প্রকৃতি দেবীও তাই ধরিত্রীকে নব সাজে সজ্জিতা করে তুলেছেন! আমরাও উৎফুল্ল হৃদয়ে নব সাজে আমাদের ডালি সাজিয়ে রেখেছি—প্রিয়জনদের উপহার দিতে।
P.DAS.
ফোন বি, বি, ৫০৩৫
১১৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা
আমাদের কোনও ব্রাঞ্চ দোকান নাই

দুধের কথা

[১৮৪ পৃষ্ঠার পর]

রোগীর ঘর থেকে বেরোবার পরই নিজেকে চিকিৎসাবিজ্ঞানসম্মত ভাবে বিশুদ্ধীকৃত না করে, তবে তাদের মারফতও রোগের জীবাণু ছড়িয়ে পড়তে পারে। সংক্রামক রোগে মৃত জীবজন্তুর দেহাংশ শিয়াল, কুকুর, শকুনি প্রভৃতি দ্বারা একস্থান হতে অন্য স্থানে নীত হতে পারে এবং তাতেও রোগ বিস্তারের সম্ভাবনা হয়। দুধ সম্বন্ধেই এই প্রবন্ধ, তাই দুধ মারফত যে সব জীবাণু বাহিত হয় বা হতে পারে, এই প্রবন্ধে কেবল সেইগুলিই আলোচিত হোলো।

গবাদি পশুর এমন কতকগুলি সংক্রামক ব্যাধি আছে যে সবের জীবাণুদ্বারা আক্রান্ত হোলে মানুষেও অনুরূপ ব্যাধির সৃষ্টি হয়, যথা, যক্ষ্মা (Tuberculosis), দড়কা (Anthrax), খুরাই বা এঁসো (Foot and Mouth Disease), গোবসন্ত (Cowpox), জলাতঙ্ক (Hydrophobia) প্রভৃতি।

উপরোক্ত রোগগুলির মধ্যে যক্ষ্মারোগই সবচেয়ে মারাত্মক। অনেকের ধারণা যে, গরুর যক্ষ্মা মানুষে হয় না, কিন্তু এটা খুবই ভুল। তথ্য সংগ্রাহকরা হিসাব ক'রে দেখিয়েছেন যে, যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত মানুষের সমগ্র সমষ্টির শতকরা নব্বইটি মানুষ হতে উদ্ভূত, আর বাকি দশটি গরু থেকে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দুধ বেশী খায় এবং তাদের জীবনীশক্তি স্বাভাবিক অবস্থাতেই কম ব'লে রোগ প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা না থাকাতে, এই শতকরা দশটির মধ্যে শিশুর সংখ্যাই বেশী। বয়স্ক লোকের মধ্যে যে সংখ্যায় গরু থেকে এই রোগ হয় তা খুবই সামান্য এবং যা হয় তার কিছুটা হয় আক্রান্ত গরুর দুধ খেয়ে, আর সামান্য কিছুটা হয় তার মাংস খেয়ে।

যক্ষ্মারোগের পরই যে রোগটির স্থান, সেটি হোলো খুরাই বা এঁসো (Foot and Mouth Disease)। যক্ষ্মারোগ সম্পর্কে বর্ণিত কারণ দু'টির জন্য এই রোগটিও শিশুদের মধ্যেই বেশী সংখ্যায় হতে দেখা যায়। দুগ্ধজাত খাদ্য, যেমন দই, মাখন ইত্যাদি খেয়েও মানুষের যে এই রোগ হ'তে পারে তারও দৃষ্টান্ত আছে। এই রোগে আক্রান্ত গরুর পায়ে, মুখে ও পালানে যে ক্ষত হয়, দুধ দোওয়ার সময় বা অন্য কোন কারণে ঐ ক্ষতের রস যদি দৈবাৎ কোন কাটা ঘায়ের সংস্পর্শে আসে, তবে তাতে ক'রেও এই রোগ হবার সম্ভাবনা থাকে। তবে সুখের বিষয় যে, এই রোগটি যক্ষ্মা-রোগের মত অত বেশী সংখ্যায় হয় না বা তার মত মারাত্মক নয়। বাড়ীতে সাধারণতঃ যে ভাবে দুধ জ্বাল দেওয়া হয় তাতেই এই রোগের জীবাণু নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু গোয়ালার কাছ থেকে যে পাত্রে দুধ নেওয়া হয়েছিল তা বিশুদ্ধীকৃত না ক'রে দুধ জ্বাল দেবার পর যদি সেই পাত্রেই তা রাখা হয় তবে তাতে ফের বিপদের সম্ভাবনা হয়।

দড়কা (Anthrax) রোগটি সাধারণতঃ এই রোগে মৃত পশুর অবিশুদ্ধীকৃত (unsterilized) চামড়া, লোম প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত মানুষের প্রয়োজনীয় নানাবিধ জিনিষ ব্যবহারের ফলেই হ'তে দেখা যায়। মশা বা মাছির কামড়ে, আক্রান্ত পশুর দেহ নিঃসৃত নানাবিধ পদার্থ ক্ষতস্থানে লেগে, বা আক্রান্ত পশুর মাংস খেয়েও এই রোগ হতে পারে। এই রোগে মৃত পশুর অবিশুদ্ধীকৃত লোমের কণা নিশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে গিয়েও এই রোগ সৃষ্টি করতে পারে। এই রোগ হোলে গরুর দুধ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একেবারে বন্ধ হয়ে যায় বলে আক্রান্ত গরুর দুধ খেয়ে মানুষে এই রোগ হবার সম্ভাবনা সেই অনুপাতে খুবই কম, কিন্তু আক্রান্ত গরুর মল মূত্রাদি দ্বারা সুস্থ গরুর দুধ দূষিত হবার ফলে সেই দুধের মারফত এই রোগের জীবাণু মানুষে সংক্রমিত হবার সম্ভাবনা খুবই বেশী। এই রোগটি যক্ষ্মা-রোগের চেয়ে বেশী মারাত্মক, কারণ, যক্ষ্মা রোগের সূত্রপাতে চিকিৎসা আরম্ভ করলে সারবার বেশ কিছু সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু দড়কা রোগে ধরলে মৃত্যু ছাড়া অন্য গতি আছে বলে জানা নেই। তবে সুখের বিষয় যক্ষ্মারোগের তুলনায় এই রোগের সংখ্যা একেবারে খুবই কম, আর তাও আবার চামড়া বা পশুলোমের কারখানার কর্ম্মীদের মধ্যেই সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ থাকে।

গোবসন্ত (Cowpox) ও মানুষের বসন্ত (Smallpox) মূলে এক রোগ হলেও মানুষের পক্ষে এই রোগ যতটা মারাত্মক হয়, গরুর পক্ষে তা মোটেই হয় না এবং এই জন্যই গোবসন্তের জীবাণু থেকে প্রস্তুত নির্ব্বীজ টিকা (সাধারণ কথায় যাকে 'বসন্তের টিকা' বলে) দিয়েই মানুষকে বসন্তের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার ব্যবস্থা করা হয়। আক্রান্ত গরুর দুধের সঙ্গে এই রোগের জীবাণু নিঃসৃত হয় না বটে, কিন্তু আক্রান্ত গরুর পালানে যে সব ছোট ছোট ফোসকা হয়, দুধ দোওয়ার সময় তার রস বা ছাল দুধে পড়লে তা দূষিত ক'রে তোলে। হাতে কোন কাটা ঘা থাকলে দুধ দোওয়ার সময় তাতে সেই ফোসকার রস লাগলেও এই রোগ হতে পারে।

সাধারণতঃ পাগলা কুকুর বা ঐ জাতীয় অন্যান্য জন্তুর কামড় থেকেই মানুষের সরাসরি ভাবে জলাতঙ্ক (Hydrophobia) রোগ হয়, কিন্তু উক্ত কারণের জন্যই গরুর যখন এই রোগ হয় তখন তার দুধ খেয়েও মানুষের এই রোগ হতে পারে বলে জানা গেছে। তবে এই উপায়ে এই রোগ হবার সম্ভাবনা খুবই কম।

উপরোক্ত রোগ কয়েকটি ছাড়াও গবাদি পশুর আরো কয়েকটি রোগ আছে যা মানুষে সংক্রামিত হয়ে অনুরূপ রোগের সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু সেই রোগগুলি এতই বিরল যে, এই প্রবন্ধে তার বিশেষ কোনও উল্লেখ করা হোল না।

গবাদি পশুর আরো কয়েকটি রোগ আছে যার সংক্রমণে মানুষের অনুরূপ রোগ না হোলেও অন্য ধরণের রোগ সৃষ্টি করতে পারে। পচনশীল স্তন প্রদাহ, অন্ত্র প্রদাহ, জরায়ু প্রদাহ (Septic Mastitis, Enteritis and Metritis) এবং অন্যান্য অনেক প্রকার পূযোৎপাদক-জীবাণু ঘটিত রোগ এই শ্রেণীভুক্ত।

এই সম্পর্কে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, আক্রান্ত গরু থেকে উপরোক্ত সব কারণ-গুলির জন্য মানুষে এই সব রোগ হবার যেমন সম্ভাবনা থাকে, আক্রান্ত গরুর মলমূত্রাদি দ্বারা সুস্থ গরুর দুধ দূষিত হোলেও রোগ হবার সম্ভাবনা ঠিক তেমনি থাকে।

টাইফয়েড (Typhoid), প্যারা-টাই-ফয়েড (Para typhoid), আমাশয় (Dysentery), কলেরা বা ওলাউঠা (Cholera), দূষিত গলক্ষত (Septic Sorethroat), ডিপথিরিয়া (Diptheria) প্রভৃতি রোগ-গুলি মানুষের নিজস্ব রোগ। এর সবগুলিই সংক্রামক জাতীয়। অন্যান্য যে সব সাধারণ কারণে বা উপায়ে এই রোগগুলি মানুষের হয় তা তো আছেই, উপরন্তু গোয়ালাদের অসাবধানতার বা অজ্ঞতার জন্য গরুর দুধ এই সব রোগের জীবাণু দ্বারা দূষিত হয়ে সুস্থ এলাকাতেও এই সব রোগ ছড়াতে পারে, এমন কি অনেক সময়ে মহামারীরও সৃষ্টি ক'রে তোলে।

ধুলা,—যা অধিকাংশ জীবাণুরই বাহক এবং যার মারফতই অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগের সৃষ্টি হয়, তা নানা প্রকারে দুধে প'ড়ে জীবাণুদুষ্ট করতে পারে। দোহকের অপরিষ্কার হাত ও ময়লা কাপড় চোপড়; গরুর অপরিষ্কার দেহ,—বিশেষ ক'রে পশ্চার্দ্ধ; দুধ দোয়ার বা রাখবার জন্য অপরিষ্কার পাত্র; আবর্জ্জনাপূর্ণ গোশালা; মুখখোলা পাত্রে অনেকক্ষণ দুধ রাখা; দুধে অপরিষ্কার খেজুর পাতা বা খড় দেওয়া প্রভৃতি কারণগুলি খুবই সাধারণ। পথের ধারের ডোবার জলে তার নিজস্ব বহুপ্রকার জীবাণু তো থাকেই, তার ওপরে তাতে ধুলা ও অন্যান্য আবর্জ্জনার সঙ্গে অন্যান্য বহুপ্রকার জীবাণু প'ড়ে সেটাকে আরো বিষাক্ত ক'রে তোলে। সত্য গরল-রূপী এই জল দিয়ে দুধের পরিমাণ বাড়ালে সেই দুধের দ্বারা কি ভয়ানক অনিষ্ট যে হতে পারে তা কল্পনা করবার আবশ্যক করে না।

দুধে ডোবার জল মেশানোর কথাটা মোটেই কাল্পনিক বা অতিরঞ্জিত নয়, আমি অনেক বারই এটা নিজের চোখে দেখেছি। ক'লকাতার কাছাকাছি—অথচ রেলে চ'ড়ে আসতে হয়, এমন সব গ্রামের গোয়ালাদের মধ্যেই এই দুষ্প্রবৃত্তি খুব বেশী দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করলাম, এটিও আমার চাক্ষুষ দেখা।

মফঃস্বলের এই সব গোয়ালারা মুখখোলা পাত্রে করেই কলিকাতায় দুধ নিয়ে আসে। বর্ত্তমান সময়ে রেলের কামরায় অতিরিক্ত ভিড়ের জন্য আরোহীদের কষ্টের সীমা নেই। তাই অনেক আরোহী, এমন কি গোয়ালারা নিজেরাও, ওর মধ্যেই একটু আরাম পাবার জন্য, গাড়ীর মেঝেতে রাখা দুধের পাত্রের কানায় পা তুলে বেঞ্চির পিঠে ঠেসান দিয়ে আরাম ক'রে বসেন। এতে যে তাঁরা চরণ ধূলি দানে সেই দুধকে পবিত্র করেন তাতে কোন সন্দেহই নেই। একদিন ঠিক এই অবস্থাতে বসার সময় এক ভদ্রলোকের এক পাটি ছেঁড়া ধূলিকর্দ্দমলিপ্ত জুতা দুধের মধ্যে পড়ে যায়। ভেবেছিলাম যে, এর জন্য হয়তো ভদ্রলোকটি সেই দুধের মালিক গোয়ালাটির কাছে তিরস্কার বা তার বেশী অন্য কিছু লাভ করবেন; কিন্তু যেন দোষণীয় কিছুই হয়নি এমনি ভাব দেখিয়ে গোয়ালাটি নিজের পদমর্দ্দন কার্য্যে নিযুক্ত পদধূলিলিপ্ত হাত দিয়ে দুধের ভেতর থেকে জুতাটি উদ্ধার ক'রে ভদ্রলোকটিকে প্রত্যার্পণ করেছিল। দুধের বিশুদ্ধতা—তথা জনসাধারণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে গোয়ালারা এবং সেই সঙ্গে জনসাধারণ নিজেরাও কতটা উদাসীন তা এই ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয়।

দুধে ভেজাল মেশানোর অপচেষ্টায় যে সব কথা এই প্রবন্ধে বলা হয়েছে, তা যে কতখানি সত্য এবং বর্ত্তমানে তা যে কতখানি গুরুতর আকার ধারণ করেছে, গত ১৯শে মে তারিখে 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' প্রকাশিত একটি বিশেষ সংবাদের উল্লেখ করলে সেটা নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হবে। সংবাদটি এই :—

সংবাদটিকে সংক্ষেপে বললে এই দাঁড়ায় যে, বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষরা সম্প্রতি সহরের বিভিন্ন স্থান হতে সংগৃহীত ২২৪টি দুধের নমুনা পরীক্ষা ক'রে দেখেছিলেন। এই ২২৪টি নমুনার ভেতর ১৫১টি ভেজাল দুধ বলে প্রমাণিত হয়েছিল এবং এই ১৫১টি ভেজাল দুধের মধ্যে কতকগুলির আবার ভেজালের মাত্রা শতকরা ৮৬ ভাগেরও বেশী ছিল,—অর্থাৎ ১০০ ভাগ দুধের মধ্যে দুধের পরিমাণ ছিল ১৪ ভাগেরও কম আর ভেজালের পরিমাণ ছিল ৮৬ ভাগেরও বেশী। আর সবচেয়ে সাংঘাতিক ব্যাপার এই যে, এই ভেজাল দুধের সব কটিতেই অপরিশুদ্ধ জল,—অর্থাৎ সোজা কথায় ময়লা জল মেশানো হয়েছিল, যার জন্য সব কটি নমুনাতেই এমন কয়েক প্রকারের জীবাণুর অস্তিত্ব ধরা পড়েছিল, যারা কেবল জল মারফতই মানুষের শরীরে নানাবিধ রোগের সৃষ্টি করতে পারে। এই সংবাদটির টীকা নিষ্প্রয়োজন।

বর্ত্তমান সময়ে দুধের স্বল্পতাহেতু যে গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়েছে তা নিয়ে সরকারী ও বে-সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ, এমন কি জনসাধারণের মধ্যেও বেশ কিছু চাঞ্চল্য পড়ে গেছে এবং এর সমাধানকল্পে অনেক কিছু কল্পনা-জল্পনা, আলোচনা ও পরিকল্পনা করা হয়েছে ও হচ্ছে। এটা খুবই আশাপ্রদ লক্ষণ। এই সুযোগে যদি দুধ সরবরাহ ব্যাপারের অন্যান্য যেসব তথ্য জনসাধারণ ও দুগ্ধ ব্যবসায়ে লিপ্ত সমুদায় লোকের পক্ষে অবশ্যজ্ঞাতব্য, সে সবেরও আলোচনা এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়, তবে সেটা খুবই সময়োচিত হবে. কারণ আধুনিক বিজ্ঞানের 'সোণার কাঠি' ছুঁইয়ে এদের অজ্ঞতা দূর করবার প্রচেষ্টার পক্ষে এটা একটা মহা সুযোগ।

মেঘে ও রোদে

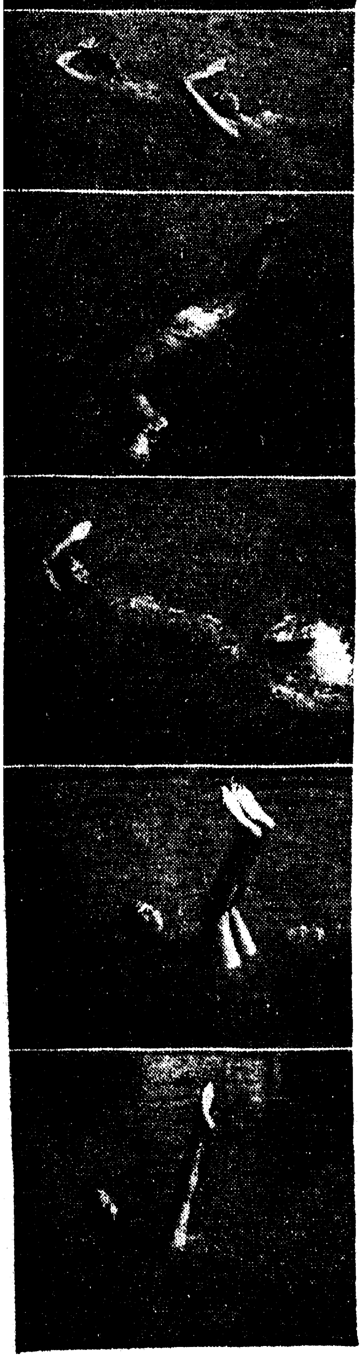
শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

সকালেতে ছিল মেঘ আকাশ ঘিরে।
কখনো চলিছে দ্রুত, কখনো ধীরে।
কখনো বা সাদা-সাদা, কখনো কালো।
কখনো বা ছেঁড়াছেঁড়া, দেখায় ভালো।
কখনো বা রোদ ওঠে, মেঘের ফাঁকে।
কখনো বা মেঘদল রোদেরে ঢাকে।
তারপর এ কি হ'ল—রোদ বিজয়ী!
গাছে পাতে পড়ে তেজ ভরিয়ে মহী।
তারপর একেবারে সব উজলি'
রোদে রোদে গলা রূপা উঠিল জ্বলি'।
সবুজ পাতায় আর বনের গায়ে
মায়াময় মহা রোদ রহে জড়ায়ে।



দুঃখীরা — সুনীল পাল





ডাঙ্গার খেলার তুলনায় সাঁতারের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে শিক্ষার্থীরা নিজের দোষ-দুষ্ট পাড়ি স্বচক্ষে দেখিতে না পাইয়া অনেক সময় মারাত্মক ভুল করিয়া বসেন। সাঁতার শিক্ষার গোড়া হইতে যদি ইহা সংশোধন করা না যায় বা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়া না যায় তাহা হইলে সেই দোষ সংশোধন করিতে প্রাণান্ত পরিশ্রম হয়। এই দোষ একটা সংস্কারে পরিণত হইয়া কার্য্যকালে এমন বাধা সৃষ্টি করে যে, অনেক সময় প্রতিযোগী সেই সামান্য ত্রুটীর জন্য প্রতিপক্ষের নিকট পরাজিত হন। অনেকেই মনে মনে এইরূপ ধারণা পোষণ করেন যে, সাঁতারের মধ্যে এমন কিছু শিক্ষা করিবার নাই, কেবল অভ্যাস করিলেই চলিতে পারে। এ ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক তাহা জোর করিয়া বলা যায়। সাঁতারের মধ্যে এমন অনেক কিছু শিক্ষা করিবার আছে। নির্ভুল পাড়িতে সাঁতার কাটা একটি কলা-বিদ্যা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আমাদের দেশে শতকরা পঁচানব্বই জন ব্যক্তি অবৈজ্ঞানিক কৌশলযুক্ত পাড়িতে সাঁতার দিয়া থাকেন। তাঁহাদের সাঁতারের সহজ ও সরল পথ প্রদর্শন করাইবার উপযুক্ত শিক্ষকও প্রায় দেখা যায় না। আমাদের বিবেচনায় শিক্ষার্থী যদি প্রাথমিক শিক্ষা কালে অথবা প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুতিকালে সুদক্ষ শিক্ষকের সাহায্য না পান তাহা হইলে শিক্ষার্থীর উচিত ভাল ভাল সাঁতারুর সাঁতার কাটিবার কায়দা দিনের পর দিন লক্ষ্য করিয়া চলা। তবে শিক্ষকের অধীনে থাকিয়া শিক্ষা করিতে পারিলে খুবই ভাল হয়। শিক্ষকদেরও উচিত পাড়িগুলির ব্যাখ্যা সম্পূর্ণরূপে প্রথমে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া পরে ছাত্রদের দোষগুণ সংশোধন করা। সাঁতারুর হাত পাড়ি অথবা পা-পাড়ির কোন অংশে দোষ হইতেছে অথবা শরীরের কোন অংশ নিয়মিত সঞ্চারিত হইতেছে না তাহা লক্ষ্য করিয়া সেই সেই অংশগুলি প্রথমে সুমার্জ্জিত করিয়া পরে পাড়ির সহিত মিলাইয়া সাঁতার কাটাইবেন; কারণ দোষ-দুষ্ট পাড়িতে সাঁতার কাটান কোনক্রমেই উচিত নহে। এই সকল প্রক্রিয়া যদি প্রস্তুতির প্রথম হইতে করা যায় তাহা হইলে প্রতিযোগিতার সময় ভাল ফল পাওয়া যাইতে পারে।



কবি-সাঁতারু শান্তি পাল

প্রতিযোগিতার জন্য সাঁতারু নির্ব্বাচন করাও কঠিন। সাঁতারু নির্ব্বাচন করিতে গেলে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকা চাই। এ সম্বন্ধে কতকগুলি অতি সাধারণ নিয়ম আছে। এই নিয়মগুলি প্রতিপালন করা প্রত্যেক শিক্ষকের উচিত। এ সম্বন্ধে মিঃ স্পাল্ডিং বলিতেছেন :—প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে কোন সাঁতারু অল্পপথ বা দূর পথের প্রতিযোগী হইবেন তাহা দুই চারিটা আপোষ বাজির পর সাঁতারু নিজেই বুঝিতে পারেন।

দ্রুত যাইবার জন্য সাঁতার-শীলন করিতে গেলে প্রতিযোগী যত্ন ও অধ্যবসায়ের সহিত হাত এবং পা-পাড়ি নির্ভুল করিয়া শিক্ষা করিবেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দোষ-দুষ্ট পাড়ি একবার বসিয়া গেলে তাহা সংশোধন করা যে কি কঠিন তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। একথা প্রত্যেক সাঁতারুর জানা দরকার যে, গায়ের জোরে সাঁতার কাটা চলে না। অল্পপথ সাঁতারের জন্য সাঁতারুর দেহের গতিভঙ্গি, হাত-পাড়ি, পা-পাড়ি ও নিশ্বাস-প্রশ্বাস সকল দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া ধীরে ধীরে একশ' মিটার হইতে দু'শ মিটার পর্য্যন্ত সাঁতার কাটিয়া নির্ভুলভাবে পাড়ি জমাইয়া লইয়া পরে পঞ্চাশ মিটার হইতে গতিবেগ বাড়াইয়া অভ্যাস করাই বিধেয়। এই অনুশীলন প্রতিযোগিতার অন্ততঃ দুইমাস পূর্ব্বে সুরু করা উচিত। একশ' মিটারের জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে একদিন তিনটি করিয়া পঞ্চাশ মিটার, পাঁচ-সাত মিনিট অন্তর কাটা এবং অপর দিন দু'শ মিটার শ্লথগতিতে কাটা উচিত। এইভাবে একমাস সাঁতার কাটিবার পর সপ্তাহে দুইবার করিয়া যে পথ প্রতিযোগিতায় সাঁতার দেওয়া হইবে সেই পথটুকু সময় সীমা লক্ষ্য রাখিয়া সাঁতার কাটিবেন। প্রত্যহ সাঁতারের পর দুই-চারি মিনিট উপক্রম-ঝাঁপ, বাককের প্রভৃতি সাঁতারের

সাঁতারের কথা

শ্রী শান্তি পাল

আনুষঙ্গিক বিষয়গুলিও অনুশীলন করিবেন। সপ্তাহে একদিন করিয়া বিশ্রাম লওয়া দরকার। ঐ দিন সাঁতার না কাটিয়া উপক্রম-ঝাঁপ, বাঁকফের, থিকে প্রভৃতি অভ্যাস করিবেন। সাঁতারুর আর একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার; সাঁতার অনুশীলনের পর অকারণ জলে পড়িয়া থাকিবেন না।

দূরপথ অর্থাৎ পনেরশো মিটার সাঁতারের জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে ঐ একই নিয়মেই চলিতে হইবে। তবে প্রস্তুতির সময়কাল কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইলেই ভাল হয়। প্রতিযোগিতার অন্ততঃ তিন মাস পূর্ব্ব হইতে একদিন চারশো মিটার এবং অপর দিন তিন চারিটি পঞ্চাশ মিটার সাঁতার কাটিবেন। সপ্তাহে একদিন বিশ্রাম এবং একদিন সময়-সীমা লক্ষ্য রাখিয়া যে পথ সাঁতার দিবেন সেইপথটুকু কাটিবেন। বিশ্রামের দিন ঐ একই নিয়মে উপক্রম ঝাঁপ বাঁকফের, নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি অনুশীলন করিবেন। সাঁতারুর মনে রাখা উচিত যে, সাঁতারুর বিশ্রাম জলেই।

প্রতিযোগিতার দিন সাঁতারুর পক্ষে কখনও ছুটাছুটি, দৌড়-ঝাঁপ, রৌদ্রে ঘোরা-ফেরা করা উচিত নহে। সাঁতার-বাজির নির্দ্দিষ্ট সময়ের অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে রঙ্গস্থলে যাওয়াই সমীচীন। সেই দিন সর্ব্বদাই দুই এক জন বিশিষ্ট বন্ধুর সহিত রহস্যালাপে নিজেকে মসগুল করিয়া রাখা দরকার। প্রতিযোগিতার বিষয় আদৌ চিন্তা করা উচিত নহে। সাঁতার সুরু হইবার কুড়ি পঁচিশ মিনিট পূর্ব্বে সারা দেহে উত্তমরূপে সরিষার তৈল মর্দ্দন করাইয়া লইবেন স্মরণ রাখিবেন যে সাধারণ ব্যক্তির দ্বারা এই কাজ সম্ভবপর নহে। যিনি এই কাজে বেশ নিপুণ ও পারদর্শিতা

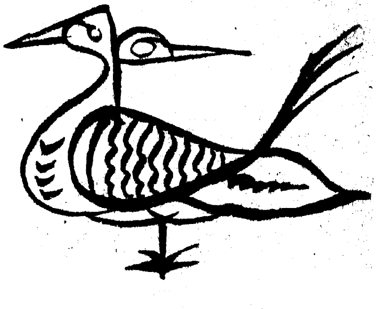


শ্রীমতী লীলা

লাভ করিয়াছেন এরূপ ব্যক্তিকেই আহ্বান করিবেন। সাঁতারের ডাক পড়িলেই ধীরে ধীরে মঞ্চে গিয়া দাঁড়াইবেন।

সাঁতার সুরু করিবার পূর্ব্বে প্রতিযোগী সর্ব্বদাই সঙ্কেতকারীর মুখের দিকে লক্ষ্য রাখিবেন। সাঙ্কেতিক বাক্য প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের প্রান্তে দুইটি পা জুড়িয়া আঙ্গুলের টিপনি রাখিয়া দাঁড়াইবেন। তারপর কোমর ভাঙ্গিয়া জলের দিকে ঝুঁকিয়া চিবুকের সম্মুখে হাত দুইটি প্রসারিত করিয়া মনে মনে এক দুই তিন বলিবেন। দুই এবং তিন বলিবার অবকাশে পিস্তলের অথবা বাঁশীর শব্দের ১/৪ সেকেণ্ড পূর্ব্বে জলপৃষ্ঠের উপর শরীরকে সোজা গড়াইয়া দিয়া অর্থাৎ জল-পৃষ্ঠের যতদূর সম্ভব ততদূর উপর দিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িবেন। ঐ পিস্তল অথবা বাঁশীর শব্দ যেন জল স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে শ্রুত হয়। সাঁতারুর আর একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। এই উপক্রম-ঝাঁপ যেন দুরুপক্রম ঝাঁপ অর্থাৎ 'ফলস-ষ্টার্ট' হইয়া না যায়। ইহাতে সাঁতারুর সাঁতার নাকচ হইতে পারে। এসম্বন্ধে পারদর্শিতা লাভ না করিলে প্রতিযোগিতার সময় সাঁতারুকে বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হয়। অল্পদূর পথ সাঁতারের বাজিতে জয় পরাজয় অনেকাংশে নির্ভর করে এই ঝাঁপ দিবার কৌশলের উপর।

সাঁতারের সময় ক্ষিপ্রতার সহিত বাঁকফের ও পাড়ির গতিবেগ নিয়ন্ত্রণও একটি কলাবিদ্যা। সাঁতারুর এ বিষয়ও বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। আজকাল অধিকাংশ সাঁতার-দৌড় পঞ্চাশ মিটার জলক্ষেত্রে বা 'ট্র্যাকে' অনুষ্ঠিত হয়। একশো মিটার কাটিতে গেলে সাঁতারুকে একবার বাঁকফের দিতে হয়। দ্রুত বাঁকফের গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কতকগুলি ক্রিয়া কৌশলের উপরও সাঁতারুর জয়-পরাজয় নির্ভর করে। পনেরশো মিটার সাঁতার কাটিতে গেলে সাঁতারুকে আটাইশবার বাঁকফের করিতে হয়। পাকা সাঁতারু এই বাঁকফের অন্ততঃ আটাইশ সেকেণ্ড কমাইতে পারেন। ইহা সাঁতারুর পক্ষে কম লাভের বিষয় নহে। সাঁতারু নিজের শক্তি বা দম অনুযায়ী সাঁতার সুরু করিয়া প্রতি বাঁককেরে, মঞ্চের দশ-বারো হাত দূর হইতে গতিবেগ কিঞ্চিৎ বাড়াইয়া এবং বাঁকফের শেষ করিয়া সেই গতিবেগ অবলম্বনে ঐ দশ-বারো হাত পুনরায় আসিয়া পূর্ব্বের গতিবেগে সাঁতার সুরু করিবেন। বাঁকফেরের সময় মঞ্চের কাছাকাছি আসিলে তবে ডুব মারিবেন। অর্থাৎ সেই গতিবেগের উপর দেহটি ছোট করিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া কাঁধ হইতে ঘুরিবেন। ঘুরিয়াই জলের নীচে পাটাতনে দুই পায়ের পুরা পাতা দিয়া জোরে ধাক্কা মারিয়া হাত দুইটি মাথার সম্মুখে সোজা রাখিয়া জুড়িয়া দিবেন এবং যুগপৎ পা দুইটি চালাইয়া বুক-ঝাঁপের ভঙ্গি হইতে অর্থাৎ সেই ভাসমান অবস্থা হইতে পাড়ি ধরিবেন। এই কায়দায় কয়েকবার বাঁকফের করিতে পারিলে প্রতিদ্বন্দ্বীর নাগালের বাহিরে যাইতে পারিবেন। দূর পথ সাঁতারের বাজিতে প্রতিপক্ষকে ঠকাইবার ইহা একটি প্রশস্ত উপায়। এইরূপ কয়েকবার নিপুণতার সহিত বাঁকফের করিতে পারিলে অন্য সাঁতারু ক্রমশই হতাশ হইয়া পড়িবেন এই কৌশলের উপরেও সাঁতারুর জয়-পরাজয় অনেকাংশে নির্ভর করে। এই সমস্ত কৌশলগুলি সাঁতারু প্রস্তুতির সময় শীলন করা বিশেষ প্রয়োজন।




অন্ধজনে দেহ আলো
মৃতজনে দেহ প্রাণ!
যুগ যুগ ধরে ভারতের আয়ুর্ব্বেদ রোগ পাণ্ডুর মুমূর্ষের দেহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে আসছে। ভারতের সেই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের ধারা আজও অক্ষুণ্ণ আছে পাহাড়পুর ঔষধালয়ের সাধনা আর তার কর্ম্মপ্রচেষ্টার মধ্যে।
পাহাড়পুর ঔষধালয়
দিনাজপুর

চেঞ্জ

[১৭৭ পৃষ্ঠার পর]

ঠাকুমা,—"এসো দিদি এসো, খেতে গেছলে বুঝি ?"—কুন্তলা ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, "না।"—"তবে ?"—"ছিলাম ঐ দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে,"—"ওমা কেন ? আড়িপেতে শুনছিলে বুঝি কে কি বলে তোমার নামে"—"না সে অভ্যেস আমার নেই। তবে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কথাগুলো কানে এসে পড়েছে।"—"এখান থেকে উঠে গেছলেই বা কেন ? ভাবলাম বুঝি খেতে গেলে,"—"এখানে বসে আপনাদের ঠাট্টা নির্ব্বিবাদে সহ্য করবার মত শক্ত মন আমার নয়। তাই উঠে গেছলাম।" ঠাকুমা যেন আকাশ হইতে পড়িলেন—"ওমা তোমায় আবার কে শক্ত কথা বলবে। তুমি অতিথি দেবতার সমান।" তাহার পর কি যেন চিন্তা করিয়া বলিলেন, "ও বুঝেছি, উলু দেবার কথায় তুমি রাগ করেছ ? ওরা তোমায় ঠাট্টা করেছে, এতে কি রাগ করে! এত লেখাপড়া শিখেছ, সামান্য ঠাট্টাও বুঝতে পার না ?"—"না ঠাকুমা, রাগ আমি করিনি, তবে দুঃখ হয়েছিল, আমার চরিত্র সম্বন্ধে আপনাদের মনোভাব দেখে ; ভেবেছিলাম কিছুই বলব না, চুপ করেই থাকব কিন্তু আপনারা আমায় ভুল বুঝছেন, তাই গুটিকতক কথা বলতে চাই। আপনাদের এই আনন্দে সত্যিই আমি মনখুলে যোগ দিতে পারিনি কেন জানেন ? এটা একটা অসার আমোদ বলে। যে দেশের ১৫ লক্ষ লোক না খেয়ে মরে, যে দেশে দুবেলা পেট ভরে লোক খেতে পায় না, যে দেশের মেয়েরা কেবলমাত্র পেটের জন্য সন্তান ত্যাগ করে, লজ্জাকর পথে যেতে বাধ্য হয়—সে দেশে মাত্র পুতুলের বিয়েতে হাজার হাজার টাকা খরচ দেখে স্তব্ধ হয়ে গেছলাম, হিংসেতেও নয় কিংবা অহংকারেও নয়।" বরের মাসী হাসিয়া বলিলেন, "আমরা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, অত বুঝি না।" ঠাট্টার ছলে হইলেও মুখ্যু কথা বরের মায়ের গায়ে লাগিল। তিনি ভাবিলেন মেয়েটি হয়তো ভাবিবে ইহাদের টাকাই আছে বিদ্যা নাই। পুরুষগুলো শুদ্ধ মুখ্যু। তাই বোনের দিকে ফিরিয়া অনুযোগের সুরে বলিলেন "তুই শুধু শুধু মুখ্যু মুখ্যু করছিস কেন ? আমাদের বংশে কোন ছেলেটা বি এ, এম এ, পাশ করেনি, কোন মেয়েটি মাষ্টারের কাছে পড়েনি ?"

বরের জেঠিমা অর্থাৎ ওবাড়ীর বড়বো কুন্তলার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "দুর্ভিক্ষের সময় আমার শ্বশুর দুমাস ধরে হাজার হাজার ভিখিরী খাইয়েছেন, কাপড় দিয়েছেন, এতে কি তাঁর কম খরচ হয়েছে ? দেশের এবং দশের জন্যে প্রাণ সকলেরই কাঁদে ; তবে আমরা অত ফস্ ফস্ করিনা বা সভাসমিতিতে দাঁড়িয়ে করুণ গলায় বক্তৃতা করে হাততালি পেতেও চাইনা। এতে আমরা বেশ দুঃখ বোধ করি। দুঃখীর দুঃখ দূর করতে হলে কথার কারসাজি ছেড়ে যেটুকু কাজ করা দরকার সেটুকু করি। আমাদের চৌধুরী বাড়ীতে কোন প্রার্থীকে কখনও একশ' টাকার কম দেওয়া হয় না। এই আমাদের নিয়ম। আমরা দরকারে যেমন খরচ করি, অ-দরকারেও করি"—বলিয়া চৌধুরী বধূ গর্ব্বোজ্জ্বল মুখে শাশুড়ীর মুখের দিকে চাহিলেন। চৌধুরী গৃহিণী অর্থাৎ পুতুল বরের ঠাকুমা মুখে জরদা দিয়া মুখে মিষ্ট হাসি টানিয়া বলিলেন, "আহা ও কি করে জানবে বৌমা চৌধুরী বংশকে, আদা-ব্যাপারীর যুদ্ধের খবর রাখা সহজ নয়। এই বংশের মান আর দান কি তোমরাই ঠিকমত ধরতে পেরেছ ? এরা পরকেও যেমন দিতে পারে তেমনি নিজের জন্যও খরচ করতে পারে।" তাহার পর কুন্তলার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এই ধরনা এসেছ চেঞ্জে শরীর সারাতে, কিন্তু মনটারও তো চেঞ্জ চাই ; সেই খাও দাও ঘুমাও করলে চলবে কেন ? পুতুলের বিয়েকে উপলক্ষ করে ১০।১২দিন ধরে কেমন আমোদ হোল, কত লোকের পায়ের ধুলো পড়ল কতজনের সঙ্গে দেখা শোনা হোল, এই এক ঘেয়ে সংসারে একটু নূতনত্ব আর কি টাকা কহাজার গেল বটে তা ভগবানের আশীর্ব্বাদে"—বলিয়া কথাটি সমাপ্ত করিয়া ইঙ্গিতেই সারিলেন।

কুন্তলার সামান্য গুটিকয়েক কথা ইহাদের কথাস্রোতে কোথায় ভাসিয়া গেল। বুনিয়াদী বংশের ধনগর্ব্বিত বধূদের মধ্যে সে নির্জ্জীবের ন্যায় বসিয়া রহিল।

রৌদ্রের গান

বিমলচন্দ্র ঘোষ

ঝিম্ ঝিম্ ঝিম ঝিম রৌদ্রের গান।
কম্পিত পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়া
বাজে বীণ সূর্য্যের দ্বিপ্রহরে
ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্।
শুকনো ধুলোয় কা'র খর নিঃশ্বাস
অতীন্দ্রিয় ?
অণু পরমাণু কাঁপে নব ফাগুনের
শুকনো হাওয়ায়।

ছন্দিত মন কাঁপে তন্দ্রাভরে
নিঃঝুম হৃদয়ের বাসনা-বিলাস
ধুলোর জোনাকি ওড়ে শ্বেত রোচনায়
ঝিম ঝিম ঝিম।
শ্যামপল্লব ঘন বকুলশাখা
ঝড়ে ভাঙা নীড় বাঁধে কত না পাখি
কাকলি মুখর।

কবে কোথা বিরহিণী বিরহী কূজন
দুঃসহ বিচ্ছেদে বিরহ-গীতি
গেয়ে গেছে ; সেই সুরে কপোত-কূজন
আজো নিষ্কম্প,
আজো রৌদ্রের গান ঝিম ঝিম ঝিম্।

বুনো ঘাসে রূপুরের ছন্দে আলো
ঝলমলে সূর্য্যের রাঙা জোৎস্নায়—
কম্পিত ফড়িংয়ের অভ্র পাখা
রূপালি ও গৈরিক স্বপ্নমাখা
বেগনি আভায়।

মৌমাছি গুঞ্জন গান গেয়ে যায়
বাজে বীণ সূর্য্যের শুকনো হাওয়ায়
ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্।
কাঁপে ধূ ধূ রৌদ্রের নারঙ্গী রঙ
হৃদয়ের তারে তারে স্বপ্ন-সারঙ
বাজে উদাসীন
গাঢ় নীল মহাকাশ কাঁপে নিঃসীম।

হর্ষ বিষাদ মাখা উদাসী হাওয়া
ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যায় বনাঞ্চলে
ঝরাপাতা উড়ে যায় শূন্য মনে
মৃদু মর্ম্মর।
অতন্দ্র উদাসীন অশোক পলাশ
শোনে হু হু অতনুর তপ্ত নিশ্বাস
শোনে খর রৌদ্রের উজ্জ্বল গান
অবোলা অবোধ কত বিবশ প্রাণ
শ্রম-জর্জ্জর।

ফুলে ফুলে রক্তিম কৃষ্ণচূড়া
বিদ্রোহে ? বেদনায় ? হর্ষভরে ?
জানি না। কেবল জানি শত জনপদ
বিস্মৃত কান্নার সমাধিতলে :
গান শোনে রৌদ্রের নব ফাগুনের
শোনে গান নব-জীবনের
ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্।

শ্যাওলা

(১৬১ পৃষ্ঠার পর)

একেবারে ঘুমে ঢুলে পড়ে। জবুথবু হ'য়ে াসে রইলো লোকটি। ফিরে ফিরে দেখে াশপাশের অচেনা হাটখোলা—ভাঙা াালা। আকাশের আধখানা চাঁদের ওপর িদয়ে ভেসে চলেছে মেঘের সারি। ভয়ানক াস্ত মনে হয়—হঠাৎ যেন মনে পড়ে যায় ায়ের কথা : কোথায় কোন্ গ্রামে এক াশবনের ধারে একটা সুন্দর ঘর ছিল। েকটা রোগা কালো মেয়ে পিঠে চুল ালিয়ে দিয়ে ছেলের কান্না থামাতো—

আয় চাঁদ আ—
ফটিকের কপালে আমার
টিপ দিয়ে যা।

তারপর এলোমেলো হয়ে যায় সবটা। ক যেন ডাকছে তাকে : কেশব—কেশব কোথায় রে!

এই যে বাবু। কেশব সাড়া দিল।

মন্দিরতলার দলপতি তামাক নিয়ে নকে এসে দাঁড়ালো কেশবের সামনে। বললো, তামাক খা। সদা কোথায় গেল—াদা ?

এই যে কত্তা—ইদিকে। দূর থেকে াড়া দিল সদানন্দ। একরাশ ধোঁয়া াগলা কণ্ঠস্বর। আই প্লটের একটি লোকের াঙ্গে কথা কইছে ফিস ফিস ক'রে। ািন্দিরতলার দলপতি এগিয়ে গেল সেই িদকে—গিয়ে বসলো সদানন্দের গা ঘেঁষে।

তামাকের গন্ধ ছাপিয়ে ওঠে উৎকট াঁজার গন্ধ।

ওপাশে কে একটি শোয়া লোক উঠে ব'সে হাই তুলে বললো, ঘুম পায়—আরও কত রাস্তা বাকী!

কেউ কথা বলে না—কান খাড়া ক'রে থাকে সবাই। কেশব তামাকের ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে যেন দেখে ধোঁয়াটে একটা ঘর। কতলোক ঘুমুচ্ছে এমন রাতে—সারা জগৎ। ধোঁয়াটে ঘরটা ঘুরতে থাকে ধোঁয়ায়।

ঢুলুনি আসে।

তারপর হঠাৎ এক সময়ে চোখ মেলে দেখলো—ফিকে চাঁদের আলোয় এসে দাঁড়িয়েছে কে একটি মেয়ে—চাপা গলায় জিজ্ঞেস করছে তাকেই—ছেলেটা কি তার ঘুমিয়েছে? ভালো লাগে মেয়েটিকে। হঠাৎ কোনো কথা জোগায় না মুখে, কেশব চেয়ে রইলো। হাতে অনেকগুলি মাদুলি বাঁধা নব হাজরার তৃতীয় পক্ষের বৌ। স্বামীর সঙ্গে এসেছিল কয়েকদিনের জন্যে বাপের বাড়ীতে, ফিরে যাচ্ছে আবার। মেয়েটা দাঁড়িয়েই থাকে কেশবের সুমুখে।

এমন রাতে এই মেয়েটার দিকে চেয়ে চেয়ে আর একটা মেয়েকে মনে পড়ে যায় কেশবের—রোগা কালো মেয়ে একটা। এক রাতে কত কাছে মনে পড়ে তাকে। হঠাৎ সাধ হয়, কত লোকই তো বেঁচে গেছে বেঁচে আছে অভাবে, ক্ষুধায়, রোগে—সে মেয়েটা না মরলে বড় যেন ভালো হ'তো।

আর একটি দল এলো হাটে।

কুন লাটের লোক গো। হাঁক দিল আই প্লট।

মরিচখালি।

মরিচখালি গা ঘেঁষে বসে মন্দিরতলা আর আই প্লটের।

কিছুক্ষণের বিশ্রাম।

তারপর আবার যাত্রা শুরু। তিনটি দল হেঁটে চলে নিঃশব্দে। ফিকে জ্যোৎস্নায় সুমুখে এসে দাঁড়ালো মেয়েটি—এবারে চলেছে কেশবের আগে আগে। সদানন্দ চলেছে কেশবের পাশাপাশি। নীচু গলায় আলাপ করে সেই রুখে দাঁড়ানো তেজী মেয়েটির কথা নিয়ে—কামিনী যার নাম। আই প্লটের একটি লোকের কাছ থেকে সব খবর জোগাড় ক'রে ফেলেছে সদানন্দ। মেয়েটির বয়স সতের আঠারো নয়—বছর পঁচিশ, বিধবা, এক ছেলের মা। ছেলেটি গত বছর সাপকাটায় মারা গেছে লাটে। আই প্লটের দলপতি মনোহর দাস জোগাড় ক'রেছে কোত্থেকে। বেশ মেয়েটি।

কেশব কিছু বলে না। ক্ষুব্ধ সদানন্দ কেশবের পাশ ছেড়ে হারিয়ে যায় ভীড়ের মধ্যে। কিছুক্ষণ পরে গিয়ে পড়ে আবার কার ঘাড়ের ওপরে।

কে লোক গো! একটি মেয়ে হাউমাউ ক'রে ওঠে।

আহা-হা, বুড়ো মানুষ।

ঠাউর নাই ভাই—ঠাউর নাই। সদানন্দের আবার কাতরোক্তি শোনা যায়।

কিছুক্ষণ পরে এসে জোটে আবার কেশবের পাশে। ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে, বুড়ী বুড়ী—একাবারে বুড়ী। চিনা যায় নি আঁধারে।

লাটফেরত সদানন্দ—বহুবার যাওয়া আসা ক'রেছে সে। এই লোকটার কাছে কেশবের নিজেকে ভয়ানক বোকা মনে হয়। লাটের লোকগুলো কি সবাই এই রকম? শুনেছে সে, আলো নিভলে সেখানে সম্পর্কের ঠিক নেই। জানে সে, অনেক দিন আগে তাদের গ্রামের একটি বৌ পালিয়েছিল কার সঙ্গে লাটে—এ রকম অনেককে পালাতে শুনেছে সে। শুনেছে, সেখানে বেশীর ভাগ লোকেরই খারাপ অসুখ। বহুদিনের পরিচিত শান্ত একটা গ্রাম টান মারে পেছনে।

সুমুখে স্বর্ণভূমি···ধান ধান ধান।

এতগুলি লোক ছুটেছে সেই দিকে—কেশব তো একা নয়! আর সেই মেয়েটি—যে ফিকে জ্যোৎস্নায় সুমুখে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস ক'রলো : ছেলেটি কি তার ঘুমিয়ে পড়েছে? নব হাজরার তৃতীয় পক্ষের নাম কি?

সদানন্দকে জিজ্ঞেস করতে ভয় করে কেশবের।

তারপর একসময়ে দীর্ঘ যাত্রার শেষ হ'লো খেয়াঘাটে এসে। অন্ধকারে হুগলী নদীর যেন সীমা নেই। সবাই যেন এসে পড়েছে কূলহারা এক মহাসাগরের পারে। ওপারে সেই সোনার দেশ। কারুর মুখে কথা নেই। শুধু লাটফেরতা লোকগুলি মাঝে মাঝে কথা কয়—এর ওর নাম ধরে ডাকে। নোঙর ফেলা বড় বড় পারানি নৌকোগুলি দোল খাচ্ছে নিঃশব্দে। সবটা কেমন যেন ভূতুড়ে মনে হয়।

খেয়া ছাড়বে শেষ রাত্তিরে—প্রায় ভোরের দিকে। সবাই হাঁ ক'রে চেয়ে বসে থাকে—সবাই যেন ক্লান্তি ভুলে গেছে, ভুলে গেছে ঘুম।

ছেলেটা কি ঘুমিয়ে গেছে?

আবার তেমনি ক'রে এসে সুমুখে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে সেই মেয়েটি।

থতমত খেয়ে কেশব বললো, হ্যাঁ।

দাও আমাকে।

অতি সহজে টিকটিকির মতো রোগা ছেলেটাকে কেশবের কোল থেকে নিজের কোলে তুলে নিল মানকুমারী। অস্ফুট কণ্ঠে বললো, খেয়া ছাড়বে সেই ভোরে। ঘুমাক ততক্ষণ।

মানকুমারী চলে যেতে সদানন্দ পেছন থেকে হেসে উঠলো খুক খুক ক'রে।

কেমন যেন ভয় পায় কেশব।

সদানন্দ চাপা গলায় বললো, বেশ বেশ—ভালো।

কি ভালো?

এই নব হাজরার তৃতীয় পক্ষ। সুখে থাকবে কেশব। কিন্তু হাজরা লোক বড় খারাপ হে।

কেশব চুপ।

পাপী পাপী—ঘোর পাপী। হাজরার ছেলেপিলে হয়নি কেন জান? শয়তান। তুমি ভাল লোক কেশব—গিরস্ত চাষী ছিলে, যেয়োনি ওর লাটে। চাষের সময়টুকু খাটিয়ে দূর করে দিবে।

সদানন্দ ভাববার যেন কয়েক মুহূর্ত মাত্র সময় দেয় কেশবকে। তারপর আবার বললো, চল তার চেয়ে আই প্লটে, যাই দু-জন। থাকব ভাল চাষীর মত—ঘর-দোর কর, বিয়ে-সাদি কর। দিব্যি—

কানখাড়া ক'রে শোনে সবাই। ঘর-দোর—আবার জীবন। কি সুন্দর কথাগুলি!

কেশব মিনমিন ক'রে বললো, আমি যে কথা দিছি হাজরাকে।

বুঝি—বুঝি। সদানন্দ অল্প হেসে বললো, কিন্তু ওই মেয়েমানুষটি—বুঝছ, বাঘিনী। জাল কল পাতছে হাজরা।

হাসে সদানন্দ। তারপর উঠে গেল সে কেশবের পাশ থেকে।

খেয়া ছাড়লো ভোরে।

সদা—সদা গেল কোথায়? মন্দির-তলায় নৌকোয় খোঁজ করে নব হাজরা।

সদানন্দ নেই। সে বসেছে শেষ পর্যন্ত আই প্লটের নৌকোয়—রাত্রির সেই রুখে দাঁড়ানো বিধবা মেয়েটির পাশ ঘেঁষে। নির্বিকার সদানন্দ। ডাকলেও সাড়া দেয় না।

অশ্লীলভাবে নব হাজরা গালাগালি করে। মন্দিরতলায় যাবে ব'লে এতখানি পথ এসে শেষকালে উঠে বসলো আই প্লটের নৌকোয়। নব হাজরার বুড়ো টোলখাওয়া মুখখানা কয়েক মুহূর্তের জন্য বীভৎসতম হ'য়ে ওঠে।

মানকুমারীর হাসি পায় সে মুখের দিকে চেয়ে—কোনো বিতৃষ্ণা আসে না আজ আর। কেন যেন আজ তার সব কিছু ভালো লাগছে। একটি মেয়ের পাশ ঘেঁষে বসা সদানন্দ, স্বামীর বুড়ো বীভৎস মুখখানা, বিরাট কাঠামো কেশব লোকটা—যে না-কি যোয়ান যোয়ান বলদগুলোকে হিম-সিম খাইয়ে দেয়, মাথায় বোঝা নেওয়ার জুড়ি যার নেই, ধানকাটার সময় হাত চলে যার যন্ত্রের মতো—সেই লোকটার বোকা বোকা ভীরু চাহনি, সব ভালো লাগে মানকুমারীর। কেশবের কচি ছেলেটা তখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছে তার কোলে কোমর জড়িয়ে। কেশব হাঁ ক'রে চেয়ে আছে কূলের দিকে। কি দেখছে কি জানি। হাসি পায় মানকুমারীর।

কেশবের ভালো লাগে না সে হাসি। ভোরের আলোয় হাতে একগাদা মাদুলি বাঁধা আঁটসাট এই বাইশ বছরের মেয়েটিকে এতটুকু আর ভালো লাগে না কেশবের। হঠাৎ যেন তার চোখ জ্বালা ক'রে জল আসে। ওপারে ফিরবে না সে আর কোনদিন—কোনদিনই না। একটা গ্রাম, একটা মরে যাওয়া মেয়ে অনেক দূরে রয়ে গেল এ জীবনে। মনে পড়ে সদানন্দের হুঁসিয়ারী। কিন্তু এতগুলি লোক—এতগুলি লোক কি তবে ভেসে যাবে?

নোঙর উঠলো। শেষ পর্যন্ত নৌকো তিনটি ভাসলো।



জটাধারী

[১৮০ পৃষ্ঠার পর]

কী একটা ষ্টেশনে জল নেবার জন্যে গাড়ী অনেকক্ষণ থামলো। লোকজন কিছু পাতলা হোল। যা'রা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর ঝুলে ঝুলে যাচ্ছিল তা'রাও প্ল্যাটফরমে নেমে পায়চারী করতে লাগলো। আমি এক ফাঁকে ইঙ্গিতে ডাকতেই জটাধারী দেখতে পেলে আমাকে। রিক্সাওয়ালাকে কী যেন বলে' গোটাকয়েক বোঁচকা টপকে একেবারে আমার কাছে এল। সামনে কতগুলো লোক দাঁড়িয়ে ছিল—তা'দের আড়ালে আমি বসে'ছিলাম।

জটাধারী কাছে আসতেই বললাম—বাপার কী, চলেছ কোথায়?

জটাধারী করুণ চোখে বললে—যাচ্ছি বসিরহাটে, ওদের দেশে, কিছুতেই মশাই এড়াতে পারিনে ওকে—শেষে আর কোনও উপায় না পেয়ে রাজীই হ'য়ে গেছি; বলেছি—আচ্ছা বাপু তোর কাকাই হলাম আমি—আপনি তো সেদিন আমায় রেহাই দিলেন—কিন্তু এ আমার কী গেরো বলুন তো—আমাশার মতো লেগে রয়েছে—

বললাম—তা' এ-রকম বেশে কেন?

জটাধারীর চোখ ছল ছল করে' উঠ্‌লো। চাপা কান্নায় গলাটা বুজে এল, বললে—এই দেখুন কী সং সাজিয়েছে—বড়বাজার থেকে ও নিজের পয়সা দিয়ে সব কিনে দিয়েছে—বলে, এখন আমি গোবিন্দ মহারাজ। বসির-হাটের জমিদার বাড়ীর বউঠাকরুণ রাজ-রাজেশ্বরের এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন—লক্ষ লক্ষ টাকার দেবোত্তর—আর আমি তার মোহান্ত গোবিন্দ মহারাজ—বলে' জটাধারী প্রায় কেঁদে ফেলবার জোগাড় করছিল। তারপর থেমে বললে—কী জানি মশাই পুলিশে আবার ধরবে কি না—বড় ভয় করছে—তা আমি ওকে বলেছি—কথা আমি বলবো না, মৌনীবাবা হয়ে থাকবো—শেষকালে কী বলতে কী বেফাঁস কথা বলে' ফেলবো—কাজ কী মশাই, কী বলেন—

বেশ কৌতুক বোধ করলাম। একেই বলে ভাগ্য!

—যাই, ও আবার ভাববে বুঝি পালিয়েই গেলাম। ও এখনও জানে কিনা আমি ওর সত্যিকারেরই কাকা!...মুখ ধোবার নাম করে' চলে' এসেছি—বলে' জটাধারী পাশের ল্যাভাটরীতে গিয়ে ঢুকলো—তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে আবার নিজের জায়গায় গিয়ে বসলো।

গিন্নীর মুখের দিকে তাকালাম। ট্রেন ছেড়ে দিলে।

কথা ও কাজ

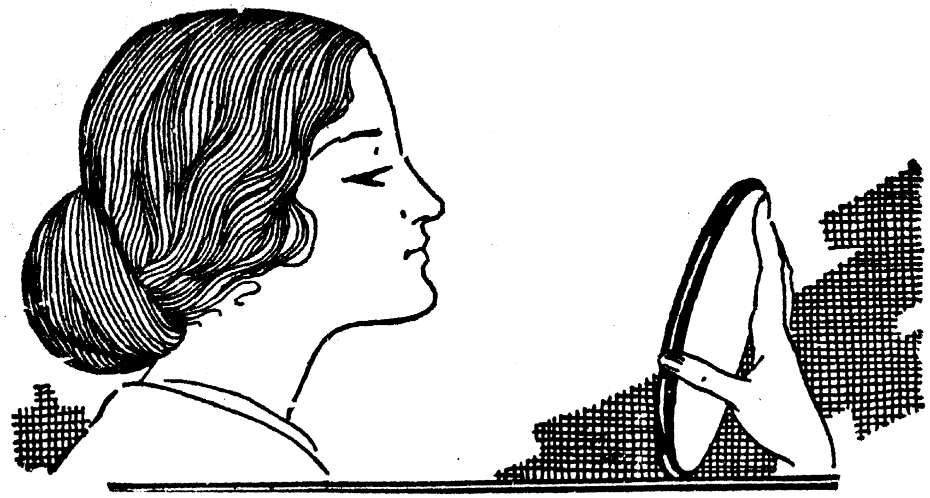
গোপাল ভৌমিক

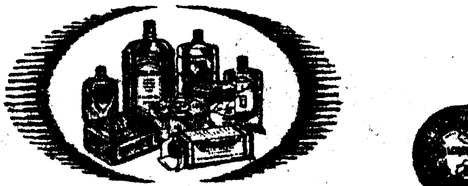
এখানে তিমির—গহ্বর শুধু—
নেই আলো, আলো নেই:
মানুষেরা বুঝি ফেললো হারায়ে
জীবনের সোজা খেই—
অন্ধকারের শঙ্কা-জটিল পথে—
পৃথিবীর বুক ভেসেছে রক্ত-স্রোতে!
দুই দিক থেকে ভেসে আসে শুধু
প্রতিপক্ষের বাণী:
যে-পথে রয়েছে সাম্য-শান্তি
আমরা সে-পথ জানি;
আমাদের সাথে তোমরাও এস
মুছে ফেলে সব গ্লানি—
দূর দিগন্তে পাওনা শুনতে—
সাম্য শঙ্খ-ধ্বনি?

শুধু কথা আর কথা:
দ্বিধা-বিজড়িত মানুষের মনে
কাঁদে যে অন্ধ ব্যথা—
কে তার খবর রাখে?
পৃথিবীকে তারা জড়ায় কেবল—
স্বার্থের বেড়া-পাকে!
বার বার ক'রে তোমাদেরই কথা শুনে—
আমরা এনেছি রক্তের স্রোত
ষ্টালিনগ্রাড—ডান্‌কার্কে:
প্রতিদানে তার কিই বা পেয়েছি ফল—
মানুষের গায়ে আরও জোরে বসে
অধীনতা-শৃঙ্খল!

ফাঁপানো কথার জাল বুনে বুনে
কেটেছে অনেক কাল:
নগর-সৌধ ধ্বংসের স্তূপ
ভাঙা লাঙলের ফাল।
জনহীন প্রান্তরে—
কায়াহীন যত ছায়ার সারিয়া
গুমরিয়ে শুধু মরে।
এবার তোমার কুঞ্চিত ভুরু তোল—
কাজের পালায় কথার মায়াকে ভোল।
নতুবা তোমার তরণী যে ডুবে যায়—
নতুন যুগের কাজের মানুষ—
সাগরোর্মির প্রায়—
আশাবাদী চোখে পৃথিবীর দিকে চায়





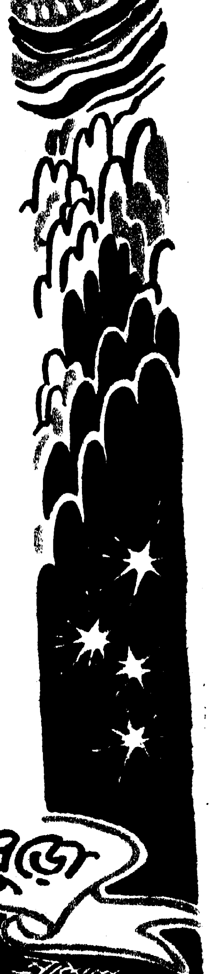


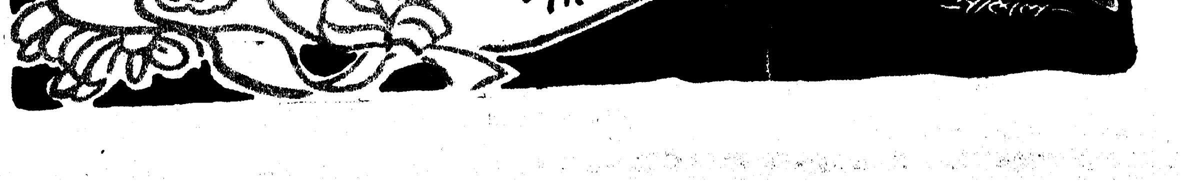


স্বপন-বুড়োর ঝুলি



বাঙ্‌লা দেশের ছেলে-মেয়ে বল্‌ছিরে মন খুলি
তোদের তরে আছে যে এক স্বপন বুড়োর ঝুলি !
সেই ঝুলিতে লুকিয়ে আছে সবার প্রাণের প্রীতি—
বাঙ্‌লা মায়ের স্নেহ-সুধার নতুন সুরের গীতি— !
লুকিয়ে আছে ঝুলির মাঝে কিশোর কল-হাসি—
রামধনুকের রঙ দিয়ে তাই রাঙ্‌তে ভালোবাসি !
সত্য পথে চলার দাবী ঝুলির মাঝেই জমা—
অন্যায়েরে কোনোমতেই করবো না ভাই ক্ষমা !
তাইত ঝুলি নবারুণের নতুন-বাণী বহে—
মিথ্যা স্তূপের আবর্জ্জনা বইতে রাজী নহে !
ঝুলির মাঝে সহজ কথা, সফল করার সুর
তোদের জীবন সকল দিকেই করবে সুমধুর।
তাইত সবায় ডাক্‌ছিরে ভাই…আয় না সবে ছুটে,
ঝুলির মাঝের যতেক মজা সবাই নে না লুটে !
আছে যতেক কিশোর দলের মনের-যাদুকর
এই থলিতে তাঁদের লেখার সাজাই যাদুঘর।
রূপকথারই রূপ অপরূপ, গল্প রকমারী
শুনতে যদি চাস্‌রে ও ভাই, আয় না তাড়াতাড়ি !
ইতিহাসের আজব কথা, হাসির ছড়া-ছবি
পাত্‌তাড়িরই পাতায় পাতায় মিল্‌বে রে ভাই সবি !
দেশ-বিদেশের গল্প-কথার সহজ অনুবাদ
শারদীয়ার পাত্‌তাড়িতে যায় নি জেনো বাদ !
সকল রসের সমন্বয়ে ভরা যে মোর ঝুলি ;
যার যে রকম রয় কামনা দুই হাতে নাও তুলি !







শ্রী দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

এক

পক্ক পল্লবের মুকুট মাথায়, সিংহাসনে, আম।

রাণী কলাবতীর সোনার মুকুট আর অল্প পাতার ঘোমটা; বসেছেন পাশে।

তালগাছ ধরেছে সবুজ ছাতা। সুপুরী গাছ—চামরের হাওয়া করছে।

কাঠঠোকরা সুপুরী গাছের গায়ে তিন ঘা দিয়ে বললে, "ওয়ান, টু, থ্রি। পাখীদের শানাই আর ঝিঁঝি-র বাঁশী আর বাজবে না মহাশয়গণ। সহরের মাঝখানে, রাজারাণীর জন্য শ্বেতপাথরের প্রকাণ্ড বাড়ী তৈরি হচ্ছে। আপনারা বেশ নিশ্চিন্তে থাকুন।"

"...'হচ্ছে' মানে কি? যাঁরা যাঁরা যাবেন, চলুন। সে বাড়ীর দোর খোলা হয়েছে আজ সাতদিন। কাল একজিবিশন হবে।"

বড় বড় তিনখানা মোটর। তাতে দলবল এসে গেল রাজারাণীকে অভ্যর্থনা করে নিতে।

সেই সময়ে, গোলমাল।

গাঁয়ের লোকেরা খবর পেয়েছে। আশে-পাশের গাঁয়ের লোক, ভেঙ্গে এসেছে, বলছে, "রাজারাণী চলে যাচ্ছেন, একটিবার আমরা দর্শন করতে পাই!"

মোটরের কাবুলী মেওয়ার দল থেকে কিসমিস ফিসফিস করে বললে, "ঈশ, কী কোলাহল! এরকম জটলা হলে, বেজায় দেরী হয়ে যাবে।"

নবাবী মেজাজ। এর মধ্যেই ঘেমে, মুছলে ঘাম।

নাশপাতি বললে, "সর্বনাশ। দর্শন করতে দাও, তা' পরেই বলবে, স্পর্শন!"

দাঁতের ফাঁক দিয়ে হেসে, কেশে, মস্কট বললে, "তা' পরে?... একেবারে দংশন!"

আর মোটর দেরী করতে চাইলে না। রাজারাণীকে, আর যে যে ফল মোটর চড়ার সখে সাজগোজ করে নিলে, তাদের নিয়ে মোটর চলে গেল।



মন্ত্রী কাঁটাল, সেনাপতি ডাব, রাজপুত্র আনারস, তাঁর কাকা তরমুজ, সিপাই শশা আর আর ছোটখাট ফল, মোটরের ধুলোর ধমকেও রইলেন গ্রামে।

কেউ গেলেন না।

দুই

দেশে যখন দুর্ভিক্ষ হল, তখনি হল মুস্কিল। গ্রামে কিচ্ছু নেই। কাজেই আশে-পাশের ছোটখাট সহরে মহকুমায়, যেতে হল ওঁদেরও।

মন্ত্রী, বেশ একটা ভাল বাজারে উঠে, হায়রাণ হয়ে গিয়ে, একেবারে শুয়ে পড়লেন। রাজপুত্র, একটা দোকানে ঢুকতে গিয়ে দেখলেন, সেখানে সিঙ্গাপুরী রাজপুত্রেরা আর সেখানকার রাজকন্যেরাও, এসে দোকানটি ভর্ত্তি করে রেখেছে। গাঁয়ের ধুলোয় মলিন পোষাক নিয়ে রাজপুত্র ঝাঁকামুটেদের একটা ঝাঁকায় উঠে ছোট একটা দোকানীর কাছে গিয়ে রইলেন ব'সে।

রাজপুত্রকে খুঁজতে রাজার ভাই আর সেনাপতি আসছিলেন। আসতেই, দেখেন বেশ একটা দোকান; অনেকটা জায়গা। বললেন, খুশী হয়ে দোকানীকে, "ঘরটা ঠিক কর তো, ভাই, এখানেই আমরা থাকব।"



দোকানী অবাক্ হয়ে বললে, "বলছেন কি? এখানে আমি সোডা লেমনেড বরফ সরবতের দোকান কচ্ছি, মাপ করুন, ঘরে উঠে নোংরা করবেন না।"

পাগড়ী মাথায় বাজারের ইজারাদার এসে বললে, "ক্যা হুয়া? হল্লা মৎ করো; ভাগো, ভাগো!"

ওঁরাই ভাগলেন, সিপাই শশা আর ছোটখাট ফলেরা দূর থেকে দেখতে পেয়ে, তাড়াতাড়ি উচ্ছে-টুচ্ছে, শাক তরকারির আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বললে, "বাপ! বাঁচলেম!"

তিন

রাজপুত্র ছিলেন যে দোকানে, তার পাশের দোকানে বিষম ঝগড়া। মনিহারী দোকান আর দৈ-দুধ চিঁড়ে-গুড়ের দোকান গায়ে-গায়ে। মনিহারী দোকানের আলমারি থেকে একটা কৌটো বারবার আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে। আর বড় কৌটোটা বুট শুদ্ধ পা বাড়িয়ে বাড়িয়ে দিচ্ছে। দৈ-দুধ চিঁড়ের দোকানের ওরা বলছে ডালা, হাঁড়ি, কড়াই-টরাই থেকে মাথা তুলে, "ওরকম কচ্ছ কেন?"

দু'কৌটো এক সঙ্গে বললে, "করব না?
আমাদের জাহাজ আসছে, ভাগো, ও দোকানটাতে আমাদের আলমারি বসবে।"

আর একটা আলমারি থেকে আরো বড় একটা লাল কৌটো নাক উঁচু করে বললে, "ওদের জাহাজ আসছে, আমার ট্রেণও আসছে, জান ?"

নিঃশ্বাস ছেড়ে দুধ, দৈ আর চিঁড়ে বললে, "কি আর বলব, দিন তোমাদেরি। ভাই কনডেন্সড্, তুমি সবার ছোট, চুপ চাপ থাক। ভাই ওটস, তুমিও চুপ কর। ভাই চা, তুমি আবার মানুষ। নিজে কখনো কারো পেট ভরাতে পেরেছ, যে বলছ ?

মুখ বোজ।"

চা একটু লজ্জা পেল। পেয়ে চুপ করেই রইল। কিন্তু, কনডেন্সড আর ওটস, খুব রেগে গিয়ে হাত পা ছুঁড়ে নেমে এসে, ঢুকল গিয়ে পাশের ওষুধের ডিস্পেন্সারীতে।

তাদের দেখে, ওষুধেরা বললে, "কি ব্যাপার ?" বল্লে তারা, "শোন, দাদা।"

চার

ক'টা দোকানেই হুলস্থূল পড়ল। শুনে-টুনে' ওষুধেরা বললে, "তাই তো। এ দেশে আবার কী আছে ? মানুষ বেঁচে যে আছে, সে আমাদের জন্য।"

তার পাশের দোকান থেকে আস্তে বুড়ো গলার আওয়াজ, এল "কী বলছ হে ভাই ?"

ওষুধের লেবেলগুলো বেশ লাল হয়ে উঠল, বললে মোটা গলায়, "বুঝে শুনে কথা বলো।"

বুড়ো গলায় উত্তর এল একটু স্নেহের সুরেই, "ভাই, থামো, থামো, একটু ঠাণ্ডা হও।"

আলমারি থেকে ডাক্তারী ওষুধেরা বেরোতে যাবে, এমন সময় একটি রোগী এল ওষুধ নিতে।

ওষুধেরা দাঁড়াল, "আপনার কী অসুখ ?"

রোগী বললেন, "ও! এটি ডাক্তারখানা ? কবরেজী চিকিৎসে বুঝি পাশে হয় ?"

ভদ্রলোক, ফিরে, পাশের ঘরে গেলেন।

সেখানে বললে কবরেজী বড়ি-টড়িরা, "আসুন, বসুন। বসে' আছিই।"

আলমারির ভিতরে ভিতরে দুই দোকানে তখন ভারি গোলমাল।

ডাক্তারখানার ওষুধেরা ভাবছে, রোগী চলে গেল, এটা ঠিক নয়। "ওখানে ও ভদ্রলোকটি নিশ্চয় মারা যাবে, ওঁকে উদ্ধার আমরা করবই।"

কবরেজী বড়িরা শুনতে পেয়ে বললে, "আমরা ওঁকে বাঁচাবই।"

পাঁচ

দোকান ছেড়ে বাজার শুদ্ধ, শেষে সহর শুদ্ধ, হুলস্থূল পড়ল। সারা সহরের যত ডাক্তারী ওষুধেরা, শিশিটিশি থেকে বেড়িয়ে, সঙ্গীন উঁচিয়ে জমল খোলা বড় বড় মাঠে। ইন্জেক্শানের দারুণ ছুঁচলো ছুঁচলো সঙ্গীন্। কবরেজী ওষুধেরা কৌটো-টৌটো থেকে বেরিয়ে, গুলিগুলো আর বারুদ···চূর্ণ, ভস্ম, সব ঠিক আছে কিনা, দেখতে লাগল।

ক'দিনেই, খবর সব, খবরের কাগজে উঠে গেল।

বড় বড় সহরে তো বটেই, দেশের সমস্ত ডাক্তার কবিরাজেরা দেখলেন, মহাবিপদ!

সব জায়গাতে হোমিওপ্যাথির ছোট ছোট হাজার হাজার শিশির ওষুধেরা এক একটা কিশোর ব্রিগেড গড়ে তুলল।

কলকাতায় ব্রিগেড হ'ল। দমকলের। আগুন নেভাবার জন্য।

এদিকে মন্ত্রী এসেছেন উঠে। ভাবছেন। সেনাপতি, রাজার ভাই এসেছেন। রাজপুত্র এসেছেন। এঁরা সব মুটের ঝাঁকায়। ব্যাপার যদি তেমন কিছু দেখেন। ধরবেন একটা পথ।

যত ফল, যত মানুষ, যত চিকিৎসকেরাই ভাবতে লাগলেন,—"এখন কি করা যাবে ?"

———





ভুল

শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

নাচকে যদি নৃত্য বলো
মাছকে বলো মৎস।
গাছকে তবে বল্‌বনাক
কেন বলো গৎস ?

রাত্রিবেলা দুপুর হলে
পিসেমশাই গেলেন জলে
বাছা বলে' ডাকেন না আর—
বলেন মোরে বৎস।

দাঁতের ব্যথা হলে কাণে—
ওষুধ খুঁজি অভিধানে
নিন্দা শুনে মনে আনে
উৎসাহেরি উৎস।

সাত বৎসর কেটে গেছে
শিখতে ত যুযুৎস।

———



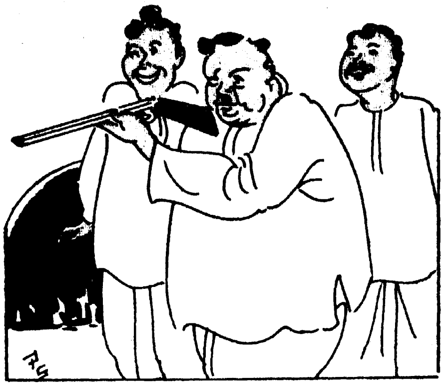
জমিদার বাবু নৌকা ভাসান নদীতে,
সুন্দর বনে চলেন ব্যাঘ্র বধিতে।
নায়েব এবং মোসায়েবগণ সদলে,—
সাথে চলে তার, লোক-লস্কর সকলে।
লাঠি, বল্লম, বর্শা ও টাঙ্গি যা'ছিল,
আর যত কিছু হাতিয়ার ঘরে আছিল,
সব নিয়ে চলে ব্যাঘ্র শিকার করিতে।
জমিদার বাবু জাঁকিয়ে বসেন তরীতে।
বন্দুক আর পিস্তল তাঁর দু'হাতে,
গর্ মাগরম্ গুলী ভরা আছে উহাতে ;



নিজ হাতে আজ শিকার করিবে বাঘেরে,
ভাবতেও মনে কত আনন্দ জাগে রে।
যেখানেই থাক্ সাম্‌নে কিম্বা পিছুতে
বাঘ-বাবাজীর রক্ষা নাইক' কিছুতে।
জমিদার বাবু এ কথা জানান্ আভাসে,
উৎসাহ পান্ 'বাহবা' এবং 'সাবাসে'।
মোসায়েব দল খোসামোদ করে তাঁহারে
জমিদার বাবু হেসে ঢলে পড়ে, আহা রে।

সন্ধ্যা নেমেছে শান্ত-নদীর দু' তীরে,
আকাশের পটে ক্রমে ক্রমে ওঠে ফুটি রে
জল্‌জল্-করা লক্ষ-তারার হীরা যে,—
সমুখে গভীর সুন্দর-বন বিরাজে।
নদীতীরে এক ছোট গ্রাম আছে যেখানে
জমিদার বাবু নৌকা ভিড়ান্ সেখানে।

খস্ খস্ ধ্বনি হঠাৎ শুনিয়া ওপারে
জমিদার বাবু সোল্লাসে কন "তোফা রে,—
ঐ এলো বাঘ, আওয়াজটা তার চিনা রে,—
ঐ জ্বলে চোখ কালো ঝোপটার কিনারে।"
এই ব'লে বাবু বন্দুক তুলে দাগিয়া—
'দুম' করে ছুটো গুলী ছেড়ে দিল রাগিয়া।



ঘায়েল হয়েছে বাঘটা এবার পলকে,
এমন ব্যাপারে সন্দেহ করে বলো কে।

ভোরবেলা সবে ডাঙায় আসিয়া দাঁড়ালো,—
বাঘ নাহি পায়, মরা-বাঘ কোথা হারালো ?
হঠাৎ বলিল নৌকার মাঝি পীরু আলি,—
"আরে আরে হেথা মরে আছে এক বিড়ালী।"
ঝোপের আড়ালে বিড়ালী রয়েছে মরিয়া,
গুলী ছুটো তার গেছে দেহ ভেদ করিয়া।
বাঘের বদলে বিড়ালী মরেছে তবে কি ?
জমিদার হাতে এত বড় ভুল হবে কি ?



ব্যাপার দেখিয়া জমিদার বলে হাসি রে—
"বাঘ না মেরেছি, মেরেছি বাঘের মাসীরে।"
"ওটা একই কথা—" মোসায়েব দল বলিল,
আবার সকলে নৌকা ভাসায়ে চলিল।

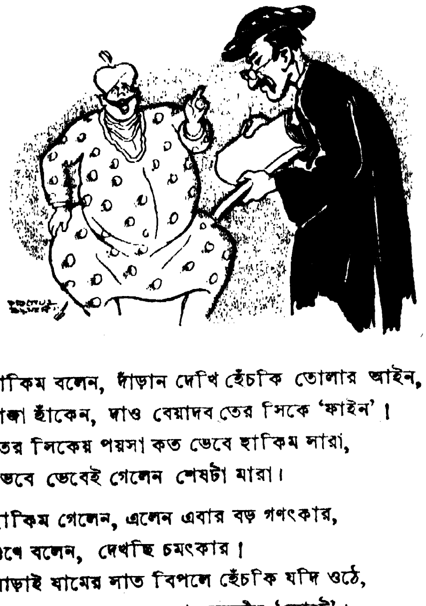


বদ্‌রাগী রাজা

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

এক যে ছিলেন রাজা
সামনে যারে পেতেন তারেই
ধরে দিতেন সাজা।
এমনি ছিলেন বদ্‌রাগী সে রাজা।

হ'ল কি একদিন,
হেঁচকি তুলে বলেন রাজা,
গা কেন ঘিন্ ঘিন্ ?
হেঁচকি কেন ওঠে ?
শুক্‌নো গলা, সাড় কেন নেই জিভে এবং ঠোঁটে ?
উজির, নাজির, আমির সবাই আনতে ছোটে হাকিম ;
আকার টুকুর ভুল করে' সব এনে হাজির হাকিম।



হাকিম বলেন, দাঁড়ান দেখি হেঁচকি তোলার আইন,
রাজা হাঁকেন, দাও বেয়াদব তের দিকে 'ফাইন'।
তের লিকেয় পয়সা কত ভেবে হাকিম সারা,
ভেবে ভেবেই গেলেন শেষটা মারা।

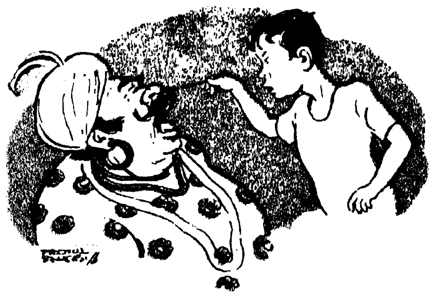
হাকিম গেলেন, এলেন এবার বড় গণৎকার,
গুণে বলেন, দেখছি চমৎকার।
আড়াই ঘামের সাত বিপলে হেঁচকি যদি ওঠে,
রাজার দফা রফা হবে, শহরতলীর 'ভোটে'।
বিষম রাগে ফুলে',
রাজা বলেন, চড়াও ওটায় শূলে।
গণৎকার 'ত শূলে গেলেন হেঁচকি থামে কই
সারা দেশে পড়ল হৈ চৈ।

হেঁচকি নিয়ে বিচার করে দিগ্‌গজেরা সব
টাউন হলে বসল সভা, বিষম কলরব।

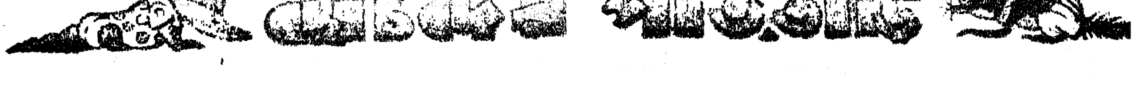
অবশেষে কবিরাজ এক এলে ধরেন নাড়ি,
বলেন, দেখি বেজায় বাড়াবাড়ি।
বুঝতে বাকি নেই তবুও কেন ওঠে হেঁচকি,
খেয়েছিলেন রাণীর রাঁধা হেঁচকি।
রী রী করে ওঠে রাজার গা,
বলেন, মোটেই না।
রাজা হয়ে এতই বুঝি গেছি অধঃপাতে ?
হেঁচকি ত খায় যত হাড় হাবাতে।
যা খায় তাই হজম করে' মরে,
হতভাগা গরীব উড়নচড়ে।
পোলাও বিনে পেট ফাঁপে না, কিসের রাজা তবে,
কালিয়া কাবাব খেয়ে যদি বদহজম না হবে।
শুনে ভয়ে যেই কবিরাজ মলতে গেলেন কান,
দেখেন, আগেই গিয়েছে গরদান।

পড়ল ঢেঁড়া হাটের মাঝে, ওঠে রাজার হেঁচকি,
ঘুমিয়ে আছে দেশ কি ?
জলদি এসে যে পার সে থামাও।
হয় বখশিষ নাও নইলে জান্‌টা দিয়ে যাও।

রাজার যত হেঁচকি ওঠে, দেশে লাগে মড়ক।
তৈরী হ'ল মশান যাওয়ার চওড়া পাকা সড়ক্
কত এল দেশ-বিদেশের গুণী রোজা, ওঝা।
নামিয়ে গেল শুধু মাথার বোঝা।
জড়ি বুটি খাওয়ায় কেউবা, কেউবা করে মালিশ,
শোওয়ায় বসায় নানাভাবে, পেটেপিঠে-বালিশ,
জল খাওয়াল ঘড়া ঘড়া, জালা জালা ঘোল
ফুলে রাজার পেটটা হল ঢোল।
হেঁচকি তবু ওঠে,
দেশে বুঝি জন মানুষ রইল না আর মোটে।
সবার শেষে এল হেসে ডান্‌পিটে এক ছেলে,
বলে, পারি রোগ সারাতে খেংরাকাঠি পেলে।



খেংরাকাঠি নিয়ে রাজার নোংরা নাকে পুরি',
যেমনি সে না দিয়েছে সুড়সুড়ি,
বাজের মত পড়ল বিষম হাঁচি।
রাজার ভুঁড়ি কেঁদে গেল, শুনে আমরা বাঁচি।



জয়চন্দ্রদা



অনিল চন্দ্র রায়

ছেলেবেলার কথা আমার আজও বেশ মনে পড়ে। আমাদের ছোট গ্রামখানিতে তখন কত লোকই না বাস করতো ; পাড়ায় পাড়ায় ছেলের দল মিলে ক্লাব, কুস্তি করবার আখড়া কতই না গড়েছিল। গ্রামের প্রান্ত দিয়ে ধরলা নদী এঁকে-বেঁকে আপনার মনে ব'য়ে চল্‌তো—কত দূর দেশ থেকে পণ্যদ্রব্য বোঝাই করা নৌকো পাথরের জিনিষ, চকমকি খেলনা, কাঠের দু'নলা বন্দুক, তুলো দিয়ে তৈরী হাঁস নিয়ে গ্রামের ঘাটে এসে নোঙ্গর করতো, তারপর দু'দিন থেকে সমস্ত জিনিষ বিক্রী করে বিদেশী মাঝিরা পাল তুলে গান গাইতে গাইতে নৌকো ছেড়ে দিতো। দিদিমা মনে করতেন মাঝিরা ছেলে ধরে নিয়ে যাবে, তাই আমাদের শত সহস্র আবদার সত্বেও নদীর ধারে বল্লভ কাকার সঙ্গেও যেতে দিতেন না। নৌকো ঘাটে এলেই আমরা খবর পেতাম আর বিস্ময়জড়িত কৌতূহল আমাদের সর্ব্বদা ঘিরে রাখতো।

একদিন ভোরে আমরা বাইরের বারান্দায় বসে সবে পড়া আরম্ভ করেছি—দাদামশাই হুঁকোয় টান দিতে দিতে আরাম কেদারায় তন্দ্রাতুর হয়ে আছেন। ঘরের পাশেই বল্লভ কাকার বড় সাধের ফুলের বাগান। সেখানে ভোর না হতেই যে কত রকমের পাখী এসে কলরব করে তার ইয়ত্তা নেই ;—কত দূরদেশে এদের বাড়ীঘর, সেখানে কি ফুলের অন্তহীন বন, গন্ধভারাক্রান্ত হোয়ে চিরসরস হোয়ে থাকে! লাল নীল ছোট একটি পাখীকে দেখবার জন্য আমরা দু'ভাই প্রায়ই উদভ্রান্ত হোতে থাকতাম। বাগানের দিকে এগিয়ে যেতেই দেখি একটি বিরাট পুরুষ একজন যুবককে অবলীলাক্রমে কোলের মধ্যে খেলার মত করে নিয়ে ঘরের দিকে আসছে। লোকটা লম্বায় চওড়ায় কি ভীষণ, চোখ দু'টো যেন অস্বাভাবিক জ্যোতিতে পূর্ণ! বারান্দায় উঠেই যুবকটিকে ধপ করে ফেলে দিতেই, বিস্মিত হোয়ে দাদামশাই বলে উঠলেন, "ও কি জয়চন্দ্র, এ আবার তোমার কি ব্যাপার, একটা না একটা লেগেই আছে যে দেখছি।"

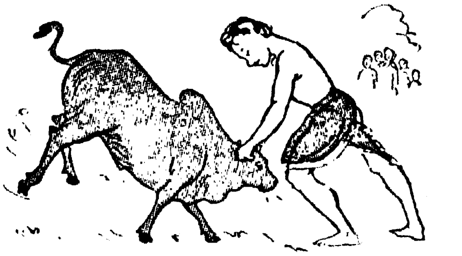
লোকটি দাদামশাইয়ের পায়ের ধূলো নিয়ে বিনীত কণ্ঠে বল্‌লো,—"দাদাবাবু, দেখুন না এ কি অন্যায়, আমি নদীতে প্রাতঃস্নান করতে যেয়ে দেখি এ ব্যাটা মাঝি একটা তুলোর হাঁস বের করে, পালদের বাড়ীর ছোট ছেলেটার হাতে দিয়ে, এদিক ওদিক চেয়েই টান মেরে তার গলার সোনার হারটা ছিনিয়ে নিয়ে নৌকোয় পালিয়েছে। ওর মা তো দূর থেকে দেখেই কেঁদে খুন।"

দাদামশাই বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, "তুমি কি করলে তখন, জয়চন্দ্র ?"

জয়চন্দ্র রোষান্বিত নেত্রে যুবক মাঝিটির নিতান্ত ভীত সঙ্কুচিত দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করে সজোরে বল্লে, "এক লাফে আমি নৌকার গলুইতে উঠতেই একটা মাঝি সবেগে আমাকে তাড়া করে আসছিল। এগিয়ে যেয়ে তাকে এক ধাক্কায় জলের তলে, তারপর এ ব্যাটাকে উঁচু করে তুলে মাটিতে প্রথমে ফেলে দিয়ে—নীচে নেমে, ওর হাত আর পা বেঁধে চ্যাংদোলা করে এনেছি ; বিচার তো আপনার হাতেই।"

দাদামশাই গম্ভীর সস্নেহ দৃষ্টিতে জয়চন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বল্লেন, "কয়েক বছর ছিলে না এখানে, কোন গণ্ডগোলই ছিল না, এসেই দেখ্‌ছি আবার ল্যাঠা বাধালে, বাঘ মেরে হাত পাকিয়েছ তুমি, তোমার কি মানুষের কাজ—।"

আমরা দু'ভাই বিস্মিত নয়নে তাকিয়ে রইলাম ; এই সেই জয়চন্দ্রদা—কয়েক বছর আগে দাদাভাই যখন সন্ধ্যের দিকে ভাত খেতে চাইতো না, মা উনুনের ধারে রান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, তখন নিতান্ত স্নেহসিক্ত কণ্ঠে দিদিমা 'জয়চন্দ্রদার' গল্প বলে খাবার মুখে তুলে দিতেন। দাদামশায়ের পাঁঠাকাটা বড় খড়্গ নিয়ে গ্রামপ্রান্তে বরিষার ঘন জঙ্গলের ধারে দ্বিপ্রহরের নির্জ্জনতার মধ্যে অসীম সাহসের যুদ্ধ, দ্বিখণ্ডিত বাঘের রক্তাক্ত দেহ ঘাড়ে নিয়ে দাদামশায়ের চরণপ্রান্তে ফেলে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম, নৌকোর অভাবে ছয়মাইলব্যাপী বর্ষাবিস্ফারিত নদী অবলীলাক্রমে সন্তরণ করে সপ্তমী পুজোর তিথির মধ্যে চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত হোয়ে "মা, মা দুর্গা দশভুজা" বলে বিরাট চীৎকার আজও যেন সকলের কাছেই প্রত্যক্ষের মত স্মৃতিপটে জাগরিত হোয়ে আছে।



কিন্তু ভীমসম জয়চন্দ্রদার এত পরাক্রম গ্রামের জমিদার আমার দাদামশায়ের কাছে এলেই যেন স্তিমিত হোয়ে পড়তো—যার যত নালিশ, যত আবদার, যত অপরাধের সাজা সব যেন এই একটি লোকের কাছেই বিচারের জন্য অপেক্ষা করে থাকতো।

দাদামশায়ের ভৎসনায় জয়চন্দ্রদা মুখ নীচু করল—মাঝির ওপর কড়া হুকুম হলো ওপারের উজান গাঁয়ের কোন নৌকো ছ'মাসের মধ্যে এ ঘাটে ভিড়তে পাবে না, তা' ছাড়া মাঝিকে নগদ জরিমানার টাকা এম্নি দিয়ে যেতে হবে—সেদিনকার কালে আদালত বলতে গ্রামের লোক দাদামশায়ের বৈঠকখানা বুঝতো—সব অভাব অভিযোগের মীমাংসা এখান থেকেই হোতো এবং এই দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপশালী জমিদারের হুকুম কেউ অবজ্ঞা করবার সাহস পেতোনা। মাঝিরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই দূর থেকে একটা কলরব যেন ক্রমশঃ কাছে আসতে লাগলো। একদল লোক লাঠি, বর্শা, কোদাল হাতে করে উত্তেজিতভাবে এগিয়ে আসছে—দাদামশায় ধরপড় করে চেয়ার থেকে উঠে এগিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা অমন করছ কেন ? কি হোয়েছে ?'

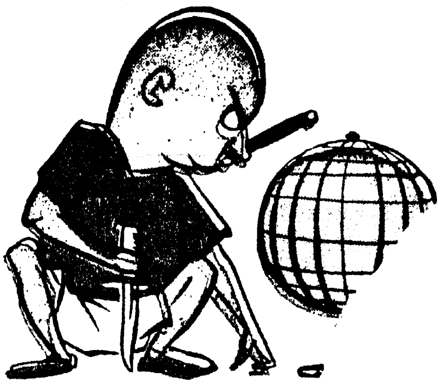
অনেক লোকই এক সঙ্গে উত্তেজিতভাবে যা বলবার চেষ্টা করলো তাতে এই বোঝা গেল যে, কলুদের বড় ষাঁড়টা ক্ষ্যাপার মত হোয়ে ঘানি ভেঙ্গে বেরিয়ে গেছে, দক্ষিণা-ঠাকুরের ছোট ছেলেকে গুরুতর রকম জখম করে এই রায়পাড়ার দিকে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ একটি 'সরসর' শব্দ শোনা গেল, দূরে বাগানের মধ্যে বাঁশের বেড়ার ধারে মুখ নীচু করে ষাঁড়টা আসছে—অস্ত্রধারী সবাই যে যেদিকে পারে দৌড়। গোমস্তা বল্লভ কাকার কচি ছেলে রামু উঠানের



আণবীয় বোমা ফাটিয়া কোথায়
দানবীয় কাজ করে।—
বি-এস সি ফেল বৈজ্ঞানিকের
তাইতে টনক নড়ে।
কহিলেন রেগে গজপতি সেন,
'আমারি রিসার্চ্চ-রুমে



ল্যাবোরে
'স



এরি গবেষণা চালাচ্ছিলাম,
যুক্তেরি মরশুমে
ভালো ক'রে ফল না হ'তে
ফাঁস করে
কহিলেন—'ম্যাও সামলা
বিপদে পড়
কাদের বিপদ, কিসের বি
আমরা জা
মুগ্ধ দৃষ্টি মেলিয়া চাহি
মাথা হ'তে

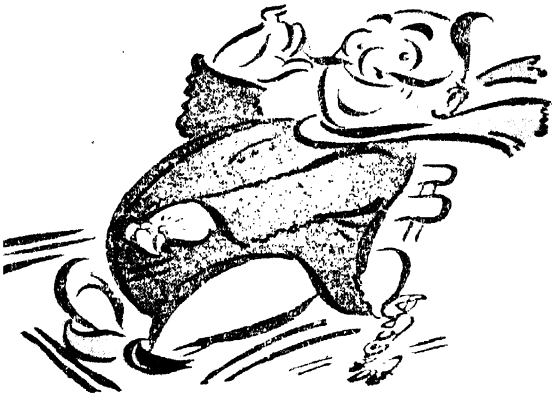
মধ্যে যে একা! ফলাফল চিন্তা
মালকোঁচা দিয়ে জয়চন্দরদা এক
তার পেশী-বহুল হাতের শিরা
চোখে দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের ভাব। অ
বেড়ার পাশে গিয়ে জয়চন্দরদা
সঙ্গে ষাঁড়ের দু'টো শিং চেপে
ধ্বস্তাধ্বস্তি, লাঠিধারী লোকজনের কে
না। হঠাৎ ষাঁড়টা এক প্রবল আর্ত
মধ্যে গিয়ে পড়লো—রক্তের স্রোত তার
জয়চন্দরদার দুইহাতে ষাঁড়ের দুই শি
পড়ছে। সেই থেকে তার নাম হোল

• মূলে সত্য ঘ





বেচু তলাপাত্র
কিছু বলা মাত্র
মিছি মিছি খপ ক'রে
ক্ষেপে হয় খাপ্পা।



সখারাম চৌধুরী,
হাঁকায় সে চৌঘুড়ি,
ট্যাঁকে নেই টাকা, শুধু
দেয় মিছে ধাপ্পা।

রঘুরাজ শিকদার,
মাথা নাই ঠিক তার,—
চোখ লাল, মুখ লাল,
গালে গালপাট্টা।

গোবেচারী জগু রায়,—
রঘু গিয়ে বক্তৃতায়
দিয়ে তারে গালাগাল
গালে মারে গাঁট্টা।

লোকনাথ মোক্তার,
অতি সাধুলোক,—তার
হাতে হরিনাম ঝোলা,
পাতে দধি-মাংস।

ডি-কে-সেন ডাক্তার,
ঘরে ঘরে ডাক তার,—
রুগী তার হাতে এলে
মরে অধিকাংশ।

ভৈরব কবিরাজ,
আগে ছিল কবি,—আজ
তেজারতি কারবার
করে নানা সূত্রে।

রামগতি সরকার,
সুতো কাটে চরকার,—
ছুতো পেলে দেয় জেলে
আপনার পুত্রে।

নিকুঞ্জ হালদার,
উকিল সে মালদা'র,—
সম্প্রতি ছবি আঁকে
আধুনিক আর্টে।



বেনোয়ারী পাঠকের
বাতিকটা নাটকের,—
গ্রামজোড়া নাম তার
শকুনির পার্টে।

নকুড় তরফদার,—
বন্ধু এ-সব তাঁর,—
নাম শুনে' ছেলে-বুড়ো
মরে-যে আতঙ্কে।

আমি রাজু মিত্র,
তাঁরি দৌহিত্র,—
মিল ক'রে ছড়া লিখি,
ফেল করি অঙ্কে।

———



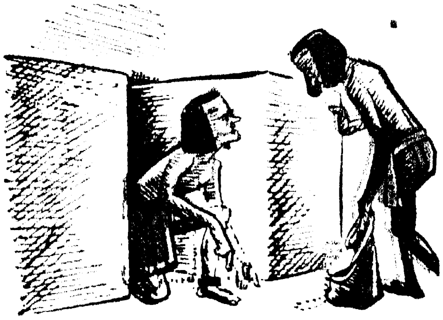
মিশর দেশের রূপকথা

এক ছিল রাজমিস্ত্রী। তার মত কাজ জানা লোক সে দেশে আর একজনও ছিল না। কিন্তু ভালো কাজ জানলে কি হবে, ভালোমত পয়সা সে পেত না, সারা জীবনটা দুঃখ করেই কেটে গেল।

মরবার সময় দুই ছেলেকে ডেকে সে বলে গেল—দেখ, বাবা, তোরা আর রাজমিস্ত্রীর কাজ করিসনে, আমার মত দুঃখ পাবি। রাজার যে ধনভাণ্ডার আছে, সেটা আমিই তৈরী করেছিলাম, তার উত্তর দিকের দেয়ালে চিহ্ন করা একখানি পাথর আছে, সেখানা একটু চেষ্টা করলেই খুলতে পারবি, ভিতরে ঢুকে যখন যেমন দরকার সোনা রূপা নিয়ে আসবি—

রাজমিস্ত্রী মারা যাবার পর দুই ছেলে রীতিমত চুরি সুরু করলো। মাঝ রাতে যায়, পাথরখানি সরিয়ে বড় ভাই ভিতরে ঢোকে, ছোট ভাই বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দেয়। বড় ভাই থলি ভরা মোহর নিয়ে বেরিয়ে এলে, পাথরখানি আবার ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিয়ে দু ভাই বাড়ী ফেরে। মোহর ভাঙায় আর খায়, দিব্যি দিন কাটে।

এদিকে রাজা দেখেন ধনভাণ্ডারের টাকা পয়সা হীরে জহরৎ রোজই যেন কিছু কিছু কমে যাচ্ছে। চোরকে ধরার জন্য তিনি ভিতরে একদিন ফাঁদ পেতে রাখলেন।



টহু মহু দু'ভাই চুরি করতে এসে, সেই রাতে ফাঁদে পড়ে গেল। টহু ভিতরে ঢুকেছিল, বললো—মহু, লোহার ফাঁদে আটকে গেছি ভাই, ছিঁড়ে বেরুবার তো উপায় নেই। তুই এক কাজ কর, আমার মাথাটা কেটে নিয়ে যা—

মহু বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, বললো—সে আমি পারবো না।

টহু বললো না পারলে চলবে না। রাজার বাড়ী চুরি করা, ধরলেই ফাঁসী দেবে, আমি তো মরবোই। তবে শুধু আমাকেই তো মারবে না, আমাকে চিনতে পারলে তোকেও ধরবে, চোরের ভাই চোর বলে তোকেও ফাঁসী দেবে—আর তুই যদি আমার মাথাটা এখনই কেটে নিয়ে যাস তাহলে আমাকে আর চিনতে পারবে না, তাহলে দু'জনে আর প্রাণে মরলুম না, একজন বেঁচে গেল।

টহুর কথাই ঠিক। কাজেই শেষে মহু ভাইয়ের মাথাটা কেটে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল।

রাজা দেখলেন চোর তো ধরা পড়েছে, কিন্তু তাকে চেনা যায় না। বললেন—বেশ! ওকে কবরও দিওনা পুড়িয়েও ফেলো না, মাঠে ফেলে রেখে দাও গে। যে মুণ্ডু নিয়ে গেছে সে ধড়টাও নিতে আসবে, তফাৎ থেকে নজর রাখবে, তাকে ধরবে—

মহু দেখলো টহুর দেহ মাঠে পচছে, আর তার উপর নজর রেখেছে দু'জন সৈন্য।

সন্ধ্যাবেলা দু'বোতল মদ হাতে নিয়ে মাতাল সেজে মহু সৈন্য দু'জনের সামনে গিয়ে বসলো, বললো—বাবা, আর চলতে পারছি নে, একটা বোতল আগে এখানে শেষ করি পরে অন্য কথা।

একটা বোতলে জল ভরা ছিল, সেই বোতলের ছিপিটি খুলে মহু গলায় ঢেলে দিল। তারপর মাতালের মত সটান শুয়ে পড়লো সেই-খানেই। মদের বোতল দেখে সৈন্যদের জিবে জল এসেছিল, এখন সুবিধা পেয়ে ভর্তি বোতলটি টেনে নিয়ে দু'জনে আধাআধি ভাগ করে খেল।

সে বোতলটায় শুধু মদই ছিল না, মদের সঙ্গে মেশানো ছিল ঘুমের ওষুধ। সৈনিক দু'জন খেল আর ঘুমোলো।

মহু এতক্ষণ চোখ বুজে ঘুমের ভাণ করে পড়েছিল, এবার উঠে টহুর দেহটা নিয়ে সরে পড়লো।

রাজা এবার চোর ধরার নতুন ফন্দী করলেন, চারিদিকে ঢাক পিটিয়ে দিলেন—রাজকন্যার স্বয়ম্বর হবে, যে নিজেকে সবচেয়ে চালাক প্রমাণ করতে পারবে, রাজকন্যা তাকেই বিয়ে করবে—

একে একে কত লোক আসে, কত চালাকির কথা বলে, কিন্তু কাউকেই রাজকন্যার পছন্দ হয় না। শেষে একদিন সন্ধ্যাবেলা মহু গেল রাজকন্যার সঙ্গে দেখা করতে। রাজকন্যার কাছে গল্প করলো—ধনভাণ্ডারে চুরি করার কথা··· সৈন্যদের মদ খাইয়ে টহুর দেহ সরিয়ে আনার কথা···

রাজকন্যা দেখলো এতদিনে ঠিক লোককে পাওয়া গেছে, তাড়াতাড়ি তার একখানি হাত চেপে ধরলো—চীৎকার করে উঠলো—দারোয়ান! দারোয়ান!

এমনি একটা কিছু ঘটতে পারে, মহু তা গোড়া থেকেই আন্দাজ করেছিল, গায়ে তাই সে চাদর জড়িয়ে গিয়েছিল, আর চাদরের ভিতর ছিল একটি মোমের হাত। যতক্ষণ সে কথা বলছিল সেই মোমের হাত নাড়ছিল সত্যিকারের হাতের মত। রাজকন্যা সেইটিকেই আসল হাত ভেবে চেপে ধরেছিল। সেই মোমের হাত রাজকন্যার হাতেই রইল, দারোয়ান ছুটে আসার আগেই সে জানালা টপ্‌কে উধাও হয়ে গেল।

দেখে শুনে রাজা তো থ'! বললেন—হাঁ, এতদিনে আমার রাজ্যে একজন সত্যিকারের বুদ্ধিমান লোক জন্মেছে!

পরদিন রাজ্যময় ঢাক পিটিয়ে দিলেন,—চোরকে তিনি ক্ষমা করেছেন, তার বুদ্ধি দেখে খুসি হয়েছেন, তাকে পুরস্কার দেবেন—অর্দ্ধেক রাজ্য আর রাজকন্যা।···



মহু এবার রাজ-দরবারে এলো, রাজকন্যা দেখেই চিনলো—হাঁ, এই লোক।

বিরাট ধুমধাম করে রাজকন্যার সঙ্গে মহুর বিয়ে হয়ে গেল। অর্দ্ধেক রাজ্য পেয়ে মহুর আর কোন দুঃখ রইল না।

আমার কথাটিও ফুরালো।

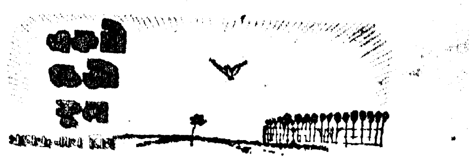
— — —



হঠাৎ গিয়ে পড়েছিলাম লাইন-দেওয়ার দেশে
সেই কথাটা ভেবে এখন, মরছি হেসে হেসে।
সবাই মিলে হাসেন সেথা লম্বা ক'রে লাইন,
অমনি করেই হাসির রেওয়াজ, এই সেথানের আইন।
বৌ-ঝি'রা সব ঝগড়া করে এমনি লাইন ক'রে
রাস্তা-ঘাটে চলছে এমন অষ্টপহর ধরে।
চুল কাটে সব লাইন দিয়ে, কামায় মুখের দাড়ি
লাইন ক'রে খোঁজেন সবাই কোথায় ভাড়া-বাড়ি।
দেখে এলাম বর-ক'নে সব করছে মজার বিয়ে
লাইন ধ'রে ছাদনা-তলায় টোপর মাথায় দিয়ে।
গল্প ক'রে পদ্য লেখেন লাইন দিয়ে কবি
শিল্পীরা সব তেমনি ক'রে আঁকেন ডিমের ছবি।
দেখে এলাম সেই দেশেতে সব কিছুতে লাইন
আইন-ভঙ্গ করলে নাকি আড়াই টাকা ফাইন।
নাচতে হ'লে লাইন লাগায়, কিংবা পেলে হাঁচি
লাইন সেথায় দিতেই হবে, নেহাৎ কেন' মাছি-ই।
পান সাজে সব লাইন দিয়ে, তেল মাখে সব টাকে
গামছা প'রে অমনি ক'রে, ওষুধ লাগায় নাকে।
লাইন দিয়ে ওস্তাদেরা করেন কালোয়াতী
রাত-দুপুরে নস্যি নিয়ে মাথায় দিয়ে ছাতি।
কিন্তু এমন কাণ্ড কভু কেউ শুনেছ ভবে—
মোচার ঘণ্ট খেতে হ'লেও, লাইন দিতে হবে?



আজ শরতের সোনার আলো
ডাক পাঠালো দিগ্‌বিদিকে,
কিশোর মনে সঙ্গোপনে
পাতলো রঙিন আলনটিকে।
ধানের শীষে কাশের ফুলে
এলোমেলো লাগলো দোলা,
আয়রে কাঁচ আয়রে কাঁচা
আয়রে কিশোর আপন ভোলা।
মৌমাছিরা ভীড় জমিয়ে
পদ্মফুলের বনে বনে,
আগমনীর গান ধরেছে
মিষ্টি মধুর গুঞ্জরণে।
ভাইবোনেরা ভীড় ক'রে আয়
আয় ছুটে আয় নিঃস্ব যারা,
ভোরের আলো ডাক পাঠালো—
"আনন্দ আজ বাঁধনহারা।"



পথের ধারে একখানি বাগান-বাড়ি। তার সামনে একখানি ফুলে ভরা বাগান। বাগানখানি সাদা রঙের কাঠের বেড়া ঘেরা। কাঠগুলির মাথায় একটি করে সবুজ রঙের কাঠের গোলা বসানো। বেড়ার বাইরে বাঁধের ওপর সবুজ, কোমল ও সবচেয়ে তাজা ঘাসের বনে হয়েছিল ছোট্ট একটি ডেজী ফুল। বাগানের সুন্দর ফুলগুলির ওপর সূর্য্য যেমন আলো ঢালতো তেমনি ঢালতো তারও ওপরে। তাই সে ফুলে উঠছিল, বাড়ছিল। শেষে একদিন সকালে সে পাপড়িগুলি সব মেলে দিয়ে ফুটে উঠলো।

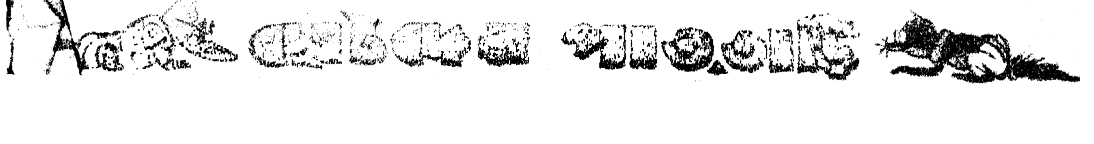
সেই ছোট্ট ফুলটির একটিবারও মনে হত না, সে ঘাসের বনের মাঝে রয়েছে, তাই কেউ তাকে দেখতে পায় না। সে তাতেই ছিল খুশি। সে শুধু সূর্য্যের দিকে মুখ ফেরাতো, তার দিকে তাকাতো, আর কানপেতে শুনতো লার্ক-পাখিটির গান। পাখিটি গাইতো আকাশে। সেও যে গান গাইতে পারতো না, তাতে তার মনে কোন কষ্ট হত না। সে ভাবতো, "আমি তো দেখতে পাই, শুনতে পাই। সূর্য্য আমার ওপর আলো ঢালে; বাতাসে আমাকে চুমো খায়। আহা, আমার জীবন কি সুখের!"

বেড়ার মধ্যে ছিল কয়েক রকমের জমকালো ফুল। তারা থাকতো একেবারে সোজা হয়ে। যার গন্ধ ছিল যত কম তার চটক ছিল তত বেশি। পিওনি ফুলগুলো গোলাপের চেয়েও যাতে তাদের বড় দেখায়, সেজন্যে থাকতো ফুলে। টিউলিপগুলোর রঙ ছিল সবার চেয়ে উজ্জ্বল, সুন্দর। একথাটা তারা ভাল করেই জানতো। তাদের যাতে ভাল করে দেখতে পাওয়া যায়, সেজন্যে তারা থাকতো মোমবাতির মতো খাড়া হয়ে। বেড়ার বাইরে ছোট্ট ফুলটির দিকে তারা ফিরেও তাকাতো না। সে কিন্তু তাদের দিকে খুব তাকিয়ে থাকতো আর ভাবতো, "ওরা সবাই কি রকম জমকাল, সুন্দর। ওই সুন্দর পাখিটি নিচে নেমে এসে নিশ্চয় ওদের কাছে যাবে। আমি কত সুখী। ওদের কত কাছে আছি আর ওদের রূপ দেখছি।"

ঠিক তখনই লার্ক-পাখিটিও নেমে এল বটে কিন্তু সে পিওনি বা টিউলিপগুলোর কাছে গেল না। না; উড়ে এল ঘাসের বনে সেই বেচারী ছোট্ট ডেজী ফুলটির কাছে। সে তো ভয়ে, আনন্দে প্রায় সারা; অবাকও হয়ে গেল এমন যে কি ভাববে, বুঝতেই পারলে না।

ছোট্ট পাখিটি চারধারে লাফাতে লাফাতে গাইতে লাগলো, "আহা! এই ঘাসগুলো কি নরম! এখানে ফুটে রয়েছে কি মিষ্টি ছোট্ট একটি ফুল। ওর বুকটুকু সোনালি, পোষাকটি রূপালি।" কারণ ডেজীটির হলুদ রঙের মাঝখানটিকে দেখাচ্ছিল সোনার মতো, আর চারধারে ছোট ছোট সাদা পাঁপড়িগুলো যেন ঝিকমিকে রূপালি।

ছোট্ট ডেজী ফুলটি হল কত সুখী। সে যে কতখানি সুখী হয়েছিল কেউ কল্পনাও করতে পারে না। পাখিটি ঠোঁট দিয়ে তাকে চুমো খেল, তার কাছে গান গাইলো; তারপর আবার উড়ে গেল নীল আকাশে! ফুলটি সতেজ হয়ে উঠতে লাগলো পুরো পনেরো মিনিট সে আধ-লাজে পড়েছে নুয়ে। তবুও সুখে ভরপুর হয়ে বাগানের ফুলগুলোর দিকে তাকালো। তার ওপর যে সুখ ও সম্মান বর্ষিত হয়েছে তারা তা জানতো নিশ্চয়ই; তারা নিশ্চয়ই জানতো তার আনন্দ হয়েছে কতখানি। কিন্তু টিউলিপগুলো আগের মতোই খাড়া হয়ে রইলো। রাগে তাদের মুখ হয়ে গেল একেবারে রাঙা। আর পিওনিগুলো, তারা এমন মাথামোটা—এটা সত্যিই খুব ভাল হয়েছে যে তারা কথা কইতে পারে না। না হলে ডেজীটি এমন কিছু শুনতো যা বিশেষ সুখের নয়। ছোট্ট ফুলটি বেশ ভাল করেই দেখলে, তারা সকলে রুক্ষ হয়ে উঠেছে। তাতে সে খুব বিরক্ত হ'ল।



একটু পরে বাগানে এল একটি ছোট মেয়ে হাতে নিয়ে ধারালো, ঝকঝকে ছুরি। সে টিউলিপগুলোর কাছে গিয়ে তাদের সকলকে একটি একটি করে কেটে ফেল্‌লে। ডেজীটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, "ওঃ! কি ভয়ঙ্কর! ওদের দফারফা!"

মেয়েটি টিউলিপগুলো নিয়ে চলে গেল। সে যে ফুটেছে বেড়ার বাইরে ঘাসের বনে, সকলে তাকে উপেক্ষা করে এতে ডেজী ফুলটি হল কত সুখী! সূর্য্য অস্ত গেলে সে পাপড়িগুলি মুড়ে ঘুমোতে লাগলো এবং সারারাত আলো ও সুন্দর পাখিটির স্বপ্ন দেখলে।

পরদিন সকালে আমাদের ছোট ফুলটি তাজা হয়ে, আনন্দে, উজ্জ্বল আলোয়, নির্মল নীল বাতাসে তার সাদা পাপড়িগুলি সব আবার মেলে দিলে। সে শুনতে পেল পাখিটির কণ্ঠস্বর। কিন্তু সে গাইছে করুণ সুরে! আহা! বেচারী লার্ক-পাখিটির দুঃখের যথার্থ কারণও ছিল। তাকে ধরে একটি খাঁচায় পুরে জানলার ধারে রাখা হয়েছে। সে গাইতো স্বাধীন, অবাধ উড়ে চলার আনন্দময় গান; গাইতো ক্ষেতের কচি সবুজ ফসলের আর খোলা হাওয়ার ডানায় ভর দিয়ে ভেসে চলার সুখের গীতি। বেচারী পাখিটি সত্যিই বড় অসুখী হয়েছে। সে ছোট খাঁচাটিতে বসে আছে বন্দী হয়ে।



ছোট ফুলটি আপন ইচ্ছায়ই তাকে সাহায্য করতো, কিন্তু করবে কেমন করে? সে বুঝতে পারলো না। তাই ভুলে গেল, তার চারধারে সব কিছু কত সুন্দর, সূর্য্য কেমন তপ্ত আলো ঢালছে। আহা! সে কেবল ভাবছে বন্দী পাখিটির কথা!

বাগান থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল, দু'টি ছোট ছেলে। তাদের একজনের হাতে সেই মেয়েটি যে-রকমের ছুরি দিয়ে টিউলিপ-গুলো কেটেছিল সে-রকমের একখানা ছুরি। তারা সোজা এল সেই ছোট ডেজী ফুলটির কাছে। সে বুঝতে পারলে না, তারা কি চায়!

একটি ছেলে বললে, "আমরা পাখিটির জন্যে এখান থেকে খানিকটা ঘাসের চাবড়া কেটে নিতে পারি।"

সে ডেজী ফুলটিকে মাঝখানে রেখে ছুরি বসিয়ে তার চার ধারের জায়গা গোল করে কাটতে লাগলো।

অন্য ছেলেটি বললে, "ফুলটা ছিঁড়ে ফেলে দাও।"

ছোট ডেজীটি ভয়ে শিউরে উঠলো। কারণ, সে জানতো তাকে ছিঁড়ে ফেললেই সে শুকিয়ে, মরে যাবে। তার বাঁচবার আর খাঁচায় লার্ক পাখিটির কাছে থাকবার এত ইচ্ছে!

প্রথম ছেলেটি বললে, "না, ওটা থাক। বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে।" তাই ফুলটিকে না ছিঁড়ে লার্কটির খাঁচার মধ্যে রেখে দেওয়া হল।

কিন্তু বেচারী পাখিটি তার স্বাধীনতা হারিয়ে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলো। তার খাঁচাটার লোহার শিকগুলোতে ডানা দু'টির ঝাপটা মারতে সুরু করলো। ছোট ফুলটির বড় ইচ্ছে, তবুও সে কথা বলতে পারলো না। একটি কথায়ও তাকে সান্ত্বনা দিতে পারে না। এই ভাবে সারা সকালটি গেল কেটে।

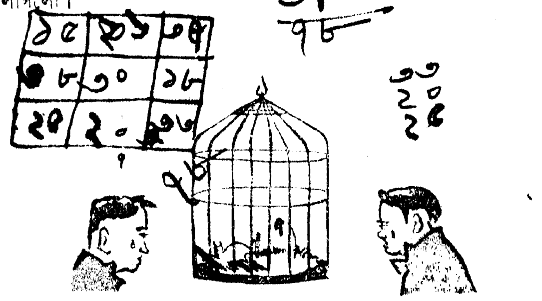
পাখিটি বললে, "এখানে একটুও জল নেই। ওরা সকলে বেরিয়ে গেছে। আমার কথা মনে নেই। খাবার মতো এক ফোঁটা জল পাচ্ছি না। আমার গলা শুকিয়ে জ্বলে যাচ্ছে। আমার ভেতরে আগুন জ্বলছে। বাতাস এমন গুমোট! হায় রে! আমি নিশ্চয়ই মরে যাব, আমাকে ছেড়ে যেতে হবে তপ্ত রোদ, সবুজ মাঠ।"

সে ঠাণ্ডা ঘাসের চাবড়ায় ঠোঁট ঢুকিয়ে দিলে একটু আরাম পাবার আশায়—তখন তার চোখ পড়লো ডেজী ফুলটির ওপর। সে মাথা নুইয়ে ফুলটিকে বললে, "আহা ছোট ফুলটি, তুমিও এখানে শুকিয়ে যাবে। সারা দুনিয়ার বদলে ওরা আমাকে দিয়েছে তোমায় আর তোমার চারধারের সবুজ জায়গাটুকু। আমি আগে ছিলাম সারা দুনিয়ার অধিকারী। এখন আমার কাছে ঘাসের প্রত্যেকটি পাতা হবে একখানি বড় সবুজ মাঠ, প্রত্যেকটি সাদা পাপড়ি হবে একটি করে সুগন্ধি ফুল! হায় রে! কেবল তুমিই আমাকে মনে করিয়ে দিলে আমি কি হারিয়েছি।"

ডেজীটি মনে মনে বললে, "যদি ওকে সান্ত্বনা দিতে পারতাম!"

তখন সন্ধ্যা। তবুও বেচারী পাখিটিকে কেউ এক ফোঁটা জলও দিতে এল না। সে সরু ডানা দু'খানি টান করে দিয়ে, ছোট ফুলটির দিকে নুয়ে পড়লো এবং পিপাসায়, কামনায় তার বুকখানি গেল ভেঙে। ফুলটি এখন আগের সন্ধ্যাটির মতো পাপড়ি-গুলি মুড়ে ঘুমোতে পারলো না। সে ম্লান, পীড়িত হয়ে মাটিতে পড়লো নুয়ে।

পরদিন সকালের আগে ছেলে দুটি এল না। তারা এসে দেখলে পাখিটি মরে গেছে। তখন গভীর দুঃখে দু'জনে কাঁদতে লাগলো।

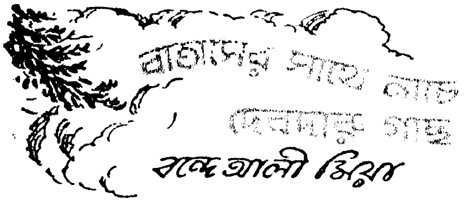


তারা পাখিটিকে একটি লাল রঙের বাক্সে পুরে মাটিতে কবর দিলে। তারপর সমাধিটি সাজিয়ে দিলে ফুলে। বেচারী পাখিটিকে কবর দেওয়া হল জাঁক-জমকের সঙ্গে। সে যখন ছিল বেঁচে, গাইছিল গান তখন তারা তার কথা ভুলে গিয়ে খাঁচায় দুঃখের মাঝে ফেলে রেখেছিল! এখন সে গেছে মরে। তাকে দেওয়া হচ্ছে প্রচুর সম্মান। তার জন্যে কাঁদছে গভীর দুঃখে।

কিন্তু ডেজী ফুলটি সুদ্ধ সেই ঘাসের চাবড়াটিকে টেনে ফেলে দেওয়া হল পথে। ছোট পাখিটির জন্যে সবার চেয়ে বেশি দুঃখ পেয়েছিল যে, তাকে সান্ত্বনা দিতে যে এত ব্যাকুল হয়েছিল তার কথা কেউ ভাবলে না।*

---

* অ্যানডারসেন



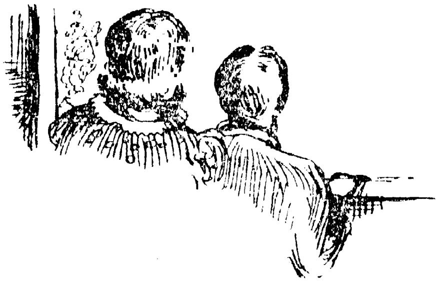
বাতাসের সাথে নাচে দেবদারু গাছ

বন্দে আলী মিয়া

বাগানের পশ্চিমে দেবদারু গাছ
রোদে পুড়ে জলে ভিজে টিকে আছে আজ।
কতকাল হতে আছে ইতিহাস নাই
গম্ভীর ঋষি যেন—চেয়ে থাকি তাই।
চারদিকে ছেয়ে গেছে শাখাপাতা তার
এর মতো বয়সের গাছ নাই আর।
মাথা তুলে উঠেছে সে ছাড়িয়া সবায়
ছোটো ছোটো তরুলতা নতি করে তায়;
সন্ধ্যায় পাখী আসে করে কলরব
ভোর হতে নীড় ত্যজি উড়ে যায় সব।
ভিন্‌গ্রাম হতে কভু ফিরিবার পথে
উঁচু তার শির দেখি বহুদূর হতে।

টুটু মিনা ছোটো ছোটো দুটি ভাই বোন
জানালায় দাঁড়াইয়া রহে সারাক্ষণ।
চেয়ে রয় তাহাদের বাগানের পানে
সুবিশাল দেবদারু মন যেন টানে।





বাতাসের সাথে দোলে শাখাপাতা তার
ভাই-বোন তালি দিয়ে হাসে বার বার।
মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে খোলা জানালায়
টুটু মিনা বাইরেতে ভয়ে ভয়ে চায়।
গাছ-পালা কালো ঘন আঁধারের মাঝে
কত কাল হতে যেন ডুবে তারা আছে;
জোনাকিরা মিট্‌ মিটে নেভে আর জ্বলে
আকাশের তারা যেন হেসে কথা বলে।



ভগবান কি আছে?

অধ্যাপক

বালক সংঘের থিয়েটার।

স্থান—খানকাকি মধ্যপাড়া। কাল—রাত্রি। আষাঢ় মাস। অম্বুবাচির তিনদিন বাকি।

নাড়ু-বুড়ো-তারা টানা এ্যাণ্ড কোম্পানীর উৎসাহের অন্ত নাই। ঝোপ থেকে বাঁশ, লোকের বাড়ী থেকে তক্তপোষ, বৈঠকখানা থেকে সতরঞ্চি, মায় সাত মাইল দূরের গোয়ালপাড়া গাঁয়ের যাত্রাদলের জমকালো পোষাক—সবি ওরা জোগাড় করেছে জলে ভিজে আর রোদে পুড়ে। অনেক খড়কুটো পোড়াতে হয়েছে। অনেক কপালের ঘাম হয়েছে ফেলতে। তবেই না দাঁড়িয়েছে আজকের এই ঝলমলানো ষ্টেজ।

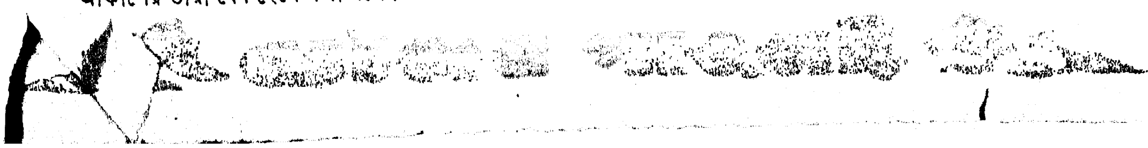
সত্যি, বড়ো বাহারের ষ্টেজ ওরা বেঁধেছে। প্রথমেই নানান লতাপাতা আঁকা গেট। দুই পাশে ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি আঁকা। ড্রপ-সিনে পাহাড়ের বুক চিরে নতুন সূর্যের আবির্ভাব। তারপর শিবিরের সিন। সকলের শেষে অরণ্য-দৃশ্য। নইলে 'একলব্য' তপস্যা করবে কোথায়? (থিয়েটারের পালা হবে 'গুরুদক্ষিণা')। বনের সিনের সংগে ম্যাচ করবার মতো উইংস্ নাই বলে দুই পাশে দাঁড় করানো হয়েছে দুটো নারকেলের ডাল। সিনের সামনে পুঁতে দেওয়া হয়েছে পেয়ারা-আতা জামরুলের ডাল। (নইলে বনচারী একলব্য খাবার ফল পাবে কোথায়?)

আয়োজনের কোন ত্রুটি নাই। গুরু দ্রোণাচার্যের মাটির মূর্তিও জোগাড় হয়েছে একটা। কোথা থেকে এনেছে এক জোড় আসনকরা কার্তিক ঠাকুর। তার মুখে জুড়িয়ে দিয়েছে পাটের সাদা দাড়ি। বুদ্ধির তারিফ করতে হবে বালক সংঘের।

হাঁ, আলোর বন্দোবস্তও হয়েছে। টিমটিমে হ্যারিকেন নয়। চৌদ্দবাতিও নয়। একেবারে দুইটো হ্যাজাক্। সাধে কি আর ষ্টেজটি অমন ঝলমল করছে ইন্দ্রপুরীর মতো! রীতিমতো কালো বাজার থেকে কেরোসিন যোগাড় হয়েছে বারো আনা পাঁইট হিসাবে। তবেই না ষ্টেজের জৌলুষে কানা হয়েছে আজ চাঁদের চোখ। চাঁদ এখন না থাকলেই বা কি যায় আসে!

উঃ! এ-কথাটা ভাবতেই যেন বালক সংঘের বুকের ভেতরটা খচ করে ওঠে। নাড়ু-বুড়ো-তারা টানা এ্যাণ্ড কোম্পানীর মুখ

টুটু মিনা চেয়ে দেখে দেবদারু গাছে
পরীরা পাখ্‌না মেলে ডালে ডালে নাচে।
রিম্‌ ঝিম্‌ বাজিতেছে পায়ের নূপুর
ভেসে আসে তাহাদের কণ্ঠের সুর।
টুটু আর মিনা ভাবে বাহিরিয়া যায়
যায় চলে পরীদের নাচের সভায়।
তাহাদের সাথে সাথে গায় আর নাচে
ফুল হয়ে ফুটে রয় সারা গাছে গাছে।



কালো হয়ে যায়। চাঁদ যদি না থাকে আকাশে? মেঘে মেঘে যদি ঢেকে যায় চাঁদের মুখ? গুরু গর্জনে মুষলধারে যদি নামে আষাঢ়ে বাদল? তাও আবার অষ্টুবাচি মুখে? তাহলে উপায়? বালক সংঘ এ ওর মুখের দিকে চায়।

কিন্তু না। সে ভয়ও ওদের নাই। ওরা সবাই ভগবান মানে। তেত্রিশ কোটি দেবতা মানে। বুড়ো শিব মানে। হাজরাতলা মানে। তেমাথার 'বট বেরেক্ষ' মানে। অতএব মাভৈঃ।

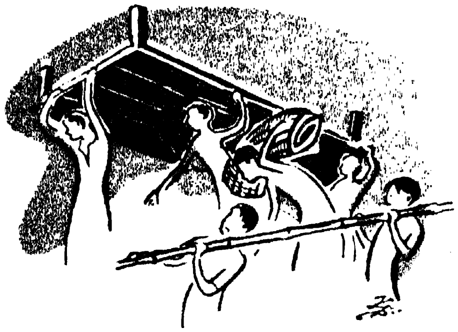
ষ্টেজের বাঁশ যেদিন গেড়েছে, সেদিন থেকে ওরা মনে মনে ভগবানকে কতো যে ডেকেছে। এখনো ডাকছে। ওরা মানত করেছে হাজরাতলার কালীমণ্ডপে। মানত করেছে হরিসভায়। বট বেরেক্ষের কাছে।

বুড়ো বলেছে: দোহাই মা কালী, এক সের দুধ দিয়ে 'দুধ-চিনি' দেব তোমার আসনে,—থিয়েটারের রাত্তিরটায় বিষ্টি যেন না হয়।

নাড়ু বলেছে: হরি ঠাকুর, চার আনার হরিলুট দেব তোমার সভায়, বিষ্টি যেন না নামে।

তারা বলেছে: হে বট বেরেক্ষ, আলো চাল আর কলা দিয়ে তোমার পুজো দেব। থিয়েটারের দিন আকাশ যেন ফট্ ফট্ করে।

শুধু কি তাই? ঝাড়-ফুক, তুক-তাকও ওরা বাদ দেয় নাই।



পরশু রাতে আকাশভরা উঠেছিল ঝিকিমিকি তারা। অমনি ওরা কাপড়ের খুঁটে একটি তারাকে বন্দী করে ফেলল। সবাই সুর মিলিয়ে ছড়া ধরল আকাশে চেয়ে:

তারা বন্ধন, তারা বন্ধন,—
তারারা কয় ভাই?
তারারা সাত ভাই।
বাইন্ধ্যা ফেললাম বড়ো ভাই।
গরু মরে ঘাসে,
মানুষ মরে ভাতে,—
কালকের রোদ্দুরে যেন
পিদ্দিম ফাটে।

—বলতে বলতেই সকলে যে যার কাপড়ের খুঁটে বাঁধল গেরো। সাত ভাই তারাদের বড় ভাইবন্দী হলো। ঠিক হলো: থিয়েটারের দিন রাতে বাকি ছয় ভাই আকাশ জুড়ে পাহারা দেবে। মেঘকে ঘেঁষতে দেবে না। তাড়িয়ে দেবে জল-ঝড়-বৃষ্টি। তবেই পরদিন সকালে জ্যেষ্ঠ তারা মুক্তি পাবে। অতএব—

হে বালক সংঘের শিল্পিবৃন্দ, নির্ভয়ে তোমরা 'গ্রীণ-রুমে' যাও। জিংক্-অক্সাইড, খ্রিক-আলতা ও কাজল সহযোগে 'পেন্টিং' সুরু করে দাও। আকাশে ছয় তারা পাহারায় বসেছে। বিষ্টির বাপের সাধ্য কি, এদিক মাড়ায়।

'গ্রীণ-রুমে' সাজো-সাজো রব পড়ে গেল।

—আমার ঠোঁটটা আর একটু লাল করে দাও ভাই।

—আমার কপালের ত্রিপুণ্ড্রকটা যুতসই হলো না নিতাই দা।

—বকের পালকগুলো মাথায় ভালো করে বেঁধে দাও না রাখাল দা। আমি যে ব্যাধের ছেলে।

—এ-কালিংটা কেমন যেন এলোমেলো। পাগলের মতো। এ আমি কিছুতেই মাথায় দেব না।

•

এমন সময়—

গুরু—গুরু—গুরু—

ও কি?

ও-পাশের নারকেল গাছটার মাথা হঠাৎ ঝিলমিলিয়ে উঠলো কেন?

একটা অস্পষ্ট সোঁ সোঁ শব্দ কি কানে আসে?

'গ্রীণ রুম' থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো একলব্য। আশংকায় বুক কাঁপছে।

এঃ, মেঘ যে আকাশের অনেকখানি ঢেকে ফেলেছে। ভাঙা ভাঙা মেঘের মাঝে চাঁদের লুকোচুরি। মেঘলোকে গুরু গুরু ধ্বনি। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমক। তবে কি?

আতংকে শিউরে ওঠে একলব্য। সংগে সংগেই নিজেকে সান্ত্বনা দেয়: খরার ঝিলিকও তো হতে পারে।

বাইরে ছেলের দল তখন কলরব তুলেছে:

কচুর পাতায় করমচা,
মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যা।

বুড়োরা বলাবলি করছে: না না, বৃষ্টি হবে না। ও সামান্য মেঘ বাতাসেই উড়ে যাবে। তোমরা সাজো হে, সাজো। কোন ভয় নাই।

সাধু বুড়ো বলল: হে—হে, ভগবানের একটা বিচার তো আছে। ছেলেপিলেরা এতো আকাংখা ক'রে সব করেছে—

কে একজন বলল: আর সবাই মিলে এ কয়দিন ধরে যা মানত-মানসিক করেছে, তাতে আর যায় কোথা?

কিন্তু সব বৃথা। বৃথা মানত-মানসিক। বৃথা তুক-তাক, মন্তর-তন্তর; দুধ-চিনি, আর হরিলুট, আর চাল-কলা। তেত্রিশ কোটি দেবতা রইল ঘুমিয়ে। 'বট বেরেক্ষ' অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল ঘাপটি মেরে। ছয় তারা ভংগ দিল রণে। জ্যেষ্ঠ তারার বন্ধন আর ঘুচল না এ-জীবনে। আকাশ ভেঙে নামল বৃষ্টি। ঝর-ঝর-ঝর।

ছেলেরা যে যেখানে ছিল ধরা চূড়া খুলে ফেলে লাফিয়ে পড়ল ষ্টেজে। হাতে নিল দা-কাচি-কুড়ুল।

খট-খট-কচ-কচ খটাং-খট—

দেখতে দেখতে ঝলমলানো ইন্দ্রপুরী হাওয়ায় মিশে গেল। ষ্টেজ খুলে ফেলা হল ক্ষিপ্র হাতে। থিয়েটার গেল ভেঙে।

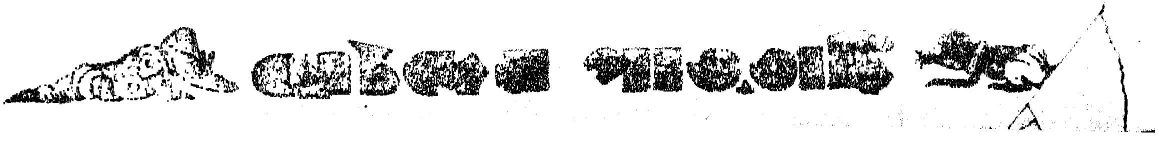
খোলা ষ্টেজের উপর তখনো জোড়-আসনে বসে আছে মাটির দ্রোণাচার্য। বৃষ্টির জল লেগে খসে পড়েছে তার সাদা দাড়ি। গায়ের হলদে রং গলে গলে মিশছে বৃষ্টির জলে।

বালক সংঘের চোখের কোণগুলিতেও চকচক করছে একেক ফোঁটা জল।

সহানুভূতি জানাল সাধু বুড়ো: ভগবানের এ কি বেয়াড়া বিচার রে বাপু—

গাণ্ডীবধারী অর্জুন এতোক্ষণ দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়েছিল এককোণে। এবারে বিকৃত গলায় চেঁচিয়ে উঠল, ভগবান না ছাই। ধুত্ত সব—

ক্রুদ্ধ আক্রোশে হাতের আলতা রাঙানো গাণ্ডীব সে ছুঁড়ে ফেলে দিল উঠোনের মাঝখানে।



লাল দরজা-ওয়ালা বাড়ী



শ্রীইন্দিরা দেবী

লালু অনেকদিন ধরে বিছানায় শুয়ে আছে। অসুখ করে একটা পা তার নষ্ট হয়ে গেছে, কাজেই চলাফেরা বারণ। চুপচাপ করে আরও অনেকদিন শুয়ে থাকতে হবে। ডাক্তার বাবুটা কিচ্ছু বোঝে না, সারাদিন কি শুয়ে থাকতে ভালো লাগে? ক'মাস ধরে সে এমনি শুয়ে আছে। জানলা দিয়ে বাইরে তাকালে তার চোখে পড়ে একটা ফুলবাগান, তার পরেই চোখে পড়ে একটা ভাঙ্গা বাড়ী—টকটকে লাল দরজাটা। কতদিন ধরে বন্ধ হয়ে আছে কে জানে! রোজ সকালে এটাই তার চোখে পড়ে, লালু ভাবে কেউ দরজাটা খোলে না কেন? কি আছে ঐ লাল-দরজা-ওয়ালা বাড়ীটাতে? তার পা ভালো হয়ে গেলে সে আগে গিয়ে দেখবে কি আছে ওখানে।

সেদিন লালুর মনে হ'ল আজকে চাঁদনী রাতে বাড়ী থেকে চুপি-চুপি বেরিয়ে, বাগান পেরিয়ে ওখানে গেলে কেমন হয়……………।

রাত্তির—অনেক রাত্তির, বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। লালু আস্তে আস্তে উঠলো বিছানা থেকে, চারদিকে তাকালো সবাই ঘুমোচ্ছে। দরজার কোণে বাবার লাঠিটা ছিল—সেইটাতে ভর দিয়ে খুব আস্তে আস্তে সে দরজাটা খুললো, একটা শব্দ শুনে সে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো যে তাদের ভুলো কুকুরটা। সে লালুর পা-টা চুঁয়ে আগে আগে চলতে লাগলো। লালু তো অবাক! ভুলো কি তার মনের কথা জানতে পেরেছে?

লাঠির উপর ভর দিয়ে সে চলেছে……………………………।
পিছনে সে ফেলে এলো তার বাড়ী—বাগানটাও পার হয়ে গেল। এইবার সে পৌঁছোলো সেই লাল-দরজাওয়ালা ভাঙ্গা বাড়ীটাতে। একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো—ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় তাদের বাড়ীটা দাঁড়িয়ে যেন স্বপ্ন দেখছে।

লালু এলো সেই লাল দরজার কাছে। হাত দিয়ে ঠেললো সে; দরজাটা যেন ভেতর থেকে বন্ধ। ভুলো তার ল্যাজ দিয়ে দরজায় আঘাত করতেই দরজাটা খুলে গেল। ভিতর থেকে ভেসে এলো সম্মিলিত কণ্ঠের হাসি গান। লালু তো অবাক!

ভুলো যেন তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ভিতরে। ক'পা এগোতেই লালু দেখলো ঘরের ভেতরে গোল হয়ে বসে খরগোস, বেজি, হাঁস, কুকুর বেড়াল, ইঁদুর মনের আনন্দে হৈ হৈ করছে। ইঁদুর নাচছে—বেড়াল গান ধরেছে, অন্য সবাই কেউ তাল দিচ্ছে, কেউ মাথা নাড়ছে, কেউ বা আহা বেশ বলে চীৎকার করছে।

কিন্তু লালুকে দেখেই ওরা হঠাৎ থেমে গেল। ভুলো বলে উঠলো—আমাদের লালু, আমাদের বন্ধু! মানুষের গলায় ভুলো কথা বললো দেখে, লালু তো আরও অবাক। ঘরের ভিতর গোল হয়ে বসে যারা আনন্দ করছিলো, তারা লালুকে অভিবাদন জানিয়ে বললো। এসো এসো বন্ধু!

লালু ক্রমশঃ আরও অবাক হচ্ছে, ওদের কথা শুনে আর আচরণ দেখে। বেড়াল তো ইঁদুরকে তাড়া করছে না, কুকুর তো বেড়ালের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ছে না! সকলে মিলে বেশ আনন্দ করছে।

অবাক কাণ্ড! আরে এরা তো সব চেনা। ঐ তো মিনুদের বাড়ীর পুষি বেড়াল—বুনুদের বাড়ীর টমিটা যে—কি সর্বনাশ! কেয়াদের বাড়ীর খরগোসটা হাজির হয়েছে। শুধু কি তাই? মাস্তু পিসীর টিয়াটাও রয়েছে। বুলুর পোষা সাদা ইঁদুরগুলোও কি… করে এদিক ওদিক বেড়াচ্ছে। লালু ঘরের সব পশু পাখীদের চিনতে পারলো—শুধু কালো ইঁদুরগুলো ছাড়া।

আমাদের দেখে খুব অবাক হয়ে যাচ্ছ না?—টমি বলে উঠলো।

লালু মাথা নাড়লো।

—কি করবো বল, আমাদের ঐরকম হতে হয় দিনের বেলায়, তা না হলে উপায় নেই। কিন্তু সত্যি বলতে কি রাত্তিরে আমাদের আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ে; টমি গম্ভীর হয়ে বললো।

বেড়াল মশাই গোঁফ উঁচিয়ে বললো, ঠিক বলেছো, মানুষের সঙ্গে আমাদের ঐরকম করতে হয়—তা না হলে আমাদের না মেলে মাছ, না মেলে দুধ।

—তা যা বলেছ ভায়া, আমরা যা চাই না, তাই করতে হয়। টিয়া মাথা নেড়ে বললো।

ইঁদুরটা হেসে উঠলো। তারপরে ল্যাজ দুলিয়ে একবার নেচে নিয়ে বললো:—তা যা বলেছো দাদা, মানুষগুলোর জন্যেই তো যতো হাঙ্গামা।

ইঁদুর নাচ সুরু করতেই সবাই আবার গান ধরলো; বা ভাই, বা ভাই! চীৎকার শোনা যেতে লাগলো।

লালুর ভারী মজা লাগছে। অদ্ভুত ব্যাপার, আর ভালোও লাগছে খুব।

লাল দরজাটা আবার ক্যাচ করে উঠলো।

—কে রে?

—আমি নীলিমাদের বাড়ীর বিলিতী কুকুর। সারা পথ ধরে হাঁপাচ্ছে বেচারী।

—এতো দেরী কেন হে?—হাঁস গিন্নী বলে উঠলো।

—কি করবো, আসতে কি পারি? পাজী বাপু এমন করে আমাকে শেকল দিয়ে বেঁধেছে। আরও একটু দেরী হলে আমার নামের খাতায় অনুপস্থিত বলে লেখা হয়ে যেত, আর আমায় ফাইন দিতে হতো।

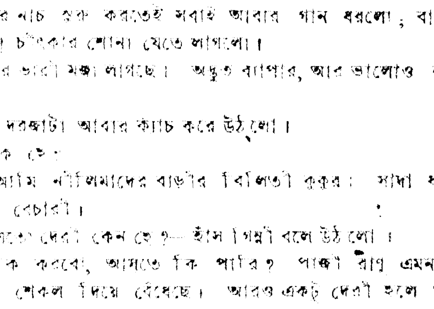
পেছন থেকে বিজুদের ময়নাটা বলে উঠলো, খুব বেঁচে গেছ দাদা!

—আরে এ কে? কুকুরটা লালুর দিকে পিট পিট করে চাইলো।

—আমাদের বন্ধু ও। সকলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো।

—মানুষ আমাদের বন্ধু কোনোকালে ছিল, না হবে? তা ছাড়া মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা আমাদের রাজ্যের নিষেধ আছে। তা কি কারুর মনে নেই? বিলিতী কুকুর বিলিতী প্যাঁচে কথাগুলো বললো।

—তা বটে, তা বটে। ওরা অপ্রস্তুত হয়ে সাড়া দিলো।



—তা ছাড়া ওদের দাসত্ব করেই আমাদের জীবন গেল, তবু কি কোনোদিন ওদের মন পেয়েছি? ছেলেবুড়ো ওরা সব সমান। এতো আনন্দ দিই তবু ওদের মন ওঠে না। ওরা আমাদের দুঃখকষ্ট বোঝে না। বিশেষ করে ছোটোগুলো, যখন তখন খোঁচা দেয়, মারে আর আনন্দে হাসে।—বিলিতী কুকুর ভারী গলায় বললো।

—আমার গলায় ফাঁস পরিয়েছে—টমি বললো।

—আমাদের পায়ে শেকল দিয়েছে—টিয়া আর ময়না বললো।

কালো হয়ে—

অজব গাঁয়ের আজব ব্যাপার

প্রভাত বসু

আজব গাঁয়ের পথটি ধরে চলতেছিলাম একা
ঘুর্‌রে এক বুড়োর সাথে হঠাৎ সেথায় দেখা।
দু'চোখ বেয়ে জল ঝরে তার, কান্নাভরা ঠোঁট;
এগিয়ে গিয়ে শুধাই তারে, "লাগল বুঝি চোট?"
কয়না কথা, কেবল কাঁদে—ব্যাপার গুরুতর।
আবার শুধাই, "ছেলের অসুখ? সেই কি মর-মর?"
ঘাড়টি নেড়ে বল্লে বুড়ো, "সে-সব কিছুই নয়;
কানটি মলে দেছেন বাবা!"—হয় না যে প্রত্যয়!
"তোমার বাবা আছেন বেঁচে, বয়স কত তাঁর?"
চক্ষু মুছে বল্‌লে বুড়ো, "একশ পাঁচ কি চার!"
অবাক আমি—চুল্‌কে মাথা আবার শুধাই তারে—
"কি দোষ তোমার? এই বয়সে ছেলেকে কেউ মারে?"
জবাব দিলে বুড়ো তখন মুখটি করে হাঁড়ি,
"ঠাকুরদাদা এসেছিলেন আজ আমাদের বাড়ী;
প্রণাম তাঁরে করতে আমি গিয়েছিলাম ভুলে,
রাগের চোটে হয়ত বাবা আছাড় দিতেন তুলে!
ঠাকুরদাদা ছিলেন বলে রক্ষা পেলাম আজ,
নাকে-কানে খৎ দিয়েছি করব না এ কাজ!"

আজব গাঁয়ের আজব কথা শুনলে কেমন বল?
'মিথ্যে কথা', ভাবছ মনে? সংগে আমার চল!!

—আমার বাচ্ছাগুলো ওরাই তো সাবাড় করেছে—ওদের বিশ্বাস করতে নেই—মুরগী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলো। বিলিতী কুকুর হঠাৎ লালুর হাতের লাঠিটা ছিনিয়ে নিয়ে গেল। এই হঠাৎ আক্রমণে লালু পড়ে যাচ্ছিল। ব্যথা পায়ে ভর দিয়ে সে নিজেকে সামলে নিলো।

উঃ, লালুর চোখে জল এসে গেছে।

লালু চমকে চেয়ে দেখলো, বাচ্ছা খোকন হামাগুড়ি দিয়ে তার পায়ের উপর এসে পড়েছে।

লালু ভালো করে তাকালো সেই লাল-দরজা-ওয়ালা বাড়ীটার দিকে, সেটা তখনও তেমনি বন্ধ! আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলো সুন্দর সকাল। সূর্য্যের আলো এসে পড়েছে জানলা দিয়ে।

তাহলে এতক্ষণ যা দেখছিলো সেগুলো কি সত্যি? বারে বারে লালু সেই লাল দরজাটার দিকে চাইতে লাগলো। সেটা কিন্তু তেমনি বন্ধ।

—o—

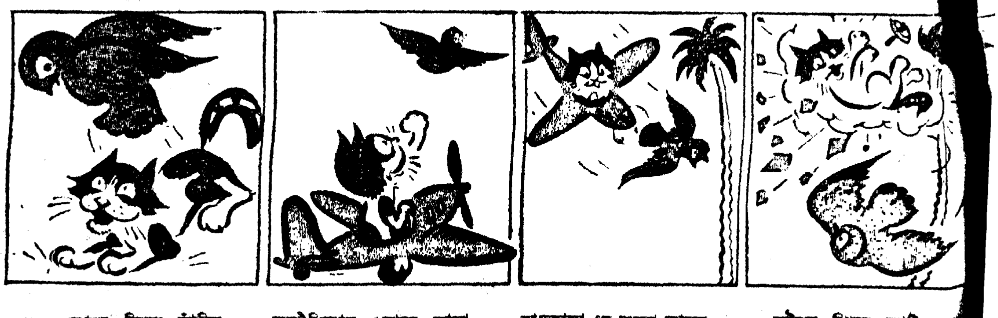
স্বপ্নরাজ্য

নরেন্দ্র দেব

এখানে যদি আসিতে চাও, সরল করো মন,
তরল করো নিগূঢ় তব গভীর দরশন।
খুলিয়া রাখো ক্ষণেক তব জ্ঞানের গাঢ় ঠুলি,
বুলায়ে এসো নয়ন কোণে কল্পনারি তুলি।
ভেবনা কিবা অসম্ভব—সম্ভব কি নয়;
বুদ্ধি দিয়ে বিদ্যা দিয়ে মাপা কি সব হয়?
এখানে যাহা দেখিবে যদি স্বপন হেন লাগে,
হারাণো তব শৈশবেরই স্মৃতিটি মনে জাগে—
নীরব নত সুসংযত চরণপাতে এসো
স্নেহের দিঠি মেলিয়া দেখো, পার তো ভালবেসো।
ইহারা জেনো আপন জন নিখিল ভুবনের,
সকল দেশে নিবসে এরা—সুখী জীবনের।
জানেনা এরা প্রবঞ্চনা, শেখেনি কোনো ছল,
এদের মাঝে নাহিক মত-বিরোধী কোনো দল।
বিকার কিছু নাহিক মনে, রুচির নাহি ভেদ,
এদের কাছে নিরর্থক কোরাণ-গীতা-বেদ।
কাদার ভাত, মাটির ডাল, চূণের দধি মেখে,
ঘাসের শাক, পাতার মাছ, সবারে দেয় ডেকে।
ভাজিয়া দেয় খোলার কুচি, কাগজে লুচি গড়ে;
উইয়ের ঢিবি দেখিলে তারা পাহাড় বলি চড়ে।
গোষ্পদ জলে সাগর হেরে, শিশিরে সারাকা...
নারী ও নর, বধূ ও বর, পুতুলে মেটে আশ।
নগর পাতে খাটের নীচে, ঘরের কোণে ...
মশা খুনী তাদের হাতে সবারই বাঁচা ...।
কাঠের ঘোড়া ছুটিয়া যায়, টিনের গাড়ী ...,
সোলার পাখী উড়িতে পারে, পাথরে ... বলে।
কুকুরে পড়ে প্রথম ভাগ, বিড়ালে গাহে ...,
বালক রাম রাবণে মারে পাকাটি ছোঁড়া ...!
তালের ভেঁপু, টিনের ঢাক, মধুর সুরে ...—
ফেলনা যত খেলনা হয়ে এখানে লাগে ...।

"এয়ারক্র্যাশ্"

ছবি ও ছড়া—শ্রীরেবতী ... ঘো...



সুড়ৎ কোরে দিয়ে ফাঁকি
ফুড়ৎ কোরে উড়্‌লো পাখী

জঙ্গীবিমান কোরে তাড়া
বল্লে মেনি "রোস্ না দাঁড়া"

রামতাড়া সে করলো তাকে—
পাল্টা খেয়ে পাকে পাকে

ছুটতে গিয়ে কাটিয়ে ...
গাছের সঙ্গে এয়ারক্র্যাশ্...

"পাউডার বনাম ধূলা"

[৩৭ পৃষ্ঠার পর]

ঝক্ত কেমন করিয়া ওঠে। দুধের বাটিতে চুমুক দিতেছে, খল-খল, খিল-খিল করিয়া সেই অনেক রকম গলায় অনেক রকম হাসি উঠিল; চুমুক দেওয়া বন্ধ করিয়া দাঁতে বাটি কামড়াইয়া ভুলু দেয়ালের দিকে চাহিয়া থাকে। এক একদিন দুপুরে সামনের শাদা রোদ্দুর যখন যেন চুপ করিয়া কি ভাবিতে থাকে, ভুলু ঘুমন্ত মায়ের পাশে বালিস থেকে একটু মাথা তুলিয়া—পাশের বাড়ির খুকুর নিজের হাতে কাজল-পরা দেখে, দেয়ালের ওদিকে হঠাৎ সেইরকম কত গলায় কত রকমের শব্দ ওঠে—হাসি, চেঁচামেচি, যা' খুশি তাই শব্দ বাড়িয়া ওঠে—ওদের মায়ের বকুনীতে আরও বাড়িয়া ওঠে—শুধু বাড়া নয়, শব্দগুলা চারিদিকে যেন ছুটাছুটি করিয়া ফেরে। বেশ বোঝে ভুলু—শুধুই যা' খুশি তাই চেচামেচি নয়, কতরকম ছেলে কতরকম করিয়া খেলা করে এই চমৎকার দুপুর রোদ্দুরে—যত খুশি ছুটিয়া যেখানে খুশি শুইয়া বসিয়া, যা' খুশি তাই মাখিয়া।...খুকুর অত চমৎকার কাজল-পরা দেখা ছাড়িয়া ভুলু দেয়ালের দিকে চায়; কী যে মনে হয় ভুলুর, পায়ে যেন সুড়সুড়ি লাগে—ইচ্ছা হয় যাই ছুটিয়া—ঝিয়ের মেয়ের বাবার মতন বড় হইয়া উঠিবার আর দেরী সয় না।...ভুলু জানে, তবু দোরের দিকে চায়—একেবারে উঁচুতে লোহার ছিটকিনি দিয়া যেখানে দোরটা বন্ধ করা সেইখানটিতে গিয়া চোখ পড়ে.........

ভুলু যে বাহিরে না যায় এমন নয়। রোজ সকালে বিকালে ঝি পেরামবুলেটারে করিয়া তাহাকে মা-গঙ্গার ধারের কালো রাস্তা দিয়া বেড়াইতে লইয়া যায়। একটু ভালো লাগে ভুলুর—শুধু বাড়ির চেয়ে ভালো, তার বেশী আর ভালো লাগে না। একই রকম গাছ দেখে ভুলু, একই রকম মা-গঙ্গা, একই রকম রাস্তা; সকালে যখন যায় দাড়ি-ওয়ালা বুড়ো সেপাই নাচিয়া, লোহার খাঁচায় রাঙা ঠোঁটের পাখি লইয়া—"সীতারাম কহো, সীতারাম কহো" বলিতে বলিতে ভুলুর পেরামবুলেটারের পাশ দিয়া চলিয়া যায় ভুলুর খানিকটা ভালো লাগে আর খানিকটা কেমন কেমন লাগে ঠিক বুঝিতে পারে না, শুধু ফিরিয়া দেখে পাখিটা কোন মতেই 'সীতারাম' বলিতেছে না। ভুলুর আশ্চর্য বোধ হয়,—খাঁচা কি পাখিদের পেরামবুলেটার?

এরপর থেকেই ভুলুর দেয়ালের বাইরের সেই জায়গাটার কথা বেশি করিয়া মনে পড়ে। এক একদিন ঝিকে বলে, এদিকে রোজ যেখানে যায় সেখানে না গিয়া মাটির রাস্তা দিয়া ওদিক পানে চলুক না, বেশ হইবে; কাহারা সব অত খেলা করে ভুলু দেখিবে—শুধু দেখিবে, পেরামবুলেটার থেকে নামিবে না, কিচ্ছু না। ঝি গালে হাত দিয়া হাঁ করিয়া চায়, বলে—"ছি, ছি, ওদিকে কেউ যায়? যত ছোটলোকেদের বাড়ি, মা শুনলে কি বলবে?"

ভুলু বলে সে মাকে কখনও বলিবে না। শুধু কাহারা খেলা করিতেছে দেখিবে।

ঝি আরও হাঁ করিয়া পেরামবুলেটার দাঁড় করায়, বলে—"ছি ছি খোকা, নোংরা ছেলেরা খেলা করে, ধুলো মাখা ল্যাংটো, তাদের কাছে যেতে আছে নাকি? দুষ্টু তারা সব।"

আবার পেরামবুলেটার চালাইয়া যায়। প্রথমে ভুলুর কষ্ট হয়, দুষ্টু ছেলেরাই যে ভালো এটা কেউ বোঝে না কেন? তাহার পর রাগ হয়, ঠিক করে এবার ঝি যখন কিছু বলিবে, সে কোনমতেই কথা কহিবে না। সেপাইয়ের পাখির মতন ঠোঁট দুইটা বন্ধ করিয়া মুখ ভার করিয়া বসিয়া থাকে।

তাহার পর একদিন ভুলু তাহার খেলার রাজ্যের পথ আপনিই আবিষ্কার করিয়া ফেলিল।

সেদিন মা ভুলুর বাবাকে বলিল—"ডাক্তার বাবুর বৌ এসেছে, ভাবছি বিকেলে গিয়ে দেখা করে আসব।" বাবা বললে—"যাও।" পেরামবুলেটারে না গিয়ে ভুলু মায়ের সঙ্গে নতুন কাকিমার বাড়ি গেল।

ওদিকে আর কখনও যায় নাই ভুলু। বেড়াইতে যেমন সামনের ফটক দিয়া যায় এ তেমন নয়। বাগানের পাশের দিকের দরজা দিয়া উহারা বাহির হইয়া অন্য রাস্তায় পড়িল, তাহার পর বাগানের অন্যদিকের দেয়ালের পাশ দিয়া চলিল। দেয়ালটা শেষ হইয়া যেখানে আবার ওদিকে ঘুরিয়া গেছে—সেখানে আসিতেই একপাল কালো কালো ছেলে-মেয়ে সামনের একটি সরু রাস্তা দিয়া হাসিতে হাসিতে, চেঁচামেচি করিতে করিতে এ ওর গায়ে পড়িতে পড়িতে একটু আসিয়াই আবার সেইভাবেই ছুটিয়া ওদিকে কোথায় চলিয়া গেল, আর তাহাদের দেখা গেল না। কাহারও হাতে হলদে ফুল শুদ্ধ গাছের ডাল, কাহারও হাতে ছড়ি, কাহারও হাতে আরও কি, ঐটুকু সময়ে ভালো করিয়া দেখা গেল না। ভুলুর যে কি মনে হইল, ইচ্ছা হইল ঝিয়ের কোল থেকে লাফাইয়া পড়ে। কিন্তু ইচ্ছা হইলেই তো হয় না, তাহার উপর আবার মা রহিয়াছে। বাড়ি থেকে যেমন শোনে সেই রকম হাসি-হল্লা শুনিতে শুনিতে ওরা নতুন কাকিমাদের বাড়ি চলিয়া গেল।

খোকার মনে আছে সেরাত্রে ঘুমের বুড়ি ওকে সেই বাগানের পেছনের খেলার রাজ্যেই লইয়া গিয়াছিল,—কত যে খেলা, কত যে চেঁচামেচি, কত যে হাসি-হল্লা! ভুলু এমনটা আর কখনও দেখে নাই, সে নিজেও কি কম খেলিল—কম ধূলাটা মাখিল!

পরদিন দেয়ালের ওধারে আবার যখন সেই শব্দ উঠিল, ভুলুর মনটা অন্য দিনের চেয়েও ছটফট করিতে লাগিল, মনে হইল রাত্তিরের যত চেনা শোনা ছেলেমেয়ে সবাই তাহার জন্যও যেন ওদিকে হাঁকাহাঁকি লাগাইয়া দিয়াছে।...জামা জুতা পরিয়া, পাউডার মাখিয়া যখন ভুলু পেরামবুলেটারে উঠিল, কান্নায় তাহার গলাটা বুজিয়া আসিয়াছে।

সে-রাত্তিরেও আবার ঘুমের বুড়ি আসিয়া নতুন-চেনা পথে তাহাকে বাগানের ওদিকে খেলার রাজ্যে লইয়া গেল।

তাহার পরদিন মা মা ঘুমাইয়া কাকিমাদের বাড়ি গেল দুপুরবেলা। ভুলু রহিল ঝিয়ের কাছে। ঝি যখন ঘুমাইয়া পড়িল, ভুলু আস্তে আস্তে বাহির হইয়া বাগানের ওপাশের দরজা দিয়া ওদিককার রাস্তায় পড়িল। ওদিকে সেই দুপুরে খেলার চেঁচামেচি, ভুলু রাস্তায় নামিয়া একটু অগ্রসর হইল। কেমন একটু একটু ভয় করিতেছে; রাস্তাটাকেই ভয়,—মনে হইতেছে রাস্তাটা যদি না থাকিত, একেবারেই ওখানে গিয়া পড়া যাইত তো বেশ হইত। তবুও একটু অগ্রসর হইল ভুলু; আর খানিকটা গেলেই ঐ খেলার রাজ্যের সরু রাস্তাটা...কিন্তু ভুলুর আর সাহসে কুলাইল না। আস্তে আস্তে ফিরিয়া লক্ষ্মী ছেলের মতন ঝিয়ের পাশটিতে শুইয়া পড়িল।

(৩)

পরের দিনের কথা ভুলু জীবনে কখনও ভুলিবে না।

সন্ধ্যার একটু পরে অনেক দূরে কোথায় এক সঙ্গে অনেক বাজনা বাজিয়া ওঠার শব্দ হইল। ঝি বলিল—বাজারের মারোয়াড়ীর বাড়ীতে বিয়ে আছে, ষ্টেশন থেকে আলো-বাত্তি করিয়া বর আসিতেছে। তাড়াতাড়ি ভুলুকে কোলে লইয়া, ভুলুর দাদার হাত ধরিয়া ঝি গঙ্গার দিকের রাস্তার ধারে ফটকটায় গিয়া দাঁড়াইল। বাদ্যির আওয়াজ ক্রমেই বাড়িয়া গেল, আর একটু পরেই কালো রাস্তার চারিদিকে আলোয় আলোয় ছড়াছড়ি। তাহার পরই বরের দল আসিয়া পড়িল—পা পর্যন্ত রাঙা জামা পরা, হাতে শাদা শাদা চকচকে লাঠি লইয়া কত লোক; রাঙা জামা পরা ঘোড়া, রাঙা জামা পরা হাতি; তারপর দুটা শাদা ঘোড়ায় টানা প্রকাণ্ড একটা পেরামবুলেটার, তার ওপর জমজমে ঝকমকে পোষাক পরা বর, চোখে কাজল, মুখে সিঁদুর, চন্দন—কত কি মাখান, মাথায় টকটকে ঝকমকে পাগড়ি; তার সঙ্গে আরও সবাই, অতটা নয়, তবু খুব সাজগোজ। বরের মাথার ওপর সোনার ছাতা, পেছনে একটা লোক ধরিয়া আছে।...ভুলুর একবার মনে হইল—বৌ কোথায়? কিন্তু তখনই বরের পেরামবুলেটার আগাইয়া গিয়া আবার আসিল সাজগোজ পরা ঘোড়া, হাতি, পতাকা হাতে রাঙা জামা পরা ছেলের দল, তার সঙ্গে সঙ্গে মটোর, ঘোড়ার গাড়ি,

টমটম, কতরকম জামা কাপড় পরা কতরকম লোক সে সবের মধ্যে।...এর সঙ্গে সঙ্গে কতরকম যে আলো, কী সব বাদ্যি, এত বড় হইয়াছে ভুলু কিন্তু কখনও যদি দেখিয়াছে! কনের কথা আর মনেই রহিল না।

এর ওপর আবার মাঝে মাঝে কতরকম বাজি পোড়ানো!

শুধু তাই নয়, বোধ হয় এসবের চেয়েও যা ভালো লাগিল, অন্ততঃ যা ভুলুর পা দু'টাতে সুড়সুড়ি দিতে লাগিল, তা আগে পাশে পেছনে—সমস্ত বরের দল ঘিরিয়া ছেলেদের নাচ, খেলা, চেঁচামেচি, যা খুশি তাই করা; কাহারও হাতে একটা ফুলের ডাল, কাহারও হাতে কিছু; আমোদের চোটে এক একজন রাস্তার ওপরই লুটাইয়া পড়িয়া আবার ছুটিয়া আগাইয়া যাইতেছে।

এত বড় আশ্চর্য কাণ্ড ভুলুর জীবনে আর কখনও হয় নাই। ওর মনে হইল যেন মায়ের মুখে শোনা সাতমহলের রাজ-কন্যাকে উদ্ধার করিতে যাওয়া রাজপুত্র কোটালপুত্রের গল্পের সঙ্গে ভুলুদের বাগানের ওদিকের খেলার রাজ্যটা কি করিয়া মিশিয়া গেছে—। এত বড় অসম্ভব ব্যাপার ভুলু যেন ঠিক বুঝিতে পারে না। কি মনে হয়, বাজনা-বাদ্যি লইয়া বরের দল যত দূরে যায়, খেলার রাজ্যের কালো ছেলেদের চেঁচামেচি যত আরও কম শোনা যায়, ভুলু ভাবে এইবার বুঝি তাহার ঘুমটা যাইবে ভাঙিয়া, দেখিবে বিছানায় মায়ের কাছে শুইয়া আছে, এইবার বুঝি মা ডাকিবে—"ঝি, খোকার ইজের-জামা নিয়ে আয়তো।" তাহার পর চিরুণি, পাউডারের কৌটা লইয়া বসিয়া যাইবে।... খোকা বেশ স্পষ্ট করিয়া কিছুই বুঝিতে পারে না।

সে রাতে ঘুমের বুড়ির দেশেও কত সব অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল, এত অদ্ভুত যে ঘুম ভাঙার পর আর স্পষ্ট কিছুই মনে পড়িল না ভুলুর। শুধু যেন কোথায় যাওয়ার, কি করিবার জন্য মনটা সমস্ত দিন কেমন কেমন করিতে লাগিল। সে রাতেও আবার ঐ সব কাণ্ড, পরের দিন সমস্ত সকালটাও সেই মন কেমন-কেমন করা। নতুন কাকিমাকে ভুলুর মায়ের বড় ভালো লাগিয়াছে, সেদিন দুপুরে আবার ভুলুকে ঝিয়ের কাছে রাখিয়া গল্প করিতে গেল।

(৪)

ভুলুদের বাগানের পেছনে, দেয়ালের ঠিক পরেই একটা বস্তি। মাঝখানে দু'টা আম আর একটা হলদে ফুলে ভরা সোঁদাল গাছের নিচে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, পাশে একটা ছোট ডোবা। এই জায়গাটাকে তিন দিকে ঘেরিয়া কতকগুলা বাড়ি। এই সব বাড়ির ছেলেমেয়েরাই আম-সোঁদালের তলায় চোপর দিন জমা হইয়া ওদিকে ভুলুর মাথায় খেলার রাজ্যের স্বপ্ন রচনা করে।

দুদিন থেকে ওদের মস্ত বড় একটা উৎসবের আয়োজন চলিয়াছে। তাহার অনু-প্রেরণাটা পাওয়া মাড়োয়াড়ীদের বিবাহের জলুস থেকে। এরাই ছুটিয়া, গড়াইয়া, হাসিয়া, হল্লা করিয়া সমস্ত উৎসবটাকে সেদিন শরীরে মনে মাখিয়া লইয়াছিল। আজ ওদের নিজেদেরই এক বিবাহের জলুস বাহির হইবে।

সব একরকম জোগাড় হইয়াছে।

ঘোড়া-ঘুড়ি মিলাইয়া ছয়টা থাকিবে—তাহার মধ্যে তিনটা ছাগলি, দুইটা খাশি, একটা বোকা-পাঁঠা। তাদের শিঙে কলকে ফুল আটকাইয়া, পিঠে ছেঁড়া কলাপাতার মখমলের ঝালর বাঁধিয়া সাজাইবার চেষ্টায় একদল মাতিয়া আছে। কতরকম পাতাসুদ্ধ ডালের কত-রকম পতাকা! আলোয়-আলোয় তো জয়লাপ হইয়া গেছে—হলদে ফুলে ভরা সোঁদাল গাছটার প্রায় অর্ধেকটা উজাড় হইয়া গেছে। বাজনাবাদ্যির ঢালোয়া ব্যবস্থা,—গোটা-দশেক পেঁপেডাঁটার বিলাতি শানাই, কলাপাতার ডাঁটার পটপটি করিয়া ঝাঁঝর করতাল হইয়াছে। একটা একদিক-ছেঁড়া আসল ঢোলও জোগাড় হইয়াছে। বাজনার মহলায় সমস্ত জায়গাটা গমগম করিতেছে। সবচেয়ে ভালো পাওয়া গেছে হাতিটা,—কাছেই ডোমপাড়া, একটা শুওর ছিটকাইয়া আসিয়াছিল, তাহাকে ধরিয়া-বাঁধিয়া ডোবায় চোবাইয়া পরিষ্কার করিয়া এখন তাহার গায়ে-মাথায় হাতির-মতন প্রসাধন হইতেছে। কী শুঁড়! কী হাতির-মতন ছোট ল্যাজ! কী কালো-কালো লোমে ভরা হাতির-মতন চলচলে শরীর! এত সত্যিকার কাছাকাছি কোনটাই হয় নাই। হুল্লোড় পড়িয়া গেছে তাহাকে লইয়া।

এদিকে একদল বর-কনে সাজান লইয়া পড়িয়াছে। কাছেই ফুলপাতা দিয়া-সাজানো বর-কনের গাড়ি,—রাস্তার ময়লা-ফেলা একটা একচাকার টিনের গাড়ি,—কাছের ডোমপাড়া থেকেই সংগ্রহ হইয়াছে। ছাগলকে রাজি করা গেল না, তাই দুইটা ওরই মধ্যে একটু ফরসা গোছের ছেলেকে শাদা ঘোড়া করিয়া জুতিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহারা যথারীতি পা ঠুকিতেছে আর লাগাম চিবাইতেছে। গাড়ির পেছনে একটা পাকা পেঁপে-পাতার ছাতা লইয়া একটি ছেলে মোতায়েন হইয়া আছে।

এমন সময় হঠাৎ একদল ছেলে চীৎকার করিয়া উঠিল—"আরে খোকাবাবু! খোকা-বাবু! খোকাবাবু এসেছে।"

দেখা গেল সরু রাস্তাটা যেখানে আসিয়া ফাঁকা জায়গাটায় পড়িয়াছে সেখানে বাগানের ওদিককার বাঙালী বাবুর ছোট ছেলে দাঁড়াইয়া; খালি পায়ে হাঁটু পর্যন্ত ধুলা, ইজেরের উপর একটা পরিষ্কার নীল জামা। খোকাবাবু মুখে চারিটা আঙুল পুরিয়া উৎসব আয়োজনের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বিবাহ মিছিলের এমন অভিজাত দর্শক পাইয়া একটা সোরগোল পড়িয়া গেল। প্রায় সমস্ত দলটা চেঁচামেচি করিতে করিতে আসিয়া খোকার সামনে জড়ো হইল।

খোকা এতক্ষণ আর একটু আড়াল থেকে সব দেখিতেছিল—কী অপূর্ব জায়গা! কী যা-খুশির ব্যাপার। যত খুশি ফুল-ফুটান গাছ—। যেদিকে খুশি মুখ-ফেরান বাড়ি-ঘর, যেমন খুশি সেই রকমভাবে দাঁড়াইয়া আছে—কোনটার মাথায় রাঙা-খোলা, কোনটার মাথায় ভাঙা-খোলা, কোনটার খড়ের চাল, কোনটা খড়ের মধ্যে দিয়া বাঁশবাতা বাহির হইয়া আসিয়াছে, কেহ যেন কিছু বলিবার নাই, শাসন করিবার নাই।...ডোবায় হাঁসের পাল, নামিতেছে, উঠিতেছে, সাঁতার কাটিতেছে, ডুব দিতেছে। আর এই খেলার সরঞ্জাম! কত ছেলে,—ন্যাটো, কোমরে শুধু ঘুনসি, কাহারও কোমরে ছোট একফালি কাপড়, কাহারও ময়লা, ছেঁড়া হাপপ্যান্ট, কাহারও শুধু গায়ে একটা বড় জামা—ওই রকম মেয়েরাও।...শুওর, পিঠে পাতার ঝালর দেওয়া-ছাগল, শিঙে ফুল! আর কত রকম বাজনা!...ভুলুর যেন আবার সেই বিয়ের দিনের মতন মনে হইতেছে—এখনই মায়ের কোলের কাছে জাগিয়া উঠিবে যেন...

নিঃসাড়ে কখন আগাইয়া রাস্তার মুখটিতে আসিতে ছেলে-মেয়েরা "খোকা বাবু! খোকা বাবু!" করিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল।...

ভুলু যেন কিরকম হইয়া গেছে, লজ্জা, একটু বোধ হয় ভয়, আর তার সঙ্গে আস্তে আস্তে অনেকখানি আনন্দ। প্রথমটা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াই রহিল, তাহার পর প্রশ্নে, মন্তব্যে, প্রশংসায়, আদরের মিষ্টি কথায়, সবার ওপোর ওদের আহ্লাদের ছোঁয়াচ লাগিয়া ভুলুর মনটাও যেন বাহির হইয়া আসিতে লাগিল, হাত পা যেন হাল্কা হইয়া আসিতে লাগিল।

"খোকাবাবু, তামাসা দেখতে এসেচ?"

ভুলু মাথা নাড়িল।

একটু গুজগুজ চাপা খুশির হাসির পর—

"খোকাবাবু, খেলবে আমাদের সঙ্গে?"

ভুলু এবার কথা কহিয়াই বলিল—"খেলব।"

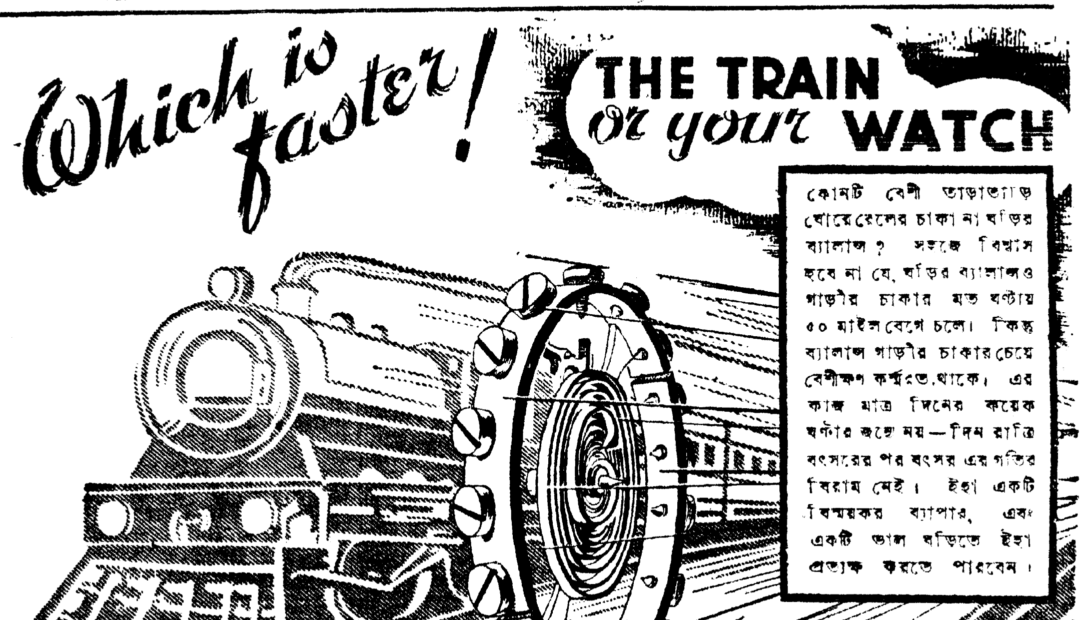
বিয়ের দিন রাস্তায় যেমন ফুলঝুরির বাজি হইয়াছিল, যেন সেই রকম গোছের একটা কাণ্ড হইল,—"খোকাবাবু খেলবে! খোকাবাবু খেলবে!" শব্দে সমস্ত জায়গাটা ভরিয়া গেল, তাহার সঙ্গে হাসি, হাততালি; কত ছেলে ডিগবাজিই খাইয়া গেল,—আহ্লাদে সে কি করিবে যেন ভাবিয়া পাইতেছে না।...খোকাকে সঙ্গে করিয়া সবাই উঠানের মাঝখানে লইয়া গেল। বুঝাইয়া দিল কোনটে হাতি, কোনটে ঘোড়া, কোনটে আলো, কোনটে বাঁশি; তাহার পর আসল জায়গায় লইয়া আসিল—যেখানে বর-কনেকে সাজানো হইতেছে।

খোকার বয়সী বর, একটু ছোট কনে।

[ইহার পর ২৪৭ পৃষ্ঠায়]


সাধ্বীর সম্পদ
সিন্দুর!
লাল রংয়ের গুঁড়া মাত্রেই সিন্দুর নয় আর সিন্দুর মাত্রেই ব্যবহারের যোগ্য নয়। সিন্দুর বৈজ্ঞানিক মতে বিশুদ্ধ না হ'লে, সতীদের সমূহ ক্ষতি করে।
সুবাসিত
সোহাগ সিন্দুর
(রেজিষ্টার্ড)
বৈজ্ঞানিকমতে পরিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য
গুহ এণ্ড ব্রাদার্স :: কলিকাতা


ইণ্ডিয়ান সিল্ক টেক্সটাইল্স
৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা
স্থাপিত-১৯২৪


Which is faster!
THE TRAIN or your WATCH
কোনটি বেশী তাড়াতাড়ি ঘোরে রেলের চাকা না ঘড়ির ব্যালান্স? সহজে বিশ্বাস হবে না যে, ঘড়ির ব্যালান্সও গাড়ীর চাকার মত ঘণ্টায় ৫০ মাইল বেগে চলে। কিন্তু ব্যালান্স গাড়ীর চাকার চেয়ে বেশীক্ষণ কর্ম্মরত থাকে। এর কাজ মাত্র দিনের কয়েক ঘণ্টার জন্যে নয়—দিন রাত্রি বৎসরের পর বৎসর এর গতির বিরাম নেই। ইহা একটি বিস্ময়কর ব্যাপার, এবং একটি ভাল ঘড়িতে ইহা প্রত্যক্ষ করতে পারবেন।
ANGLO-SWISS WATCH CO
CALCUTTA

দুঃশাসনীয়

(২৬ পৃষ্ঠার পর)

খুকী মোর ডর লাগছে। দে তবে, দে কাপড় খুলে। খোল কাপড়। যাবি তো চ', নয় কাপড় খুলে দিয়ে ঘর যা।'

বৈকুণ্ঠ বলে, 'ঝাঁপ ভাঙবো ছোট বো।'

মানদা বলে, 'ভাঙো,—মাথা ভাঙব তুমার আমি।'

সন্ধ্যার পর মানদা ঝাঁপ খোলে। সন্ধ্যার পর সোয়ামীর কাছে মেয়েমানুষের লজ্জা কি?

ভূতির ছেলে কানুর বয়স বার বছর। ভূতির স্বামী গদাধর কাজ আর কাপড়ের খোঁজে বেরিয়েছে আজ এগার দিন। খিদেয় কাতর হয়ে কানু ভূতির কয়েদখানার বাইরে থেকে কেঁদে বলে, 'মা, ওমা। খিদে পায় যে?'

ভূতি বলে ভেতর থেকে, 'শিকেয় হাঁড়িতে পান্তো আছে, খে গে যা নিয়ে।'

'পাড়তে পারি নে যে। তুই দে।'

ভূতি দিশেহারা হয়ে ভাবে, যাবে? ছেলে মাকে ন্যাংটো দেখলে কি আসে যায়? মা কালীও তো ন্যাংটো। ওমা কালী, তুই-ই বল মা যাবো? বল মা, মোর হিদয়ে থেকে একটা কিছু বল!

কিন্তু সেদিন হঠাৎ তাকে উলঙ্গ দেখে কানু যেমন হি হি করে হেসেছিল, আজও যদি তেমনি করে হাসে? চোখ ফেটে জল আসতে চায় ভূতির, জল পড়ে না। জল শুকিয়ে গেছে চোখের। চোখ শুধু জ্বালা করে আজকাল কাঁদতে চাইলে।

হঠাৎ ছেঁড়া মাদুরটা চোখে পড়ে।

'দাঁড়া একটু।'

মাদুরটা সে নিজের গায়ে জড়ায়। একহাতে শক্ত করে ধরে থাকে গায়ে জড়ানো মাদুরটা, আর এক হাতে দুয়ার খুলে রসুই ঘরে গিয়ে শিকা থেকে নামাতে যায় পান্তার হাঁড়িটা। পড়ে গিয়ে চুরমার হয়ে যায় হাঁড়িটা, পান্তা ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। তখন মাদুরটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে ভূতি এঁটো ভাত আর ভাত ভেজানো এঁটো জলের মধ্যেই ধপ করে বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে সুরু করে কান্না। আর এমনি আশ্চর্য্য কাণ্ড, এবার তার শুকনো চোখ থেকে জল বেরিয়ে আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে ফোঁটা ফোঁটা মিশতে থাকে মেঝেয় ভাত ভেজানো জলে।

রাবেয়া বলে আনোয়ারকে, 'আজ শেষ। আজ যদি না কাপড় আনবে তো তোমায় আমায় খতম। পুকুরে ডুবব, খোদার কসম।'

রাবেয়া ক'দিন থেকেই এ ভয় দেখাচ্ছে, তবু তার বিবর্ণ মুখ, রুক্ষ চুল আর উদভ্রান্ত দৃষ্টি দেখে আনোয়ারের বুক কেঁপে যায়। চাষীর ঘরের বৌ দুর্ভিক্ষের দিনগুলি না খেয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে কাটিয়ে দিয়েছে, কথা বলেনি, শাক পাতা কুড়িয়ে এনে খুদ কুঁড়োর সাশ্রয় করে তাকে বাঁচিয়ে লড়াই করেছে বাঁচবার জন্য, আজ কাপড়ের জন্য সে কামনা করছে মরণ! খেতে দিতে না পারার দোষ তার ওর চোখে ধরা পড়ে নি, পরতে দিতে না পারায় দোষ ও সইতে নারাজ, দিনভর ফুঁসে ফুঁসে গঞ্জনা দিচ্ছে। বিবিকে যে পরনের কাপড় দিতে পারে না সে কেমন মরদ, তার সাদি করা কেন!

অনুনয় করে আনোয়ার বলে, 'আজিজ সা'ব খপর আনতে গেছেন। হাতিপুরের কাপড়ের ভাগ মিলবে আজকালের মধ্যে। একটা দিন সবুর কর আর।'

'সবুর! আর কত সবুর করব? কবরে যেয়ে সবুর করব।' সেমিজ না পরলে দু'ফেরতা শাড়ী পরা রাবেয়ার অভ্যাস। এক ফেরতা কাপড় জড়িয়ে মানুষের সামনে সে বার হয়নি কোন দিন। পায়খানার চটের পর্দাটা গায়ে জড়িয়েও নিজেকে তার বিবসনা মনে হচ্ছে। কাপড় যদি নেই, ঘোষ বাবুর বাড়ীর মেয়েরা এবেলা ওবেলা রঙীন শাড়ী বদলে পরে কি করে, আজিজ সায়েবের বাড়ীর মেয়েরা চুমকি বসানো হালকা শাড়ীর তলার মোটা আবরণ পায় কোথায়? সবাই পায়, পায় না শুধু তার স্বামী! আল্লা, এ কোন্ মরদের হাতে সে পড়েছিল!

রাতের ছায়ামূর্তি হয়ে রাবেয়া গিয়ে দেখে আমিনা জ্বরে শয্যাগত হয়ে পড়ে আছে, তার গায়ে চাপানো ফুটো বস্তা—চুণের বস্তা! বস্তার নীচেই আমিনার গায়ের চামড়া।

আমিনা বলে ফিসফিসিয়ে, 'গা জ্বলছে—পুড়ে যাচ্ছে! আজ ঠিক মরব। এ বস্তা মুড়ে কবর দেবে মোকে।'

আবদুল আজিজ আর সুরেন ঘোষ হাতিপুরের একুশ শ' চাষী ও কামার কুমার জেলে জোলা তাঁতি আর আড়াইশ' ভদ্র স্ত্রীপুরুষের কাপড় যোগাবার দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন। মাস দেড়েক আগে উলঙ্গ হাতিপুর দোওয়াগুঁজি সদরে গিয়ে মহকুমা হাকিম গোবর্দ্ধন চাকলাদারকে সন্ত্রস্ত করেছিল। এভাবে সিধে আক্রমণের উস্কানি যুগিয়েছিল শরৎ হালদারের মেজ ছেলে বঙ্কু আর তার দলের জন সাঙ্গোপাঙ্গো। সাতের মাইল দূরে স্বদেশ সেবক তপন বাবুর কাপড়ের কল কয়লার অভাবে অচল হয়েও সাড়ে তিনশ' তাঁত কি করে সচল আছে আর খালি গুদামে কেন সাতের শ' গাঁট ধুতি শাড়ী জমে আছে, এসব তথ্য আবিষ্কার করায় বঙ্কু আর তার সাতজন সাঙ্গোপাঙ্গো মারপিট দাঙ্গা হাঙ্গামার দায়ে হাজতে আছে সোয়া মাস। মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামা তারা না করে থাকলে অবশ্য বিচারে খালাস পাবে, মিথ্যে হয়রানির জন্য ক্ষতিপূরণের পাল্টা নালিশও রুজু করতে পারবে আইন অনুসারে কিন্তু গুরুতর নালিশ যখন হয়েছে ওদের নামে হাজতে ওদের থাকতে হবে। জামিন দেওয়ার অনেক বাধা। সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে জামিনের কথা।

ঘোষ আর আজিজ সভা ডেকে ঘোষণা করেছে হাতিপুরের জন্য কাপড়ের 'কোটা' তারা যা আদায় করেছে, কাপড়ের ভাবনা কারো ভাবতে হবে না। মানিক সাঁর প্রস্তাবে নিজেদের তারা হাতিপুরের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করেছে। বিশ্বাস না করেও হাতিপুরের লোক ভেবেছে, দেখা যাক। আশা ছেড়ে দিয়েও হাতিপুরের নরনারী ভেবেছে, উপায় কি।

দু'জনে আজ সদরে গিয়েছিল, কবে হাতিপুরে এসে পৌঁছবে হাতিপুরের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা কাপড়ের ভাগ। গাঁয়ের লোক উন্মুখ হয়ে পথ চেয়েছিল তাদের। হায়ারা ঘরে ঘরে লুকিয়ে আছে। বিকালে ছোট-খাট একটি জনতা জমে উঠল গ্রামের পূব প্রান্তে কাঁথি সড়কের বাস-থামা মোড়ে।

ঘোষকে একা বাস থেকে নামতে দেখে জনতা একটু ঝিমিয়ে গেল। ভিড় দেখে ঘোষও গেল একটু থতকে।

'কি হল ঘোষমশায়, কাপড়ের কি হল?'

'গোলমাল হয়েছে একটু।'

'গোলমাল? কিসের গোলমাল?'

'কলকাতা থেকে মাল আসে নি। তাই সব, আমরা জীবনপাত করে—'

বঙ্কুর সাঙ্গোপাঙ্গোদের একজন কলেরায় মরমর হওয়ায় মারপিটের নালিশে যে হাজতে যেতে পারে নি, বজ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করে, 'শনিবার ক্ষেত্র সামন্তের চালান এসেছে, সাত ওয়াগন। আমি দেখেছি পুলিস দাঁড়িয়ে গাঁট নামিয়ে গুণে গুণে চালান দিল।'

'ও সদরের জন্যে। হাতিপুরের 'কোটা' আসে নি।'

'কবে আসবে?'

'আসবে। আসবে। ছুটোছুটি কর মরছি দেখতে পাচ্ছ তো। তাই তোমাদে জন্যে?'

হতাশ ম্রিয়মান জনতা গাঁয়ে ফিরে যাবার উপক্রম করছে, কাপড়ের গাঁট বোঝা প্রকাণ্ড এক লরী রাস্তা কাঁপিয়ে এসে থামব উপক্রম করে। ড্রাইভারের পাশে ব আজিজ, তার পাশে সুরেন ঘোষের জা নরেন। সুরেন ঘোষ মরিয়া হয়ে পাগলে মত হাত নেড়ে নেড়ে ইসারা করে, আজি জনতার দিকে তাকিয়ে তার ইসারা জ্যাে ড্রাইভারকে কি যেন বলে, থামতে থামা আবার গর্জ্জন করে লরীটা জোরে এগি গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় অল্প দূরে পথের বাঁকে আড়ালে। লাল ধূলায় মেঘারণ্য সৃষ্টি হয়

জনতা ঘুরে দাঁড়ায়, একপা দু'পা এগি এসে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। ব তখনো ছাড়েনি বাস থেকে নেমে এক খাকি পরা সুদেব বাবু কোমরে চাম চওড়া বেল্টটা তার কি চকচকে! পাগড়ী আঁটা একজন চা আনতে যায় সুমা দোকান থেকে—চা এবং একটা কি

যেন বোতল আর চ্যাপ্টা সোডার শিশি। ঘোষের হাত থেকে সিগারেট নিয়ে সুদেব বাবু ধরাল, টান মেরে ধোঁয়া ছাড়ল যেন ভেতরে কাঁচা কয়লার আগুন ধরেছে মানুষের ভিড় দেখার উত্তেজিত রাগে।

'কিসের ভিড় ?'

'কাপড় চায়।'

'হাঃ, হাঃ। পশু পটেটিপুরে মার্চে গেছলাম—মন্দ জানার বাড়ী। বাড়ীর সামনে যেতেই হাত জোড় করে বলল, কি করে ভেতরে যাবেন হুজুর, মেয়েরা সব ন্যাংটো। ওরা রসুই ঘরে যাক, সারা বাড়ী তল্লাস করুন। আমায় যেন বোকা পেয়েছে। রসুই ঘরে ফেরারী ছোঁড়াটাকে লুকিয়ে সারা বাড়ী সার্চ করাবে। আমি বললাম, বেশ। তারপর সোজা রসুই ঘরের দরজা ভেঙে একদম ভেতরে। আরে বাপরে বাপ, সে যেন লাখ শালিখের কিচিরমিচির সুরু হয়ে গেল মশায়! সব কটাই প্রায় বুড়ী, কিন্তু একটা যা ছিল মিঃ ঘোষ, কি বলব আপনাকে। পাতলা একটা উড়ুনী পরেছে, একদম জালের মত, গায়ের রঙ দেখে তো আমি মিষ্টার—'

হাতিপুরের মানুষ হাতিপুরে ফিরে যায় ধীরে ধীরে। এদিকের আশা ফুরিয়ে যাওয়ায় হতাশার চেয়ে চিন্তা সকলের বেশী। এভাবে যখন হল না তখন এবার কি করা যায়! কেউ যদি উপায় বাৎলে দিত!

'জান্ দিলাম রে আব্বাস,' আনোয়ার বলে ভুরু কুঁচকে, 'কি জিনিষ জানটা দিব তা বল ?'

ভোলা বলে, 'লুট করে তো আনতে পারি দু'এক জোড়া, কিন্তু তারপর ?'

তারপর সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। আকাশে ছোট চাঁদটি উঠেছে আছে, দিন দিন একটু একটু বড় হবে। ক'দিন পরে জ্যোৎস্নার তেজ বাড়লে বন্দিনী ছায়াগুলির কি উপায় হবে কে জানে। চাঁদ ডুবলে তবে যদি বাড়ীর বাইরে যাওয়া চলে, রোজ পিছিয়ে যেতে থাকবে শেষরাত্রির দিকে চাঁদ ডুববার সময়। বিলের ধারের বাঁধানো সড়কে নানা-রঙা শাড়ী পরা মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে বাবুরা কজন হাওয়া খাচ্ছেন। কাপড় তৈরীর কলেই যে হাতিপুরের লোক কাজ করে ওই তার প্রমাণ। কিন্তু আরও কত লোকেও তো কাজ করে সতের মাইল দূরে কাপড় তৈরীর কলে, তবে কেন এ অবস্থা তাদের ?

হাতিপুরের ঘরে ঘরে খবর রটে যায়, কাপড় পাওয়া যাবে না।

'তবে যে ঢেঁটরা দিয়ে গেল কাপড় পাওয়া যাবে ?' সকলে প্রশ্ন করল সন্ত্রস্ত হয়ে।

রসুল মিয়ার দালানের সামনের রোয়াকে এক ঘণ্টা ধর্ণা দিয়ে পড়ে থেকে আনোয়ার বাড়ী গেল সন্ধ্যার পরে। শাড়ী না পাক, সে কথা আদায় করেছে। বাড়তি শাড়ী ঘরে ছিল কিন্তু রসুল মিয়াও একটু ভয় পেয়ে গেছেন। অবস্থাটা একটু ভাল করে বুঝতে চান আগে। ক'দিন পরে তিনি একখানা শাড়ী অন্ততঃ আনোয়ারকে দেবেন, আজ হবে না। তাই হোক, তাও মন্দের ভাল। রসুল মিয়ার কথার খেলাপ হবে না আশা করা যায়। রাবেয়াকে এই কথাটা অন্ততঃ বলা যাবে।

রাবেয়া খানিক পরে ঘাট থেকে ফিরে আসে। বড় অদ্ভুত রকম শান্ত মনে হয় আজ তাকে। আনোয়ার গোড়ায় তাকে দুঃসংবাদটা দেয়। রাবেয়া বলে, 'জানি।' তারপর আনোয়ার রসুল মিয়ার কাছে দু'চারদিনের মধ্যে শাড়ী পাবার ভরসার খবরটা জানায়। এবারও রাবেয়া বলে, 'জানি।'

দাওয়ায় এসে রাবেয়া কাছেই বসে। তেল নেই, দীপহীন অন্ধকার বাড়ী। অন্ধকার বলেই বুঝি পায়খানার ছেঁড়া চটের পর্দা জড়ানো নিজের কাছে রাবেয়া লজ্জা কম পায়। তাই বোধ হয় সে শান্ত হয়ে বসে কথা বলে আনোয়ারের সঙ্গে, ফুঁসে না, শাসায় না, খোঁচায় না। মনে মনে গভীর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আনোয়ার অনেকদিন পরে সাহস করে হাত বাড়িয়ে রাবেয়ার হাত ধরে।

রাবেয়া বলে, 'যাবেনি ? চল।'

'চল।'

দাওয়ার গাঢ় অন্ধকার থেকে ক্ষীণ চাঁদের আলোয় উঠানের আবছা অন্ধকারে নেমে রাবেয়া একটু দাঁড়ায়। তারপর আনোয়ারকে অবাক করে গায়ে জড়ানো চটটা খুলে ছুড়ে দেয় উঠানের কোণে।

'ঘিন্না লাগে বড়। গা কুট কুট করছে।'

আনোয়ারের একটু ধাঁধা লাগে, একটু ভয় করে।

'ফের নেয়ে লি।'

ঘর থেকে ভরাকলসী এনে রাবেয়া মাথায় উপুর করে ঢেলে দেয়। গায়ের ছেঁড়া কুন্তিটা খুলে চিপে নিয়ে চুল ঝেড়ে গা মোছে।

'পানি ঢেলে দিলি সব ?'

'ফের আনব।'

আনোয়ারকে খাইয়ে নিজে খেয়ে সানকি আর কলসি নিয়ে রাবেয়া ঘাটে গেল, আর ফিরল না। কাপড় যে দিতে পারে না এমন মরদের ঘর না করে রাবেয়া একটা বস্তায় কতগুলি ইট পাথর ভরে মাথাটা ভেতরে ঢুকিয়ে গলায় বস্তার মুখটা দড়ি জড়িয়ে এঁটে বেঁধে পুকুরে জলের নীচে পাঁকে গিয়ে শুয়ে রইল।

প্রকাশ

সন্ধ্যা ভাদুড়ী

অতীতের শুষ্ক মৌন ভাষাহীন দ্বারে
মিথ্যা এত স্মৃতি লেখা, কে স্মরিবে তারে ?
শাশ্বত সত্যের বাণী বিস্মরণ আঁকে
জীবনের যাত্রাপথে, মিলনের বাঁকে।
মিথ্যা তাই মধু ছন্দে অপরূপ করে
নিজেরে প্রকাশ করা বাকা আড়ম্বরে।



কর্ণফুলির কল্লোল কানে ভাসে :
তীর-তরংগে চলে হুল্লোড়,
কত কানাকানি রাত দিন ভোর,
আকাশের চাঁদ লাজে মরে যায়,
সূর্যকিরণ হাসে ;
কর্ণফুলি সে ভ্রূক্ষেপহীন
তার কিবা যায় আসে ?

অদূরে পাহাড় ঘন অরণ্যে ঘেরা :
পাহাড়ের গায়ে স্মৃতি অম্লান,
বন মর্মরে শহীদের গান,
স্বপ্ন এ নয়, অমর কাহিনী
সারা জগতের সেরা ;
দেশের মাটির গৌরব আজ
কি করে ভুলিল এরা ?

এরা চটুল মেয়ে—
কর্ণফুলির ইতিকথা এরা জানে,
বীরাঙ্গনার মর্মমর্ম মনে প্রাণে এরা মানে ;
অন্ধকারের অতল তলায় কেন তবু এরা নামে
সব কিছু ভুলে যেয়ে ?

আসে পঞ্চাশ—
আনে অভিশাপ মৃত্যুর মহাত্রাস,
এ সোনার দেশ শবে ও শ্মশানে শোভে
যত অতিলোভী উল্লাসে মাতে
বিকারের বৈভবে,
নামের নেশায় দানের বহর বাড়ে ;
শত কংকাল মরে পড়ে রয়
রাজপথে সারে সারে।

আরাকান রোডে ট্রাকের মিছিল চলে :
ধূলার ধূসর আকাশ পাথার,
জঠর জ্বালায় উঠে হাহাকার,
সব দিকে শুধু আঁধার আঁধার,
প্রদীপ জ্বলে না ঘরে—
তারি ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যুৎ হাসে
কর্ণফুলির কূলে।

রূপের বেসাতি জমে :
অসহায় নারী দলে দলে এসে
জুটেছে লেবার কোরে ;
আলো ঝলমল শাড়ী গহনায়,
মাঝি মেনকারা কেমন মানায়,
প্রাতা ভগিনীর বীরত্ব গাথা এরা কি
গিয়েছে ভুলে ?

এদের এপথে যাহারা এনেছে টেনে,
স্বদেশের সেই লোভী দালালেরা—
রাখুক তাহারা জেনে :
সমাগত আজ তাদের বিচার দিন।
বন্দী বীর ও বীরাঙ্গনারা আসে
জনতার মাঝে বিপুল জয়োল্লাসে
অনেক পাপের দণ্ড বিধান করে
স্মৃতি-উজ্জ্বল কল-কল্লোল কর্ণফুলির কূলে।

জাপান যুদ্ধে নামিল কেন ?

[৩৩ পৃষ্ঠার পর]

মহাযুদ্ধের আগে আমেরিকা ও জারের রাশিয়া ইত্যাদির বাণিজ্যগত প্রভুত্বে বাধা দেওয়ার জন্য, মহাযুদ্ধের পর সোভিয়েট রাশিয়ার কমিউনিজম ও চীনের বৈপ্লবিক জাতীয় শক্তি (ডাঃ সান্ ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে) এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে প্রতিরোধ করিবার জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও জাপ সাম্রাজ্যবাদ পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছিল।

কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, ইহারই গতিপথে পূর্ব্ব এশিয়ায় বৃটেনের বাণিজ্য ও রণনৈতিক শক্তি মন্দীভূত হইতে লাগিল। ১৯১৩ হইতে ১৯২৫ সালের মধ্যে চীনের আমদানী বাণিজ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অংশ বৃদ্ধি পাইল শতকরা ৬ ভাগ হইতে ১৫ ভাগে, আর বৃটেনের নামিয়া গেল শতকরা ৪২ ভাগ হইতে শতকরা ২৮ ভাগে। আমেরিকার এই পরিবর্দ্ধিত বাণিজ্যের সঙ্গে জাপানী রাজ্য ও বাণিজ্যের ক্রমে তীব্র দ্বন্দ্ব সুরু হইল। এশিয়াখণ্ডে জাপানের এই আক্রমণাত্মক রণনীতি ও বাণিজ্যনীতির বিরুদ্ধে মার্কিণ কর্ত্তারা বৃটেনের নিকট আবেদন করিয়াও সাড়া পাইলেন না। ১৯৩৪ সালে জাপান বিদেশীদিগকে 'চীন হইতে হাত গুটাইবার' ('Hands off China') দাবী জানাইল। আর বৃটিশ নীতির ব্যাখ্যা করিয়া কমন্স সভায় পররাষ্ট্র সচিব স্যার জন সাইমন বলিলেন—"His Majesty's Government are content to leave this particular question where it is!" সাম্রাজ্যবাদীয় চালটা লক্ষ্য করিবার মত। কিন্তু একদিকে প্রশান্ত মহাসাগরে ও এশিয়াখণ্ডে জাপানের নৌবল ও সামরিক বলের অভূতপূর্ব্ব প্রাধান্যের জন্য যেমন বৃটিশ বাণিজ্য হ্রাস পাইয়া গেল, তেমনই সুদূর প্রাচ্যে বৃটিশ নৌশক্তিও দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। ক্রমে জাপানের সঙ্গে বৃটেনেরও যুদ্ধ বাধিবার একান্ত সম্ভাবনা দেখা দিল। কারণ বৃটিশ স্বার্থ উভয় দিক দিয়াই নষ্ট হইতেছিল। চীনের সঙ্গে ব্রহ্ম, মালয়, ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ এবং অষ্ট্রেলিয়া ইত্যাদির দিকে জাপান হাত বাড়াইতেছিল। ১৯৩৪ সাল হইতেই জাপানী আক্রমণাত্মক নীতিতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের কর্ণধারগণ বিপদ গণিতেছিলেন। জেনারেল স্মাটস ও লর্ড লোথিয়ান প্রভৃতি তখন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একত্রিত হইয়া জাপানকে প্রতিরোধের জন্য আন্দোলন সুরু করিলেন। ঐ বৎসর নভেম্বর মাসে Royal Institute of International Affairs'এ সুদূর প্রাচ্যের সমস্যা সম্পর্কে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে জেনারেল স্মাটস ঘোষণা করিলেন—'I would say that to me the future policy and association of our great British Commonwealth of Nations lie more with the U. S. A. than with any group in the world.'

আর লর্ড লোথিয়ান 'অবজার্ভার' পত্রিকায় লিখিলেন—"......that the United States and the nations of the British Commonwealth will be driven together in resistance to Japan if her leaders adopt the militarist policy." এই সমস্ত মতামত জাপানের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিণ মৈত্রী আন্দোলনেরই অগ্রদূত ছিল। অবশ্য আর একদল তখনও জাপান সম্পর্কে তোষণ নীতির (১৯৩৮ সালের বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনের কার্য্যাবলী ও বর্ম্মা রোড বন্ধ ইত্যাদি স্মরণীয়) পক্ষপাতী ছিলেন। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যোগ দিবে কিনা, এমন সন্দেহ আন্তর্জ্জাতিক মহলে ছিল এবং এই জন্যই ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক জাপানী ধনসম্পত্তি আটকের হুকুম জাপানের বিরুদ্ধে প্ররোচনা বলিয়া কেহ কেহ (যেমন, রণপণ্ডিত লীডেল হার্ট) ব্যাখ্যা করেন। অর্থাৎ ইহা দ্বারা একপক্ষে বৃটেন ও আমেরিকা এবং অন্যপক্ষে জাপান নিশ্চিত যুদ্ধের মধ্যে পড়িয়াছিল—এই অনুমান সম্পূর্ণ যুক্তিহীন নহে।

বৃটিশ পররাষ্ট্র নীতির প্রসাদে জাপান চীনে ও প্রশান্ত মহাসাগরে কায়েম হইয়া বসিতেছিল। কিন্তু ইহাতে এক সাম্রাজ্যবাদীয় নীতির দ্বারা আর এক ধনতন্ত্রবাদের প্রসারে বিঘ্ন ঘটিতেছিল। আমেরিকা ক্রমেই শঙ্কাবোধ করিতেছিল। কিন্তু গোড়াতেই বলিয়াছি যে, এই জাপ-মার্কিণ বিরোধের সূত্র খুঁজিতে হইলে উনবিংশ শতাব্দী হইতে সুরু করিতে হইবে। গত শতাব্দীতেই বিভিন্ন ইউরো-মার্কিণ শক্তি পৃথিবীর নানা অংশে ছড়াইয়া পড়িয়া রাজ্য ও বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা দিয়াছিল। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ ও প্রশান্ত মহাসমুদ্রের আরও কয়েকটি দ্বীপ দখল করিল। মার্কিণ নৌবহর ও বাণিজ্যবহরের দূর প্রাচ্যযাত্রার ঘাটি সৃষ্টি হইল। আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিতে জাপান তখন প্রবেশ করিয়াছে। আমেরিকার এই অগ্রগতি তাহার ভালো লাগিল না, বরং সন্দেহের সৃষ্টি হইল। ইহার পর ফিলিপাইন ও গুয়াম আমেরিকার হাতে যাওয়ায় জাপানীদের সন্দেহ আরও বাড়িয়া গেল। অবশ্য এই সময়ে আমেরিকা ও জাপানের মধ্যে বাণিজ্য ও সৌহার্দ্দের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এই সম্পর্কের উপর প্রথম যে আঘাত পড়িল, তাহারও মূলে অর্থনৈতিক কারণ রহিয়াছে।

ক্ষুদ্র জাপানের বাড়তি লোকসংখ্যা জীবিকার সন্ধানের জন্য বাহিরের পৃথিবীর দিকে তাকাইতেছিল। ইহাদের বেশীর ভাগ চীনে দেশান্তরিত হইতেছিল বটে, কিন্তু বৃহৎ একদল প্রতি বৎসর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যাইতে লাগিল। তখন মার্কিণ ব্যবসা-বাণিজ্যের হাঁকডাক শুনিয়া ইউরোপ ও এশিয়ার ভাগ্যান্বেষী দল চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮৯৩ সাল হইতে বিগত মহাযুদ্ধের শেষে (১৯১৯) পর্য্যন্ত মার্কিণ-প্রবাসী জাপানীদের সংখ্যা দাঁড়াইল ২,১৯,০৪৮ জন। সংখ্যাটা নিশ্চয়ই তুচ্ছ করিবার মত ছিল না। এই নবাগত জাপানীরা প্রশান্ত মহাসমুদ্রের তীর ধরিয়া নীড় বাঁধিতে সুরু করিল। বেশীর ভাগ জাপানী 'নীড়' দক্ষিণ ও মধ্য ক্যালিফোর্ণিয়ায় গড়িয়া উঠিল। কারণ, সেখানকার আবহাওয়া চমৎকার ছিল। ক্যালিফোর্ণিয়া ছাড়া ওয়াশিংটন, বৃটিশ কলম্বিয়া ইত্যাদি সহরেও জাপানীরা ছড়াইয়া পড়িতেছিল। প্রথম প্রথম মার্কিণ পুঁজিপতিরা ইহাদিগকে সাগ্রহে গ্রহণ করিতেছিলেন। কারণ, ইহারা অত্যন্ত মিতব্যয়ী ও পরিশ্রমসহিষ্ণু ছিল, বিশেষভাবে অতি সামান্য অর্থের বিনিময়ে ইহারা কঠোর শ্রমসাধ্য কাজও গ্রহণ করিত। ইংরাজীতে যাহাকে cheap labour বা 'সস্তা মজুর' বলে, ইহারা ছিল সেই শ্রেণীর। ফলে কৃষিক্ষেত্রের মজুর, কলকারখানার শ্রমিক, গৃহের ভৃত্য ইত্যাদি নানা কাজে ইহাদের চাহিদা দ্রুত বাড়িয়া গেল। মার্কিণ বা 'সাদা শ্রমিকদের' চেয়ে অতি কম মজুরি পাইয়াও এই সমস্ত জাপানী শ্রমিক উৎকৃষ্টতর কাজ করিতে লাগিল। কেবল তাহাই নহে, ইহারা স্বভাবতঃই মিতব্যয়ী ছিল বলিয়া স্বল্প বেতন হইতেও কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিত। ইহাদের প্রধান খাদ্য ছিল সামান্য মাছ-ভাত এবং জীবন-যাত্রা ছিল অত্যন্ত সাধারণ। একজন মার্কিণ শ্রমিক স্ত্রী-পুত্রসহ যে টাকায় উপবাস করিত, জাপানীরা সেই অবস্থায় টাকা বাঁচাইয়া সঞ্চয় করিতে পারিত। ফলে, উভয় পক্ষে সংঘর্ষের বীজ রোপিত হইল। এই দেশান্তরিতের দল কেবল টাকা বাঁচাইয়াই চুপ করিয়া থাকিল না। তাহারা সেই উদ্বৃত্ত অর্থের দ্বারা জমি কিনিতে কিম্বা 'লীজ' নিতে লাগিল। এভাবে প্রশান্ত মহাসমুদ্রতীরের কতকগুলি উৎকৃষ্টতম উর্ব্বর জমি তাহাদের হাতে গেল—কোন কোন ক্ষেত্রে এই জমির পরিমাণ দাঁড়াইল শতকরা ৫০ হইতে ৭৫ ভাগ। চাষবাসের ব্যাপারেও তাহারা বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির পরিচয় দিতে লাগিল। ক্রমে সামান্য মজুর হইতে বহু জাপানী বেশ বড় রকমের পুঁজিপতিতে পরিণত হইল। কিন্তু জীবন-যাত্রা তাহাদের রহিয়া গেল সামান্য মজুরের মতই। ফলে, অর্থ ও সম্পদের পরিমাণ তাহাদের ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। অপর পক্ষে সমস্ত জাপানীদেরই জমি কিনিবার শক্তি ছিল না। তাহারা সস্তা শ্রমিক ও মজুররূপে বাজার ছাইতে লাগিল। স্বভাবতঃই ইহার অনিবার্য্য পরিণতি ঘটিল সংঘর্ষের মধ্যে এবং এই সংঘর্ষ দুই দিক হইতেই আসিল। মার্কিণ জমির মালিক এবং শ্রমিক, উভয় পক্ষই এই নূতন জাপানী

উৎপাতে অতিষ্ঠ বোধ করিতে লাগিল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে স্যান ফ্রান্সিস্কোতে প্রথম বৃহৎ প্রতিবাদ সভার অনুষ্ঠান হইল—জাপানী দেশান্তরিতদের আমেরিকায় আগমনের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন সুরু হইল। ১৯০৫ ও ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মার্কিণ শ্রমিক সঙ্ঘ বা আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবর-এর উদ্যোগে দেশব্যাপী বহু রাজনৈতিক ও শ্রমিক প্রতিষ্ঠান একত্রে জাপানীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইয়া উহাদিগকে বিতাড়নের দাবী জানাইল। রুশ-জাপান যুদ্ধের পর জাপানীদের স্বাজাত্যাভিমান, সামরিক শক্তি এবং শ্বেতকায় জাতিসমূহের সহিত সমকক্ষতা বোধ বাড়িয়া গিয়াছিল। সুতরাং জাপ-বিরোধী মার্কিণ নীতিতে একদিকে জাপানীরা যেমন ক্ষেপিতে লাগিল, অন্য দিকে মার্কিণীরাও সস্তা জাপ শ্রমিকের বিরুদ্ধে অতি ব্যাপক ও তীব্র আন্দোলন চালাইতে লাগিল। কেবল সস্তা শ্রমিক হিসাবেই নহে, আমেরিকার সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রার ধারার সঙ্গে জাপানীদের কোন প্রকার সম্পর্ক ছিল না। ফলে, তাহারা সর্ব্বত্র অবাঞ্ছিতরূপে বিবেচিত হইতে লাগিল।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে খাস মার্কিণ কংগ্রেসে এবং ক্যালিফোর্ণিয়া রাজ্যের আইনসভায় জাপানী দেশান্তরিতদের বা immigrant-এর উপর নানা বিধি-নিষেধ আরোপ করিয়া আইন রচিত ও প্রবর্ত্তিত হইল। ক্যালিফোর্ণিয়ায় জাপানীদের আর জমির মালিকানা স্বত্বের অধিকার রহিল না। ইহার আগে জাপ শিশুদের শিক্ষা সম্পর্কেও নিষেধ-বিধি জারির চেষ্টা হইয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে যে ধরণের বিরোধ চলিয়া আসিতেছে, আমেরিকায়ও তাহাই ঘটিতেছিল। ১৯০৭ সালের আইনের মধ্যে কোন কোন সর্ত্তে জাপানীদের চাষবাসের অধিকার স্বীকার করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু ১৯২০ সাল হইতে তাহাও কাড়িয়া লওয়ার জন্য আন্দোলন দেখা দিল। অবশেষে ১৯২৪ সালে জাপানীদের বিরুদ্ধে কার্যাতঃ আমেরিকা গমন নিষিদ্ধ করিয়া এক ব্যাপক আইন গৃহীত এবং ১লা জুলাই তারিখে উহা প্রবর্ত্তিত হইল। ১৯২৪ সাল হইতে এই আইন আজও বলবৎ আছে।

দেশপ্রেমিক, সাম্রাজ্যগর্ব্বী ও সামরিক শক্তিতে বলীয়ান জাপানীদের কাছে এই নূতন মার্কিণী আইন অসম্মানজনক বলিয়া বিবেচিত হইল। ১লা জুলাই (১৯২৪) তারিখ জাতীয় অসম্মানের দিন বলিয়া ঘোষিত হইল জাপানের ১৯টি সংবাদপত্র একযোগে সম্মিলিত প্রতিবাদ প্রকাশ করিল, জাপানী পার্লামেণ্টের (Diet) এক বিশেষ অধিবেশনে জাপ বিতাড়ন আইনের বিরুদ্ধে এক প্রস্তাব গৃহীত হইল দেশের সর্ব্বত্র জনসভার অনুষ্ঠান হইল এবং টোকিওতে মার্কিণ দূতাবাসের সম্মুখে কয়েকজন জাপানী হারাকিরি' (আত্মহত্যা) করিল এবং মার্কিণ দূতাবাসের পতাকাও কেহ কেহ নামাইয়া ফেলিল।

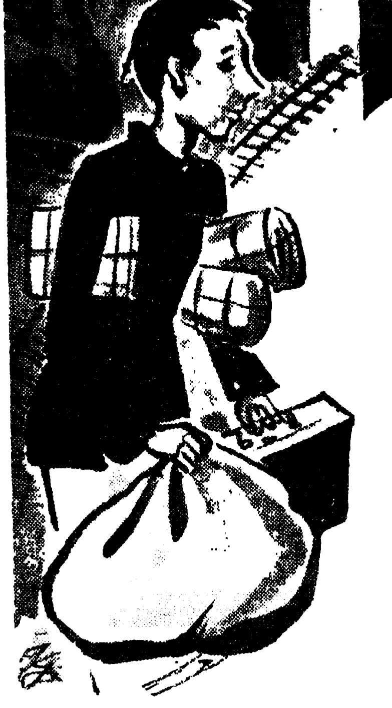
এই জাতীয় মনোবেদনা ও বিক্ষোভ (অবশ্য জাপানও নিজ দেশে চীনা শ্রমিক ও মজুর সম্পর্কে একই নীতি অবলম্বন করিয়াছিল) ক্রমশঃ আমেরিকা ও জাপানের কূটনৈতিক সম্পর্ককেও ঘোরালো এবং উগ্র করিয়া তুলিল। তখন হইতেই প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য একদল চীৎকার করিতেছিল, "আমেরিকাকে শাস্তি দাও", ক্রমেই সেই চীৎকার ১৯৪১ সালের রণ-ধ্বনিতে পরিণত হইল। মাঞ্চুরিয়া ও চীনের জাপানী আক্রমণাত্মক নীতি লইয়া বিরোধ প্রবলতর হইতেছিল। চীন বহু পূর্ব্বেই রুশ, ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইংরাজ, মার্কিণ ও জাপানী বৈদেশিক শক্তির 'লুঠের মালে' পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার 'বখরা' লইয়া আবার পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া লাগিল।

মাঞ্চুরিয়ার উপর জাপানের আধিপত্য বিস্তার লাভ করিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার রেলপথ অত্যন্ত গুরুত্বসম্পন্ন ছিল। এই রেলপথ যাহাতে জাপানের হাতে না পড়ে এজন্য মার্কিণ গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে উহা ক্রয় করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু জাপান তাহাতে বাধা দেয়। কেবল বাধা দিয়াই ক্ষান্ত রহিল না, কার্যতঃ কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ার রেলপথগুলির উপর জাপানীরা প্রভুত্ব বিস্তার করিল। এদিকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, জার্ম্মাণী ও ফ্রান্স—এই চারি শক্তি মিলিয়া ব্যাঙ্ক ও রেলপথ স্থাপন এবং প্রভূত মূলধন নিয়োগের দ্বারা চীনকে 'সাহায্য' করিতে চাহিল। কিন্তু জাপানী সাম্রাজ্য-স্বার্থের ইহা পরিপন্থী বলিয়া জাপান ইহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাধা দিল। ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত এই অবস্থাই চলিতে থাকে, সেই সময় জাপান মিত্রপক্ষের সহিত যোগ দিয়া চীন ও প্রশান্ত মহাসমুদ্রে জার্ম্মাণ অধিকৃত দ্বীপ ও রাজ্য কাড়িয়া লয়। মহাযুদ্ধের পর বৃটেন, আমেরিকা ও জাপানের সম্পর্কের মধ্যে কিছুটা পরিবর্ত্তন ঘটে। কারণ, ইহার আগ পর্য্যন্ত জাপানীদের বিশ্বাস ছিল যে, চীনে আমেরিকার অগ্রগতির প্রধান বিঘ্ন হইতেছে জাপান ও ইংলণ্ডের মধ্যে মৈত্রী। জাপানী নৌ-বিভাগের কিনোয়াকাই মাৎসুয়ো লিখিয়াছেন—"The primary obstacle to America's advance in China was the alliance between Japan and England. That is should the United States attempt to challange Japan's position in Asia, this would mean She would face the combined Anglo Japanese armies and navies." কিন্তু ১৯২১ সালে ওয়াশিংটন সম্মেলনে বিভিন্ন রাষ্ট্রের নৌবল নিয়ন্ত্রণ ও চীন সম্পর্কে নয় শক্তির সন্ধির পর ইঙ্গ-জাপ সম্পর্কের পরিবর্ত্তন ঘটে। ১৯২২ সালে বৃটেন ও জাপানের মধ্যে মৈত্রী চুক্তির অবসান হয়, কারণ জার্ম্মাণীর পরাজয়ের পর পরিবর্ত্তিত আন্তর্জ্জাতিক অবস্থায় বৃটেনের পক্ষে জাপানের সহযোগিতার আর ততটা প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু সেই চুক্তির অবসান ঘটিলেও এবং উহা দ্বারা জাপান ক্ষুব্ধ হইলেও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীয় নীতি জাপানকে কার্য্যতঃ বাধা দেয় নাই। ১৯৩১ সালে জাপানের মাঞ্চুরিয়া অভিযানের পর আমেরিকা তারস্বরে প্রতিবাদ জানাইল। কিন্তু জেনেভায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের বৈঠকে স্যার জন সাইমন বৃটিশ নীতির অতি উদার ব্যাখ্যা করিয়া জাপানকে সমর্থন করিলেন। ১৯৩৪ সালে জাপান ওয়াশিংটন বৈঠকের নৌবল-নিয়ন্ত্রণ চুক্তি বাতিল করিয়া দিল। ইহার পর হইতে জাপান, বৃটেন ও আমেরিকা যেন পরস্পরের সহিত পাল্লা দিয়া নৌবল বৃদ্ধি করিতে লাগিল। এই নৌবল বৃদ্ধির উদ্দেশ্য অতি স্পষ্ট ছিল। কেবল নৌবল নহে, অস্ত্রশস্ত্রের দিকেও বিভিন্ন রাষ্ট্র মনোযোগী হইল। বিশেষভাবে নাৎসীপন্থী রাষ্ট্রসমূহ রণসজ্জা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। ১৯৩৬ সালে জাপান, জার্ম্মাণী ও ইতালী 'anti-Comintern Pact' বা 'সোভিয়েট-বিরোধী সন্ধি' সর্ত্তে আবদ্ধ হইল। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের মতে (১৯৪১ সাল, ১৫ই ডিসেম্বরের বক্তৃতা) উহার উদ্দেশ্য ছিল বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নাৎসী শক্তিবর্গের ঐক্য বিধান। ইহার পরের বৎসর ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে জাপান চীনে নূতন পর্য্যায়ের অভিযান সুরু করিল।

আমেরিকা বরাবর জাপানের এই আক্রমণাত্মক রণনীতি ও বাণিজ্যনীতির বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছে। ১৯৩৭ সালে বেলজিয়ান গভর্ণমেণ্টের উদ্যোগে ব্রুসেলসে সুদূর প্রাচ্য সংশ্লিষ্ট সমস্ত রাষ্ট্রের এক সম্মেলন হয়। ইহাতে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু জার্ম্মাণী ও জাপান নিমন্ত্রণ সত্ত্বেও উহাতে উপস্থিত হয় নাই। তারপর ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভ। আমেরিকা ক্রমশঃ মহাযুদ্ধে জড়াইয়া পড়িতে লাগিল এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় জাপানী রাজ্য বিস্তারের সুযোগও আগাইয়া আসিতে লাগিল। যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন এবং আপোষ মীমাংসার দ্বারা উহা এড়াইবার জন্য জাপানী গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ কর্ডেল হাল আলোচনা শুরু করিলেন। ৯ মাস ধরিয়া এই আলোচনা চলিয়াছিল এত দীর্ঘকাল ধরিয়া আলোচনা অত্যন্ত অভিনব বটে। ইহা দ্বারাই বুঝা উচিত ছিল যে, আপোষ-মীমাংসা সম্ভব নহে। কারণ, বিরোধের আসল প্রশ্ন রহিয়া গিয়াছে উভয় দেশের ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদীয় দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে,

[ইহার পর ২৭৯ পৃষ্ঠায়]







প্রভাসের ব্যবসা

শ্রীবিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত

পরিকল্পনা মন্দ ছিল না, ধোপে টিকিল না। অত্যল্প বয়সে পুত্রের পিতা হইয়া প্রভাস ভাবিয়াছিল ভালোই হইল। তাহাকে আর অর্থের সন্ধানে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অফিসে কিংবা কারখানায় ছুটিতে হইবে না। বাবা যতদিন বাঁচিয়া আছেন খাওয়া-পরার ভাবনা তিনিই ভাবিবেন, আর তাঁহার পরলোকযাত্রার পূর্ব্বেই পুত্র বড় হইয়া উঠিবে, সেও তাহার অনাদর করিতে পারিবে না। প্রথম জীবনে পিতা এবং শেষ জীবনে পুত্রের উপার্জ্জনে নির্ভর করিয়া সে তাহার নিজের জীবন 'ফাউ' হিসাবেই ঝুঁকিয়া দিতে পারিবে।

বাপের কিছু বলবার নাই, ছেলেরও মতামত প্রকাশের বয়স হয় নাই। অতএব প্রভাস নিশ্চিন্ত আরামে মৎস্য ধরিবার বাতিক সুখে চালাইয়া ঝিলে, বিলে, পুকুরে, খালে ছিপ ফেলিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। দিনের শেষে সদ্যধৃত মাছের সুগন্ধে ও টাটকা তেলের সুঘ্রাণে ঘর ভরিয়া উঠে, সকলেরই মুখে প্রসন্ন পুলক ছড়াইয়া পড়ে, বাদ কেবল ! কেবল প্রভাস-পত্নীই 'গুম' হইয়া থাকে। তাহার ইচ্ছা হয় মাছ, মাছের চুপড়ি, ছিপ, সুতা ও মাছ ধরিবার সব সরঞ্জাম ভাঙিয়া, চুরিয়া আবর্জনা স্তূপে নিক্ষেপ করে। আজকার মাছটা টোপ গিলিতে কত বিলম্ব করিয়াছে এবং ওস্তাদ শিকারী প্রভাসকেও কত বেগ দিয়াছে, তাহারই কাহিনী যখন রান্নাঘরে সবিস্তারে বর্ণিত হইতে থাকে, প্রভাস-গৃহিণী তখন গৃহান্তরে চলিয়া যায়।

অবজ্ঞাটা প্রভাস লক্ষ্য করে, কিন্তু ওটা তাহাকে বিদ্ধ করিতে পারে না। কারণ, গৃহিণীর অবজ্ঞা অপেক্ষা মাছের আকর্ষণ অনেক বেশী। আর একই দৃশ্য বহুবার দেখিতে দেখিতে গা-সহা হইয়া গিয়াছে, তবু মনটা যখন মানুষেরই, তখন একেবারে উপেক্ষা করিয়া থাকাও অসম্ভব। নিরালা অবকাশের নিঃসঙ্গতায় অলক্ষিতে একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া যায়, প্রভাস ভাবে—এত অতল জলের মাছ তুচ্ছ সুতায় মুঠার মধ্যে টানিয়া আনি, আর এত কাছের মানুষকেই কাছে রাখিতে পারি না!

* * * *

সেই পুরাতন, পরিচিত, পাড়াগাঁয়ের প্রভাস ঠাকুর একদিন আমারই কলিকাতার বাসায় আসিয়া হাজির! ছিপ নাই, বঁড়শী নাই, চোঙ্গ নাই, একটা বাক্স কিংবা একটা বিছানা পর্য্যন্ত নাই, খালি গায়ে, খালি হাতে শুভ্র উপবীতের উপর একখানি সিল্কের চাদর জড়াইয়া, আমারই পাশের চেয়ারে সসঙ্কোচে বসিয়া যাহা কহিল তাহার সারমর্ম এই যে, অর্থের সন্ধানে সে কলিকাতায় আসিয়াছে। অসার খলু সংসারে সে এতদিনে বুঝিয়াছে—পুত্র, পরিবার কেহই কিছু নয়, নিজের টাকা না থাকিলে পুত্রও পর।

[ইহার পর ২৭১ পৃষ্ঠায়]

কল্পান্ত

[৩৫ পৃষ্ঠার পর]

ভাই? দিনকাল একেই ত' ভালো নয়,—চারদিকে মিলিটারি। কিছু একটা ঘটলে শ্বশুরবাড়ী, বাপের বাড়ী—সকলেরই বদনাম। তুমি নৃপেনকে লিখে দিয়ো অমল, আমরা কোথাও যাবো না।

আচ্ছা, আমি তবে এখন উঠি ছোড়দি—এই ব'লে অমল উঠে দাঁড়ালো। হেসে পুনরায় বললে, টুনু, জাপানীরা যদি আসে তাহ'লে কান ম'লেই তাড়িয়ো, কেমন?

টুনু বললে, হ্যাঁ অমলমামা, ভাঙ্গা বন্দুকের বদলে ভাঙ্গা বঁটিখানা রইলো ঘরে। ওরা তা'তেই ভয়ে পালাবে।

অমল হাসিমুখে বেরিয়ে সদর দরজা অবধি গেল, তারপর সহসা কি মনে ক'রে ফিরে এলো। বললে, ছোড়দি, আসল কথাটাই ভুলে গেছি।

কি ভাই?

নাগপুর থেকে নৃপেন পঁচিশটে টাকা পাঠিয়েছে আপনাকে দেবার জন্যে—এই নিন। এই ব'লে অমল পকেট থেকে টাকা বা'র করলো।

ছোড়দিদি বললেন, আমার এখানে না পাঠিয়ে তোমার কাছে পাঠালো কেন? সত্যি নৃপেন পাঠিয়েছে ত?

নিজের মুখের ভাব যথাসাধ্য গোপন ক'রে অমল হেসে উঠলো। বললে, সে কি আর জানে আপনি এখানে এখনো আছেন? হয়ত পালিয়ে গেছেন কোথাও, সে মনে করেছে!

ভ্রূকুঞ্চন ক'রে ছোড়দি কি যেন ভাবলেন পরে বললেন, হ্যাঁ, এটা বিশ্বাসযোগ্য। আচ্ছা,—খুব উপকার করলে তুমি, ভাই।

টাকা দিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে অমল সেদিনকার মতো তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চ'লে গেল। পাছে হঠাৎ পিছন থেকে ডেকে ছোড়দিদি কি মনে ক'রে পঁচিশটে টাকা ফেরৎ দেন—এজন্য অমল হন্ হন্ ক'রে গলির বাঁকে একদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ফেব্রুয়ারী মাস থেকে দেশের ইতিহাসটা বদলাতে লাগলো। মাঝখানে কিছুদিনের জন্য বিদেশ থেকে ঘুরে এসে অমল দেখলো, কলকাতা থেকে বেশীর ভাগ লোক একেবারেই পালিয়েছে। পথে সন্ধ্যার আলো জ্বলে না, রাত্রের দিকে রাজপথের মাঝখান দিয়ে চলতে গেলে গা ছম ছম করে। দিনের বেলা উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার যতদূর দেখা যায়—পথ ঘাট জনবিরল। হাজার হাজার বাড়ীঘর শূন্য, দোকানপাট নিশ্চিহ্ন। দিবালোকে তখন দেশীয় লোকেরা পালায়, আর রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে ইউরোপীয়রা পালায় স্পেশ্যাল ট্রেণযোগে। মৃত্যুভয়ভীত, আতঙ্কিত, সন্ত্রস্ত জনসাধারণ।

অমল আর ছোড়দিদিদের ওখানে গেল না। বোমা যখন পড়েনি, এবং জাপানীরাও ঢাল-তলোয়ার নিয়ে এসে পৌঁছয়নি, তখন যেমন ক'রেই হোক তাদের দিন কেটে যাচ্ছে বৈকি। অনেক দিন পরে নৃপেনের কাছ থেকে অমল একখানা চিঠি পেলো, নৃপেন নাগপুর থেকে বিশেষ মিলিটারী কাজে বোম্বাই চ'লে গেছে। যুদ্ধ থামার আগে হয়ত সে আর কলকাতায় ফিরতে পারবে না।

তখন বর্ষাকাল। ভারতবর্ষব্যাপী রাষ্ট্র-বিপ্লব চলছে। দেশের সর্বত্র হত্যাকাণ্ড, অরাজকতা ও সম্পত্তিনাশ ঘটছে। অমল ভাবলো, ছোড়দিদিরা মেয়েছেলে, সুতরাং দুশ্চিন্তার কারণ নেই। তা'র নিজের বাড়ীতে প্রায় সকলেই ফিরে এসেছে। জাপানীরা বর্মা দখল ক'রে বিশ্রাম নিচ্ছে, এক আধবার বোমা ফেলে যাচ্ছে ভারতের এখানে ওখানে,—এর বেশী কিছু না। কলকাতা এখনও নিরাপদ,—সুতরাং ছোড়দিদির খবর নেবার আছেই বা কি।

শীতকাল দেখা দিল, রাষ্ট্রবিপ্লবের ধারালো অবস্থা অনেকটা যেন নিস্তেজ হয়ে এলো। ইতিমধ্যে ভারতের সামরিক শক্তি অনেকখানি বেড়ে গেছে এবং জনসাধারণ অনেকখানি সাহস সঞ্চয় করেছে। তবে জাপান-বেতারে অবিশ্রান্ত ঘোষণা করা হচ্ছে, তা'রা শীঘ্রই প্রবল শক্তিতে ভারত আক্রমণ করবে। এদেশে তখন প্রচুর পরিমাণে ইংরাজ বিদ্বেষ জমে উঠেছে। অমল ভাবছিল, কি হয়, কি হয়!

এমন সময় হঠাৎ একদিন রাত্রে কলকাতায় জাপানী বোমাবর্ষণ সুরু। এতদিন পরে যেন পালে বাঘ পড়লো। বিপদ যতদিন আসন্ন ছিল ততদিনই আতঙ্ক, যেদিন সেই বিপদ সত্য সত্যই এলো, সেদিন অমল মনে মনে বললে, ও এই তুমি? এর বেশী কিছু নয়?

আবার সেই লক্ষ লক্ষ লোকের পলায়ন। উন্মত্ত, মূঢ় অন্ধ ও দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য জনসাধারণ ছুটেছে···ছুটেছে···যেদিকে দু'চোখ যায়। রোগে, অপঘাতে, দুর্ঘটনায় যত পলায়মান নরনারীর মৃত্যু ঘটলো,—বোমাবর্ষণে তা'র শতাংশের এক অংশও মারা যায়নি। কলকাতাটা সাতদিনের মধ্যে শ্মশান হয়ে গেল। অমল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো সব।

বেলেঘাটার ওদিকে বোমা পড়েনি, তবুও অমল ছোড়দিদির একটা খবর নেবে ভাবছিল, এমন সময় বোম্বাই থেকে নৃপেনের তার এলো, তোমরা আর ছোড়দিদিরা কেমন আছ শীঘ্র জানাও।

অমল তাড়াতাড়ি চ'লে গেল বেলেঘাটার ওদিকে।

তখন মধ্যাহ্ন, সুতরাং পথঘাট চেনার কোনো অসুবিধা নেই, এবং তা'র পরিচিত পথ—ভুলে যাবার কথাও নয়। কিন্তু অনেকক্ষণ একই গলির মধ্যে ঘোরাফেরা ক'রে নম্বর মিলিয়ে অমল একই বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো। সন্দেহ নেই, এইটিই ছোড়দিদিদের বাড়ী, সেই সুবিস্তৃত পুরনো পাঁচিল দোতলায় ভাঙা অংশটা তেমনই রয়েছে, পুরনো দরজাটাও সেই একইভাবে দাঁড়িয়ে—তবু সমস্ত বাড়ীটার চেহারা ফিরে গেছে! বাড়ীর ধারে আগে এই টিউব-ওয়েলটি ছিল না, আজকাল এটা নতুন হয়েছে। সেই বাড়ী কিন্তু সেই আগেকার বাড়ী নয়। ভিতরে কাঁদের যেন একটা কলরব চলছে,—একটা মস্ত সমারোহ।

হয়ত কোথাও থেকে কেউ অমলের সন্দেহজনক গতিভঙ্গী লক্ষ্য ক'রে থাকবে,—তাকে নির্বোধের মতন অমনি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সহসা একটি খাকি পোষাক-পরা লোক এগিয়ে এসে বললে, এই—ক্যা দেখতা?

অকস্মাৎ অমল হকচকিয়ে গেল। বললে, আমার লোক এখানে থাকতো।

ক্যা? তুমারা আদমি?—লোকটা কাছে এগিয়ে এলো।

অমল বললে, হ্যাঁ, এ কোঠি হামারি বহিনকা।

হিয়া কোই নেই,—এ মিলিটারী ব্যারাক হ্যায়···যাও!

অমল মূঢ়ের মতো কিয়ৎক্ষণ তাকিয়ে ধীরে ধীরে চ'লে গেল। সেইদিনই সে বোম্বাইতে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে জানালো, ছোড়দিদিরা কোথায় চ'লে গেছে, তা সে জানে না। তাদের বাড়ীঘর মিলিটারীর লোকেরা দখল করেছে।

কয়েকদিন অবধি অমল অনেক চেষ্টা করেছে, অনেক জায়গায় খবর নিয়েছে, কিন্তু ছোড়দিদির কোনো সন্ধান না পেয়ে মাস তিনেক পরে একদিন সত্যই সে হাল ছেড়ে দিল। ছোড়দিদি হলেন তা'র বন্ধুর দিদি এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের কুলবধূ, তাঁর সম্বন্ধে অতিশয় উদ্বেগ এবং কৌতূহল খানিকটা বেমানান বৈ কি। অমল সেদিকে আর ভ্রূক্ষেপ না ক'রে নিজের কাজে মন দিল।

দেশের দিকে যতদূর দেখা যায়, সমস্তটাই আতঙ্ক পাণ্ডুর, নৈরাশ্যময় এবং—জনজীবনের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। অথচ ভিতরে ভিতরে কী বিপুল পরিবর্তন—কোথাও স্থিতিশীলতা নেই। অমলের বন্ধুরা কে কোথায় হারিয়ে গেল—ভাগ্যচক্রে তা'রা সবাই ঘূর্ণমান। যারা নীচে ছিল তা'রা উপরে উঠে এলো, যারা উপরের মানুষ, তা'রা গেল তলিয়ে। অমল চেয়ে দেখলো, তা'র পারিপার্শ্বিক জীবনে যারা প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপনাকে আঁকড়ে ছিল, তাদের অন্তরলোকে কী বিরাট বিপ্লব! স্বেচ্ছাতন্ত্রী, অধীর, অস্থায়ী, ক্ষণমর্ত্য নরনারীর দল। নগরের পরিধির মধ্যে সবাই রয়েছে একত্র, কিন্তু কী বিচ্ছিন্ন, কী আত্মকেন্দ্রিক! মরুভূমিতে কত অপরিমেয় বালুকণা একত্র, কিন্তু কণায় কণায় কোনো যোগ নেই প্রকাণ্ড চাকা, নিত্যপরিবর্তনের দুরন্ত গতিতে ঘুরছে—মানুষ ছিটকে পড়ছে তা'র থেকে। অমল এদের থেকে পৃথক,—অমলের সঙ্গে এদের কোনো যোগ নেই। অমল একা।

বহুদিন পরে ধর্মতলার মোড়ে ছোড়দিদির মেজ ভাসুরের সঙ্গে অমলের হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। তিনি চিনতে পারেন নি অমলকে। অমল তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, কেমন আছেন প্রকাশবাবু? আমি অমল, নৃপেনের বন্ধু।

ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। কিন্তু কী বৃদ্ধ, মৃত্যু যেন ঘনিয়ে রয়েছে মুখে চোখে। তিনি হতচকিত হয়ে কিয়ৎক্ষণ পথের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, কেমন আছি? ঠিক বলা কঠিন ভাই।

অমল বললে, টুনুরা কোথায় জানেন?

টুনু? প্রকাশবাবু যেন অনেক দূরের দিকে তাকিয়ে কী যেন স্মরণ করবার চেষ্টা করলেন, অতঃপর মৃদুকণ্ঠে বললেন, ওঃ টুনু, মানে ছোট বৌমার মেয়ে··হ্যাঁ, মেয়েটি ভারি লক্ষ্মী ছিল!

কোথায় তাঁরা?

ঘাড় নেড়ে প্রকাশ বাবু বললেন, তাত' বলতে পারিনে, ভাই! মাস ছয়েক আগে কে যেন বললে, তাঁরা যেন কোথায়—!

উৎসুক অমল প্রশ্ন করলো, কোথায়? কলকাতায় নেই? দেশে?

প্রকাশবাবু একটা ল্যাম্প-পোষ্টে হেলান দিয়ে কেমন একটা ক্লান্তির সঙ্গে আত্মবিস্মৃত-নির্লিপ্ত হাসি হাসলেন। বললেন, দেশে! কিছু নেই গ্রামে। একখানা করগেটের ঘর ছিল দাঁড়িয়ে, বানের সময় তাও ভেসে গেছে। সেখানে দাঁড়াবার ঠাঁই নেই।

অমল বললে, নৃপেন আমাকে প্রায়ই চিঠি লিখছে ছোড়দিদিদের খবর জানবার জন্যে। অথচ আমি এক বছর হয়ে গেল ওদের খবর জানিনে। কি করি বলুন ত?

প্রকাশবাবু হঠাৎ এবার সজাগ হয়ে বললেন, এবার আমি যাই অমল। নৃপেনকে লিখে দিয়ো, চারদিকে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ ক'রে,—এ আগুন না নিবলে জানা যাবে না, কে বেঁচে আছে, আর কে নেই।

প্রকাশবাবু মন্থরগতিতে হাঁটতে লাগলেন ধর্মতলার পথ দিয়ে। অমল পিছন দিক থেকে চেয়ে রইলো। তিনি যেন সেই সম্ভ্রান্ত রায় পরিবারের ভগ্নাবশেষ! অমলের চাপা চাপা নিশ্বাস পড়লো।

বোমাবর্ষণের আতঙ্কে লক্ষ লক্ষ লোক পালিয়েছিল, কিন্তু বোমাবর্ষণের পর থেকে লোক বাড়তে লাগলো নগরে। অসংখ্য অগণ্য কাজ জুটছে এখানে। কোটি কোটি কাগজের টুকরো ছাপা হচ্ছে,—ত'র নাম টাকা। বসন্তের ঝরাপাতার মতো রাশি রাশি কাগজ যুদ্ধের ঝড়ের তাড়নায় চারিদিকে উড়ছে। সহস্র সহস্র যন্ত্রশালা সর্বত্র দাঁড়িয়ে উঠলো, তার সঙ্গে অগণ্য যুদ্ধের দপ্তর। অমল দেখলো মৃত্যুর ভয় স'রে গেছে, তা'র জায়গা নিয়েছে লোভের লোলিহান জিহ্বা। সঙ্গে সঙ্গে এলো চোরাবাজার এবং খাদ্যসম্ভার নিয়ে জুয়াখেলা। আবার অভিনব যুগের আরম্ভ।

ইতিহাসের পাতা ওলটালো। দুর্ভিক্ষ দেখা দিল করাল চেহারায়। ওদিনের সেই বীভৎস বিকারের মাঝখানে অমল একবার মরিয়া হয়ে চেষ্টা করলো, যদি ছোড়দিদিদের কোনো খোঁজ পায়। বার বার সে বেলেঘাটার ওদিকে ছুটে গেল, অনেক বাড়ীর কড়া নাড়লো, অনেক প্রশ্ন করলো অনেক প্রতিবেশীকে,—কিন্তু কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

গ্রীষ্মকাল ধু ধু করছে। দেশে দুর্ভিক্ষের মৃত্যু আরম্ভ হয়েছে। গভর্ণমেন্টের তখনও কিছু চক্ষু লজ্জা ছিল, তাই পথের মৃতদেহগুলি ভোরের আগেই তা'রা সরিয়ে দেয়। ক্রমে ক্রমে শ্মশানে জায়গা হয় না, শবদেহ পথে প'ড়ে থাকে। গাদিতে নিয়ে যাবার লোক নেই, গাড়ী নেই, পেট্রল নেই। অমল একদিন শ্মশানে গিয়ে দেখে এলো, শবদাহের কাঠ পাওয়া যায় না। ক্রমে বর্ষা নামলো; কলকাতার পথে ঘাটে প্রতিদিন শত শত মৃতদেহ প'চে ওঠে। অমল একটা ভয়ানক আতঙ্কে পথে-পথে কা'কে যেন খুঁজে বেড়ায়। অল্প-বয়সী মুমূর্ষু বিধবা দেখলেই অমল হেঁট হয়ে লক্ষ্য করে সে তা'র পরিচিত কিনা। সে নিশ্চয় জানে, ছোড়দিদির কোনো সহায় সম্বল নেই, শ্বশুরবাড়ী থেকে কোনো সাহায্য সে পাবে না, কেউ তাকে দয়া করবে না,—তাকে মুখ বুজে উপবাস করতে হবে। অমল অক্লান্তভাবে খুঁজে বেড়াতে লাগলো।

একদিন হতাশ হয়ে সে চেষ্টা ছেড়ে দিল। নৃপেনকে সবিস্তারে চিঠি লিখে জানালো, ছোড়দিকে কোথাও সে খুঁজে পায় নি। তা'র সাধ্যের অতীত।

এমনি ক'রে প্রায় দেড় বছর কেটে কাটলো।

ইউরোপের যুদ্ধের চূড়ান্ত অবস্থা দেখা দিয়েছে। অনেকে বিশ্বাস করে, জার্মাণীর আর বোধ হয় রক্ষা নেই। তবে হিটলার হয়ত তা'র পাশুপত অস্ত্র এখনও লুকিয়ে রেখেছে; চরম অবস্থায় নিক্ষেপ করতে পারে। ওদিকে জাপানকে আক্রমণ করার ষড়যন্ত্র চলছে। ভারতের প্রান্ত থেকে জাপানীদের তাড়ানো হয়েছে।

এমনি সময়টায় একদিন লোয়ার সার্কুলার রোডের এক বিদেশী পল্লীর ধারে চলতে চলতে সহসা অমল থমকে দাঁড়ালো। অদূরে ফুটপাথের ধারে একখানা দামী মোটর থেকে জনৈক শিখ মিলিটারী অফিসার নামলেন, তাঁ'র সঙ্গে একজন মহিলা। তিন বছর আগে শেষবার অমল ছোড়দিদিকে দেখেছিল,—তারপর দেশের উপর দিয়ে কল্পান্ত ঘটে গেছে,—এ মহিলার সঙ্গে সেই ছোড়দির সামঞ্জস্য বড়ই কম। অমল ভুল করেছে, শীতের সন্ধ্যার কুয়াশায় সে ঠিক চিনতে পারেনি। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে লক্ষ লক্ষ যুবকের মতো তারও চোখের জ্যোতি ক'মে গেছে,—উনি সেই ছোড়দি নন। এ হোলো প্রেতিনী, একে মানুষ বলা চলবে না।

অমল তাড়াতাড়ি নতমুখে চ'লে গেল। সেই পথের মোড়ে একটি পানের দোকানের কাছে এসে সে দাঁড়ালো। অলক্ষ্যে ঝাপসা কাঁচের আয়নার ভিতরে সে নিজের চেহারার দিকে তাকালো। মনে মনে বললে, ওরে মূঢ়, প্রাচীন নীতিবুদ্ধির পুতুল, চিনতে পারলি নে? না, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হোলো না? কোন্‌টা?

অমল ফিরে দাঁড়ালো। পুরনো বিশ্বাস একযুগে ভেঙে নতুন বিশ্বাস দাঁড়িয়ে ওঠে এ যুদ্ধে ভেঙে গেল সব—অভ্যাস, আদর্শ নীতি, চিন্তাধারা। এ যুদ্ধ একটি প্রকাণ্ড নাটক,—এক এক অঙ্কে এক এক যুগ সৃষ্টি হয়েছে, তা জানিস? মূঢ়, তুই কি সেই তিন বছর আগেকার ছোড়দিকেই ধরে থাকতে চাস? মূর্খ, নিজের অভ্যস্ত চিন্তাধারাকে বর্তমানের গতিশীলতার সঙ্গে বদলে নিতে পারিসনে? একথা কি মনে থাকে না, অবস্থার পরিবর্তনশীলতাকে মেয়েরাই সহজে প্রথমে স্বীকার ক'রে নেয়? ছোড়দিও ত' সেই মেয়েদেরই একজন রে!

অমল আবার ফিরে এলো। পা দু'খানা ঠিক পড়ছে না, কেমন যেন সভয় জড়তায় আর সঙ্কোচে, অথচ অধীর উত্তেজনায় অগ্রপশ্চাৎ বোধহীন। কয়েক পা এসে দেখলো মোটরখানা তখনও দাঁড়িয়ে, কিন্তু আরোহীরা ভিতরে গেছে।

অমল গিয়ে ভিতরে ঢোকবার চেষ্টা করতেই গার্ড বাধা দিল। বাড়ীটা যতদূর মনে হচ্ছে সামরিক কর্মচারীদের বাসস্থান অমল বললে, মায়িজী ভিতর গিয়া, উনকো মাংতা—

তুম কোন্ হায়?

উনকো ভাই—

গার্ড একটি স্লিপ ও পেনসিল দিল। অমল লিখে পাঠালো। কি যেন লিখলো কি যেন ভাষায়—অস্থির হাতে, আঁকাবাঁকা অক্ষরে। তারপর সে দাঁড়িয়ে রইলো।

দাঁড়িয়ে রইলো অনেকক্ষণ। কেমন একটা অপমানজনক হীনতাবোধ ঘুলিয়ে উঠছে তার শরীরে—যার কোনো ব্যাখ্যা নেই। গলার ভিতর থেকে কিছু একটা উঠে আসছে,—সেটা যেন কুণ্ডলীকৃত মৃত্যু—উঠে আসছে হৃদপিণ্ডের কোনো একটা জায়গা থেকে। অমল অনেকক্ষণ দাঁড়ালো।

এমন সময় মিলিটারী গার্ডসে এ জানালো, যাইয়ে উপরমে—

সামনেই কার্পেট মোড়া কাঠের সিঁড়ি। এদিক ওদিকে অজস্র আসবাব, আর সাজ-সজ্জা। সিঁড়ির দেওয়ালে দামী দামী বিলাতী ছবি ঝোলানো। অমল উঠে গিয়ে ড্রয়িং রুমে এসে দাঁড়ালো।

সেই মহিলাটি এবার বেরিয়ে এলেন সেই স্লিপটি হাতে নিয়ে। অমলকে দেখে বিস্ফারিত চক্ষে বললেন, ওঃ মি! নামটি

[ইহার পর ২৭৬ পৃষ্ঠায়]

তেলেনাপোতা আবিষ্কার

(২১ পৃষ্ঠার পর)

এলি? অভাগী মাসিকে এতদিনে মনে পড়ল, বাবা। তুই আসবি বলে প্রাণটা যে আমার কণ্ঠায় এসে আটকে আছে। কিছুতেই যে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারছিলাম না। এবার ত আর অমন করে পালাবি না?"

মণি কি যেন বলতে যাবে, তাকে বাধা দিয়ে আপনি অকস্মাৎ বলবেন, "না মাসিমা, আর পালাব না।"

মুখ না তুলেও মণির বিমূঢ়তা ও আর একটি স্থাণুর মত মেয়ের মুখে গুম্ভিত বিস্ময় আপনি যেন অনুভব করতে পারবেন। কিন্তু কোন দিকে তাকাবার অবসর আপনার থাকবে না। দৃষ্টিহীন দুটি চোখের কোটরের দিকে আপনি তখন নিস্পন্দ হয়ে রুদ্ধ নিশ্বাসে চেয়ে আছেন। মনে হবে সেই শূন্য কোটরের ভেতর থেকে অন্ধকারের দুটি কালো শিখা বেরিয়ে এসে যেন আপনার সর্ব্বাঙ্গ লেহন করে পরীক্ষা করছে। ক'টি স্তব্ধ মুহূর্ত ধীরে ধীরে সময়ের সাগরে শিশির বিন্দুর মত ঝরে পড়ছে আপনি অনুভব করবেন। তারপর শুনতে পাবেন: "আমি জানতাম তুই না এসে পারবি না বাবা। তাইত এমন করে এই প্রেত-পুরী পাঁহারা দিয়ে দিন গুণেছি।"

বৃদ্ধা এতগুলি কথা বলে হাঁফাবেন; চকিতে একবার যামিনীর ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আপনার মনে হবে বাইরের কঠিন মুখোসের অন্তরালে তার মধ্যেও কোথায় যেন কি ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছে—ভাগ্য ও জীবনের বিরুদ্ধে, গম্ভীর হতাশার উপাদানে তৈরী এক সুদৃঢ় শপথের ভিত্তি আলগা হয়ে যেতে আর বুঝি দেরী নেই।

বৃদ্ধা আবার বলবেন, "যামিনীকে নিয়ে তুই সুখী হবি বাবা। আমার পেটে হয়েছে বলে বলছি না, এমন মেয়ে হয় না। শোকে তাপে রোগে বুড়ো হয়ে মাথার ঠিক নেই, রাতদিন খিট্ খিট্ করে মেয়েটাকে কত যন্ত্রণা যে দিই—তা কি আমি জানি না। তবু মুখে ওর রা নেই। এই শ্মশানের দেশ—দশটা বাড়ি খুঁজলে একটা পুরুষ মেলে না, আমার মত ঘাটের মড়ারা শুধু ভাঙা ইঁট আঁকড়ে এখানে সেখানে ধুঁকছে, এরই মধ্যে একাধারে মেয়ে পুরুষ হয়ে ও কি না করছে!"

একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও চোখ তুলে একটিবার তাকাতে আপনার সাহস হবে না। আপনার নিজের চোখের জল বুঝি তাহলে আর গোপন রাখা যাবে না।

বৃদ্ধা ছোট একটি নিশ্বাস ফেলে বললেন, "যামিনীকে তুই নিবি ত বাবা! তোর শেষ কথা না পেলে আমি মরেও শান্তি পাব না।"

ধরা গলায় আপনি তখন শুধু বলতে পারবেন, "আমি তোমায় কথা দিচ্ছি মাসিমা। এ কথার আর নড়চড় হবে না।"

তারপর বিকালে আবার সেই গরুর গাড়ি দরজায় এসে দাঁড়াবে। আপনারা তিনজনে একে একে তাতে উঠবেন। যাবার মুহূর্তে গাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে আপনার দিকে সেই করুণ দুটি চোখ তুলে যামিনী শুধু বলবে,—"আপনার ছিপটিপ যে পড়ে রইল!"

আপনি হেসে বলবেন, "থাক্ না। এবারে পারিনি বলে, তেলেনাপোতার মাছ কি বার বার ফাঁকি দিতে পারবে!"

যামিনী মুখ ফিরিয়ে নেবে না। ঠোঁট থেকে নয়, মনে হবে, তার চোখের ভেতর থেকে মধুর একটি সকৃতজ্ঞ হাসি শরতের শুভ্র মেঘের মত আপনার হৃদয়ের দিগন্ত স্নিগ্ধ করে ভেসে যাচ্ছে।

গাড়ি চলবে। কবে একশ না দেড়শ বছর আগে প্রথম ম্যালেরিয়ায় মড়কের এক দুর্ব্বার বন্যা তেলেনাপোতাকে চলমান জীবন্ত জগতের এই বিস্মৃতিবিলীন প্রান্তে ভাসিয়ে এনে ফেলে রেখে গিয়েছিল—আপনার বন্ধুরা হয়ত সেই আলোচনা করবেন। সে সব কথা ভালো করে আপনার কানে যাবে না। গাড়ির সঙ্কীর্ণতা আর আপনাকে পীড়িত করবে না, তার চাকার একঘেয়ে কাঁদুনি আর আপনার কাছে কর্কশ লাগবে না। আপনি শুধু নিজের হৃদস্পন্দনে একটি কথাই বার বার ধ্বনিত হচ্ছে, শুনবেন,—"ফিরে আসব, ফিরে আসব।"

মহানগরের জনাকীর্ণ আলোকোজ্জ্বল রাজপথে যখন এসে পৌঁছোবেন তখনও আপনার মনে তেলেনাপোতার স্মৃতি সুদূর অথচ অতি অন্তরঙ্গ একটি তারার মত উজ্জ্বল হয়ে আছে। ছোটখাট বাধা বিড়ম্বিত দিন বয়ে যাবে। মনের আকাশে একটু করে কুয়াশা জমছে কিনা আপনি টের পাবেন না। তারপর যেদিন সমস্ত বাধা অপসারিত করে তেলেনাপোতায় ফিরে যাবার জন্যে আপনি প্রস্তুত হবেন সেদিন হঠাৎ মাথার যন্ত্রণায় ও কম্প দেওয়া শীতে লেপ তোষক মুড়ি দিয়ে আপনাকে শুতে হবে। থার্মোমিটারের পারা জানাবে এক শত পাঁচ ডিগ্রি, ডাক্তার এসে বলবে, "ম্যালেরিয়াটি কোথা থেকে বাগালেন?" আপনি শুনতে শুনতে জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে যাবেন।

বহুদিন বাদে অত্যন্ত দুর্ব্বল শরীর নিয়ে যখন বাইরের আলো হাওয়ায় কম্পিত পদে এসে বসবেন, তখন দেখবেন নিজের অজ্ঞাতসারে দেহ ও মনের অনেক ধোয়া মোছা ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। অস্ত যাওয়া তারার মত তেলেনাপোতার স্মৃতি আপনার কাছে ঝাপসা একটা স্বপ্ন বলে মনে হবে। মনে হবে তেলেনাপোতা বলে কোথায় কিছু সত্যি নেই। গম্ভীর কঠিন যার মুখ আর দৃষ্টি যার সুদূর ও করুণ, ধ্বংসপুরির ছায়ার মত সেই মেয়েটি হয়ত আপনার কোন অলস দুর্ব্বল মুহূর্তের অবাস্তব কুয়াশাময় কল্পনা মাত্র।

একবার ক্ষণিকের জন্যে আবিষ্কৃত হয়ে তেলেনাপোতা আবার চিরন্তন রাত্রির অতলতায় নিমগ্ন হয়ে যাবে।



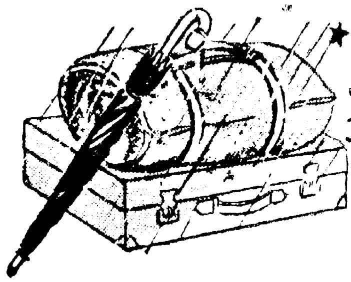
যাক বাঁচা গেল, বছর দশেকের মতন এখন নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

জনসাধারনের সেবায়
পঁচিশ বছর
১৯২০..........১৯৪৫

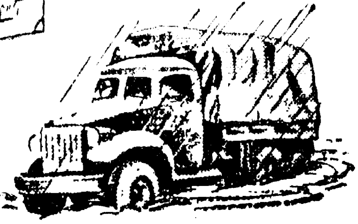
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ... আমাদের পঁচিশ বছরও পূর্ণ হলো.......... যুদ্ধ পরিস্থিতির অবসানে জনসাধারণের চাহিদা আমরা সম্পূর্ণভাবে মেটাতে পারবো।



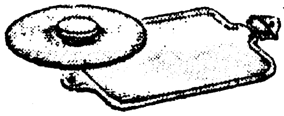
ডাকব্যাক ওয়াটারপ্রুফ



ডাকব্যাক ওয়াটারপ্রুফ ভ্রমন-দ্রব্যাদি



ডাকব্যাক ওয়াটারপ্রুফ ক্যানভাস ও ত্রিপল



রোগীর শুশ্রূষায় রবারের সরঞ্জাম

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ
ওয়ার্কস (১৯৪০) লিমিটেড

কলিকাতা • নাগপুর • বোম্বাই

COMARTS

শারদীয়া পূজায়

-হিন্দুস্থান রেকর্ড-

বিমল আনন্দের খনি

—প্রত্যেকটি শিল্পী আপনার পরিচিত—

- কুমার শচীন দেববর্ম্মণ
- কুন্দনলাল সাইগল
- পঙ্কজকুমার মল্লিক
- সুধীন চট্টোপাধ্যায়
- সুধীরলাল চক্রবর্ত্তী
- বিনয় অধিকারী
- সুপ্রভা সরকার
- উৎপলা সেন
- তৃপ্তি সিংহ
- ইন্দ্রাণী রায়
- বেলা মুখোপাধ্যায়
- অসিতবরণ মুখোপাধ্যায়

ইত্যাদি ইত্যাদি

পূজার আনন্দে ইহাদের গান উপভোগ করুন

হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রডাক্টস্ লিঃ

কলিকাতা



বাসন্তিকা
হেয়ার অয়েল

ব্রাহ্মী, ভৃঙ্গরাজ সার ও ভিটামিন এক সংযুক্ত কেশ তৈল। মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে ও চুল বৃদ্ধি করিতে আদর্শনীয়।

বল্‌সেইন কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ
কালকাতা।

সিটি সেলস অফিসঃ—
২০।১নং লালবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রতি জেলায় এজেণ্ট আবশ্যক।

বন্ধু-বিদায়

[২৯ পৃষ্ঠার পর]

নীলিমা। অন্যের মনের কথা আমি কেমন করে' জানব বলুন?

সমর। বেশ, নিজেরটাই না হয় বলুন। শিশিরকে পেয়ে আপনি সুখী হয়েছেন?

নীলিমা। সে-সব কথা জেনে আপনার লাভ? আপনি কেন ও-কথা জিজ্ঞেস করছেন?

সমর। কেন জিজ্ঞাসা করছি? করছি এই জন্যে যে, প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখি—আমাদের দেশে বিবাহ সুখের হয় না। কিছুদিন পরেই গ্লানি অতৃপ্তি এসেছে। এর কারণ কি? আর এর প্রতিকারই বা কি?

নীলিমা। ও-সব বুঝি না সমরবাবু, ও-সব বোঝবার মত বুদ্ধিও আমার নেই। (মুখ নামিয়ে) আচ্ছা, আপনি আমার মুখের পানে ওরকম করে চেয়ে রয়েছেন কেন বলুন তো? আমার সত্যি ভারি লজ্জা করছে।

সমর। কেন চেয়ে রয়েছি তাও আপনাকে বলে বুঝিয়ে দিতে হবে? আপনি অসাধারণ সুন্দরী বলে'।

নীলিমা। কিন্তু অসাধারণ সুন্দরী তো আমি নই।

সমর। নিজে কতখানি সুন্দর তা কি কেউ বুঝতে পারে কখনও?

নীলিমা। নিজে না বুঝতে পারলেও আপনার মত নারী-বিদ্বেষী পুরুষের এমনি লোলুপ দৃষ্টিও তো মাঝে মাঝে সেকথা আমায় বুঝিয়ে দিতে পারতো। (হাসতে লাগলো)

সমর। আবার আমাকে অপমান করছেন। এবার যদি আমি রাগ করে' সত্যিই চলে যাই—

নীলিমা। যেতে দেবো না। ফিরিয়ে আনবো।

সমর। যদি না খাই?

নীলিমা। নিশ্চয়ই খাবেন। আপনি ক্ষুধার্ত।

সমর। কিন্তু আমার এ ক্ষিদে মেটবার নয়।

নীলিমা। রাক্ষুসে ক্ষিদে যদি হয় তো না মিটবারই সম্ভাবনা বেশি। দশরথ! দশরথ! (উঠে দাঁড়ালো) (দশরথের প্রবেশ) বাবুর খাবার এইখানে দিয়ে যেতে বল্। (দশরথের প্রস্থান)

সমর। রাত্রে খাবার পর আমি কিন্তু আর নড়তে পারি না। এই আমার স্বভাব। এইখানেই তাহলে আমায় রাত্রিবাস করতে হবে।

নীলিমা। খেতে পেলে শুতে চায়—এ শুধু আপনার স্বভাব নয়, এই মানুষের স্বভাব।

(খাবারের থালা নিয়ে ঠাকুরের প্রবেশ)

ঠাকুর। কোথায় দেবো মা?

নীলিমা। দাও, এই টেবিলের ওপরেই দাও। উনি বিলেত-ফেরত মানুষ, ওঁর অভ্যেস আছে।

(টেবিলের ওপর খাবারের থালা নামিয়ে দিয়ে ঠাকুরের প্রস্থান)

সমর। তাহ'লে আরম্ভ করি। (খেতে খেতে) ওদেশে কিন্তু এ নিয়ম নেই। একজন খাবে আর একজন বসে বসে খাওয়াবে, এ চলে না। দু'জনকেই একসঙ্গে খেতে হয়।

নীলিমা। খাইয়ে আমরা কিন্তু সত্যিই আনন্দ পাই সমরবাবু। ওদের সামাজিক প্রথা কিন্তু মেয়েদের সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে' রেখেছে। যাক্ সেকথা। আমি আপনাকে অন্য একটা কথা জিজ্ঞেস করব। জবাব দিন।

সমর। কি কথা বলুন?

নীলিমা। বিয়ে কি আপনি করবেন না ভেবেছেন?

সমর। হাঁ, মনে তো করি তাই।

নীলিমা। কেন বলুন তো? কোনও নারী কি আপনাকে কোনোদিন প্রতারণা করেছে?

সমর। করেছে।

নীলিমা। কিন্তু সব নারীই এক নয়। এমন মেয়েও হয়ত আপনি খুঁজলে পাবেন যে আপনাকে সত্যিই ভালবাসবে।

সমর। কিন্তু কি হবে নারীর ভালবাসা পেয়ে?

নীলিমা। (হেসে) কি হবে? পৃথিবীর রং যাবে বদলে। বেঁচে থেকে আনন্দ পাবেন।

সমর। আপনি কি সে আনন্দ কোনদিন পেয়েছেন?

নীলিমা। (হেসে) সব কথাতেই কেন আপনি আমাকে টানছেন বলুন তো? সে আনন্দ যদি আজও আমি না-ই পেয়ে থাকি, ভবিষ্যতে পাবার আশাও তো করি।

(শিশিরের প্রবেশ)

শিশির। আরে! এ যে দেখছি বেশ জমিয়ে নিয়েছ তোমরা।

সমর। কেন, তুমি কি ভেবেছিলে জমবে না?

শিশির। আমি ভেবেছিলাম, গিয়েই হয়ত আমাকে পুলিশ ডাকতে হবে। তোমাকে তো আমি চিনি। আর মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার যা ধারণা—

সমর। সেই ভরসাতেই তুমি বুঝি ওঁকে আমার কাছে একা ফেলে দিয়ে গিয়েছিলে?

শিশির। আরে না না (হো হো করে হাসতে হাসতে), তাহ'লে তোমাদের বেশ ভাব হয়ে গেছে বল।

সমর। নিশ্চয়ই। নারী আর পুরুষ—এ দুটি জীবের সৃষ্টি বিধাতা তো শুধু ভাব হবার জন্যেই করেছেন।

শিশির। (জোরে হাসতে হাসতে) মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার এতদিনের ধারণা তাহ'লে বদলে গেছে বল?

সমর। (ঘাড় নেড়ে) হ্যাঁ, তা কিছু কিছু বদলেছে বই-কি।

শিশির। তাহ'লে নীলিমার বাহাদুরী আছে বলতে হবে।

সমর। একশ'বার। (খাওয়া শেষ করে' জল খেতে লাগলো)

নীলিমা। ও কি! খাওয়া আপনার শেষ হয়ে গেল? না না, ও দু'খানা লুচি আপনার ফেলে রাখলে চলবে না। আর ওই সন্দেশটা—

সমর। আর যে পারব না খেতে। (গ্লাস নামিয়ে) আচ্ছা, আপনার অনুরোধ—(আবার খেতে লাগলো)

(শিশির এতক্ষণ এদের দু'জনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল)

শিশির। তুমি অমন করে' বসে রয়েছ কেন নীলিমা, সমরের জন্যে আঁচাবার জল—পান—

সমর। (শিশিরের মুখের পানে তাকিয়ে) পান আমি খাইনে তুমি তো জানো।

শিশির। ও হাঁ। তা আঁচাবার জল তো দিতে হবে!

নীলিমা। (একটু হেসে) তার জন্যে তো তোমার বাড়ীতে চাকরের অভাব নেই। দশরথ! দশরথ!

(দশরথের প্রবেশ)

নীলিমা। বাবুর হাতে জল দে।

(দশরথের পিছু পিছু সমরের প্রস্থান)

নীলিমা। (স্বামীর দিকে তাকিয়ে) খাওয়ার পর উনি আর নড়তে পারেন না বলছিলেন। আজ রাত্রে এইখানে থাকবেন। শোবার ব্যবস্থা কোন্ ঘরে করে' দেবো?

শিশির। তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না। আমি ব্যবস্থা করছি।

(তোয়ালেয় হাত মুছতে মুছতে সমরের প্রবেশ)

সমর। চমৎকার খাওয়া হ'লো। গৃহকর্ত্রীকে ধন্যবাদ। এইবার একটুখানি গড়াতে পারলেই—

শিশির। (হাতের ঘড়ি দেখে) রাতও তো কম হয়নি। তাহ'লে চল সমর, তোমাকে আমি আমার গাড়ীতে করেই পৌঁছে দিয়ে আসি।

সমর। (অবাক হয়ে একবার শিশিরের মুখের পানে তাকালে, তারপর পকেট থেকে সিগারেট বের করে দেশলাই জ্বেলে ধরাতে গিয়ে নীলিমার মুখের পানে তাকিয়ে অকারণেই একটু হেসে) না না, গাড়ী করে কেন, তোমাকে আর এত কষ্ট করতে হবে না শিশির, একা একা পথ চলতে আমার ভারি ভাল লাগে।

শিশির। তাতে আর কি হয়েছে? এতদিন পরে দেখা, দু'জনে গল্প করতে করতে চল যাই—

(সমরকে একরকম টানতে টানতে দরজার কাছে নিয়ে গেল। সমর মুখ ফিরিয়ে নীলিমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে)

সমর। আপনাকে 'গুড নাইট' বলবো, না 'বিদায়' বলবো কিছুই বুঝতে পারছি না. নীলিমা দেবী, যাহোক একটা ব'লে গেলাম, কিছু মনে করবেন না।

(নীলিমা ম্লান একটুখানি হেসে হাত দু'টি জোড় ক'রে কপালে ঠেকিয়ে একটি প্রণাম করলে। শিশির ও সমর চলে গেল। নীলিমা তখনও তেমনিভাবে ঘরের মাঝখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো)।

পঞ্চশর রায়

[৯৪ পৃষ্ঠার পর]

তাহাতে তাঁহার উপর আমার অশ্রদ্ধা হয় নাই। শিল্পীর জীবনে অপরিহার্য্য আনুষঙ্গিক প্রেম। নিত্য নবশিল্পের সন্ধানে ধাবমান পঞ্চশরকে 'অশান্ত প্রতিভা' আখ্যা দিয়া নিজের নিকট তাঁহাকে লেবেল আঁটিয়া লইলাম। আমি তাঁহার অনুগতা সেবিকা মাত্র। আমার বিকার ঘটিল না।

পঞ্চশরের মহিলা ভক্তবৃন্দ তাঁহার জন্মতিথির উৎসব করিল, প্রত্যেকেই তাঁহাকে নানাবিধ উপহার দিল।

আমি চিন্তায় পড়িলাম। আমি এমন কিছু দিতে চাই যাহা তাঁহার নিত্য ব্যবহারে তাঁহার সান্নিধ্যে থাকে, যাহা আমার নীরব সেবার সাক্ষ্য বহন করিতে পারে। অথচ শত ধনী কন্যা, ধনীপত্নী রূপসীদের উপহার প্রাচুর্য্যে আমারি মত পিছনে থাকিয়া সেই উপহার আমার গোপন প্রেমের মূক বাণী জানাইতে পারে।

যুদ্ধের বাজার। অনেক বিবেচনার পর পনেরো টাকা দিয়া একগজ সিল্ক কিনিয়া আনিলাম। অতিযত্নে সেলাই শিখিয়া রুমাল একখানি প্রস্তুত করিলাম। সেলাই শিখিবার অবকাশ আমার ছিলনা, পঞ্চশরের পাণ্ডুলিপিকে ছাপিতে দেওয়া এবং জীবিকা সংস্থানের কাজটুকু করিয়া যাওয়া, ইহাই জীবনের লক্ষ্য হইয়াছিল। রাত্রি জাগিয়া অনভ্যস্ত হস্তে নানা ফলফুল অঙ্কিত করিয়া রবীন্দ্রনাথের কবিতার পংক্তি চয়ন লিখিয়া রুমালখানি তাঁহাকে উপহার দিলাম।

সেই বস্তুটির পরিণতি আজ মনে পড়িয়া আত্মগ্লানিতে হৃদয় অস্থির হইয়া উঠিতেছে।

পঞ্চশরের নবতমা শিষ্যা অনুপমা লাহিড়ির সহিত একটি সভায় আলাপ হইয়া গেল। সে রূপে সত্যই অনুপমা। আমাদের পার্টিতে তাহার পরে অনুপমা যোগদান করিল।

একদিন পার্টির এক মিটিংয়ের শেষে অনুপমা টাকা বাহির করিবার জন্য হাত-ব্যাগ খুলিতে তাহার ব্যাগের মধ্যের রুমালটি চোখে পড়িল। টানিয়া লইয়া দেখিলাম— সেই ঈষৎ-নীল জমির উপর গোলাপী সূতার কারুকার্য্য; রবীন্দ্রনাথের কবিতা রেশমে গাঁথা,—

"না চাহিতে না জানিতে যেই উপহার,
সেই তো তোমার।
আমি যাহা দিতে পারি সামান্য সে দান
হোক ফুল, হোক তাহা গান।"

ভুল হইবার কিছুই নাই। প্রাণপণে আত্মসংবরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এমন সৌখীন জিনিষটি পেলেন কোথা থেকে, মিস লাহিড়ি?"

অবহেলায় রুমালখানি হাতব্যাগে নিক্ষেপ করিয়া অনুপমা কহিল, "এর এক ইতিহাস আছে। একদিন পঞ্চশর রায় আমাদের বাড়ীতে এই রুমালখানা বার করে মুখ মুছছিলেন। আমি সুন্দর বলায় তক্ষুণি আমার হাতে গুঁজে দিলেন। বল্লেন, 'একবার সুন্দর বলেছ, এ তোমার নিতেই হবে। সুন্দর সুন্দরীর হাতেই মানায়'।" উচ্চস্বরে হাসিয়া অনুপমা বলিল, "এই সব বড়লোকেরা মনের দিক থেকে কি রকম দীন। একঘর ছেলেপিলে নিয়ে এই বয়সেও ভাঁড়ামী যায় না। সামান্য একখানা রুমাল দেবেন তাতেও কি উচ্ছ্বাস।" অনুপমা তাহার ভাবী জমিদার স্বামীর গাড়ীর হর্ণে চকিত হইয়া উঠিয়া গেল।

পার্টির অফিসের চায়ের দাগে রেখাঙ্কিত টেবিলে আমি মাথা রাখিলাম। অনুপমা লাহিড়ি, তুমি জাননা ওই সামান্য জিনিস কত অনুরাগে, কত ভালবাসায় অসামান্য হইয়া উঠিয়াছে। সামান্য পনেরোটি টাকা মাত্র। কিন্তু আমার অন্তরের পঞ্চদশ বিন্দু রক্ত। অভাবগ্রস্ত দরিদ্রের সংসারে ওই পনেরোটি টাকা পনেরোটি মোহর। উহার জন্য বহুদিন অফিসে জল না খাইয়া, ছেঁড়া জুতা পরিয়া কাটাইয়াছি। গোলাপী রেশম অনভ্যস্ত হস্তের অঙ্গুলি সঞ্চালনে গভীর রজনীর জাগরণের কাহিনী বলিয়া দিতেছে। ও রুমাল সামান্য নহে।

অতীতের বহু কাহিনী মনের নিভৃত কোণ হইতে বাহির হইয়া চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে। আমি সে সব কাহিনী স্বেচ্ছায় মনে করিতে চাই বা না চাই তাহারা আমাকে দেখা দিবেই। গ্রীক পুরাণের ড্রাগনের দন্ত। একটি হইতে সহস্রের উদ্ভব। একটি বিষাক্ত স্মরণ শত সহস্রকে ডাকিয়া আনিতেছে। নিজেদের মধ্যে তাহারা ড্রাগনদন্ত হইতে উৎপন্ন যোদ্ধৃমণ্ডলীর মত হানাহানি, কাটাকাটি করিতেছে। আমার মনের মধ্যে এই অবিরাম সংগ্রামে আমি নির্বাক হইয়া বসিয়া আছি। কোনও কাহিনী এড়াইবার সাধ্য আমার নাই। আমি যে আজ বিচারাসনে বসিয়াছি। এ আসনের মর্য্যাদা আমাকে রক্ষা করিতে হইবে।

আমার প্রতিবেশী নীরদ বসু একখানি ছোট মাসিকপত্র বাহির করিল। তাহারা কয়েকজন বেকার যুবক নিজেদের মধ্য হইতে চাঁদা তুলিয়া নিজেদের সাহিত্যানুরাগ তৃপ্ত করিবার জন্য এবং সময় কাটাইবার জন্য সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। তাহাদের দলে অনিচ্ছুকভাবে আমি কিয়ৎপরিমাণে যুক্ত হইয়া পড়িলাম।

নীরদের পত্রিকার উপর পঞ্চশর রায় যথেচ্ছ গালি বর্ষণ করিলেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধবদের পক্ষ গ্রহণ করিয়া, মতভেদের মর্য্যাদাহানির অপরাধে তিনি সাহিত্য সীমানার বহির্দেশে নীরদদের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

তাহাতে আমি ক্ষুব্ধ হই নাই। পঞ্চশরের কঠোর লেখনীর উপর আমার অগাধ বিশ্বাস ছিল। জনগণের মঙ্গলের জন্য সে লেখনী সময়ে সময়ে বিষোদগীরণ করে। ব্যাঙের ছাতার মত যে সব সাহিত্যিক অফিস-গুলিতে জন্মিয়া প্রাত্যহিক শাক-সব্জীর ডালায় অখাদ্য বিষাক্ত শস্যরূপে দেখা দিতেছে তাহাদের ছুঁড়িয়া ফেলাই উচিত। অন্যথায় অজ্ঞানের খাদ্যসম্ভার বিষাক্ত হইয়া উঠিতে পারে। নীরদের মত বহু তরুণ এদেশে আছে, যাহাদের সৃষ্টির ক্ষমতা নাই, দম্ভের বিলাস আছে। যৌবনের অদম্য তেজ রক্তের মধ্যে অনুভব করিয়া তাহারা নিজেদের জগজ্জয়ী এবং নবজাগ্রত বলিয়া ভাবে। ন্যায় ও অন্যায়ভাবে তাহাদের আক্রমণে পঞ্চশরের সাহসেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

নীরদের সহিত মাঝে মাঝে সাহিত্য-সভা ইত্যাদি স্থানে যাতায়াত করিতে লাগিলাম। ইতিপূর্ব্বে কদাচিৎ সুযোগ ঘটিত। পঞ্চশরের অতি নিকটে যাহারা থাকিতাম, তাহাদের বিষয়ে তিনি বিশেষ চিন্তা করিয়া মস্তিষ্ক চালনা করেন নাই। তাহাতে তাঁহাকে দোষ দেওয়া চলে না। ঐ মস্তিষ্কের তো আমার মত নগণ্য ব্যক্তির মঙ্গল চিন্তার জন্য উদ্ভব হয় নাই।

নীরদ আমারি মত পরিচয়হীন নগণ্য ব্যক্তি। সুতরাং সাধারণের সহিত আমার পরিচিতি করাইয়া দিবার জন্য সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার ফলে, দুই একটি পত্রিকা হইতে আমার প্রবন্ধ চাহিয়া আমন্ত্রণ আসিল এবং দুই একটি নবগঠিত সমিতি আমাকে সভ্য করিয়া লইতে আগ্রহ দেখাইল।

সামান্য মনোযোগ মাত্র। কিন্তু আমার বঞ্চিত, ভীরু চিত্তের সঞ্জীবনী মন্ত্র। পঞ্চশরের পদলগ্না ছায়া ভিন্ন আমার নিজেরও যে একটা পৃথক সত্তা আছে জীবনের প্রথম উপলব্ধি করিতে পারিলাম। বিশাল সহকারের মূল বেষ্টন করিয়া যে লতিকা আত্মবিস্মৃতিতে নিমগ্ন হইয়া থাকে, সহকারের আশ্রয় ভিন্ন তাহার অপর জীবন তাহার কল্পনার বাহিরে হইলেও সম্ভব। আমারও আত্মবিস্মৃত চিত্তে প্রথম অনুভূতি জাগিতে চাহিল, তবে কি আমারও সমাজে কোন স্বতন্ত্র মূল্য আছে!

একটি সভায় পঞ্চশরের নিকটে বসিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। সভা মধ্যে পঞ্চশর সহসা রাণীগঞ্জের মহারাজকে দেখিয়া পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। তাঁহার দিকে একপদ অগ্রসর হওয়া মাত্র শুনিলাম আমার পিছনে চাপাগলায় কে যেন বলিতেছে, —"এই চললো গাদাবোট স্টীমারের পেছনে। সব সময়ে পঞ্চশর রায়ের পেছনে এই মেয়েটা কুকুরের মত বেড়ায়। লোকে বলে পঞ্চশর রায় চায় নিত্য নূতন   করে কি ঘটিয়েছিল ভুলে যাও বাছা।"

এই অভদ্র অশিষ্ট ভাষা কাহার মুখ হইতে বাহির হইতেছে দেখিবার জন্য পিছনে তাকাইলাম। মাল কোঁচা গরুর গাড়ীর মত ফেলিয়া ঝুলিয়া দুইটি স্থূলকায় ব্যক্তি ঢিলা-হাতা আদ্দির পাঞ্জাবী এবং ঢাকা

ইন্দ্রিয় নিজের শিয়রে আবৃত হইয়া চলিয়াছে বার অভিমুখে: বক্ষ-বিলম্বিত সোনার ঘড়ির শিকলি, হস্তের অঙ্গুরীয়ের নীলা-পান্না-হীরা দেখিয়া তাহাদের অর্থ ও তাহার প্রচার সম্বন্ধে ইহা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

অপমানে দুঃখে চোখে জল আসিল। এ অপমান কেবল আমাকে নয়, স্বয়ং পঞ্চশরকেও। সুতরাং অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। মস্তারার্জের সহিত মোলাকাৎ করিয়া ফেরামাত্র কথাগুলি পঞ্চশরের কর্ণগোচর করিয়া দিলাম। পঞ্চশর উদ্দীপিত হইয়া উঠিলেন,—"কি অন্যায়। তাদের দেখাতে পার?"

লোক দুইটি দরজার নিকটে তখনও দাঁড়াইয়া অন্যান্য অভ্যাগতদের সহিত কথা বলিতেছিল।

তাহাদের দিকে চাহিয়া পঞ্চশর চিনিয়া ফেলেন,—"ওঃ, ওরা যে মেসার্স কাঞ্জিলালের দুই খোদ কর্তা।"

কিছুদিন পরে দেখিলাম প্রসিদ্ধ প্রকাশক মেসার্স কাঞ্জিলালের জয়গাথায় পঞ্চশর আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিয়াছেন। বোঝা গেল সমাগত প্রকাশকদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পঞ্চশর তাঁহার অখ্যাতনামা সেবিকার মান-অপমানের কথা সহজেই বিস্মৃত হইতে পারিয়াছেন।

প্রবন্ধ লিখিয়া কিছু নাম হইয়াছিল। একদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখিলাম একটি বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা নারী আন্দোলন সম্পর্কে আমার এক সদ্য প্রকাশিত প্রবন্ধকে কঠোর সমালোচনার ছুরিকাঘাতে ছিন্নভিন্ন করিয়া তাহার নানা রূপ কদর্থ করিয়াছে। আমি যাহা বলিতে চাহি নাই তাহারা তাহাই প্রমাণ করিতে ব্যস্ত।

স্বতঃই পঞ্চশরের কথা মনে জাগিল। তাঁহার বন্ধু বান্ধবদের মানরক্ষার্থে সর্বদা তাঁহার প্রসিদ্ধ পত্রিকা দুইখানি প্রস্তুত থাকে। তাঁহার শরণাপন্ন হইলাম।

পঞ্চশর অট্টহাস্য করিলেন,—"আরে ছি লীলা, এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? এর আবার প্রতিবাদ কি? প্রতিবাদ নীরবতা। তুমি প্রসিদ্ধ হয়ে উঠছো, দুঃখ কোরনা।"

নীরবে চলিয়া আসিলাম। বাড়ী ফিরিয়া দেখি নীরোদ আমার ঘরে টেবিলে বসিয়া তেলেভাজা বেগুনী সহযোগে তেল-নুন-মাখা মুড়ি খাইতেছে এবং জলদবেগে কি যেন লিখিতেছে। তাহার সম্মুখে এক পাত্র ঠাণ্ডা চা এবং বার্ণা দুইটি।

"আসুন লীলা দিদি, আপনার অনুপস্থিতিতে আমার আতিথেয়তার ত্রুটী হয়নি দেখছেনই। এই লেখাটি দেখুন দেখি, প্রায় শেষ করে এনেছি। আপনার প্রবন্ধের যা জঘন্য সমালোচনা করেছে এই কাগজটায়! তার প্রতিবাদ হওয়া উচিত, আমি করছি। এই সংখ্যায় যাবে।"

আমার কণ্ঠে বাষ্পাঙ্কুর উদ্গত হইয়া জাগিল। নীরোদ আমারি মত দুর্বল। তবু দুর্বলের সাহায্য করিতে দুর্বলই অগ্রসর হইয়া আসিল। সবলের দ্বারে বৃথা প্রার্থনা করিয়া প্রত্যাখ্যাত হইলাম। যদি আমি আজ পঞ্চশরের অন্ধ স্তাবক মাত্র না হইয়া তাঁহার প্রভাবশালী বন্ধু হইতাম, যাহার উপর তাঁহার কোনও ভবিষ্যতের আশা থাকিত, তবে তিনি তাঁহার চিরাচরিত প্রথায় সমরে অবতরণ করিতেন। আমি একটি তুচ্ছ অফিসের তুচ্ছতম কেরাণী মাত্র। সুতরাং আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি বড় প্রকাশক এবং সুবিখ্যাত পত্রিকার সহিত বিবাদ করিতে চান না। তাঁহার ব্রত অন্যায়ের বিরুদ্ধে দুর্বলকে রক্ষা নহে, সবলের পৃষ্ঠপোষকতা। চকিতে এসব কথা মনে হওয়ামাত্র মনকে চাপিয়া রহিলাম। আমার জীবনে পঞ্চশরের আসন দেবতারূপে। নিজের কোন মূল্যই আমি দিতে চাহি না।

ড্রাগনের দন্ত তখনও বপন হয় নাই। আমারি চোখের সম্মুখে বপন হইল, দাঁড়াইয়া দেখিয়া চিরদিনের মত নিজের মধ্যে সংগ্রাম বহন করিয়া চলিয়া আসিলাম।

রবিবার অপরাহ্নে পঞ্চশরের অফিসে উপনীত হইলাম। তাঁহার নূতন নাটকখানি কপি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম।

হাতের স্বর্ণ কলম নামাইয়া পঞ্চশর আমার প্রতি চাহিয়া হাসিলেন,—অনাবিল স্নেহের অকৃত্রিম হাস্য। এরূপ হাসি তিনি সহজে কাহাকেও উপহার দেন না।

"আজ নাটক টোকা হবে না লীলা, এখনি কয়েকজন লোক আসবেন এখানে। কথাবার্তার গোলমালে আমি দেখে দিতে পারব না। তার চেয়ে তুমি নূতন কি লিখছ বল শুনি।"

আশ্চর্য হইলাম। আমার রচনা সম্পর্কে পঞ্চশরের কোন আগ্রহ কোনদিন প্রকাশ পায় নাই। আজ তাঁহার কণ্ঠে কেমন যেন একটা প্রচ্ছন্ন তোষামোদের সুর। তাঁহার ভঙ্গিতে ব্যাকুল আশ্রয় অন্বেষণ।

একটি সুদর্শন যুবক প্রবেশ করিল। ছাত্র সমিতির সম্পাদক। পঞ্চশর সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাহাকে বসাইয়া সাগ্রহে আলাপ করিতে লাগিলেন।

বিস্মিত হইলাম। ইহাদের কাহাকেও তো পঞ্চশর মানুষ বলিয়া মনে করিতেন না! প্রচণ্ড তাচ্ছিল্য তাঁহার [illegible] ছিল।

সহসা নীরোদের নাম শুনিয়া সচকিত হইলাম। নীরোদ সম্প্রতি তাহার পত্রিকায় পঞ্চশর প্রমুখ তাঁহার দলীয় সাহিত্যিকমণ্ডলীর বিশদ নিন্দা করিয়াছে। পঞ্চশর বলিতেছেন,—"দেখ দেখি আস্পর্ধা? আমাদের কাছ থেকে লেখা শিখে আমাদেরই বিরুদ্ধাচরণ করে।"

যুবক বলিল, "হাঁ ওই বয়সের লেখা কিন্তু সর্বপ্রথমে আপনার কাগজেই বের হয়।"

"তা হোক। তখন ছেলে ছিল। এখন দেশের চিন্তাবীরদের নিয়ে এমন বিদ্রূপ করার কোন অজুহাতই নেই।"

"আমাদের কাগজে আমরা এর পাল্টা জবাব লিখবো। দেখবেন বাছাধনদের কি শাস্তি করি। ও কাগজ আর চালাতে হবে না।"

পঞ্চশরের বিশাল প্রতিভাদীপ্ত চক্ষু দুইটি মুহূর্তের জন্য পৈশাচিক আনন্দে জ্বলিয়া উঠিল। পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া তিনি সংযত কণ্ঠে বলিলেন, "সে তোমরা যা ভাল বোঝ কোর। এখন বল দেখি আমার লেটেষ্ট উপন্যাস কেমন লাগল?"

"চমৎকার, এমন লেখা কারুর কলম দিয়ে আর বেরোয়নি।"

"যাক, তোমাদের ভাল লাগলেই ভাল। ও বই তোমাদের জন্যেই লেখা। আর শোন, তোমার কবিতার বই দুখানা আমাকে পাঠিয়ে দিও। আমি ভাল করে পড়ে নিজে সমালোচনা করবো।"

কৃতকৃতার্থ হইয়া যুবক বিদায় লইল।

হায়, আমি কাহাকে পূজা করিয়াছি? এ তো দুর্বল, অতি দুর্বল। বাহিরে শক্তির আড়ম্বর ইহার ছদ্মবেশ মাত্র। যে সম্মান ও মর্যাদার রাজসিংহাসনে এই অভিনেতা আত্মপ্রসন্নচিত্তে উপবিষ্ট ছিল, সেই আসনের এক কোণায় সামান্য একটু টান পড়িবামাত্র এ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। রাজকীয় গাম্ভীর্য উপেক্ষা ইহার সাধ্যায়ত্ত নহে। আমার নিকট, ছাত্রসমিতির সম্পাদকের নিকট আজ ইহার মত ব্যক্তি ভিক্ষুক-হস্ত প্রসারণ করিতেছে,—'তোমরা আমাকে আমার আত্মবিশ্বাস ফিরাইয়া দাও, আমাকে রাজাসনচ্যুত করিও না। তোমরা বল আমি আমার আসনে প্রতিষ্ঠিত আছি।'—

পঞ্চশর রিসিভার তুলিয়া টেলিফোনে তাঁহার বন্ধুকে ডাকিলেন। মোহশূন্য দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া তাঁহার বচন-বিন্যাস শুনিতে লাগিলাম। "...কি অন্যায়, না?... আমরা কেউ ও কাগজের কোন সমর্থন করব না......লেখা যাতে ওরা না পায়... পাব্লিক কি মনে করবে?...কি আশ্চর্য!... আমরা কি আর পাব্লিকের ধার ধারি...—"

বক্তব্য শেষ করিয়া পঞ্চশর আমার দিকে ফিরিয়া তাঁহার দুর্লভ কোমল কণ্ঠে কহিলেন, আজ বড় ব্যস্ত আছি। লীলা, তুমি এখন বাড়ী যাও।"

"আমি যাচ্ছি। প্রণাম।"

অনভ্যস্ত প্রণামজ্ঞাপনে পঞ্চশর বিস্মিত হইয়া চাহিলেন। তাঁহার বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। অফিসের স্প্রিংএর দরজা আমার পশ্চাৎদেশে ছুটিয়া বন্ধ হইয়া গেল।

পঞ্চশর রায়, আজ তুমি দেবতার আসনে বসিয়াছ! কিন্তু তোমাকে দেবতা করিয়াছে কে জান? আমি, আমরা। আজ তুমি

পাগ্রিকের ধার ধারনা। কিন্তু, তোমার রাজাসন এই জনগণের অস্থি-পঞ্জরের উপর স্থাপিত, তোমার জয়যাত্রার রথের নিম্নে বক্ষ পাতিয়া দিয়াছি আমরা।

তোমাকে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এই নামহীন-গোত্রহীনের দল। তোমার জয়ন্তী উৎসবে বৃষ্টিতে ভিজিয়া পথে পথে আমরা হ্যাণ্ডবিল বিলি করিয়াছি, চীৎকার করিয়া গলা ফাটাইয়া তোমার রচনার প্রচার করিয়াছি। না খাইয়া তোমার গ্রন্থাবলী কিনিয়া কণ্ঠস্থ করিয়াছি। গৃহে তোমার চিত্র লম্বিত করিয়া বেলফুলের মালায় সাজাইয়াছি। একবার তোমাকে চক্ষে দেখিবার জন্য ক্রোশ ক্রোশ পথ পায়ে হাঁটিয়াছি। তবে তুমি দেবতা হইয়াছ। আমাদের নিকট তোমার ঋণ অনেক।

কিন্তু ভুলিওনা পঞ্চশর রায়, ওই দেবতার আসন হইতে এক নিমেষে তোমাকে টানিয়া ফেলিতে পারি—আমরাই। বহুদিন পূর্ব্বে বড়লোককে তুমি এইভাবে টানিয়া ফেলিয়াছিলে। তখন তোমাকে আমরা অভিনন্দন করিয়া দেবতার আসনে বসাইয়াছিলাম। তুমি আজ দেবতা হইয়া আমাদের ভুলিয়া গিয়াছ। আমরা কিন্তু ভুলি নাই যে, তোমাকেও সেইভাবে টানিয়া ফেলিবার ক্ষমতা আমরাই রাখি। দেবতাকে সৃষ্টি বা ধ্বংস করিবার ক্ষমতা এই মানুষেরই হাতে।

পঞ্চশর রায়, তুমি আমার কেহ নও। আমার স্থান ওই অখ্যাতনামাদের দলে, যাহারা আমারি মত, যাহাদের শোণিত আমারি মত পরিবর্তনশীল। লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া তোমার গজদন্তের দুর্গে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। নিদারুণ দুর্বুদ্ধিতে আপন সত্তা বিস্মৃত হইয়াছিলাম। সহসা আমার উপাস্য দেবতার মরণশীলতা আমাকে আত্মদর্শন করাইল। যাহাকে ধ্বংস করিবার আয়োজন তুমি করিতেছ, আমিও তাহারি মত এক অদম্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রকাশ।

পঞ্চশর রায়, আমি তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু আমার আদর্শ আমার ভালবাসারও ঊর্দ্ধে। তোমাকে ভালবাসিয়া আমি আমার আদর্শ হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হইতে পারিব না। ভুলিও না আমার প্রতিটি রক্ত কণিকা সংগ্রামশীল। অসংখ্য জীবাণুর বিরুদ্ধে, বাৰ্দ্ধক্যের বিরুদ্ধে তাহারা অহরহঃ সংগ্রাম করিতেছে। সেইরূপ অন্যায়ের বিরুদ্ধে, দুর্বিবেক তারুণ্য নাশের বিরুদ্ধে তাহারা সংগ্রাম করিতেছে। তোমার আকর্ষণ সে সংগ্রাম নিরস্ত করিতে পারিবে না। তাহারা আমার অপেক্ষাও শক্তিমান। সুতরাং হে পঞ্চশর রায়, আমাকে ক্ষমা কর। আজ হইতে আমিও তোমার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামিলাম।

"পাউডার বনাম ধূলা"

[২২০ পৃষ্ঠার পর]

শহরে যত খুশি ধুলা, তাহার উপর সাজানো হইতেছে কত টিপ, কত ফুল, কত কি! কনের মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া ধূলোয় মাখা রাঙা রাঙা চুল, কোমরে একটা ছোট ময়লা কাপড়, একেবারে নূতন লোক দেখিয়া একটু জড়োসড়ো হইয়া গেছে।

বোধ হয় এক সঙ্গে অনেকক্ষণ ঘোরা-ফিরা করার জন্য সবার সাহস বাড়িয়া গেছে। একজন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—"খোকাবাবু, তুমি বিয়ে করবে?"

জিনিসটা এমন লোভনীয়, তিন বছরের ছেলেরও রাজি হইতে আটকায় না, আশী বছরের বুড়োরও রাজি হইতে আটকায় না, ভুলু বিনা বিচারেই ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"করব।"

এর পরে যে আহ্লাদের ফুলঝুরি ছুটিল, তাহার কাছে আগেরটা যেন কিছুই নয়...দিকে দিকে কত ছেলে ছুটিয়া গেল, কত ফুল আসিল, কত কি আসিল এত দ্রুত আর সব দিক দিয়া এত উপযুক্ত বর পাইয়া মৌলিক বরকে সঙ্গে সঙ্গে বরখাস্ত করিয়া ভুলু বাবুকে তাহার স্থানে বসান হইল; প্রসাধন আরম্ভ হইয়া গেল।

গঙ্গার লাল মাটি দিয়া মৃন্ময় চন্দনের ফোঁটা, যেটুকু জায়গা বাকি রহিল পুঁই-শাকের পাকা ফলের বেগুনে রং দিয়া কত রকম রেখাচিত্র, পায়ে পুঁইয়ের রঙের আলতা, আরও কত রকম দাগ। কামিজের পকেটে ফুল, কলারের চারিদিকে ফুল; মাথায় খুব বেশী ফুলওয়ালা একটা গোলাপের ছোট ডাল বাঁধিয়া মাথার টোপর হইল, টোপর, মুকুট, পাগড়ি যা বলিবার অভিরুচি হয়। ভালো বর পাইয়া কনেকে আরও ভালো করিয়া সাজান হইল, শরীরের যেটুকু খালি ছিল পুঁইয়ের রস আর গঙ্গার লাল মাটিতে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল।

ওদিকে মিছিলও সাজিয়া উঠিল,—সব আগে বাজনা, তাহার পর আলো, তাহার পর ঘোড়া, তাহার পর হাতি, তাহার পর বরের গাড়ি। বরের গাড়ির পেছনে আবার ঘোড়া, আবার পতাকা, আবার বাজনা, আবার আলো।

কনেকে তুলিয়া ঠেলা গাড়ির একদিকে বসান হইল। ভুলুর আহ্লাদে যে মনটা কি হইতেছে। পেরাম্বুলেটারে চড়িয়া চির-কালটা কাটিল, কখনও সে এমন ভাবে, এমন পেরাম্বুলেটারে চড়িতে পাইবে কল্পনাও করিতে পারে নাই।

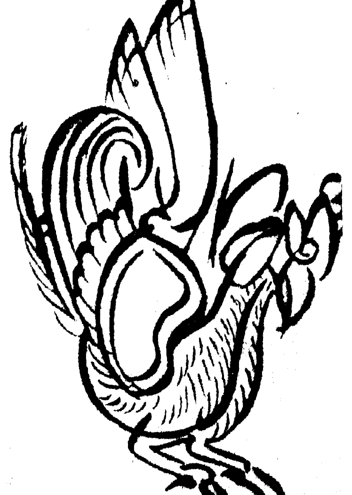
* * *

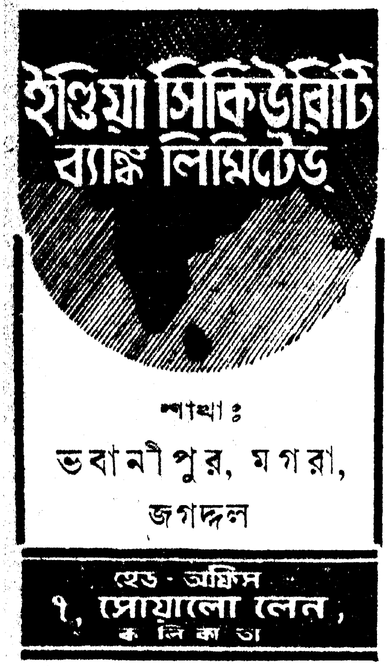
বাজনা আরম্ভ হইয়া গেল। সমস্ত মিছিলটায় যাত্রা সুরুর একটা চঞ্চলতা পড়িয়া গেল।

বরকে হাতের দোলায় করিয়া কয়েক-জন বড় গোছের ছেলে উঠাইয়া গাড়ির কাছে লইয়া গেছে, এইবার গাড়িতে তুলিবে, এমন সময় একটা উৎকট চীৎকারে সবাই একেবারে জড়ভরতের মতন হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, দেখিল শক রাস্তার মুখে ছোট একটি দল লইয়া আফিসের কোটপ্যান্ট পরা বরকর্তা! মুখের চেহারা দেখিলে বোধ হয় না ছেলের বিবাহের এমন চমৎকার যোগা-যোগে এতটুকুও খুশির ভাব আছে। ব্যাপারটা বুঝিবার আগেই একটা মেয়েছেলে একেবারে পাগলের মতন হইয়া এদিক পানে ছুটিল—মুখে—"খোকা বাবু! ভুলু বাবু! সর্বনাশ! তুমি এখানে?—আর আমরা সমস্ত শহর এক করে ফেললাম...কী ডাকাতে ছেলে রে বাবা!...ভুলুর বাবা অবশ্য তখনই চলিয়া গেলেন কিন্তু এদিকে এক মুহূর্তেই সব ওলটপালট হইয়া গেল। কোথায় যে কে গেল, হাতি, ঘোড়া, আলো, বাজনা, ছেলে, মেয়ে, এক মুহূর্তেই যেন সব মিলাইয়া গেল।

পৌষ রাতের ঘুমের দুঃস্বপ্ন দেখার মতন এমন একটা ওলটপালট যে, গলায় অত কান্না ঠেলিয়া আসিলেও ভুলু কাঁদিতে পারিল না, একটু হাত পাও ছুঁড়িতে পারিল না। নিচে থেকে কুড়াইয়া বুকে চাপিয়া কত কি বলিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে ঝি যখন সেই রাস্তার মুখে, তখন ভুলু একবার ঘুরিয়া দেখিল সেই খাঁকা লেলার-রাঙা টিনের পেরাম্বুলেটারে বসিয়া কনে শুধু হাত পা আছড়াইয়া দারুণ কান্না জুড়িয়া দিয়াছে। রাগে, আবার একটা কিসের কান্নায় যেন একটা আওয়াজ করিয়া ভুলু ঝিয়ের কোলে হঠাৎ ছটফট করিয়া উঠিল।

মায়ের গল্পের রাজপুত্র সাতসমুদ্রের রাজ-কন্যাকে উদ্ধার করিতে চলে...তাহারই কথা কি ভুলুর হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল?




ইণ্ডিয়া সিকিউরিটি
ব্যাঙ্ক লিমিটেড
শাখা ঃ
ভবানীপুর, মগরা,
জগদ্দল
হেড - অফিস
৭, সোয়ালো লেন,
কলিকাতা


ফোন:-
বি.বি. ৩৫৩২
টেলি:-
এনামেলার্স
শারদীয়া মহোৎসবকে
সার্থক ও প্র
করে তুলতে
চাই
স্বদে
মজবুত
আধুনিক
সস্তা
অলঙ্কার
ভারতের সুপ্রসিদ্ধ জুয়েলার্স
স্বদেশী শিল্প ফ্যাক্টরী
২১৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট. কলিকাতা


বিশুদ্ধতার প্রতীক
প্রকৃতির গোড়ার কথা বিশুদ্ধতা। বর্তমান ভেজালের বাজারে আমরা সে জিনিষটা হারাতে বসেছি—বিশেষতঃ খাদ্যে। দেহের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য অটুট রাখতে বিশুদ্ধ 'ঘি' অপরিহার্য। আমাদের নিজস্ব ডেয়ারীতে প্রস্তুত 'ঘি' প্রকৃতির মতই বিশুদ্ধ ও পবিত্র।
গাওয়া ঘি ও ভয়সা ঘি এক সেরী এবং আড়াই সেরী সীলড্ টিনে পাওয়া যায়। মূল্য প্রতি সের যথাক্রমে ৬৲ টাকা এবং ৪৲ টাকা মাত্র।
শাখা—৮৫বি, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, ৮, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, ৪৬-১, মানিকতলা ষ্ট্রীট, ৪২-১, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, লেক মার্কেট, পাবনা, পাটনা, ঢাকা, যশোহর।
চন্দদাস ডেয়ারী
১১৮, বিবেকানন্দ রোড — কলিকাতা





এই পৌষের প্রতীক্ষায় তাজু অধীর হইয়া উঠিয়াছিল।

চাষী জীবনের সেরা সময় পৌষ মাস। বুকে আসে অনেক আশ ; পায় অনেক আশা পূরণের আশ্বাস। কিন্তু সেসব মিথ্যা হইয়া যাইতেও সময় লাগে না। তাহার বেলায়ও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল না।

কার্তিক হইতে তাজু তাহার সর্বাপেক্ষা আগে-বোনা জমিখানার আশেপাশে ঘুরিয়া সবুজ চারাকে রঙ বদলাইয়া খুঁড়িয়ে হইয়া উঠিতে দেখিয়াছে ; কখনো বা আলগোছে দুই একটি ধান ছিঁড়িয়া পাকিল কিনা পরীক্ষা করিয়াছে ; পাশে বসিয়া কল্পনার বুনিয়াছে মন্বন্তরোত্তর জীবনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নজাল। অবশেষে তাহার দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান করিয়া সেই ধান পাকিয়াছে।

দুর্ভিক্ষের বৎসর হইতে দিনগুলি দুঃস্বপ্নময় রাত্রিপ্রহরের মতো কাটিতেছে, তবু, 'পাঁচকুড়া' জমির সোনালি শীষ-ভারাবনত গুচ্ছগুলির দিকে চাহিয়া তাহার বিষণ্ণ বুক কী এক আশ্বাসে ভরিয়া উঠিল। এই ধানে দুদিনের খাওয়া-পরা কতোদিন চলিবে, সেসব দুর্ভাবনায় আপাততঃ মন ভারাক্রান্ত না করিয়া, কতোগুলি বিশেষ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সে এক 'কুড়া' তিন কুড়ায় এক বিঘা জমির ধান কাটিয়া ঘরে আনিয়াছিল। কিন্তু সেই ধান মাড়াই করিয়া মাপিয়া—পরিমাণ দেখিয়া তাহার আরামের দুশ্চিন্তা ছাইয়া আসিল—এইরকম ফসলে দুঃসময় কাটাইয়া উঠিবার আশা কোথায় ?

গ্রামের সমবায় কৃষিঋণ সমিতির কর্জ টাকায় মা-ছেলে এতোদিন ফ্যানভাত খাইয়া কাটাইয়া আসিয়াছে। সে টাকা শোধ দিতেই হইবে, তাছাড়া গত কার্তিকে হলধর হলধর চক্রবর্তীর নিকট হইতে ত্রিশটি টাকা ধার করিয়াছিল—গত পৌষে তাহার বারংবার তাগাদা সত্ত্বেও তাহা শোধ দিতে পারে নাই ; এবারো এই ধান উঠিবার বহু পূর্ব হইতেই তিনি সুদ আসলে চল্লিশটি টাকার কথা তাহাকে স্মরণ করাইয়া আসিতেছেন ; তাঁহার সে টাকা শোধ না দিয়া উপায় নাই। নহিলে, যে-মানুষ হলধর চক্রবর্তী—কোন দিক দিয়া কোন প্যাঁচ কষাইয়া অধিকতর কোন্ বিপদে ফেলিবে, তাহা ভালো করিয়া দেখাশুও করিতে পারিবে না। অথচ এদিকে কাপড়-জামারও দরকার—বিশেষ করিয়া যাহার জন্যই তাহার ধান পাকিবার তর সহিতেছিল না। কিন্তু কেমন করিয়া কী করিবে ভাবিয়া তাজু দিশাহারা হইয়া গেল। মাপা ধানের সাজিগুলি ঘরে তুলিয়া রাখিয়া সে চাচাদের ঘরের চুলাশালে গিয়া বসিল।

তাহার মা, চাচি এবং তাহার দুই মেয়ে রিজিয়া ও সেতারা তখন রোজকার মতো উনুন ঘিরিয়া বসিয়া গল্পে রত। উনুনে ধানের হাঁড়ি ; মুখের কাছে বসিয়া চাচি মাঝে মাঝে কুটা ঠেলিয়া দিতেছেন। আগুনের লালচে আভায় অন্ধকারে সকলের মুখ মাঝে মাঝে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল।

তাজু কিছু কুটা টানিয়া একপাশে বসিয়া খানিকক্ষণ তাহাদের গল্প শুনিল। মায়ের দিকে তাকাইয়া দেখিল—মাত্র কাপড়ের ছেঁড়া খুঁটখানা গায়ে দিয়া তিনি বসিয়া গল্প শুনিতেছেন।

—এখনো ঘুমোতে যাওনি তুমি ? যা শীত ! আমাদের হাত-পা ঠক ঠক করে কাঁপছে—আর তুমি—ওঠো, ওঠো, ঠাণ্ডা লেগে শেষটায় অসুখে পড়বে।—একরকম জোর করিয়াই তাজু তাঁহাকে ঘুমাইতে পাঠাইয়া দিল।

রিজিয়া কৃত্রিম কোপকণ্ঠে কহিল—মায়ের জন্য এতো দরদ—একটা কোর্তা কিনে দিলেই পারো ?

—পারলুম কই এতদিন, এবার দেখোই দেখো। তোমার গায়ের ঐ কোর্তার চাইতেও সুন্দর কোর্তা আনবো।

তাহার কৌতুক কণ্ঠ শুনিয়া চাচির মুখে হাসি দেখা গেল। রিজিয়া অপ্রস্তুত মুখে কহিল—আমার কোর্তাটা আবার সুন্দর নাকি !—বলিয়া মায়ের দিকে ফিরিয়া তাড়া দিল—বলোনা মা আরেকটা গল্প।

তাজু টের পাইল—অসন্তুষ্ট হইয়াছে রিজিয়া—সেতারাও তাহার পাশে ছিল কাশিয়া সেই ইংগিত করিল। ফুল আর ঐ কোর্তাটির জন্য রিজিয়ার গর্বের অ


শারদীয় উপলক্ষে
আপনার প্রিয়জনকে দেবার মত উৎকৃষ্টতম উপহার
বেনীরাম মূলচাঁদের
জুল্‌ফে পাঞ্জাব
হেয়ার অয়েল
কুইন অফ দি নাইট
অটো মূলচাঁদ
বেনীরাম মূলচাঁদ
পারফিউমার্স. কনৌজ. (ইউ. পি)

নাই। পথ করিয়া ঝিমাইয়াছে। একটুকাল তাহাকে পর্যবেক্ষণ করিয়া তাজু হাসিয়া উঠিল—রাগ করলে রিজিয়া?—পাগল! তোমারও কোর্তাটিকে খারাপ বলি নাই। সত্যিই তোমার গায়ে ওটি চমৎকার মানাইয়াছে। একথায় রিজিয়া যে আবার খুশি হইয়া উঠিয়াছে, তাহা তাহার বাঁকা কটাক্ষেই তাজু বুঝিতে পারিল। সেতারা ছেলেমানুষ। সে-ও এবার প্রত্যাশী মুখে জিজ্ঞাসা করিল—আর আমার কোর্তাটি?

কিন্তু তাজু এক ফুৎকারে তাহার সব উৎসাহ যেন নির্বাপিত করিয়া দিল—দূর, রিজিয়ারটি কতো সুন্দর!

সেতারা চটিয়া গেল—হুঁ, ববুর কোর্তাটিকে তুমি তো ভালো বলবেই!—তাহার কথার ইংগিত বুঝিয়া চাচির সামনে তাজু রিজিয়া দুইজনেই একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। রিজিয়া তুম করিয়া তাহার পিঠে এক কিল বসাইয়া দিল ফাজলামি হচ্ছে!

তাজু মুখ নিচু করিয়া আড়চোখে চাচির দিকে তাকাইল একবার। তাহার ও রিজিয়ার বিবাহের কথাবার্তা বহুদিন হইতেই একরকম স্থির; কিন্তু প্রতি বৎসর একটা না একটা দুর্ভোগ লাগিয়াই আছে বলিয়া তাজুর বা তাহার মায়ের কাহারো সাধ পূর্ণ হয় নাই। তাহাদের দুইজনের অন্তরঙ্গতার কথা সকলেই জানে। সুযোগ পাইলে পরিহাস না করে এমন জন নাই।

খানিকক্ষণ সকলেই নীরব। প্রকাণ্ড তিনমুখী উনুনে, খেজুর রস আর ধানের হাঁড়ির একঘেয়ে শন শন শব্দ। তাহার এবং বেড়ার ওধার হইতে ভাসিয়া আসা কাঁঠাল কুঁড়ির গন্ধ গভীর কালোরাত্রির মধ্যে এক বিচিত্র অনুভূতির সৃষ্টি করিয়াছে। আকাশে ছোটো একফালি চাঁদ। সারা গাঁ নিঝুম—কেবল দূরে মল্লিক বাড়ির দিক হইতে কালু বয়াতির কণ্ঠ শোনা যাইতেছে—হয়তো ধানমাড়াইকে উপলক্ষ্য করিয়া উহাদের উঠানে জারীগানের আসর জমিয়া উঠিয়াছে। রিজিয়া উৎকর্ণ হইয়া গানের কথা ধরিবার চেষ্টা করিল।

চাচি কঞ্চির আগায় এক গুচ্ছ 'নুটা' উনুনের মুখে ঠেলিয়া কহিলেন—এতো কম উঠলো ধান, চক্রবর্তী মশাই আর সমিতির টাকা পারবে শোধ দিতে!

তাজু যেন অন্য কোনো জগৎ হইতে নামিয়া আসিল, চাচির প্রশ্নে বুকভরা শ্বাস লইয়া কহিল—সেকথা ভেবে তো কিনারা পাচ্ছিনে চাচি! এ ধান বেচে কাপড় কিনবো না ধার শোধ দেবো! মায়ের আমার কাপড় জামা না হলে চলে না—দেখছো তো অবস্থা! মা-ছেলের কাপড়ে তালিতে তালিতে কোথাও ফাঁক নেই। চেষ্টা করবো এখন না দেবার—খুব বেশী পীড়াপীড়ি করলে না হয় আরেক-কুড়া বেচে দেবো। তা ও যদি ধানের দর বাড়ে, নইলে না-দেবারি চেষ্টা করবো।—

ধান চাল বেচিয়া গতবার রাজা হইয়া গিয়াছে হলধর চক্রবর্তী। চক্রবৃদ্ধিমাত্র টাকা কিছুদিন পরে দিলেই বা এমন কী লোকসান হইবে তাহার!—

কথায় কথায় চাচির ধান সিদ্ধ হইয়া গেল। রাত্রিও তখন অনেক বাড়িয়া উঠিয়াছে—তাজু উঠিয়া পড়িল। শুইবার আগে ঘরে সাজানো ধানের সাজিগুলির উপর চক্ষু বুলাইয়া গেল। ভালো হয় নাই, ফসল ভালো হয় নাই এবারের। সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কেনা, কর্জশোধ, খাজনা, খাওয়া-পরা, বিবাহ—পাঁচকুড়া জমির এহেন ফসলে কেমন করিয়া সব কুলাইবে?

এদিকে রিজিয়াকে এবার আপন করিয়া লইবার ইচ্ছাটা দুর্দমনীয়। ক্রমান্বয়ে সে লোভনীয় হইয়া উঠিতেছে; ভরা ভরা মুখ-চোখ, গা-হাতপায় ঝলকাইতেছে যেন পাকা কদলীর লাবণ্য! টল টল করা চক্ষু দুইটিতে বংকিম দৃষ্টি ভরিয়া তাহার দিকে তাকাইলে অভাব অনটনের পৃথিবী তাজুর সম্মুখ হইতে যেন লুপ্ত হইয়া যায়। দারিদ্র্যের সহস্র ছোবলও যেন আর নাগাল পায় না তাহার।—কিন্তু বিবাহ হইবে কী প্রকারে, খরচপত্র কই? না, আরো একটা বৎসর প্রতীক্ষা করিবে?—নানাকথা ভাবিতে ভাবিতে কাঁথাখানা মুড়ি দিয়া তাজু একসময় ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন হাটে রওনা হইবার মুখে রিজিয়া তাহাকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গেল। একটু ইতস্তত: করিয়া কহিল—নবান্নের সময় কী বলেছিলে মনে আছে?

—কী?—তাজুর সহসা কিছু মনে পড়িল না।

—বাঃ, বলেছিলে না নোতুন ধান বেচে, আমাকে কিছু একটা দেবে? সেই মুরগীর ছানা—

—ও!—বিরক্তিতে ঠিল ছুঁড়িয়া একদিন একটা মুরগীর ছানা মারিয়া ফেলিয়াছিল তাজু,—

ঘটনাটা রিজিয়া দেখিল, কিন্তু মায়ের কাছে কহিয়া তাহাকে বকুনি না খাওয়ায়, সেজন্য একটা ঘুষ কবুল করিয়াছিল—নইলে, মুরগী-হাঁসের প্রতি তাহার মায়ের যে দরদ!—নইলে তাজুর আর রক্ষা থাকত না!—সেকথা তো ভুলেই গেছলাম। তুমিও তো আর মনে করিয়ে দাওনি! বল না নয় আমি, কী আনবো?

তাহার মুখের হাসিটা হয়তো স্বাভাবিক দেখাইল না রিজিয়া একলহমা তাহার মুখের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া, নিচু চোখে কহিল—থাক এখন,—চারদিকে যা টানাটানি!—মুখে চেষ্টাকৃত হাসি আনিয়া বাঁ হাতে আঁচলটা গায়ে জড়াইতে জড়াইতে আরেকবার সে তাজুর প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত করিল।

তাজুর মুখে মুহূর্তের জন্য একটু কালো ছায়া নামিয়া আসিল, কিন্তু পরক্ষণেই হাসিয়া বলিল—সেজন্য তোমায় গিন্নীপনা করতে হবে না। কী চাও বলো না?—বলিতে বলিতে সে লক্ষ্য করিল—ডানহাতে কী একটা জিনিষ সে পিছনে লুকাইয়া রাখিয়াছে।

—থাক আজ—তুমি যাও।

—বাঃ!—দেখি তোমার হাতে কী?

রিজিয়া আরো লুকাইল—না!

তাজু কী মনে করিয়া দুষ্টুমি করিয়া তাহার হাত হইতে জিনিষটা কাড়িয়া লইতে গেল; রিজিয়া আর জোর করিল না—তাজু হাতখানা ধরিতেই তাড়াতাড়ি জিনিষটা তাহার হাতে তুলিয়া দিল। মোম দিয়া তৈরি একজোড়া ঝুটা মুক্তার মালা! খানিকক্ষণ সেটা নিরীক্ষণ করিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিবার জন্য রিজিয়ার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতেই সে বলিয়া উঠিল—ওটা এমনিই হাতে রেখেছিলাম—দাও।

তাজু সেকথায় কোনো আমল দিল না—ও: এই! হাঁ—ঝুটা মুক্তার মালা যে তা বুঝতে পেরেছি। কার এটা?

—সইয়ের।

—কোথা থেকে এনেছে, দাম কতো বলতে পারো?

রিজিয়া তাহার হাত হইতে মালাজোড়া লইয়া কহিল—হাটের বিশ্বাসের দোকান থেকে এনেছে। কতো দাম কী জানি! তুমি যাও—দেরি হয়ে যাবে আবার।

—ওটা দাও তাহলে—পেলে একজোড় আনবো।—

—পাগল! পেটের ভাত জোটেনা—যাও যাও তুমি, নইলে কেউ দেখে ফেললে আবার ঠাট্টা শুরু করবে।—রিজিয়া সরিয়া গেল।

তাজু হাসিয়া কহিল—আচ্ছা আচ্ছা—গিন্নী হবার আগেই তোমার অতো আজে বাজে ভাবনা করতে হবে না। তুমি সজাগ থেকো ফিরতে আমার রাত হবে। পেলে নিশ্চয় আনবো।

হাটে ধান বিক্রী করিতে কী বিকাল হইয়া আসিল। ২।

তাজু কেবলই আ-

হলধর চক্রবর্তীর সঙ্গে

দেখা হইলে সে

করিয়া ডাকি

কর্ণি

উঠি

প্রবাসিনী

শ্রীমতী আশালতা সিংহ

জীবনযাত্রায় স্পষ্টতঃ দু'টো ভাগ হয়ে গেছে আজকালকার এই কঠিন জীবন সংগ্রামের দিনে। পুরুষেরা অর্থ উপার্জ্জনের ধান্দায় সারাদিন বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ান, এতে তাঁদের এত শ্রমশক্তি এবং জীবনীশক্তি নিঃশেষিতপ্রায় হয় যে, তার পরে গৃহ, সংসার বা সামাজিকতার বিস্তৃত হিসাব রাখবার না থাকে তাঁদের সময়, না থাকে তাঁদের প্রবৃত্তি। সামাজিকতার এই দিককার প্রায় সমস্ত ভারটাই পড়েছে মেয়েদের উপর। পূর্ব্বে এই সামাজিকতা বা লোক-লৌকিকতা সুপরিচালনা করতে তাঁদের বেগ পেতে হোত না, কারণ একই ধরণের একই শিক্ষা-দীক্ষার একই ভাষাভাষীদের সঙ্গে প্রায় তাঁদের কারবার করতে হোত। এমনকি গ্রামাঞ্চলের মেয়েরা পাড়া-প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে মাসীমা, জ্যাঠাইমা, সইমা, সমবয়সিনীদের সঙ্গে মকর, মিতিন, গঙ্গাজল—নানা সম্পর্ক একটা না একটা পাতিয়ে নিতেন। অনেক সময় এই পাতান সম্পর্ক কেবল লৌকিকতা রক্ষার জন্যে হোত না, তার সঙ্গে এসে মিশতো প্রাণের গভীর প্রীতি ও অকৃত্রিমতা। আজকের দিনে আমরা জীবনের এই সব ছোটখাট সহজ আনন্দগুলি হারাতে বসেছি। কলকাতায় পাশের বাড়ীতে কি হচ্ছে, কেউ তার খবর রাখেন না। অনেককে বলতে শুনেছি, আমরা যথেষ্ট শিক্ষা পেয়েছি, পাড়াপ্রতিবেশীর হাঁড়ির খবর আর এবেলা ওবেলা কি রান্না হোল ... করতে সময়মত লজ্জা অনুভব ...দের এই শিক্ষাভিমান ... দিতাম যদি না ...ন এর উল্টোটাই ...ন পরের খবর ...বল বুকের ...বলের ...রাখিত ...সবা ...তে ...



স্বামী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়-বন্ধু, প্রতিবেশী কুটুম্ব সব নিয়ে সব জড়িয়ে এমন একটা আবেষ্টনী সৃষ্টি করে, যা একমাত্র মেয়েরাই তৈরী কর্ত্তে পারে। পুরুষদের এসব বিষয়ে এমন সহজাত দক্ষতাও নেই, এ কাজের তারা উপযোগীও নয়। কিন্তু কি ব'লছিলাম, কালের বা যুগের যতই পরিবর্ত্তন হোক, ভিতরকার কথাটা কিন্তু একই রয়ে গেছে। সেই একই মেয়ে, কেবল তখন সাজসজ্জা সাদাসিধে আটপৌরে ছিল, এখন প্রসাধনের প্রাচুর্য্য এবং পরিচ্ছদের বৈচিত্র্য বহুগুণে বেড়েছে। তখন দুপুরে গ্রামের মেয়েরা এক বাড়ীতে থেকে আর এক বাড়ীতে বেড়াতে গেলে কথা উঠ্‌তো, আজ কে কি রেঁধেছে, কার মেয়ের শ্বশুর বাড়ী থেকে কেমন তত্ত্ব এসেছে, আর এরই ফাঁকে ফাঁকে পরের প্রতি ঈর্ষা, বাঁকা কথা, টিপে হাসি। আজও কি এর কোন পরিবর্ত্তন ঘটেছে? ড্রইংরুমে ব'সে সভ্যতর ভাষায় সুক্ষ্মতর ইঙ্গিতে এই একই ধরণ চর্চ্চা হয় নাকি?—তাই আজকালকার শিক্ষিতারা যখন গর্ব্বভরে বলেন, যথেষ্ট শিক্ষা পেয়ে তাঁরা পরের হাঁড়ির খবর রাখতে লজ্জা বোধ করেন, তখন সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁদের সঙ্গে সায় দিতে পারিনে। বরং তাঁরা যদি যথার্থ শিক্ষা পেয়ে পরের ছিদ্র অন্বেষণ, তা যত সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে বা ভঙ্গীতেই হোক ছাড়তে পারতেন, তাহলে সত্যিই গর্ব্ব করবার মত ব্যাপার হোত। পাড়াপ্রতিবেশীর খবর রাখাটা বা জীবনের অতি বাস্তব দিকটা নিয়ে চর্চ্চা তো মেয়েরাই করবে, তারাই তো প্রকৃতি, তারাই তো সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কারিণী মূর্ত্তিমতী শক্তিরূপিণী। পুরুষরা তো অনেক পরিমাণে আবষ্টাই বা নিষ্ক্রিয়। প্রকৃতির অনুকূল কার্য্য করাই জীব-ধর্ম্ম। তবে শিক্ষার গুণে এই কাজটাই আমরা আরও সুচারু এবং মনোজ্ঞরূপে করতে পারি, আরও ব্যাপক এবং আরও উদার-রূপে করতে পারি। আজকাল জীবন-যাত্রার জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটি ছোট গ্রামাঞ্চলে এক ভাষাভাষী এক সমধর্ম্মী প্রতিবেশীদের মধ্যেই আর আমাদের জীবনের গণ্ডী আবদ্ধ নেই। নানারকম ব্যবসায় বাণিজ্য কর্ম্ম উপলক্ষ্যে বাংলার বাইরের কত জাতি কত ধর্ম্মের কত আচার প্রথার বিভিন্ন সমাবেশ হচ্ছে আমাদেরই পাশের বাড়ীর পাড়াপ্রতিবেশীদের মধ্যে। জাহাজ, ট্রেণ, এরোপ্লেনের কল্যাণে দূর আর দূর থাকছে না। অতি দূর দেশও অতি নিকট হয়ে উঠ্‌ছে। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাইরের জগৎ যত কাছে সরে আসছে মনের জগতকেও আমরা এরই সঙ্গে মেলাতে পারছি কি? মনে হয় যেন পারছিনে। আজও শুনি, বেহারী প্রতিবেশীর বাড়ী নিমন্ত্রণ খেয়ে এসে তরুণী গৃহিণী (বাঙ্গালিনী) নাসিকা কুঞ্চিত করে বলছেন, "ম্যাগো, মেড়োগুলোর কী ভাষা! যেন মটর কলাই দাঁতে চিবুচ্ছে। আর কী কাঠ-খোট্টা, ছাতুখোর কিনা!" —আন্তরিক ঔৎসুক্য এবং সহৃদয়তার অভাবে এমনই কত বিদেশী পরিবার বাংলার মর্ম্ম-স্থানের সন্ধান পাচ্ছেন না। তাঁরা অবাঞ্ছিত অতিথির মত বাইরে বাইরেই এসে চলে যাচ্ছেন। এতে যে শুধু তাঁদেরই ক্ষতি তাই নয়, আমাদেরও সমূহ ক্ষতি। আজকাল ওদেশের বড় বড় শিক্ষায়তনগুলিতে ছাত্রদের পক্ষে দেশভ্রমণ শিক্ষার একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ বলে গণ্য করা হচ্ছে। কারণ যতই বড় বড় পুঁথি পড়া যাক, নানাদেশের নানা আচার ব্যবহার, নানা ভাষাভাষীদের নানারকম প্রথা এবং সংস্কারের সঙ্গে হাতে-কলমে চাক্ষুষ পরিচয় না ঘটলে হৃদয়-মনের প্রসারতা ঘটে না। মেয়েরা আজকাল দেশ ভ্রমণ ব্যাপকভাবে না করেও তো অনেকটা এই সুযোগই পাচ্ছেন ঘরে ব'সে। তাঁদের আশেপাশে দৈনন্দিন জীবনে নানা জাতির নানা ভাষাভাষীর প্রতিবেশীদের সঙ্গে যদি সৌহার্দ্দ্য রাখেন তাহ'লে মনের প্রসারতা ঘটবার যথেষ্ট সুযোগ ঘটে। দুনিয়াকে যত মত তত পথ। আমাদের সমাজে আমাদের সংস্কারে আমাদের ভাষায় মানুষ আছে আর কোথাও নেই,—হৃদয়-মনের এই প্রকাণ্ড সঙ্কীর্ণতা, যা আমাদের জাতীয় জীবনের সকল চেষ্টাকে নিষ্ফল করে দিচ্ছে, তার নিরসন মেয়েরা কি ইচ্ছা করলে অনেকটা করতে পারেন না? তাঁরাই তো গৃহের অধিষ্ঠাত্রী, তাঁদের মধুর আতিথেয়তায় যদি প্রবাসিনী, বিদেশিনী বোনদের চিরদিনই প্রবাসের আবহাওয়ায় ফেলে না রাখেন, নিজেদের মধ্যে আহ্বান করে নিয়ে এই দেশকেই তাঁদেরও দেশ করে তোলেন তাহ'লে আমাদেরও কল্যাণের পথ যথার্থ উন্মুক্ত হয়। কথা উঠ্‌তে পারে যে, বাধা অনেক। ওঁদের ভাষা আলাদা, আচার ব্যবহার আলাদা, মিলবার মিশবার পদ্ধতি আলাদা। বাধা আছে বটে কিন্তু সত্যকার প্রীতিবন্ধন গড়ে তুলবার আকাঙ্ক্ষা যদি থাকে তবে সকল বাধাই ক্রমে পথ ছেড়ে দেবে। ইংরিজী আমাদের বিদেশী ভাষা, তাদের সামাজিক প্রথা তাদের বেশভূষা, আচার-ব্যবহার তার এর চেয়ে অনেক অন্যরকম। কিন্তু রাজার জাতির প্রথা ও ভাষা স্বার্থের খাতিরে অনুকরণে আমাদের যথেষ্ট ক্ষমতা দেখিয়েছি। তখন যা ভারতবর্ষেরই বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা বা আচার ব্যবহার তা আয়ত্ত করতে পারব না কেন? বিশেষ করে মেয়েদের মেলামেশার বেলায় এটা অতি অবলীলাক্রমে সহজ ও মধুররূপে ঘটছে

[ইহার পর ২৭৫ পৃষ্ঠায়]

টেলিগ্রাম :
"আসামব্যাঙ্ক"

টেলিফোন
ক্যাল : ৬৯৪০

দি
ব্যাঙ্ক অফ আসাম
লিমিটেড্
(স্থাপিত : ১৯৩৬)

হেড্ অফিস : শিলং

কলিকাতা অফিস : ৬, ক্লাইভ রো

শাখাসমূহ :

বড়পেটা, ধুবড়ী, গৌহাটি, গোয়ালপাড়া, জোড়হাট, নওগাঁ (আসাম)

আদায়ীকৃত মূলধন
ও গচ্ছিত ৬,৩৮,০০০্ টাকার উপর
আমানত ৬০,০০,০০০্ টাকার উপর
কার্য্যকরী তহবিল
৭৪,০০,০০০্ টাকার উপর

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়

এইচ, ব্যানার্জ্জী, বি, এ,
(সি টি এ, আই, বি (লণ্ডন)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

টেলিগ্রাম : টাকাকড়ি—কলি:

টেলিফোন : ক্যাল : ৩০৫৪

দি ক্যালকাটা মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
(স্থাপিত—১৯৩০)

হেড অফিস : ৭এ, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

কলিকাতা ও হাওড়া ব্রাঞ্চ :

হ্যারিসন রোড, ভবানীপুর, শ্যামবাজার, শিবপুর, হাওড়া শালকিয়া।

অন্যান্য শাখা :

কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, বেলদা (কণ্টাই রোড), কাঁথি, মেদিনীপুর, শিলচর, হবিগঞ্জ, নবদ্বীপ।

নূতন শাখা :

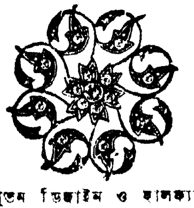
দিল্লী, এলাহাবাদ, বেনারস, বালিগঞ্জ, বারিপদা, ও খড়্গপুর শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে

অনুমোদিত জামিনে অল্প সুদে টাকা ধার দেওয়া হয়, সুবিধাজনক সর্তে বিল কালেকশন ও বিল ডিসকাউণ্ট এবং সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

প্রভিডেণ্ট ফণ্ড ডিপোজিট : প্রতি মাসে ৫্ হিঃ জমা দিলে ১২ বৎসর পর ১০৬০।৵৩ দেওয়া হয়। ২্ হইতে ৫০্ টাকা পর্য্যন্ত জমা গ্রহণ করা হয়।

এম, এস, চৌধুরী
এণ্ড সন্স
জুয়েলার্স এণ্ড ওয়াচমেকার্স
স্থাপিত — ১৯১০

—হেড অফিস ও কারখানা—
২০৯, অপার চিৎপুর রোড,
কলিকাতা।
ফোন: বি, বি, ২৭৬৯



নিত্য নূতন ডিজাইন ও ফ্যাসানের জড়োয়া, গিনিস্বর্ণের নানাবিধ মনোমুগ্ধকর অলঙ্কার রৌপ্যের বাসনাদি এবং সর্ব্বপ্রকার ঘড়ি বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা মজুত থাকে এবং পছন্দমত গহনা ২৪ ঘণ্টায় তৈয়ারী করে সরবরাহ করা হয়।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

—কলিকাতা ব্রাঞ্চ—
৬০এ কলেজ ষ্ট্রীট, ফোন বি বি, ৪৪৬০
১৬১বি, রাসবিহারী এভেনিউ, বালীগঞ্জ
ফোন : পার্ক ২১৭৫

যুদ্ধ সমাপ্ত!
কিন্তু
আপনার জীবনের দৈনন্দিন সমস্যাগুলি
আজও অব্যাহত রহিয়াছে।

একটি মেট্রোপলিটান পলিসী
আপনার সেই প্রতিদিনের অব্যাহত সমস্যাগুলি
হইতে আপনাকে স্বাচ্ছন্দ্য সুখের সুযোগ দিবে।

ক্রমোন্নতির পথে বিগত ১৪ বৎসরের ইতিহাসঃ

চলতি বীমার পরিমাণ ৩১।১২।৪৪ তারিখে	৫,০৭,৯৪,০০০্	টাকার উপর
মোট সম্পত্তির পরিমাণ	৫৬,৩১,০০০্	"
বীমা তহবিল	৫১ ৮০,০০০্	"
দাবী মেটানর মোট পরিমাণ	১৪,৫৬,০০০্	"
১৯৪৪ সালের নূতন কাজের পরিমাণ	২,১৩,৫২,৮২৫্	টাকা

দি
মেট্রোপলিটান
ইন্সিওরেন্স কোং, লিমিটেড
দি মেট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্স হাউস, কলিকাতা।

সাম্প্রদায়িকতা বনাম সামাজিকতা

শ্রীমতী অনিলা গোস্বামী

যদি কতগুলি প্রাণীর চারপাশে একটি গণ্ডী টেনে আদেশ জারী করা হয় এর বাইরে তারা যেতে পারবে না, তাহলে তাদের অবস্থা বেশ অনুমান করা যেতে পারে। সম্প্রদায় বলতে আমরা যা বুঝি সেও এই ধরণের গণ্ডী ছাড়া আর কিছু নয়। এমনি অনেকগুলি সম্প্রদায় আছে এদেশে। যেমন হিন্দু একটি সম্প্রদায়, মানে একটি গণ্ডী; মুসলমান মানেও তাই, ভারতীয় খৃষ্টান মানেও তাই। (য়ুরোপীয় খৃষ্টান আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত নয়)। সম্প্রদায়ের ভাল উপমা হচ্ছে একটি বড় অথবা ছোট circle বা বৃত্ত, যেখানে কতগুলি মানুষ বাস করে, যার বাইরে যাওয়া চলে না কোনক্রমেই, যার নিয়মকানুন মানতে বাধ্য এই ভাগ্যবানের দল। তাদের সামাজিকতার বালাই এই বৃত্তের ভিতরে যতটুকুন জায়গা আছে তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তার বাইরে তারা অসামাজিক। এদেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি হচ্ছে এই; দেখা যাক এর ভিতরে মেয়েরা কি অবস্থায় আছে।

মেয়েদের বেষ্টনকারী দুটি কাঁটাতারের বেড়া সাধারণতঃ চোখে পড়ে, একটি পারিবারিক, অপরটি সামাজিক। দুইয়ের কোনটি ডিঙ্গিয়ে যাওয়া অসাধ্য না হলেও প্রায় দুঃসাধ্য তাদের পক্ষে। যে বেচারী যে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, তার কাছে নিজের অস্তিত্ব সে দিয়েছে বিকিয়ে, তার বেষ্টনীর বাইরের জগতের কোন পরিচয় সে প্রায় রাখে না। অর্থাৎ কোন সামাজিক লেন-দেন চলে না এক সম্প্রদায়ের মেয়ের সঙ্গে অপর সম্প্রদায়ের মেয়ের। হিন্দু নারীর জীবনের বারো আনি পারিবারিক কোটার মধ্যে পড়ে, বাকী আধ আনির নামকরণ সামাজিক হতে পারে, কিন্তু তা হিন্দু গণ্ডী অতিক্রম করে যেতে পারে না। মুসলমান মেয়ের ললাট-লিপিতে মুসলমান সমাজের গণ্ডী ডিঙ্গিয়ে যাওয়ার কোন কথা নেই, তাদের বিধিনিষেধ ও পুরুষ অভিভাবকের কড়াকড়ি মিলে একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি তাকে বেষ্টন করে থাকে। সেও ভাল করে চেনে না হিন্দু মেয়েকে, হিন্দু মেয়েও তাকে চেনে না ভাল করে। উভয়ে উভয়ের সংস্পর্শে থাকে বঞ্চিত। মুখ চেনাচেনি পরিণত হতে পারে না চেনা-চেনিতে এবং চেনাচেনির পর্ব কখনই লাভ করে না পরিণতি সামাজিকতার পর্বে। ফলে মানসিক সঙ্কীর্ণতা, সামাজিক অস্পৃশ্যতা বোধ, Superiority complex প্রভৃতি অবকাশলাভ করে উভয়ের মনে। এই জাতীয় কমপ্লেক্সের চেয়ে ক্ষতিকর কোন সামাজিক ব্যাধির খবর আমরা রাখিনা, সাম্প্রদায়িক ভেদের ব্যাধিটি থেকে এর জন্ম। সামাজিক সংস্পর্শহীনতায় এর বৃদ্ধি এবং কখনো কখনো উপসর্গগুলি রোগের চেয়েও মারাত্মক আত্মপ্রকাশ করে থাকে, তা দৃষ্টি এড়ায়নি সমাজতত্ত্ববিদের। খৃষ্টানীর ক্ষেত্রে এর ইতরবিশেষ নেই, তবে বিশেষত্ব আছে কিছু অন্য অর্থে, সে বেচারী পুরাকালের চেয়ে কিছু স্বাধীনা, অভিভাবকের নিষেধের জোরে সে একটু কম বাঁধা, তাই মেলে সে একটি বিচরণ করতে পারে বাইরের জগতে, আপোষাকের ক্ষেত্রে তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, হিন্দুর ঘরে রোগশয্যার পাশে তাকে দেখা যায় অর্থের বিনিময়ে সেবাদান করতে, শিক্ষকতার মারফৎ পড়ে প্রয়োজনের তাগিদে। সে বরাবর যে স্বাধীনতা ভোগ করে আসছে, "জাতির মালিক" কোন কোন হিন্দু মেয়ে বর্তমানে ভোগ করতে আরম্ভ করেছে অবস্থার ফেরে। এদেশে খৃষ্টানীকে তুলনা করা চলে বনের পাখীর সঙ্গে, হিন্দু মেয়ে যেন খাঁচার পাখীটি। বনের পাখীর সঙ্গে খাঁচার পাখীর কোন সাদৃশ্য থাকতে পারে না কি দৃষ্টিভঙ্গীতে, কি জীবনযাত্রার প্রণালীতে। বনের পাখী নিজের অবস্থা দিয়ে খাঁচার পাখী হিন্দুনারীর অবস্থা ঠিক অনুধাবন করতে পারে না, খাঁচার পাখী "[illegible]" আদবকায়দার মধ্যে কোন অর্থ খুঁজে পায় না। এদেরও তাই সামাজিক সম্পর্ক পাতানোর পথ ওঠে না। ফলে সেই গণ্ডীর circle-এর মধ্যে বাস করে হিন্দু মেয়ের মনের উপরে পুরু হয়ে পড়তে থাকে সংস্কারের, তা শিথিল হওয়ার মত কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

যে সাম্প্রদায়িক বৃত্তের মধ্যে মেয়েরা পড়েছে বাঁধা, তা ভাঙবার কোন উপায় নেই কি? তার কাছে যে দাসখত লিখিয়ে নিয়েছে তা কি চিরন্তন? সাম্প্রদায়িক ভেদবাদকে বিনাশ করতে এতকাল অনেক যুক্তি দেখে এসেছে পুরুষ কিন্তু তার নিজের ভেদবুদ্ধি আজও ঘোচেনি। নিজেদের মধ্যে ভেদ দূর করতে প্রায় কিছু করেনি মেয়েরা, করতে পারেনি বলেই অদ্ভুত। কতখানি তারা করতে পারে তাও ভাল করে বুঝতে পারে না। অথচ তাদের নিঃসঙ্গতার জন্য তারাই কি সম্পূর্ণ দায়ী? তাদের সুযোগ ও সুবিধা রয়েছে কতটুকু? পুরুষের সুবিধা রয়েছে অনেক, তা সে কাজে লাগায়নি। —তার রয়েছে কর্মক্ষেত্র, রয়েছে বহির্জগৎ, রয়েছে সান বাঁধানো প্রশস্ত চত্বর, যেখানে সব সম্প্রদায়ের লোকেরা একজায়গায় এসে মিলিত না হয়ে উপায় নেই উদরের প্রয়োজনে। এই কাজের সম্পর্ক সামাজিক সম্পর্কে কেন পরিণত হতে পারে নি? পারেনি যে কারণে তা বোধ হয় এই যে, ব্যবসায়ের লেনদেনকে সামাজিক লেনদেনায় পরিণত করার কথাই পুরুষের মনে জাগেনি। যখনি কাজ হয়েছে হাসিল তখন গেছে তাই, বেচাকেনা শেষ করে ফিরে এসেছে আপন গণ্ডীর মধ্যে, গণ্ডী ভাঙবার কথাটা ভাল করে সে ভেবে দেখেনি সে ব্যবসায়ী মন নিয়ে। মেয়েদের তো কোন কর্মক্ষেত্র নেই, কোন outer world নেই, যেখানে সম্প্রদায় নির্বিশেষে জড়ো হতে পারে তারা, পরস্পরকে কাছে পেতে পারে অর্থনৈতিক সূত্র ধরে। সে সুযোগ নেই বলেই তো তারা আরও বেশী কুনো, আরও বেশী সঙ্কীর্ণমনা হয়ে রয়েছে। জীবিকার জন্য তাদের যে ডাক পাঠেনি জীবনের সদর রাস্তায়, অন্দরের চৌকাঠে বাঁধা পড়ে রয়েছে তাদের সব আশা আকাঙ্ক্ষা। চাকরীর ক্ষেত্রে এসে যারা ভীড় করেছে, তারা নারীসমাজের কয়জন? কয়েকজন শিক্ষিতা হিন্দুনারী কেবল প্রকাশ্যের কর্মশালায় দীক্ষিত হয়ে লক্ষ্মীদেবীর আরাধনা করতে শুরু করেছে কোন কোন সরকারী বেসরকারী অফিসে, তাদের সংখ্যা তো নগণ্য। আর মুসলমান মেয়ে? তারা চাকরী করার অর্থই ভাল করে বোঝে না, বৃহত্তর জগতে তারা প্রবেশ করতে আরম্ভই করেনি। হিন্দুমেয়ের সঙ্গে মুসলমানীর সেই জাতীয় সম্পর্ক হতে পারছে না, যা হয়ে থাকে হিন্দু ও অহিন্দু পুরুষের মধ্যে জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রগুলিতে।

খৃষ্টানী মেয়েরা যতটুকু অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য উপভোগ করে থাকে, তা হিন্দু ও মুসলমান মেয়েদের প্রাপ্তির মধ্যে আসা দূরে থাকুক, কল্পনার মধ্যেই আনতে পারে না। ফলে কি দাঁড়ায়? এমন কোন জগৎ নেই, এমন কোন ক্ষেত্র নেই, যেখানে সব সম্প্রদায়ের মেয়েরা মিলতে পারে এসে। কর্মক্ষেত্র ছাড়াও পুরুষের জন্য আছে অনেক-জাতীয় "রঁদেভু" (একত্র হওয়ার স্থান) ব্যবস্থা, আছে ক্লাব, আছে রেস্তোরাঁ, আছে খেলার মাঠ—মেয়েদের এসবের কোন বালাই নেই। এজাতীয় রঁদেভু'র ব্যবস্থা থাকলে এগুলিকে মেয়েরা কিভাবে গ্রহণ করত তা বলা মুস্কিল, তবে এগুলিকে নিছক মজলিস হিসেবে ব্যবহার করে খোকামীর পরিচয় দিত না। এগুলিকে তারা কাজে লাগাত সাম্প্রদায়িক মিলনের ক্ষেত্রহিসেবে, অতিসহজে আত্মীয়তার সম্পর্ক পাতাতে তাদের জুড়ী নেই, পুরুষের অহমিকা যেখানে বাধক-ওয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তার সামনে এবং কখনো যেন তাদের যাওয়া তার নাগাল নয়, যেখানে

[ইহার পর ২৬৮ পৃষ্ঠায়]

বিহারের লোকসঙ্গীত

শ্রীমতী মায়া গুপ্ত

(১)

নবজাতক

বিহারের 'সোহর' গীত হল নবজাত শিশুর অভ্যর্থনা — অভিনন্দন। দরিদ্রের কুটীরে এবং ধনীর প্রাসাদে এর প্রচলন চলে আসছে। প্রতিবেশিনীরা, আত্মীয়ারা একত্রিত হয়ে জননী আর শিশুকে অভিনন্দন দিয়ে থাকেন সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে। এ সঙ্গীত নিঃসংশয়ে নারীর রচনা, যুগ যুগ ধরে নারীমণ্ডলীর দ্বারা রক্ষিত ও সংরক্ষিত — একথা বলাই বাহুল্য। কোন পুরুষকবি নেই বলে মনে হয়। ভাষা এবং ভাব দেখলে মনে হয় জননীরাই এর রচনা করেছেন — কচিৎ কখনও বন্ধ্যা রমণীরও দুঃখের দুএকটি কলি শ্রোতাকে উদাস করে তোলে।

এই বিশেষ গানটি সোহর সঙ্গীতের অন্তর্গত — শিশুর জন্মাবার পূর্বেই অবশ্য এ গানটি গাইবার কথা।

"আঠাঁহি কণ্ঠ কইহুয়া পাতলে মিলে পানি
ওয়াঁহি সুন্দরী নারী চুকুয়া মে জল ভরে।
ঘোড়া চঢ়ল আয়ে রাজা বেটা —
পানিকে পিয়াসা রাজা মাগে পানি।
কহে — কণ্ঠ মোরা সুখালই"

"গভীর কূপ — পাতালে জল — সুন্দরী রমণী কলসীতে জল ভরছেন — এমন সময় ঘোড়ায় চড়ে এলেন রাজপুত্র। তিনি পিপাসার্ত — জল চাইছেন — বলছেন আমার কণ্ঠ শুকিয়ে গেছে —" এ গানটি অবশ্যই দ্বিঅর্থক।

জল খেয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করছেন —

"কে করহে কি তুহি বহুয়া, কে কর বেটীয়া?"

অর্থাৎ তুমি কাদেরের বধূ এবং কারই বা কন্যা?

নারীসুলভ উত্তর হল —

"বাপকে বেটীয়া শ্বশুরকে পুতহিয়
আপনি বালম কে সুন্দরী নারী।"

"আমি আমার পিতার কন্যা — শ্বশুর মহাশয়ের পুত্রবধূ এবং আমার প্রিয়তমের বধূ"। তারপর বধূ তাঁর শাশুড়ীকে ডেকে বলছেন —

"মাঁচিয়া বৈঠোলা তুঁহি শাশু
কুইয়া পর উতরল মুসাফির — অখিল
বোল মারে —।"

"শ্বশ্রূমাতা তুমিতো অঙ্গনে মাচিয়ায় বসে আছ এদিকে কুয়ার ধারে যাত্রী এসে আমার সঙ্গে রহস্য করবার চেষ্টা করছে যে।"

শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করলেন —

"কৌন বরণ ঘোড়াওয়া কৌন বরণ
আসোয়ারা"

বধূ উত্তর দিলেন —

"লাল বরণ ঘোড়া সবুজ রঙ সাজবাজ
শাঁবের বরণ আসোয়ারা।"

শাশুড়ী বুঝলেন ঐ তাঁর পুত্র প্রবাস হতে ফিরেছেন। বধূর অভিযোগ শুনে এবার চটে গালি দিয়ে বলছেন —

"বাপ খাঁত ভৈয়া খাঁত পুতহু বতাঁইহা
ওঁহি লাগে বেটোয়া হামার।"

অর্থাৎ বধূ —

"মত শাশু ভৈয়া খাঁত মত শাশু বাপ
লড়কা মে ভৈলেই বিহা, কৈসে চিনত
সোয়ামী —"

হে মাতা, বাপ ভাই খাওয়ার গালি দিও না — শৈশবে বিবাহ দিয়েছিলে — স্বামীকে চিনব কেমন করে? খুব রহস্যভরে এই গানটি গান সব প্রতিবেশিনীরা।

শিশুর জন্মের পরই এই গানটির গাওয়ার প্রচলন আছে —

"কোন বন উপজল নারিয়ল — কোন বন জাফর কোন বন গুলাব — গুলাবে চুনরী রঙ্গেবৈ। বাপ বন উপজল — নারিয়ল ভৈয়া বন জাফর সৈয়া বন উপজল গুলাব
গুলাবে চুনরী রঙ্গৈবৈ...।"

"কোন উদ্যানে নারিকেল, কোন উদ্যানে জায়ফল এবং কোন্ উদ্যানেই বা গোলাপের জন্ম হল? — পিতার পুত্র হলেন নারিকেলের সমান — ভাইএর পুত্র হলেন জায়ফল — কিন্তু স্বামীর পুত্রই 'গোলাপ' — ইত্যাদি।"

দরিদ্রের ছিন্ন কাঁথায় যে মানবশিশুর প্রথম শয়ন হ'ল — তার জন্য জননী গাইলেন —

"খাটিয়া খোজৈতে খাটিয়া ন মিলে
কাহে (কোন) খাটিয়ে সুতৈবৈ
(শয়ন করাব) মায় —
রাম জনম লৈ লৈ।"

"খাট খুঁজছি পাই না — নব রাম যে জন্মগ্রহণ করলেন — কোন খাটে তাঁকে শোয়াব"? উত্তর হল —

"খাটিয়া খোজৈতে খাটিয়া ন মিলে —
— তো — সোনার খাটিয়ে সুতৈবৈ — মায়
রাম জনম লৈ লৈ।"

অর্থাৎ "নাই বা খাটিয়া পেলাম — সোনার খাটে আমার রামকে শয়ন করাব — রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছেন।"

যে শিশুর অঙ্গে বস্ত্র নেই এবং জীবনে কখনও সুপরিচ্ছদ থাকবে না হয়ত — তাকে স্নান করিয়ে জননী বলছেন —

"কাপড় খোজৈতে কাপড় ন মিলে
কাহে কাপড় রাম পিন্হৈবৈ — মায়
রাম জনম লৈ লৈ।"

তারপর জননীর অন্তরের বাসনাটুকু সঙ্গীতের সাহায্যে প্রকাশ লাভ করলো — কল্পনা করলেন —

"রেশম কাপড় রাম পিন্হৈবৈ
রাম জনম লৈলৈ।"

শিশুর জন্ম হল অথচ নাড়ী কাটবার ছুরী নেই। তার আর দুঃখ কি?

"সোনার ছুরীয়ে রাম নাবা কাটৈবৈ
রাম জনম লৈ লৈ।"

অর্থাৎ সোনার ছুরী দিয়ে নাড়ী কাটা হবে! সেই রকম আর কি। রুটী নেই তো — কেক খায় না কেন প্রজারা? তারপরে গাইলেন —

"দীয়ারা খোজৈতে দীয়ারা ন মিলে
কাহে দীয়ার করবৈ ইজোর — মায়
রাম জনম লৈলৈ —"

শিশুর জন্ম হল — ঘরে প্রদীপ দিয়ে ঘর উজ্জ্বল করা চাই তো — প্রদীপ খুঁজছি অথচ প্রদীপ নেই —। অন্ধকার ঘরেই জননী কল্পনা করে গেয়ে উঠলেন —

"সোনার দীয়ারে করব ইজোর ঘর
রাম জনম লৈলৈ—"

(দীয়ার — দীপ। ইজোর — আলোকিত উজ্জ্বল)

সদ্যোস্নাত সুসজ্জিত শিশুকে
জননী চুম্বন দিচ্ছেন —

"আঁখিয়া চুমে টোপিয়া চুমে
আর চুমে গোরে গোরে গাল
ঘুংঘুর ঘুংঘুর বাল — মোরে লাল কে
পাঁইয়া চুমে মুহ ওয়া চুমে
আর চুমে গাল —
আহা মোর লাল...।"

শিশুর বস্ত্র, তার শিরস্ক আর তার গৌ কপোল চুম্বন করছেন জননী মুগ্ধ হচ্ছে শিশুর কুঞ্চিত কেশ দেখে। শিশুদেবতা চরণ তার মুখমণ্ডল চুম্বনে ভরিয়ে জননী ভাষা স্তব্ধ হল, শুধু গেয়ে উঠলেন 'আহা মো লাল' — "মরি মরি আমার বাছা"। অবর্ণনী রূপবান আমার শিশু। এই Madonna ছবি আঁকবার শিল্পী এখনও জন্মেছেন কি বলা কঠিন, তবে সেদিন মানুষের শি সার্থক হবে যেদিনকার শিল্প-জগতের সম পূর্ববর্তী Madonna-কে অতিক্রম কা বিকশিত হয়ে উঠবে। একটী জননী ন কোটী কোটী জননীর কোটি কোটি শিশু।

সামাজিক দেওয়া নেওয়ার গান গাও হয় — "প্রসূতি বধূর পিতৃগৃহ থেকে মিষ্ট এসেছে — তার শাশুড়ী অঙ্গনে দাঁড়িয়ে দেখছেন — প্রতিবেশিনী ঠাট্টা করে বলছেন

ওঁকে মিষ্টি দেওয়া নয়—। বলছেন, আদ্‌খানা মিষ্টি ভেঙে দিতে আঙুল ব্যথা করে, কিন্তু গোটাটা দেওয়া চলবে না।"

"নৈহর (পিতৃগৃহ) সে আয় লৈ পচাশ
লাড়ু য়া
অঙ্গন খড়ি' খড়ি' (দাঁড়াইয়া) শাশুনেরে খৈ
উনসে তো দিয়াল (দেওয়া) নহি যায়।
আধ তোড়াতে (ভাঙতে) মোর
আঙ্গুলী দুখায় (ব্যথা করে)
পর্ (কিন্তু) সৌসে (গোটাটি)
দিয়াল নহি যায়।"

সন্তান সৌভাগ্যে গরবিনী জননী গাইছেন—

'অঙ্গন মে বাতাশা লুটা দৈবৈ
ডগরীণ (হিজড়া) বোলায় বৈ
সোহর গাওন কো;
সোহর গাবনসে কসর মসর করি হৈঁ,
সহজ সে সিধা উঠা লৈবৈ।"

"শাঁশু সে আশ সোঁঠ খোঁটিন কে—
উনকর মাচিয়া লান দৈবৈ
সোঁঠরী খোঁটিন মে কসর মসর করিহৈঁ—
সহজ সে মাচিয়া উঠা লৈবৈ।"

'অঙ্গনে বাতাসা ছড়াব। হিজড়া ডাকবো আমার বাছার সম্বর্দ্ধনা সঙ্গীত গাইবার জন্য। যদি ভাল করে না গায় তবে তার প্রাপ্য সিধা (চাল ডাল নুন তরকারী ইত্যাদি) সহজ-সে অর্থাৎ বিনা বাক্যব্যয়ে উঠিয়ে নেব। শাশুড়ী মহাশয়া আমার সোঁঠ তৈরী (কিছু মসলা শেকড় ইত্যাদি দিয়ে প্রসূতিকে কিছু পান করতে দেওয়া হয়) করতে যদি বিলম্ব করেন বা অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, তবে তাঁকে বসবার জন্য যে মাচিয়া (ছোট খাটিয়ার মত) দিয়েছি তাও বিনা বাক্যব্যয়ে উঠিয়ে নেব।' শাশুড়ী ঠাকরুণ এহেন ঔদ্ধত্য সহ্য করেন নাতির মুখ দেখতে পেয়ে। না হলে পরের বেটীর এত স্পর্দ্ধা কোন শাশুড়ী সঙ্গীতেও সহ্য করতে পারেন না—এ বলাই বাহুল্য।

ননদিনীকে বলা হয়—

"ননদী সে আয়তৈ সোরী
(আঁতুর ঘর) নিপন কে
উহে দেবৈ সুন্দর—কাংহী"

কিন্তু সোরীতে মৃত্তিকা লেপন করে পরিচ্ছন্ন করে তুলতে তিনি যদি এদিক ওদিক করেন, তবে সেই এক পন্থা "সহজ সে কাংহী (চিরুণী) উঠা লৈবৈ"।

এই সঙ্গীতগুলি শুনলে একটা চিত্র ভেসে ওঠে চোখের ওপর। সুস্থ সুন্দরী যুবতী জননীর আর সুন্দর মানব-শিশুর, কিন্তু এ চিত্র অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি তার পাশাপাশি আর একটা চিত্র না দেখি। সেটা হল—দরিদ্র জননীর দুর্ভাগা শিশুর বাস্তব চিত্র; একশটার মধ্যে কম করে আশীটা শিশু আর জননী শীর্ণ অভাবগ্রস্ত। সোরী ঘর আলো-বাতাসহীন; অপরিচ্ছন্ন বস্ত্র, অশিক্ষিত ধাত্রী....। সঙ্গীত সর্ব্বত্রই চলে, কিন্তু এই ফাঁপা অভিনন্দন বোঝবার ক্ষমতা যদি শিশু-দেবতার থাকতো তবে তিনি দারুণ বিতৃষ্ণায় পাশ ফিরে শয়ন করতেন নিশ্চয়;—অবশ্য তা'হলে ভারতের—শুধু ভারতের কেন জগতের বহু শিশুদেবতাকে পাশ ফিরে শয়ন করতে হয়।"

(২)

অর্চ্চনা

পূজা অর্চ্চনায় যে গানগুলি শুনতে পাই, সেগুলিতে স্তোত্রের গাম্ভীর্য্য আরোপ করবার কোন উপায় নেই কেন; তা স্পষ্ট হবে যদি রচয়িত্রীদের বোঝা যায় তবেই।

ঘরে যদি শীতলা মায়ের কৃপা হল সঙ্গে সঙ্গে মানত করা হ'ল—রোগী সুস্থ হলে পূজা দেওয়া হবে—এবং নেহাৎ কৃপা করে দেবী যদি রোগীর ভবযন্ত্রণা দূরও করেন তবু পূজা তিনি পাবেন। এ রকম মানত করা হয় যে, ভিক্ষা চেয়েও পূজা করা হবে। ধনীর গৃহিণীরাও বাড়ী বাড়ী হেঁটে যান ভিক্ষা চাইতে। একলা অবশ্য নয়, সঙ্গে প্রতিবেশিনীরা আসেন আর প্রায়ই থাকে ঢাকের বাদ্য। ভাষায় ও ভাবে স্তোত্রের গাম্ভীর্য্য আসেনা, তার কারণ অশিক্ষিতা সরলা রচয়িত্রীর মন কিছুতেই দেবীকে তাঁদের কাছাকাছি মানব-গোষ্ঠীর বাহিরে দেখতে পান না, ফলে দেবী তাঁর পূজারিণীদের অবিকল প্রতিমূর্ত্তির গৌরবে অধিষ্ঠিতা থাকেন।

গান হয়—"কহি কে মে কাংহী (চিরুণী)
মাইয়া (মা)
কহি কে মে শাল (চিরুণীর দাঁত)
মাচিয়া বৈঠালে মাইয়া, লম্বী লম্বী কেশ
টুটি গেলা কাংহী মাইয়া, কহি
গেলা শাল—"

দেবী মাচিয়ায় (সিংহাসনে নয়) বসে দীর্ঘ কেশ বিন্যাস করছেন কিন্তু চিরুণীর দাঁত ভেঙে গেল। দেবী অমনি নিতান্ত সাধারণ মানবীর মত রেগে বলে উঠলেন—

[ইহার পর ২৬৮ পৃষ্ঠায়]



আরণ্যক — কালী ঘোষ দস্তিদার

পৌষ

[২০১ পৃষ্ঠার পর]

সওদা আছে,—বিবিজয়ার জন্য সেইমতো এক ছড়া মালাও নিতে হইবে। সুতরাং কাপড়ের দোকানে আঠারো-উনিশ টাকার বেশি কিছুতেই খরচ করা চলিবে না। তাজু এইসব হিসাব করিতেছে হেনকালে হাকিম কোথা হইতে আসিয়া পিঠ চাপড়াইয়া কহিল কী মর্দ, কাপড় কিনতে এলে বুঝি?

তাজুর বুক ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল। হাঁ-না করিয়া কেমন অদ্ভুতভাবে মাথা নাড়িল।

—এসো তাহলে—আমারো ভাই একখানা আলোয়ান দরকার—বলিতে বলিতে ক্রেতাদের ভীড় ঠেলিয়া সে সম্মুখে আগাইয়া গেল। তাজু কেমন অস্বস্তি অনুভব করিয়া তাহার বাহির হইয়া যাইবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। বাহিরে খালের ধানের বেপারীদের নৌকোয় আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। হাটের কোলাহল কমিয়া আসিতেছে ক্রমশঃ। কামারশালার দিকে হাতুড়ীর শব্দ।

মা হয়তো রোজকার মতো রান্নাবান্না সারা করিয়া এতক্ষণে বিবিজয়াদের চলানে আসিয়া কাহিনী শুনাইতে বসিয়াছেন। অন্যদিনের তুলনায় আজ তাঁহার মুখরতো নিশ্চয়ই আরো বেশী। নোতুন কাপড় জামা কিনিলে মা ছেলেমানুষের মতো খুশি হইয়া ওঠেন। বুড়োমানুষ শীতে খুব কষ্ট পাইয়াছেন এতোদিন। আজো যা শীত পড়িয়াছে—হয়তো তিনি চুলার কাছে ঘেঁষিয়া বসিয়া কাঁপিতেছেন, মাঝে মাঝে বলিয়া উঠিতেছেন শীতের কথা। চাচি বা বিবিজয় হয়তো বলিয়া উঠিতেছে—আর বড়োজোর বা—তাজু তো এলো বলে!—

বিবিজয়া কাহিনী শুনিতে বসিলেও হয়তো কান পাতিয়া রহিয়াছে খালের ঘাটে তাজুর নৌকোর শিকলনাড়া শব্দের প্রতীক্ষায়। কিন্তু তাজু যাইয়া প্রথমে এমন ভাব দেখাইবে যেন মালার কথা তাহার মনেই ছিল না। বিবিজয়া হতাশ হইয়া দূরে দূরে থাকিবে কিন্তু মুখে কিছু জিজ্ঞাসাও করিবে না।



তারপর তাজু একান্তে তাহাকে চুপি চুপি ডাকিয়া লইয়া নিজের হাতে—হঠাৎ তাজু চমকিয়া উঠিল। হলধর চক্রবর্তীর কণ্ঠস্বর! হ্যাঁ হলধর চক্রবর্তীই—দোকানদার বৈকুণ্ঠ সাহাকে বলিতেছেন—আমার ফিরতে দেরী হয়ে গেল। কিন্তু এই কটা কাপড় চোপড়ের এত দাম, তুমি যা মুস্কিলে ফেললে বৈকুণ্ঠ।—

তাজু ভয়ে ভীড়ের একপাশে দোকানের বেঞ্চার কাছে নিঃশব্দে বসিয়া পড়িল। দেখিয়া না ফেলে হলধর চক্রবর্তী।

—তাইতো, মুশকিলে ফেললে! এখন আর টাকা কোথায় পাই—ধারকর্জ নেবার মতোও তো কাউকে দেখছি না।

তাজুর বুক কাঁপিয়া উঠিল। তাহাকে দেখিতে পাইলে হয়তো তাহার নিকটেই চাহিয়া বসিবে হলধর। চুপি চুপি দোকান ত্যাগ করিয়া সে নামিয়া যাইতেছে, হঠাৎ হাকিমের স্বর শোনা গেল—ঐ, ঐ তাজু আছে, তাজুর কাছে চেয়ে দেখেন ও আজ ধান বেচেছে

তাজুর পায়ের গতি হারাইয়া গেল। ফিরিয়া বড় বড় চোখে হলধর চক্রবর্তীর দিকে চাহিয়া, ঢোক গিলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কী?

হাকিম আগাইয়া বলিল—চক্রবর্তী মশাইএর গোটা পাঁচশেক টাকা দরকার—তাই চাইছেন। তাজু হাবার মতো চুপ করিয়া রহিল ট্যাঁকটা শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিল ডান হাতে। চক্রবর্তীকে বড়ো ভয় তাহার। তাহার সামনে দাঁড়াইয়া সে যেন নিজেকে হারাইয়া ফেলে; তাহার কথা-বার্তা, চাল-চলন, দৃষ্টি—সবই যেন কী এক সম্মোহন। শুকনো গলায় শুধু কহিতে পারিল—আমারো যে সওদা নিতে হবে।

—বলো কী, পাঁচশ টাকায় সওদা করো নাকি আজকাল!—

চক্রবর্তী ভুরু কোঁচকাইয়া বাংগের স্বরে প্রশ্ন করিলেন।

হাকিম মন্তব্য করিল—করলেই বা কি পৌষ মাসের দিন!

—আরে দেবে তো দাও—না হয় ধারই দাও, তোমার সওদা কাল নিলেও চলবে। দাও—কাল আমার বাড়ি থেকে নিয়ে এসো।

হলধরের প্রসারিত হাত তাজুকে যেন আরো নির্জীব করিয়া ফেলিল। ট্যাঁকের উপর হইতে হাতখানা যেন অবশ হইয়া নামিয়া গেল।

—ওকী চুপ করে তাকিয়ে রইলে যে!—তোমার কাছে চক্রবর্তী মশাইর তো পাওনাও আছে কতো।

তাজুর মনে হইল ক্ষোভে দুঃখে বুঝি বা সে কাঁদিয়াই ফেলিবে। ষড়যন্ত্র! কোশল করিয়া টাকাটা আদায় করিয়া লইল হলধর আর হাকিম খাঁ! হলধর চক্রবর্তী টাকার কুমীর। কতটুকু ক্ষতি হইত তাহার ঐ ক'টি টাকা তাহার নিকট পড়িয়া থাকিলে! হাকিম শয়তানী করিয়া না জানাইলে হয়তো এমন ঘটিত না। হাকিমের উপর দুরন্ত আক্রোশে তাজুর দুইহাত হঠাৎ মুষ্টিবদ্ধ হইয়া উঠিল।

হলধর কাপড়ের পোঁটলাটি লইয়া আগে নামিয়া গেলেন। হাকিমও নোতুন-কেনা আলোয়ানখানা কাঁধে ফেলিয়া নামিয়া যাইতেছে—এমন সময় তাজু হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া দুইহাতে তাহার গলা চাপিয়া ধরিল উন্মত্তের মতো কয়েকটা ঝাঁকুনী দিয়া বিকৃতকণ্ঠে কী বলিয়া উঠিল সে-ই জানে। কিন্তু হাকিম জোয়ান লোক—নিজেকে ছাড়াইয়া লইতে তাহার সময় লাগিল না। সাত আটটি লোক তখন দোকানে। হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। হাকিমের লাঠির আঘাতে তাজুর কপাল ফাটিয়া দরদর করিয়া রক্ত ছুটিল। হঠাৎ যে কেন এমন ঘটিল ভাবিয়া সকলেই প্রথমটা একটু হতভম্ব। হলধর কী ভাবিয়া পুলিশ-নৌকার দিকে আগাইয়া গেলেন। হাকিমও ফুঁসিতে ফুঁসিতে তাঁহার অনুসরণ করিল।

রক্তাক্ত মস্তক তুলিয়া সভয়ে সেদিকে তাকাইল তাজু। কি করিয়া বসিল সে! এবার হয়তো ভিটে মাটি গ্রাসেরও সুযোগ দিল হলধর চক্রবর্তীকে। উহাদের এখন পৌষ। পৌষলক্ষ্মীর প্রসাদে সকলেই আপন আপন লাভ ভাবিতে ব্যস্ত। এতোটুকু দয়া মায়া, সহানুভূতি নাই তাহাদের চিত্তে।

শেষ হউক, হে ঈশ্বর, শেষ হউক এই দয়াহীনতার।

লক্ষ্মীছাড়া

কল্যাণী ঘোষাল

ভুই মাটির শান্ত শ্যামল বুকে
ঘর বেঁধেছিল ওরা
আঁচলে লক্ষ্মী বেঁধে।
যুগ যুগের লক্ষ ক্ষুধিত মুখে
দিয়েছে পুষ্টি ওরা
পরের দুঃখে কেঁদে।

অন্ন ওদের আজিকে অন্য-ভালে,
লক্ষ্মী গিয়াছে চুরি—
যোগাতে অন্যে মন!
দৈন্য ওদের ভাঁড়ারে বক্সি জ্বালে,
রাজপথে ঘুরি ঘুরি
চলেছে শুভ্রবধ।

যদিও আজিকে মাটির বক্ষ পরে
শৃগালের দল চলে……
…প্রেতের নৃত্য সাজা।
তবুও ওদের জীর্ণ মাটির ঘরে
সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলে
যদিও লক্ষ্মীছাড়া।



লাশিওর মায়া

পশুপতি ভট্টাচার্য

মানুষের জীবনে কচিৎ এমন সময়ও আসতে পারে যখন তার কাছে জীবন-মরণ দুই-ই সমান হ'য়ে যায়, যখন তার জীবনেও কোনো আনন্দ নেই আর মৃত্যুতেও কোনো আতঙ্ক নেই। এমনি সত্তাবিহীন অসাড় অবস্থায় কতদিন পর্যন্ত টিঁকে থাকা যায় তা জানি না, কিন্তু আমার নিজের জীবনেই এমনি ভাবের পুরো দু'টি বছর কেটে গেছে যখন আমি যেন মানুষটাও হ'য়ে পড়েছিলুম একেবারে সম্পূর্ণ রকমে বীতকাম, বীতভয়, বীতশোক, বীতস্পৃহ। সেই দু'টি বছর যে আমার কোনখান দিয়ে কেটে গেছে তা বলতে পারি না। মাঝে মাঝে মনে হয় বুঝি স্বপ্ন, কিন্তু পা'দুটোর দিকে চেয়ে মস্ত মস্ত ঐ কালো দাগগুলো দেখলেই বুঝতে পারি যে, স্বপ্ন নয়, সবই সত্য।

ডাল-ভাত আর পুঁইশাক চচ্চড়িখেকো বাঙালীর জীবনে কোনো অ্যাডভেঞ্চার নেই, কিন্তু আমার ছেলেবেলা থেকেই মনে মনে বাসনা ছিল যে, একবার কখনো একটা অন্তত রকমের অ্যাডভেঞ্চার করতেই হবে। এদিকে সুবোধ বালকের মতো ক্রমে ক্রমে ডাক্তারি পরীক্ষাও পাশ করলুম, সোলার টোপর মাথায় দিয়ে বিয়েটাও করলুম, পাটের কলে একটা চাকরিও জুটে গেল, আর জুলজুল ক'রে চাওয়া হাসিমুখী একটা কালো কুচকুচে মেয়েও ঘরে জন্মালো। তোফা তোয়াজে থেকে হাই তুলে তুড়ি দিয়ে কাটাবার মতো একটা গতানুগতিক জীবনের জোড়-জোড় প্রায় সমস্তই গুছিয়ে আনা হয়েছে, এমন সময় এই যুদ্ধ বাধলো। সুযোগ পেয়ে সমস্ত ছেড়েছুড়ে দিয়ে হ'য়ে পড়লুম ক্যাপ্টেন, চলে গেলুম একেবারে ফ্রন্ট লাইনে। তখন ভীষণ যুদ্ধ চলেছে জাপানীদের সঙ্গে, গোলা ছিটকে আর বোমা ফাটার শব্দে চারিদিক কম্পমান, অ্যাডভেঞ্চারের একেবারে খাস কেন্দ্রস্থলে গিয়ে হাজির হয়েছি। মনে বেজায় স্ফূর্তি, প্রাণে অদম্য সাহস, সারাদিনের পরিশ্রমেও একটু ক্লান্তি নেই, অকুতোভয়ে এমন সব মেজর অপারেশন করছি যে-ক্ষেত্রে কখনো ছুরি ধরতে পারবো এমন কথা কল্পনাও করিনি। যুদ্ধের ফলাফল যা হয় হোক, কাজের মতো কাজ পেয়েছি, তবে আনন্দে আত্মপ্রসাদে আমি আত্মহারা।

আমরা ইনানজ্ঞা পেট্রোল ফ্যাক্টরিতে একটা বিরাট ফিল্ড অ্যাম্বুলান্সের দল নিয়ে কাজ করছিলুম, আর আমাদের সৈন্যেরা ঐ কারখানাটাকে রক্ষা করবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছিল। হঠাৎ একটা বিপর্যয় ঘটলো, জাপানীরা একেবারে তিন দিক থেকে আমাদের সজোরে আক্রমণ ক'রে এলো। পালিয়ে যাবার একটিমাত্র পথ খোলা ছিল, সেই দিক দিয়ে সবাই পালালো, কেবল আমাদের স্ট্রেচারটা সবার পিছনে ছিল বলে পথে আটকে পড়লো। জাপানীরা রাস্তাটাকে আগলে দাঁড়িয়ে কেবলই মেশিনগান চালাতে লাগলো। অগত্যা আমরা স্ট্রেচার সমেত ধরা পড়ে বন্দী হলুম।

পেট্রোলের কারখানায় অনেকগুলো ব্যারাক বাড়ি ছিল, তারই একটার মধ্যে ওরা আমাদের সবাইকে বন্দী ক'রে রাখলে। ওদের বন্দী হ'য়ে থাকা যে কতখানি কষ্টের সে সম্বন্ধে কারো ধারণাই নেই। আমাদের পোষাকগুলো সব কেড়ে নিয়েছে, আছে কেবল সার্ট আর খাকি প্যান্ট—গায়ে দেবার কোনো আচ্ছাদন নেই। খেতে দেয় শুধু আধসিদ্ধ ভাত আর জল, এ ছাড়া আর কিছুই না। কিন্তু তবু আমরা দমে যাইনি, সকলে মিলে বেশ আনন্দেই কাটাচ্ছিলুম। জানি যে একদিন যেমন ক'রেই হোক ছাড়া পেয়ে যাবো, এটা সাময়িক কষ্ট,—যুদ্ধের সময় সকলকেই ভোগ করতে হয়।

তিন চার দিন পরেই দূর থেকে আবার গুলীগোলার আওয়াজ আসতে লাগলো। আমরা বুঝলাম যে, আমাদের সৈন্যরা এবার ওদের পুনরাক্রমণ করতে আসছে। ওদের মধ্যেও রীতিমত একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। যখন দেখলে যে, অবস্থাটা বেগতিক হয়ে আসছে তখন ওরা পরামর্শ করে স্থির করলে যে, এই জায়গা ছেড়ে যদি ওদের পালাতেই হয় তবে বন্দীদের কিছুতেই ছাড়া হবে না, অথচ সঙ্গে নিয়ে যাওয়াও অনেক হাঙ্গামা। অতএব এদের সকলকে ঐ ব্যারাকের মধ্যেই পুড়িয়ে মারা হোক। ওরা তৎক্ষণাৎ ব্যারাকের সমস্ত দরজায় কুলুপ লাগিয়ে ভিতরে বাইরে চারিদিকে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দূরে সরে পড়লো।

সমস্ত ব্যারাক বাড়িটার দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলে উঠলো। কাঠের বাড়িতে পেট্রোলের আগুন ধরতে কিছুই দেরী হয় না। আমাদের পালাবার কোনো উপায়

সেই সব দরজা বন্ধ। এদিকে বাইরে থেকে ওরা অনবরত গুলী ছুঁড়ছে, পাছে কেউ কোনোগতিকে দরজাজানলা ভেঙে পালায়। যারা আগুনের ভয়ে মরিয়া হ'য়ে জানলার গরাদে ফাঁক ক'রে উপর থেকে ছিটকে পড়ছে তারা তখনই ওদের গুলীতে মরছে। আসন্ন মৃত্যু—মানুষগুলো উন্মত্তের মতো চীৎকার করছে আর উলঙ্গ হ'য়ে ঘরের মধ্যেই ঠেলাঠেলি আর ছুটোছুটি করছে।

আমি যেখানে আশ্রয় নিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম সেখানে আগুনটা তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসতে লাগলো। ভেবে দেখলুম এ সময় জ্ঞানহারা হ'য়ে ছুটোছুটি করলে চলবে না, বুদ্ধি ক'রে একটা কিছু স্থির ক'রে ফেলতে হবে। চারিদিকে চেয়ে দেখলুম এক জায়গায় একটা জানলার গরাদে ফাঁক করে একজন লোক নিচে ঝাঁপ দিয়ে পড়বার চেষ্টা করছে। তার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালুম। গরাদগুলো একটু শক্ত ছিল, শরীর গলিয়ে বেরিয়ে পড়তে তার দেরী হ'তে লাগলো। ইতিমধ্যে আমার দু'টি পায়ে আগুন লেগে পা'দুটো বেজায় ঝলসে যেতে লাগলো। লোকটিকে ঠেলে জানলা গলিয়ে বের ক'রে দিলুম। সে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গেই দেখলুম গুলী খেয়ে সে স্থির হ'য়ে গেল। কিন্তু তখন আমার পায়ে আগুন ধরে গেছে, মুহূর্তমাত্র ইতস্ততঃ করবার আর সময় নেই। আগুনে দগ্ধে মরার চেয়ে গুলীর মুখে যাওয়াও ঢের ভালো, এই ভেবে আমি জানলা থেকে লাফ মারলুম। পায়ে তখন অসহ্য জ্বালা, লাফ মেরেই মাটিতে বসে পড়লুম। সেখানেও দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলছে, তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালুম। সঙ্গে সঙ্গে একটা গুলী আমার মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। কিন্তু তখন আমার সেদিকে কোনো জ্ঞানচৈতন্য নেই, পায়ের জ্বালায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে কোন্‌দিকে ছুটে চললুম কিছুই জানিনা। চারদিকে গুলী ছুটছে কিন্তু আমার কোনো দৃকপাত নেই, অনবরত ছুটেই চলেছি।

ছুটতে ছুটতে যখন চৈতন্য হলো তখন মাথায় বুদ্ধি এলো যে এটা ঠিক হচ্ছে না, এবার গুলীর আঘাত থেকে নিজেকে বাঁচানো দরকার। আর তখন পায়ে এমন দারুণ জ্বালা ধরেছে যে, ছোটবারও আর উপায় নেই, বারে বারে হোঁচট খেয়ে পড়ছি। যখন দেখলুম যে কোনো গতিকে আর চলা যায় না তখন গড়াতে গড়াতে একটা খানার মধ্যে গিয়ে পড়লুম।

খানিক পরে অন্ধকার হ'য়ে এলো, গুলীগোলার আওয়াজ থেমে গেল। অজ্ঞান অচৈতন্যের মতো সেই খানার মধ্যেই আমি পড়ে রইলুম। অনেক পরে জাপানীদের ভাষায় কথাবার্তা আর উচ্চ হাসি আমার কানে এলো। বুঝলুম জাপানীরাই জিতেছে, তারা এই স্থান দখল ক'রে বসেছে। চারিদিকে টর্চের আলো ফেলে তারা দলে দলে আহতদের খুঁজে বেড়াতে লাগলো, একবার আমার খানাটার মধ্যেও টর্চ ফেলে আমাকে ওরা দেখতে পেলে। বোধ হয় মনে করলে মৃত। আমাকে একটা লাথি মেরে ফেলে রেখে তারা অন্যদিকে চলে গেল।

রাত্রি গভীর হ'লে আমি খানার ভিতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলুম। মনে হলো পালাই, কিন্তু উঠে দাঁড়াবার শক্তি নেই। ঐ হামাগুড়ি দিতে দিতেই কোনো-গতিকে একটা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে চুপ চাপ বসে রইলুম।

ক্রমে ফর্সা হলো, বেলাও হলো। জঙ্গল থেকে এবার বেরুতেই হবে—শত্রু হোক বা যেই হোক, লোকের কাছে গিয়ে বলতেই হবে যে আমি বেঁচে আছি। এই মরতে গিয়ে বেঁচে থাকাটা কী বিড়ম্বনা! আমার সঙ্গে যারা ছিল তারা অনেকেই মরে গেল আগুনে কিংবা গুলীতে, কিন্তু আমি যে বেঁচে আছি তাদের চেয়ে আমার দুর্ভাগ্য আরো অনেক বেশি। তাদের কষ্ট ফুরিয়ে গেল, আমার কষ্ট এখনো অনেক। পেটের খিদের তাড়াতে শত্রুর কাছে মাথা হেঁট ক'রে খাবার চেয়ে খেতে হবে, পায়ের ঘা-গুলোতে ওষুধ লাগাতে হবে, যদিও প্রাণের ভয় তাতে যথেষ্টই আছে, তবু সেই প্রাণকে আপাততঃ বাঁচাবার জন্যে এই সব হাঙ্গামা আমাকে করতেই হবে। এর চেয়ে মরা কত সহস্রগুণ ভালো! দৈবাৎ বেঁচে গিয়ে আজ আমি কত অসহায়, কতখানি পরনির্ভর।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পা'টা ঘষতে ঘষতে বড় রাস্তার ধারে এসে পড়লুম। একটা জাপানি অ্যাম্বুল্যান্স গাড়ি সেখান দিয়ে যাচ্ছিল, তারা আমাকে তুলে এক জায়গায় নিয়ে গেল। সেখানে তাদের ডাক্তার ছিল, তাকে আমি আমার রেড ক্রসের ব্যাজটা দেখালুম। সে আমার পায়ের ঘা'গুলোতে ওষুধ দিয়ে যত্ন ক'রে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলে।

কয়েক দিন সেখানে থাকতে থাকতে আমি ক্রমশঃ সুস্থ হ'য়ে উঠলুম। যখন কাজ করবার উপযুক্ত হয়েছি তখন ওদের ডাক্তার বললে, তুমি আমার কাজে সাহায্য করতে লেগে যাও, তা'হলে আমারও সুবিধা হবে আর তোমারও কিছু সুবিধা হবে। জাপানী শত্রু হ'লে কি হয়, এদিকে লোকটার মন-টন খুব ভালো। আমি ওদের অনেক উপকারে লাগছি বলে আমার জন্যে ওরই মধ্যে যতখানি সম্ভব একটু ভালো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিলে, খানিকটা বন্ধুত্বও জমিয়ে ফেললে।

কিছুদিন পরে রেঙ্গুণ থেকে হুকুম এলো, যারা বন্দী আছে তাদের সকলকে রেঙ্গুণে পাঠিয়ে দিতে হবে। ওদের ডাক্তার তখন দুঃখ ক'রে বললে—দেখ স্যান্যাল, আর তো তোমাকে এখানে রাখা যায় না, এবার পাঠিয়ে দিতেই হবে। ভেবেছিলাম বেশ একসঙ্গে কাজ করবো তোমার দেশে গিয়ে তোমার অতিথি হ'য়ে থাকবো, কারণ তোমার দেশেই তো একদিন আমরা গিয়ে পড়ছি। যাক্‌, ঠিকানাটা আমাকে দিয়ে যাও, যখন ওখানে যাবো তখন তোমারই বাড়িতে গিয়ে ওঠা যাবে।

যখন অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে রেঙ্গুণে গিয়ে হাজির হলুম তখন ওরা আমাকে প্রশ্ন করলে,—তুমি আমাদের দলে মিশে আমাদের হ'য়ে কাজ করতে চাও, না যুদ্ধের বন্দী হ'য়ে থাকতে চাও?

আমি বললুম—আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা কিছুই নেই, যেমন তোমরা রাখবে তেমনি থাকবো। আমি তো এখন মরারই সমান।

—ও-সব চালাকি চলবে না, স্পাইগিরি করবার চেষ্টা করলেই গুলী খেয়ে কুকুরের মতো মরতে হবে।

—স্পাইগিরি কখনো শিখিনি, কেবল ডাক্তারিটাই শিখেছি।

—বেশ কথা, তুমি তাহ'লে আমাদের কুলিদের গ্যাংএর সঙ্গে লাসিওর দিকে চলে যাও। সেখানে ওরা আমাদের চীন যাবার রাস্তা তৈরী করতে যাচ্ছে, তুমি ওদের সঙ্গে থেকে ওদের ডাক্তারি করবে। সঙ্গে ওষুধ-পত্র দিয়ে দিচ্ছি।

ওষুধপত্র দিলে মাত্র তিন রকম,—কুইনিন, আর ম্যাগ-সালফ আর টিংচার আইডিন। এই তিনটি জিনিস নিয়েই আমাকে প্রায় হাজার লোকের ডাক্তারি করতে হবে। পোষাক দিলে কেবল হাফ্‌-প্যাণ্ট আর গেঞ্জি, পায়ে নেই জুতো, গায়ে নেই শীতের আচ্ছাদন। অথচ লাসিওর দিকে প্রচণ্ড শীত। কিন্তু তাতে আমার কোন কষ্ট হয়নি, শীত-গ্রীষ্মবোধ তখন আমার কিছুই ছিল না। খালি পায়ে গেঞ্জী গায়ে আমি কুলিদের সঙ্গে লাসিওর দিকে চলে গেলুম।

যেখানে গিয়ে পড়লুম সেখানে খাবার দাবার কিছুই মেলেনা, ওদের যা রেশন আসে তাই খেয়েই থাকতে হয়। কেবল ভাত আছে, আর নুন আছে, আর ডালের একটা সুপের মতো আছে। তাই খেয়ে সবাই থাকে, আমিও থাকি। ভিটামিনের অভাবের কথা মাঝে মাঝে বলি কুলির সর্দারদের, তারা সে কথা হেসে উড়িয়ে দেয়। আমার পিঠ ঠুকে বলে—এ তোমার বিলিতী ডাক্তারি করবার জায়গা নয়, জাপানী ডাক্তারিটা আমাদের কাছে শিখে নাও।

কিন্তু কুলিরা কেবল ঐ খেয়েই থাকে না, মাঝে মাঝে এটা ওটা খাবার জিনিস সংগ্রহ করে। লাসিওর কাছেই ইউনান। সেদিকে পাহাড়ী চীনাদের ছোট ছোটো গ্রাম আছে। মাঝে মাঝে তারা দল বেঁধে বেসাতি করতে আসে, এরা তাদের কাছ থেকে কিনে নেয় ডিম, ফল, তরকারি। সুবিধা পেলে অন্যরকম ধরণের জিনিসও সংগ্রহ ক'রে নেয়। তারাও এদের খুশি রাখে, আর এরাও তাদের ঘাটায় না। তাদের সঙ্গে এদের আপোষে একটা বোঝাপড়া হ'য়ে আছে। কথা আছে যে, তারা যদি মাঝে মাঝে এসে খাবার জিনিষ প্রভৃতি এদের দিয়ে যায় তাহ'লে এরা তাদের গ্রামে ঢুকে কোনো অত্যাচার করবে না। ফলে তাই

হয়। এদের সর্দারেরা গ্রামের সর্দারদের খুব খাতির করে, মাঝে মাঝে তারাও এদের নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে যায়। তখন নানারকম আনন্দের উৎসব চলে। ঐ সব দেশের চীনা মেয়েরা পুরুষদের চেয়েও বেশি সাহসী, আর সভ্য জগতের মতো নীতিজ্ঞানেরও অতো বালাই নেই, তারা অসঙ্কোচে যাতায়াত করে।

আমার দিন কেটে যায়। কত দিন কাটলো তাও আর গুণে দেখি না, কোন্ ঋতু চলেছে তাও বুঝতে পারি না। অতি দুঃখীরও হয়তো মনে মনে একটা ক্যালেণ্ডার থাকে, কিন্তু বন্দীর কোনো ক্যালেণ্ডার নেই। সন্ধ্যার সময় দেখি কুলিরা আগুন জ্বেলে বসেছে, অর্থাৎ তাদের শীত করছে। দুপুরে দেখি খাটতে খাটতে তাদের গায়ে ঘাম ঝরছে, অর্থাৎ তাদের গরম হচ্ছে। কখনো ভাবি এটা শীতকাল, কখনো ভাবি গরমকাল। ঠিক বুঝতে পারি না, আমার নিজের ভিতরে কোনো সাড় নেই।

চোখ বুজে যখন বসে থাকি তখন হঠাৎ এক একটা ছবি দেখতে পাই। ছোটো মেয়েটার হাসিমাখা কালো কালো চোখ দুটো জুলজুল্ ক'রে আমার দিকে চেয়ে আছে। সন্ধ্যা হ'য়ে এলো, পাড়ায় পাড়ায় শাঁক বাজলো, ঘোমটামুখী বৌ শাঁখাপরা হাত বাড়িয়ে তুলসী তলায় প্রদীপ দিচ্ছে। কলের কেরাণিবাবুর কনকচাঁপার মতো কিশোরী মেয়েটি ম্যালেরিয়ার জ্বরে কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে, ঠোঁট দুটোকে করুণভাবে উঁচিয়ে ক'রে বলছে, ডাক্তারবাবু, মুখে যাতে রুচি হয় এমন একটা কিছু খেতে দিন না,—আমি তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে গম্ভীর চালে বলছি, আচার রুচি একটু আধটু খেতে পাবে। পাতি লেবুর রস দিয়ে। ঘোর অন্ধকার ক'রে বর্ষা নেমেছে, ঝুপ্ ঝুপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে, আমি সুগন্ধ কলাইএর ডাল মেখে পুঁইশাকের চচ্চড়ি দিয়ে ভাত খাচ্ছি, বৌ পাখা নিয়ে মাছি তাড়াচ্ছে এইবার খেয়ে উঠেই পান মুখে দিয়ে বিছানায় গিয়ে শোবো। হঠাৎ চোখ চেয়ে দেখি, কোথায় সন্ধ্যা, কোথায় অন্ধকার, কোথায় বর্ষা,—খট খট করছে দুপুরের চড়া রোদ, ফুলঝুরির স্ফুলিঙ্গ তারাকাটার মতো অসংখ্য রোদের কণাগুলো অসীম শূন্যময় ঝিকিমিক মেরে ছুটে বেড়াচ্ছে, আর জাপানী সান্ত্রীগুলো বন্দুক ঘাড়ে ঠায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে।

কোনটা স্বপ্ন আর কোন্‌টা বাস্তব তৎক্ষণাৎ ঠাহর করতে না পেরে চোখ দুটো কচলাতে কচলাতে সটান আমি দাঁড়িয়ে উঠি। জাপানী সর্দার কাঁধ ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলে—ডাক্তার, এবার নিজে একটা দাওয়াই খাও, দিনের বেলা বসে বসে ঢুললে আমাদের কাজ চলবে না। কড়া হাতের ঝাঁকানির চোটে সমস্ত কাঁধটা ঝনঝন ক'রে ওঠে, তখন বুঝতে পারি কোনটা বাস্তব। তখন বুঝতে পারি শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ শোভাময় পৃথিবীটাকে যে কত অপরূপ বলে ভাবতুম সেটা বেমালুম একটা ফাঁকিবাজি, যা কেবল বাপ-মা-ভাই-বন্ধুর মুখে ছেলেবেলার থেকে শোনা আর কাল্পনিক করুণাময় বিধাতার দোহাই দিয়ে গড়া। আসলে বিধাতা ব'লে কেউ নেই, আর যদিও থাকে, মানুষ জাতটা বিলকুল তাকে হাতছাড়া ক'রে গেছে। ঐ আহুরে বিধাতার বদলে মানুষ যাকে এখন সব চেয়ে বড়ো বলে মেনে নিয়েছে, তার নাম ক্ষমতা। ক্ষমতা যাকে অনুগ্রহ করে সেই পৃথিবীকে চালায় তার পথেই সবাইকে চলতে হয়। মানুষের মধ্যে এখন দুটি মাত্র অনুভূতির জিনিস আছে, ক্ষমতা আর অক্ষমতা। এ ছাড়া আর যত সেকেলে অনুভূতি সব বাজে এবং বাতিল।

তা হোক, জাপানী সর্দারেরা কিন্তু লোক ভালো। আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে, ভদ্রভাবে কথা বলে, বন্দী হ'লেও নেহাৎ বন্দীর মতো মনে করে না। ওরা বুঝে নিয়েছে যে, আমি নিরীহ ভালোমানুষ ডাক্তার, ডাক্তারি ছাড়া জগতের কিছুই বুঝি না, আমাকে উৎপীড়ন করা নিরর্থক। মাঝে মাঝে এদিক ওদিক বেড়াতে যেতে পাই, তাতে কেউ বাধা দেয় না। জানে যে পালাবার কোনো উপায় নেই, কোনো রাস্তাও নেই।

রোজ বিকেলে আমি এলোমেলো বেড়িয়ে অনেকখানি ঘুরে আসতুম। একদিন ঘুরতে ঘুরতে আবিষ্কার করলুম চীনাদের এক গ্রাম, ছোটো একটি পার্বত্য নদীর ধারে। মাত্র কয়েকঘর চীনা সেখানে থাকে, গ্রামটির চারিপাশে বেড়ায় জঙ্গল। তাদের যে সর্দার সে বাস করে সকলের চেয়ে

[ইহার পর ৩০৩ পৃষ্ঠায়]



প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক বি চক্রবর্তী (চেয়ারে উপবিষ্ট বাম হইতে তৃতীয় ও ঝাণ্ডায় লক্ষ্য)

বিহারের লোক সঙ্গীত

[২০১ পৃষ্ঠার পর]

"কোন হাঁথে গঢ়ল রে কাংকীয়া কে দাঁত
হাঁথে তোরা ফুটৌ সোরাঙ এ লাগে ঘুণ।"

'কোন্ হাতে চিরুণীর দাঁত গড়েছিল? তোর চক্ষু নষ্ট হয়ে যাক্, তোর শরীরে ঘুণ ধরুক, ঠিক যেমন নিত্যকার নারী রেগে বলে ওঠেন—"মর মুখপোড়া" সেই রকম।

"লটওয়া ধুণী রে ধুণী রোয়ে সোনরা
কে মায়
ধবরি গুনহ হে মাইয়া, বকসো হামার
ফিরসে গঢ়বো মাইয়া, কাংকীয়াকে দাঁত—"

'মাথা কুটে স্যাকরার জননী কাঁদছেন—'হে দেবী মাতা এবারকার মত অপরাধ (গুনহ) মার্জ্জনা কর (বকসো)। আবার চিরুণীর দাঁত গড়ে দেবো—'

অমনি মানব নন্দিনীর মতই সহজে তুষ্ট দেবী বল্লেন—

"দুধ সে নহইও রে সোনরা,
পুত সে পাঝাইও
কহিনিসে অরজন খৈহো যুগে যুগ—"

অর্থাৎ 'দুধে স্নান কোর, সন্তান সন্ততিতে ঘর ভরে উঠুক এবং শরীরের অটুট শক্তিতে বহুকাল পরিশ্রমের অন্ন যেন খেতে পাও'—(পুত—স্ত্র পাঝাইও—পরিবেষ্টিত থেকো, কহিনিকে—পরিশ্রমের, অরজন—অর্জ্জন, খৈহো—ভোগ কোরে, খেয়ো)।

আর একটা গান গাওয়া হয়—বলা বাহুল্য বহু গান আছে এরূপ পূজা অর্চ্চনার। শীতলা দেবী এবং অপর দেবদেবীদের গান।

"গহিরী নদীয়া অগম বহে মাইয়া
হায় হায় নদী তীরে কালী সে সুন্দরী ঠাড়
'নৈয়া ন লাও হো মাঝা উতরব পার।"

'গভীর নদী বয়ে যাচ্ছে, হেঁটে পার হবার সাধ্য নেই, শ্যামলা সুন্দরী মাতা নদী তীরে দাঁড়িয়ে আছেন, (ঠাঢ়)। ডেকে বলছেন—'মাঝি নৌকা আন্ পার হব।"

বিলম্ব দেখে বলছেন—

"কাহি সে নৈয়ারা, কাহে সে রে ডোর (দড়ী)
নৈয়া ন আনে রে মাঝা উতরব পার।"

তখন মাঝি এসে দেবীর উৎকণ্ঠা দেখে হেসে বলছে—

"সোনার নৈয়া মোর, রেশম কে ডোর
হায় টুটল, পনায় দৈ মাইয়া উতরবে পার।"

আমার নৌকা সোনার তৈরী আর দড়ী রেশমের বটে, কিন্তু ভেঙে গেছে নৌকা মেরামৎ করে নি, তারপর পার করে দেব। ঘনিষ্ঠতা করবার চেষ্টা করছে।

"কঁহা সে হেকা মাইয়া, কঁহা সে লে যায়?
জাতিয়া নে অহে মাইয়া কেহ ন বিচার—"

"কোথা হতে এলে কোথায় বা নিয়ে যাব? তোমার জাতি কি?"

উত্তর হোল—

"কব কে কেবুরে মেঘা কৈলে কে যাব,
জাতিয়া বৈরাগীন মাঝা—কালী সুন্দর ঠাঢ়।"

দণ্ডায়মানা কৃষ্ণবর্ণা সুন্দরী দেবী উত্তর দিলেন—"আমি থারু (?) বাসিনী—যাব কৈলাস, জাতিতে বৈরাগী"—তারপর দেবী সন্দেহ করছেন যে, মাঝির দৃষ্টিটা তেমন সুবিধার নয়।

ক্রোধে বললেন—

"নজর চলায় বে মাল্লা, কোঢ়ী হোয় যায়
আঁচর ধরবে মাল্লা, জরি হোয় ছায়—"

"কুদৃষ্টি যদি দাও কুষ্ঠ ব্যাধি হবে, এবং আমার অঞ্চল যদি স্পর্শ কর তবে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে"।

এই বিশেষ গানটির সঙ্গে চণ্ডী কাব্যে বর্ণিত কাহিনীর কিছু কিছু আভাষ পাওয়া যায় মনে হয়। সে হিসাবে ভারতের সমস্ত প্রদেশের লোক-সঙ্গীত ও স্ত্রী-ব্রতকথার কিছু না কিছু মিল নিশ্চয় পাওয়া যাবে। লোক-সঙ্গীত সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখছি এই পূজা বা আরাধনা সঙ্গীতগুলির পৌরাণিক ভিত্তি উদ্ধার করা দুঃসাধ্য। পুরান এবং নব কল্পনার সংযোগে যে অপূর্ব্ব বস্তুর রচনা হয়েছে তা গবেষণা করতে গেলে ঠকতে হয়, কিন্তু একটি অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য এদের আছে।

ভাষা একেবারে গ্রাম্য চলিত ভাষা, উপরিউক্ত সঙ্গীতগুলিতে ছোটনাগপুরের চলিত ভাষার প্রাধান্য, কারণ এ-গুলি এখানকার সংগ্রহ।

একটি গান আছে, ভাবার্থ এই রকম—"শীতলা দেবী পুকুরে স্নান করতে গেছেন, এমন সময় অসুর তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বিবাহ করতে বাসনা করেছে। শীতলা বলছেন, যখন বিবাহ করতে আসবে ভাল-রকম সাজ বরযাত্রী নিয়ে এস।" তারপর যখন বরযাত্রী এল শীতলা দেবী আঁট করে বস্ত্র পরিধান করলেন। পুকুরের কাছাকাছি যখন বরযাত্রী এল দেবী খড়্গ খর্পর নিয়ে ভাবী শ্বশুর ভাসুর সকলকে কেটে ফেল্লেন এবং যে অসুরের স্বামী হবার সাধ হয়েছিল তাকে কেটে ভোজন সমাধা করলেন।

কহল পুছল মাইয়া একো নাহি মান লৈ
চলি গেলা পোখর অস্নান
পোখর পীঢ়িয়া থাড় অসুরাকে ঠাট।

*　　*　　*

তুষবে আয়বে অসুরা শীতলা বিহাবে
ভালি ভাতি সাজ বরিয়াত।

*　　*　　*

যব বরিয়াত বগিচা বিচে আয় লৈ,
মাইয়া কসু লাগে কচ্ছ কাছারিয়া
—(বস্ত্র অঞ্চল)
সব বরিয়াত পোক্ষরা পাশ আয় লৈ
চম্‌কে লাগে খড়্গওয়া কে ধরে,
শ্বশুর ভাঁইশুর কাটি কেলালৈ মাইয়া—
স্বামী কাটি কৈলৈ আহার।

এই সব চিত্রগুলিই দেবীর ভয়ঙ্করী চিত্র...ভয় পেয়ে নারীরা এই বন্দনাগুলিই রচনা করেছেন বলে মনে হয়। ভয় না করলে দেবীর দেবীত্ব খাণ্ডত হয় নিশ্চয় •

•'অ' শব্দটীর উচ্চারণ শুদ্ধ সংস্কৃত 'অ' উচ্চারণের মত হয়। বাংলা 'অ'-এর অনুরূপ নয়।

সাম্প্রদায়িকতা বনাম সামাজিকতা

[২৫৫ পৃষ্ঠার পর]

মেয়েরা adaptability'র সহায়তায় পরকে আপন করার কাজে লেগে যেতে পারে। বাগ্মিতায় পুরুষের সমকক্ষতা দাবী করে না মেয়েরা কিন্তু সুযোগের ব্যবহারে যে দক্ষতার প্রমাণ তারা বঙ্গদেশে দিয়েছে, এদেশেও দিতে পারে, যদি সুযোগগুলি তাদের জন্য হতে পারে সৃষ্টি। যে কোন রকমের "রঁদভু"র মধ্য দিয়ে সাম্প্র-দায়িক কুণো মন আস্তে আস্তে মৃত্যুবরণ করে, অন্ততঃ করে বলেই আমার মনে হয় পুরুষের ক্ষেত্রে কেন যে করে না তার জন্যে বোধ হয় তার অহংভাব বেশী পরিমাণে দায়ী এবং দায়ী তার দুর্দ্দম প্রেষ্টিজ-বোধ, যার পরিচয় ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রেও আমরা পেয়েছি। মেয়েদের আছে মানসিক অন্ধকার, ডাইনে বামে পিছনে সুমুখে সংস্কারের জঞ্জালের মধ্যে তার বসতি, কিন্তু সে নিষ্কৃতি পেয়েছে এক দিক দিয়ে। তার নেই প্রেষ্টিজ, নেই দুর্লঙ্ঘ্য অহং চেতনা এবং আমার বিশ্বাস, সাম্প্রদায়িক সমাধানে বড় বাধা সংস্কার নয়, বড় বাধা প্রেষ্টিজ। উল্লিখিত ধরণের "রঁদভু" যদি থাকত মেয়েদের জন্য, তবে তার সদ্ব্যবহার পুরুষের চেয়ে তারা বেশী করতে পারত এবং তার ভিতর দিয়ে সাম্প্রদায়িক মিলনকে নিকটতর করতে পারত। ভেদবুদ্ধি দূর করার জন্য প্রায় পঞ্চাশ বছর যাবৎ যাঁরা রিহার্শেল দিয়েছেন, তাঁহাদের মত সুযোগ-গুলি পেলে মিলনের ভূমিকায় অবতীর্ণা হতে পারত মেয়েরা। মেয়েদের জন্য "রঁদভু"র বিষয়টা সকলে অনুগ্রহ করে একটু যেন চিন্তা করে দেখেন, এই অনুরোধ পেশ করছি সাধারণের কাছে।





আলফালফা টনিক

উপাদান: টিঙ্চার অফ আলফালফা, চায়না এণ্ড হাইড্রাষ্টিস; ফসফেট অফ আয়রণ, পটাশ, লাইম, ম্যাগ্নেশিয়া এণ্ড সোডা, ফর্মিক এসিড, এলকোহল (২০%) এবং অ্যারোমেটিকস্।

আলফালফা রুগ্ন, দুর্ব্বল ও অপরিপুষ্টদের পক্ষে একটি উৎকৃষ্ট টনিক। ইহা সুপুষ্ট ও মাংসল দেহ ও সুদৃঢ় অস্থি সংগঠনে সাহায্য করে এবং দৈহিক ও মানসিক শক্তির স্বাভাবিক বিকাশ ঘটায়।

বিমর্ষতা, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, অনিদ্রা, অগ্নিমান্দ্য ও সর্ব্বপ্রকার শারীরিক ও মানসিক অবসাদে বিশেষ ফলপ্রদ।

সাকাস
সিনেরেরিয়া ম্যারিটিমা

ছানি ও অপরাপর চক্ষুরোগে

সাকাস সিনেরেরিয়া ম্যারিটিমা—ছানি প্রভৃতি যাবতীয় কঠিন চক্ষুরোগে আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধ বলিয়া সুপরীক্ষিত ও বহুল ব্যবহৃত।

সকল সম্ভ্রান্ত হোমিওপ্যাথি ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

হিন্দুস্থান
লেবরেটরীজ লিমিটেড
১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার
কলিকাতা

হিমকমল
আয়ুর্ব্বেদীয় কেশ তৈল

ব্যবহারে মাথা ঠাণ্ডা রাখে
ও চুল উঠা বন্ধ করে—





ত্রিশক্তি আয়ুর্ব্বেদ ওয়ার্কস্
• কলিকাতা •

কলিকাতা ষ্টকিষ্ট—বেরী ষ্টোরস, ১৯১১, ক্যানিং ষ্ট্রীট। চাটার্জ্জি এণ্ড কোং, ২, হ্যারিসন রোড। এবং শ্যামসুন্দর ভাণ্ডার, ১১৫, বেলগাছিয়া রোড।



সুদৃশ্য এবং মনোরম!

সুদৃশ্য আর মনোরম না হলে ভেতরে পরবার কাপড়-চোপড় ব্যবহার করে আনন্দ নেই। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আরামদায়ক ভেতরের কাপড়ের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। টেক্সটাইল ট্রেডমার্কের জো সম্ভারী যেমনি সস্তা তেমনি টেকসই আমাদের কাছে পুরুষ ও নারীদের জন্য বিভিন্ন রুচির বিরাট হোসিয়ারীর সমাবেশ রয়েছে।

টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্রীজ

গ্রাম
টেক্সপ্রোডাক্ট
কলিকাতা

৮৭, ওল্ড চীনা বাজার ষ্ট্রীট • কলিকাতা।

প্রভাসের ব্যবসা

[২৩১ পৃষ্ঠার পর]

শুনিয়া কৌতুহলী হইলাম, বুঝিলাম একটা কিছু ঘটিয়াছে যাহাতে প্রভাস ঠাকুরের মুখেও মৎস্যশাস্ত্রের পরিবর্তে অখ-শাস্ত্র ব্যাখ্যাত হইতেছে।

কিন্তু আমি কি করি? প্রভাস ত বাধ্য করিয়াই খালাস। আমার ত অত সহজে নিষ্কৃতি মিলিবে না। গৃহিণীকে জানাইলাম, প্রভাস ঠাকুর আসিয়াছে হাত মুখ ধোবার জল আনো, স্নান ও আহারের ব্যবস্থা কর।

অঙ্ক সেলাই করা জামাটা যেভাবে তক্তপোষের উপর নিক্ষিপ্ত হইল, তাহাতে গৃহিণীর মনোভাব সম্পর্কে কিছুই অস্পষ্ট রহিল না।

তথাপি প্রভাসকে বিদায় করিতে পারি না। হাতে একটা টাকা দিয়া বলিতে পারি না হোটেল হইতে আহার সারিয়া আইস। প্রভাস আমার আত্মীয় নহে, বন্ধুও নহে, সে আমার গ্রামবাসী, গৃহিণী তাহার মূল্য কি বুঝিবে?

রাত্রির আহারান্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তারপর প্রভাস। কি করিতে ভাবিয়া আসিয়াছ?"

প্রভাস দ্বিধাহীন চিত্তে উত্তর ক-
আমার ভাবাভাবি নাই, তোমরা যাহা
মনে কর, তাহাই করিব।

ভালো কিছু যে মনে করিতে
তাহা নয়, কিন্তু প্রভাস তাহ
করিয়া ভালোভাবে করিতে পা
ইহাই প্রশ্ন।

সাতদিন কাটিয়া গেল।
কাজই প্রভাসের মনঃপুত হই
সন্ধান, যজন যাজন এবং
একটা স্থায়ী আয়ের প
চাকুরি বা অন্য কোন ক
চালানো অসম্ভব নয়।
যজমানেরও অভাব ন
একটা পূজা বা ব্রত ন
কিছু গোছানো য
ধনীর বাড়ীতে য
দারোয়ানের ধাক্কা
সাহসে কুলায় ন
বাড়ীতেও তাহার
কথায় ভুল ধরিয়া
তাহার মাথা গুলা
গুঁতা মারিয়াও
বাহির করিতে প
থাক। যদি কেহ
দক্ষিণা দিয়া
মাসে মাসে ফল
মন্ত্রোচ্চারণ দ
প্রভাস বিবে

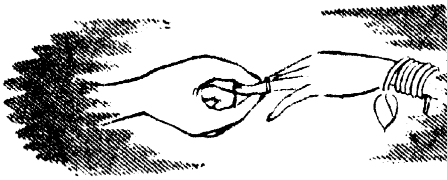
"বলো
লোক কি ভ

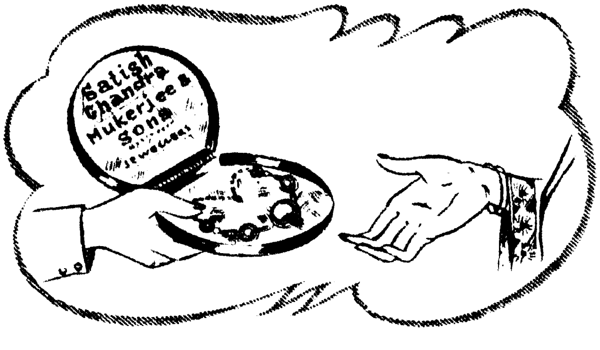
ব্রাহ্মণের 'জন্মগত অধিকার' পাচকের ব্যবসার কথাটা অতিশয় সঙ্কোচের সঙ্গেই পাড়িয়াছিলাম। উত্তর যাহা পাইলাম তাহাতে বুঝিলাম, প্রভাস ঠাকুর পাচক ঠাকুর হইতে প্রস্তুত নহে, তাহার মতে রাঁধুনী বামুনের কাজ অসম্মানজনক, গৃহকর্ত্রীদের মেজাজ আপত্তিকর। আর রান্নাঘরের কথা বাহিরে পৌঁছাইতে বিলম্ব হয় না; একবার যদি তাহার গ্রামে প্রচার হইয়া যায় যে, প্রভাস ঠাকুর কলিকাতায় রাঁধুনী বামুনের কাজ করে, তাহা হইলে তাহার আর সেখা-
নিয়া মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে।

কথাটা একেবারে মিথ্যা ন
বিদ্যা নাই অথচ মানের কাজ
নাই অথচ সম্মানজনক ব্যবসা
করি কোথা হইতে
পারিবে না, বেয়ারা
না, খাতা নকল
দের কাজের বা
শ্রমের কাজ
এবং অ
পাই
পারি

বা
লোক
তাহ
প্রভা
আফ
তাহ
অ






Satish Chandra Mukerjee & Sons
Jewellers

প্রবাসিনী

[২৫২ পৃষ্ঠার পর]

পারে। এর জন্যে তুলনামূলক ভাষা শিক্ষা বা য়ুনিভার্সিটিতে ভারতের বিভিন্ন দেশের আচার পদ্ধতির ডিগ্রী পড়াবার ক্লাস খুলবার প্রয়োজন ঘটবে না। মেয়েরা সংসারের কাজ-কর্ম্ম খেলাহাসির মধ্য দিয়ে তাঁদের দ্বিপ্রহরের বিরাম অবকাশের ভিতরেই এই সখ্যতা স্থাপন করতে পারেন। আজকাল এমন ছবি প্রায়ই দেখা যায়, স্বামী ডাক্তারি পাশ করে কোন বড় সহরে নতুন ব'সলেন। ক্রমে ভাটিয়া, মারোয়াড়ি, বেহারী সম্প্রদায়েও তাঁর পশার খুব। তাঁর বাসার একদিকে মারোয়াড়িদের বাড়ী, অন্য দিকে দু'তিনটি গুজরাটি, ভাটিয়া বা বেহারীর বাড়ী। ডাক্তার বাবুর চিকিৎসার সূত্রে এই সব পরিবারের পুরুষদের সঙ্গে সাহচর্য্য ঘটেছে। কিন্তু সেটা বাইরে বাইরে। তাঁর গৃহিণী যদি নাসিকা কুঞ্চিত করে পরম ঔদাসীন্য-ভরে এই সব বিদেশিনীদের এড়িয়ে যান তাহ'লে চিরদিনই তাঁরা বাংলার হৃদয় সীমানার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন। কিন্তু কেনই বা তা ঘটবে? অতিথিদের অভ্যর্থনা করে গ্রহণ না করলে, অনাদরে দূরে সরিয়ে রাখলে, অতিথিদের এই অবমাননায় শুধু কি তাঁদেরই ক্ষতি, আমাদের কি কোন ক্ষতি নেই? আমরা এই যে দিনে দিনে পরশ্রীকাতর, পরমত অসহিষ্ণু, কূপমণ্ডূক, অসার অপদার্থ হয়ে পড়ছি। বিশ্বের দরবারে আজ বাঙালী সকল জায়গায় স্থান-চ্যুত হয়ে পড়ছে, তার বিরুদ্ধে মস্ত অভিযোগ — কারও সঙ্গে মিলে মিশে সে কাজ করতে পারে না। কোনও একটা বৃহৎ এবং মহৎ কার্য্যের জন্য ব্যক্তিগত মতবাদ বা বিশিষ্টতা অহমিকা বিসর্জ্জন করে কিছুতেই বিলুপ্ত করে দিতে পারে না। এ সবের নিরসন কি এই পথে হয় না? নানাদেশ সমাজের আসল কাজ নানাদেশবাসীর সংস্পর্শে এসে মনকে উদার করা, যেটা আজ আমাদের পক্ষে একান্তই প্রয়োজন; সে প্রয়োজন ঘরে বসে মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য আমরা করতে পারি অত্যন্ত অনায়াসভাবে, আমাদেরই প্রাত্যহিক জীবনের অসংখ্য করণীয় কাজের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে। সেটা কেন ক'রব না? আর এর মধ্যে করণীয় বোধ ছাড়া আনন্দেরও একটি বড় রকম অংশ নেই কি? প্রবাসিনীদের কণ্ঠের সুরে রবীন্দ্রনাথের সুমহান বাণী অন্তরের আবেগভরে প্রত্যক্ষ করে রয়েছে?

"সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ লব যুঝিয়া।
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই সন্ধান লব বুঝিয়া।
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়, তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া।"

এই বাণীকে ভাষা দিতে, এই প্রতীক্ষাকে সার্থক করতে আমাদের অবহিত হতে হবে।

নীল-লোহিত

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

এখানে নির্ম্মম সূর্য্য ঐশ্বর্য্য বিলায়।
কঠিন মৃত্যুর মুখোমুখী
আমরা র'য়েছি বহুকাল,
রাত্রি সাঙ্গ হ'লো যবে আজ প্রাণ চায়
বসন্তে শরতে
নির্ভীক যৌবনস্বপ্ন, অনিদ্রায় নব মায়াজাল।
মনে হয় অজস্র মৃত্যুর
অজস্র ভ্রুকুটি অতিক্রম
ক'রে আজ এসেছি সুন্দর
নীল নব আকাশের বাতাসের প্রভাতের শিখরচূড়ায়,
দেখালো যৌবন তার অজস্র বিক্রম,
নবীন প্রেমের স্বপ্ন কালের উদ্বেগে
আজ দেশে দেশে;
এখনো রাতের চাঁদ তালতমালের শিরে নয়ন জুড়ায়।
দুর্ব্বৃত্তের ষড়যন্ত্র আজ পরিষ্কার।
কদর্য্য কলুষ হাত রক্তলোলাতুর হীন ছিল একদিন,
নির্ম্মম যাদের করে
মাড়িয়েছি সেই হাত, দুর্ব্বলতে সে-হাত বিলীন।

আমাদের নিজের দেশে
চকোরের আস্বাদন প্রাণের সন্ধ্যায় মেশে,
দিগন্তের অরণ্যরেখায়
সর্ব্বক্ষণ সূর্য্য শুধু জ্বলে।
এখানে অশান্ত হাওয়া অবারিত মাঠে।
চৈত্রদিন অবসান, সূর্য্যকালে জলে
সোনালি আলোর সোনা, নীল নভস্তলে
অনিমেষ পথরেখা সুন্দর, নির্জ্জন,
তালতমালের সারি, অরণ্যশীর্ষে মন অবসন্ন উন্মন।

আমাদের নীড়ে-নীড়ে
কখনো কোয়েল ডাকে,
নির্জ্জন কুটীর মধ্যে পরিত্যক্ত, আয়োজনহীন
দুর্ভিক্ষ এসেছে দ্বারে, রোগে শোকে গেছে কাল ক্ষণ।
নির্ভীক যৌবনস্বপ্ন এসেছিল বারিবান প্রাচীন মিশরে
পড়েছে অনেক যত তারাদের আকাশের তলে,
হয়তো কাদের ঘর, দাম্ভিক পথের মূর্ত্তি বালুর উপরে
জয়স্তম্ভ, স্তূপকীর্ত্তি, বুক, সাম্রাজ্যের স্বপ্ন জিজ্ঞাসু জলে।
কালের যাত্রা যে নির্ম্মম —
জানে তাঁর কারাগার, তাকে দ্বিধা অক্ষয় বিক্রম।
ক্ষুদ্রকাল যুগান্তের গরিমা পাতায়,
আকাশে আবরণ অন্ধকারে আলো চেনা যায়
ভুলিতার বেড়া হ'তে ধারণকে মন
ছিঁড়েছে বন্ধন,
শ্রমিকের কূটনীতি ক্রমশ বিশ্লেষণ করে বণিক বুদ্ধিকে —
তারি ছায়া চোরাবাজারে, তারি ছায়া আজ এয়ালবাম,
নির্ভীক মুক্তির কোন সম্ভাবনা আসে দিকে-দিকে।

আমরা এখানে
দাঁড়িয়েছি দু'টি সভ্যতার
ঠিক মাঝখানে;
যারা জীর্ণ পুরাতন হ'লো পড়ে দূর অস্তাচলে,
অনেক বিষণ্ণ মৃত্যু নীচে, পদতলে,
কিন্তু এ উজ্জ্বল মৃত্যু
একদিন বড় পুরাতন
প্রমাণিত হবে;
সহস্র জীবনসুধা মৃত্যুকেও টেক ক'রে স্রোতের মতন
কানে কানে এসে কথা কবে।
নক্ষত্রকে দীর্ণ ক'রে রাত্রির আকাশে ওড়ে বিশাল বিমান,
বজ্রগর্জ্জ শব্দে তার ভেঙে যায় ঘুম,
উদ্ভ্রান্ত কিশোর রোমাঞ্চে
জ্বলে প্রাণ জ্বলে,
দিকে-দিকে পুড়ে' যায় রোমাঞ্চিত জনতার অঙ্গনে কুসুম।
ট্রামে, বাসে, ট্রেনে পথে প্রান্ত রেস্তোরায়
কর্ম্মব্যস্ত সংসারের ছবি,
জীবনের দুটি মন আশিত অশেষ যাত্রায়
বিশ্ব বাড়ো, কাল নিরবধি।
সাঁওতালী পাহাড় দূরে, দীর্ঘছায়া শালবনে
আকাশে আষাঢ় নামে, দোলা লাগে মনে।
কেবল কালের যারা নবতম বিবাহ বাসরে
কী বিহ্বল রোমাঞ্চ যে আনে;
যে-বিদেশী সৈন্য তার বাতায়ন ভেঙে এসে চৌরঙ্গীতে ঘোরে,
এমন কি তারো মন টানে।
প্রতিদিন সূর্য্য ওঠে, বা একালে পূর্ণিমার চাঁদের আলোক
ভরে' দেয় যাদের ক্লান্ত চোখ,
এ আলোকে অধিকার শ্রমিকের বণিকের কেরাণীর ক্লান্ত পরিবার;
এমন কি যে যুবক মেয়ে দেখে শিস দেয় পাশে,
যে কুড়ানী সুধা নিয়ে বসে,
সে-রূপ দূরের গ্রামে সন্ধ্যাকালে পূর্ব্বাকাশে দাবা খেলে বসে'
এ আলোকে তারো অধিকার।
বিশ্বের জীবন কিন্তু পারবাহী অচেতন বলদের মত
নিঃশব্দ উদাস,
চকিতে বদন এখন চোরকাঁটায় কাঁপে বেড়ে নষ্ট দীর্ঘশ্বাস।
অথচ মর্ম্মর একেবারে।
মৃদিত মর্ম্মে দিনে অক্ষয় মতো দিন যাপনের গ্লানি,
অশুভ করি বারে বারে
জলে, স্থলে অরণ্যের পল্লবাঞ্চলে
প্রতীক্ষায় আছে বর্ণমালি;
জীবনের বন্দরে আকাশের নীলিমায় বিশাল প্রান্তরে
পক্ষীর সমাবেশে, তৃণাঙ্কুরে কোকিলের স্বরে, —
নব প্রাণ স্ফুটিকান। তাই আজো একদিন পরে
আমরা মর্ম্মরিত একেবারে।
যেখানে পাখীর গান শুরু নয় অরণ্যশাখীরে
চকিত বসন্ত এলে
যেখানে রৌদ্রের আগে তপনের পলাশের ভিড়ে,
আমরা নির্ভয় হাতি সেইখানে দীর্ঘপ্রাণ যেলে, —
প্রাণের মশাল জ্বেলে
মৃত্যুর জঙ্গল কুড়ি
নতুন প্রবাহস্রোতে একত্রতা কুসুমের কুঁড়ি।

কল্পান্ত

[২৩০ পৃষ্ঠার পর]

দেখে ঠিক—মানে, ঠিক আমার মনে পড়েনি।

ঢাকা দেওয়া আলোটার নীচে এসে মহিলা দাঁড়িয়েছিলেন। সেই আলোয় হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নেবার সময় অমল লক্ষ্য ক'রে দেখলো, তাঁর পায়ে মুসলমানী সবুজ মখমলের স্লিপার এবং পায়ের নখগুলিতে রক্তরঙীন পালিশ।

তিনি বললেন, আমি এখনই বেরুবো খুব তাড়াতাড়ি—একটু বসতে পারো তুমি!—এই ব'লে তিনি হাতঘড়িতে সময় লক্ষ্য ক'রে পুনরায় বললেন, বাই-বাই, তোমাদের সব খবর কি? মা কেমন আছেন?

অমল বললে, আপনি ত' জানেন, আমার মা মারা গেছেন!

ও: সরি! তারপর? এদিকে কোথায়?

এবার ফল ক'রে অমল বললে, আপনি এখানে কেমন ক'রে এলেন, ছোড়দি?

ছোড়দিদি হেসে বললেন, এ যুদ্ধে সবই সম্ভব!

অল্প আলোতেও অমল লক্ষ্য ক'রে দেখলো, ছোড়দিদির ঠোঁটে ও গালে রং মাখানো, চোখে হাল্কা সুর্মা, ঘন চুলের রাশি থেকে চূর্ণ গুচ্ছ দুলছে। তাঁর এক হাতে ঘড়ি, অন্য হাতে সোনার সরু বালাটি ঝিকমিক করছে। অলঙ্কারে আর আভরণে তাঁর চেহারাটিতে একটি ধনবতী রাজপুতানীর ভাব এসেছে। শুধু চোখের কোণে সেই বাধ অমিতেজ। যেন মাঝে মাঝে বিপ্লবের বিদ্যুৎকান্তি ঝিকমিক করে উঠছে।

অমল নিজের মনের অবস্থা কতকটা সামলে নিয়ে বললে, সেই দেখা আপনার সঙ্গে···তারপর এই তিন বছর পেরিয়ে গেল···বোমাপড়া, দুর্ভিক্ষ, ভারত আক্রমণ, মহামারী···কত যে বদলে গেছে সব, ছোড়দি—

ছোড়দিদি চঞ্চলভাবে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন। মাথায় ঘোমটা তাঁর নেই, এলো খোঁপায় গাঁথা রয়েছে গোটা দুই আইভরির কাঁটা, দুই কানে তাঁর উজ্জ্বল দু'টি পাথর। দু'পা এগিয়ে তিন পা পিছিয়ে নিজের পিছন দিকটা একবার লক্ষ্য করে অন্যমনস্কভাবে অমলের কথা শুনছিলেন।

অমল বলতে লাগলো, কত যে খুঁজেছি আপনাকে···পথে ঘাটে, সেই বেলেঘাটার বাড়ীতে, আপনার শ্বশুরদের ওখানে—

উৎসাহ সহকারে আরো কিছু হয়ত অমল বলবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু ঘরের ভিতর কতকগুলি লোকের কোলাহলের মাঝখান থেকে হঠাৎ পরুষ কণ্ঠের ডাক এলো, মিসেস রয়—?

থাক—ব'লে ছোড়দিদি অমলকে বাধা দিয়ে থামালেন। তারপর পর্দার ফাঁকে ঘরের ভিতরে তাকিয়ে সহাস্যে নিজের অধর সংযম করে বললেন, ইয়া···just coming,···little formalities···

তারপর মুখ ফিরিয়ে গলা নামিয়ে বললেন, হ্যাঁ···কি যেন নামটা তোমার···ভুলে যাই! হাঁ আর একদিন তুমি আসতে পারো,—আর অবিশ্যি এইত দেখা হয়ে গেল। তাছাড়া সাহেবরা থাকে এখানে,—ওসব পুরনো আলোচনা এখানে না করাই ভালো—

এমন সময়ে সেই শিখ অফিসারটি বেরিয়ে এলেন। বললেন, ইয়েস? উচ্ছ্বসিত উৎসাহে ছোড়দিদি সেই ভদ্রলোকের হাতখানা ধরলেন। বললেন, ইনিই মেজর সিং··· my great friend indeed। হাঁ, তুমি বোধ হয় একটা চাকরি চাইতে এসেছিলে, না?

অমল কি যেন বলবার চেষ্টা করতে গিয়ে তার গলায় আটকে গেল। ছোড়দিদি তার মুখের দিকে তাকিয়ে পুনরায় বললেন, হাঁ, মানে—কিছু বলতে হবেনা, বুঝে নিয়েছি—তুমি খুব needy! কতকগুলো চাকরি আমি করে দিয়েছি কতকগুলো ছেলেমেয়ের···অবিশ্যি দু'টো চারটে এখনও হাতে আছে—

অমল বললে, না, আমি চাকরি চাইনে ছোড়দি!

চাওনা?—ছোড়দিদি বললেন, I see. সেই ভালো,—দু'শো একশো টাকার চাকরি আজকাল লজ্জার কথা,—আচ্ছা, চিয়ারো।

অমল কিছু বলবার আগেই মেজর সিং সহাস্য আতিশয্যে ছোড়দির একখানি নগ্ন-বাহু জড়িয়ে ধরে ভিতরে নিয়ে গেলেন। পর্দার ওপারে মস্ত টেবলের ভোজনের আসরে তখন মোটা ও মিহি গলার অনেকগুলি হাসি গলগলিয়ে উপচিয়ে পড়ছে।

অমল পাথর নয় যে চলৎশক্তিহীন। সে মানুষ, তাই এক সময়ে মনে উঠে সিঁড়িটা খুঁজে নেমে আসছিল। সহসা নীচের তলায় শোনা গেল কলোচ্ছ্বসিত হাসির আওয়াজ। অমল ঠাহর করে দেখলো টুনু উপরদিকে উঠে আসছে,—তার সঙ্গে একটি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান যুবক। অমল বড় সিঁড়িটার একপাশে সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়ালো।

টুনুর পরণে মিহি জর্জেটের শাড়ী, গায়ে ঝলমলে সাটিনের জামা,—কিন্তু পিঠের দিকে সেই জামার আব্রুটা নেই,—মাঝখানটা নগ্ন। টুনুর চুলগুলি তাম্রবর্ণে পরিণত, মুখখানা টয়লেট করা,—সমস্ত সিঁড়িটায় রূপের গৌরব ছড়িয়ে সে উঠে আসছিল,—আর সেই তরুণটি ছুটে আসছে তাকে ধরে ফেলবার জন্য। যৌবনের জয়োৎসবে ভরা দু'টি মুখ।

সহসা টুনু দাঁড়ালো। নিয়ন্ত্রিত আলোর আভায় অমলকে দেখে বললে, হ্যাল-লো?

অমল স্মিতমুখে বললে, চিনতে পারছ টুনু?

টুনু বললে, ও ইয়েস···তুমি অমলদা—

ছি, আমি দাদা নই টুনু, আমি তোমার মামা।

ঘন তীব্র হাসি হেসে টুনু বললে, না না, কেউ নয় তুমি···তবু কী মিষ্টি তুমি··· sweet eternally!—এই বলে সে তাড়াতাড়ি তার নীরব হাতখানা বাড়িয়ে অমলের একখানা খস্‌খসে হাত টেনে নিয়ে ঝাঁকুনি দিল।

অমল বললে, আর আমার কোনো দুশ্চিন্তা নেই টুনু, তোমাদের দেখে খুশী হয়ে গেলুম।

টুনু বললে, মায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে?

সাহেব ছোকরাটি হাসিমুখে বললে, I think she is very busy—eh?

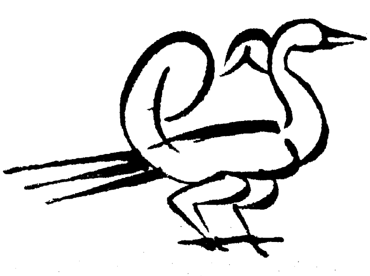
এক রাশি হাসিতে টুনু সিঁড়িটা ভরিয়ে দিল। বললে, মায়ের একটুও সময় নেই আজকাল। Come on John.

সোরগোল তুলে আবার টুনু ও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান তরুণটি দ্রুতগতিতে উপরে উঠে গেল। একটা খসখসে বাসি মিহি সুগন্ধ বাতাসটাকে ভরিয়ে দিল।

ওরা ভালো আছে, সুখে ও আনন্দে আছে,—আর কোনদিন ওদের সংবাদ নিতে হবেনা,—এমনি একটা অদ্ভুত স্বস্তিবোধ নিয়ে অমল সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলে গেল। অভিমান, ক্ষোভ, চিত্তবিকার—কিছু নেই তার। সে যেন এই তাণ্ডবকে সহজে স্বীকার ক'রে নিতে পারে, তা'র বুকের কোণ থেকে যেন কোনো প্রকার আর্ত প্রতিবাদ না ওঠে।

কিন্তু পথে নেমে এসে অমল কেমন যেন নিরুপায়ের মতো এলোমেলো হাঁটতে লাগলো। তা'র কোন্ পথ—সে ভুলে গেছে! ওদিকে, না এদিকে? ঘোর অন্ধকার রাত চারিদিকে,—আড়ষ্ট শ্রীহীন, ভয়ভীত, শীতার্ত অন্ধকার। কিন্তু এই অন্ধকার থেকে মুক্তি কবে হবে? এর মধ্যে সত্য কোথা? আলো কই?

তা'র হৃদপিণ্ড থেকে আবার সেই কুণ্ডলীকৃত মৃত্যু যেন উঠে এলো তা'র গলার কাছে—এবার অমল আর সামলাতে পারলো না। কালপ্রহরীর মতো সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোহার একটা টেলিগ্রাফ পোষ্ট। সেইটাকে দুই হাতে ধ'রে তা'র তুহীনশীতল গায়ে মাথা রেখে সহসা অমলের চোখে ঝরঝরিয়ে জল এলো। তারপর একসময়ে সে যেন বর্তমান যুগান্তরের সর্বনাশা বীভৎসতার মাঝখান থেকে মুখ তুলে কম্পিতকণ্ঠে বলতে চাইল, অনেক গেল, আমাদের অনেক গেল এ যুদ্ধে···কত যে ধ্বংস, কত মহত্তের যে সর্বনাশ··· তোমাকে আমরা বোঝাতে পারবোনা।



নিরাপত্তা, প্রতিষ্ঠা ও জন-সেবার জন্য

বেঙ্গল মেট্রোপলিটন

ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস :—৩ নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা।
শাখা অফিস :—ঢাকা, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, বহরমপুর (বেঙ্গল) ও বড়বাজার (কলিকাতা)।

অভিমত

কৃষ্ণনগর নূতন গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে সভায়
ইষ্টবেঙ্গল সোসাইটীর অন্যতম স্বত্বাধিকারী
শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মোদক মহাশয়ের বাণী :—
"সততার সহিত পরিচালিত হইলে কোন ব্যাঙ্কই নষ্ট হইতে পারে না। এই ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলীর সততার উপর আমার বিশেষ আস্থা আছে। আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, এই ব্যাঙ্কের উন্নতি সুনিশ্চিত।

:: :: ::

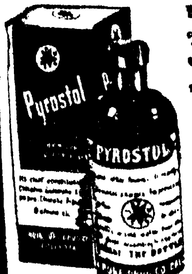
বহরমপুর (বেঙ্গল) শাখার উদ্বোধন উপলক্ষে
শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এ্যাডভোকেট মহাশয়ের অভিভাষণ :—
"আমি এই ব্যাঙ্কের পরিচালকবর্গের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত। আমি একনিষ্ঠ এবং অভিজ্ঞ কর্ণধারা এই ব্যাঙ্ক পরিচালিত হইতেছে। আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, আপনারা নির্ভয়ে এই ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিতে পারেন।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত কার্য্য করা হয়।

জেনারেল ম্যানেজার : এম. সি. বাদুড়ী

পাইরোষ্টল

ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য জ্বরের একমাত্র নির্ভরযোগ্য মহৌষধ



দুই শিশি সেবনে পুনরাক্রমণের ভয় থাকে না। ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত।

মূল্য : প্রতি ৪ আঃ শিশি ৩।০। (ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)। পত্র লিখিলে বিবরণী পুস্তিকা পাঠান হয়।

ইণ্ডিয়া পিওর ড্রাগ কোং

সিটি অফিস :
১৩, ডেভিড জোসেফ লেন,
কলিকাতা।

নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :
১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

ফোন :
ক্যালঃ ৩২৫৩
(৩টি লাইন)

বোর্ড অব ডাইরেক্টর্স

মিঃ এস্, কে, রায়
মিঃ পুলিনকৃষ্ণ রায়
মিঃ জগন্নাথ কোলে
মিঃ পি, ডি, হিম্মৎশিঙ্কা
মিঃ জি, ভি, সোয়াইকা
মিঃ ডি, পি, দাশগুপ্ত

কে, এন, দালাল, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

অফিসসমূহ :

কলিকাতা অঞ্চল—শ্যামবাজার, হাতিবাগান, বালীগঞ্জ, লেক মার্কেট বড়বাজার, বহুবাজার, ভবানীপুর, হ্যারিসন রোড, হাওড়া।

বাঙ্গলা অঞ্চল—নোয়াখালী, চৌমুহনী, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, ঢাকা নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর (পুরাণবাজার) কুষ্টিয়া।

যুক্তপ্রদেশ অঞ্চল—দিল্লী, নয়াদিল্লী লক্ষ্ণৌ, কানপুর, মেষ্টন রোড (কানপুর)।

বিহার অঞ্চল—পাটনা, পাটনাসিটি, জামসেদপুর, লাহচী, চাইবাসা, ঝড়িয়া, মজঃফরপুর ভাগলপুর, গয়া।

আসাম অঞ্চল—গৌহাটি ধুবড়ী, তেজপুর, শিলং, নওগাঁ।

বোম্বাই অঞ্চল—বোম্বাই।

জাপান যুদ্ধে নামিল কেন?

[২২৮ পৃষ্ঠার পর]

তথাপি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মার্কিণ গণতান্ত্রিক মহিমার উপর নির্ভর করিয়া আলোচনার ভিত্তি হিসাবে ৪টি মূলনীতির উপর জোর দিলেন, যথা—

(১) সমস্ত জাতির পূর্ণ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও ভূমিখণ্ডের অখণ্ডতার অধিকার এবং সেই অধিকার ভঙ্গ না করার নীতি স্বীকার করা, (২) অপর দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায় কোন হস্তক্ষেপ না করা, (৩) সকলের সমান অধিকার—ব্যবসায়গত ও আচরণের সমান অধিকার স্বীকার করা, (৪) বিরোধের ক্ষেত্রে শান্তিজনক উপায়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও আপোষের দ্বারা মীমাংসার নীতি মানিয়া চলা। কিন্তু এই মূলনীতিগুলি জাপান মানিতে পারিল না, আলোচনার নাম করিয়া কেবল সময় হরণ করিল মাত্র। অথচ জাপানের বিরুদ্ধে মার্কিণ গভর্ণমেন্টের অভিযোগের অন্ত ছিল না। ১৯৩৭ সালের ৭ই জুলাই (চীন-জাপান যুদ্ধারম্ভের তারিখ) হইতে ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত মাঞ্চুরিয়া ও চীন মহাদেশের সর্বত্র জাপান আমেরিকার স্বার্থ যেভাবে নষ্ট করিয়াছে, একমাত্র সেই কারণেই উভয় দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট আপোষ-আলোচনার দ্বারা সমস্ত বিরোধ মিটাইতে চাহিয়াছিলেন। এই নিষ্ফল কথাবার্তা অকস্মাৎ জুলাই মাসে (১৯৪১) বন্ধ হইয়া গেল। কারণ ২৩শে তারিখ ফ্রান্সের ভিসি গভর্ণমেণ্ট জানাইলেন যে, জাপান ফরাসী ইন্দোচীনের ঘাটিগুলি দখল করিতেছে এবং সেখানে সৈন্য ও সমরোপকরণ পাঠাইতেছে। সুতরাং আপোষ আলোচনা বন্ধ হইল। অথচ বিস্ময়ের কথা এই যে, তখন পর্য্যন্ত (২ বৎসর ধরিয়া) জাপানকে পেট্রোল সরবরাহ করা হইতেছিল। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বলিলেন যে, তাহা না করিলে জাপান এক বৎসর আগেই ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ করিয়া বসিত। সাম্রাজ্যবাদীয় নীতির আত্মরক্ষার চেষ্টা অদ্ভুত বটে!

এদিকে ঘড়ির কাঁটা 'শূন্য লগ্নে'র দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ২৫শে জুলাই বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিলেন যে, জাপানীদের ইন্দো-চীনে প্রবেশের জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র জাপানীদের ধন-সম্পত্তি আটক করার (Freeze) আদেশ দেওয়া হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ডোমিনিয়নসমূহ এবং ওলন্দাজ গভর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শক্রমেই ইহা করা হইয়াছে। পরদিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টও অনুরূপ এক আদেশ জারি করিয়া আমেরিকায় জাপানী ধন-সম্পত্তি আটক করিলেন কিন্তু আগষ্ট মাসে জাপানী গভর্ণমেণ্টের সনির্বন্ধ অনুরোধে আবার মার্কিণ গভর্ণমেণ্টের সহিত আপোষ আলোচনা সুরু হইল—চারিমাসের অধিক কাল, ৭ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই আলোচনা চলিল। কিন্তু ধন-সম্পত্তি আটক করিয়া আপোষ-আলোচনার অর্থ নিশ্চিত যুদ্ধের তারিখটাকে কিছু পিছাইয়া দেওয়া। ২৬শে অক্টোবর প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আপোষের সর্ত হিসাবে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা দ্বারাও যুদ্ধ নিবারিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কারণ, তিনি বলিলেন যে, জাপানকে তৈল সরবরাহ করা হইবে এবং ধন-সম্পত্তি আটকের আদেশও প্রত্যাহার করা হইবে। কিন্তু উহার সর্ত এই যে, চীন হইতে সমস্ত জাপানী সৈন্য প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং জেনারেল চিয়াং কাইশেক ছাড়া আর কোন গভর্ণমেণ্টকে সমর্থন করা চলিবে না। অর্থাৎ ইহা দ্বারা অবিলম্বে জাপানকে জেনারেল চিয়াং কাইশেক ও প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের নিকট বিনা যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করিতে হইত। নিশ্চিতরূপে ইহা জাপানী সাম্রাজ্যনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। জুলাই মাসে জাপানী ধন-সম্পত্তি আটকের উপর মন্তব্য করিয়া ক্যাপ্টেন লীডেল হার্ট বলিতেছেন—"These decisions made war certain on any rational calculation' এবং অক্টোবর মাসে রুজভেল্টের আপোষ সর্ত্তের সমালোচনা করিয়া তিনি বলিতেছেন, "The certainty of war was sealed by the conditions, which President Roosevelt stipulated on Oct. 26th ·····It was beyond any reasonable expectation that Japan would submit to such a complete 'loss of face'—ইহা বৃটেনেরই সাধারণ্যে রণপণ্ডিতের অভিমত। জুলাই হইতে ডিসেম্বর মাসের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর স্রোত অনিবার্য্যরূপে যুদ্ধের দিকেই যাইতেছিল। ৬ই আগষ্ট বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব জাপানকে সমকাইয়া বলিলেন, থাইল্যাণ্ডে হস্তক্ষেপ করিলে ভাল হইবে না। ৩০শে আগষ্ট বৃটিশ প্রজাদিগকে জাপান ত্যাগ করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেপ্টেম্বর মাসে জাপানী সংবাদপত্রসমূহ রাশিয়ার সহিত যুদ্ধ মিটাইয়া ফেলিবার জন্য জাপানীকে পরামর্শ দেয়, 'কারণ, বৃটেনের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে।' ১৭ই অক্টোবর বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট পুনরায় বর্ম্মা রোড খুলিবার আদেশ দেন এবং ঐ তারিখেই জেনারেল তোজো প্রধান মন্ত্রী ও সমর-সচিবের পদ গ্রহণ করেন। ১১ই নভেম্বর মিঃ চার্চিল ঘোষণা করেন যে, যে কোন মুহূর্তে জাপানের সহিত যুদ্ধ বাধিতে পারে। ১৩ই নভেম্বর ৬০ হাজার জাপ সৈন্য ইন্দো-চীনের উত্তরে সমবেত হয় এবং সাইগন ও হ্যানোইতে দলে দলে নূতন সৈন্য আসিতে থাকে। ১৬ই নভেম্বর কানাডীয় সৈন্যেরা হংকংয়ে পৌঁছে। ৩০শে নভেম্বর জাপানী নৌবহরকে জাপানের দক্ষিণবর্ত্তী দ্বীপসমূহের দিকে অগ্রসর হইতে দেখা যায়। ২রা ডিসেম্বর 'প্রিন্স অব ওয়েলস' এবং 'রিপালস্' সিঙ্গাপুরে পৌঁছে এবং ৭ই ডিসেম্বর সকালবেলা অকস্মাৎ জাপানী বিমানবহর ও সাবমেরিণ পার্ল হারবার আক্রমণ করে—বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে জাপান যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল।

রাজ্য ও বাণিজ্যগত যে মূলনীতির বিরোধ জাপান, আমেরিকা ও বৃটেনের মধ্যে ছিল, উহার কোন আপোষ মীমাংসা সম্ভব ছিল না। তথাপি জাপান যে আলোচনা চালাইতেছিল, ইহাও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ছিল মাত্র। ১৯০৪ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধের আগেও ৫ মাস ধরিয়া জাপানী গভর্ণমেণ্ট জারের রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনা চালাইয়াছিলেন এবং ৬ই ফেব্রুয়ারী সেই আলোচনা শেষ করিবার সময় জাপানীদের ধারণা হইল যে, আর কথাবার্ত্তা চালাইয়া লাভ নাই। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে পার্ল হারবারের উপর আক্রমণের আগেও চারি মাস (নূতন পর্য্যায়ে) ধরিয়া জাপান আমেরিকার সহিত আলোচনা চালাইয়াছিল। ২৬শে নভেম্বর তাহারা বুঝিতে পারেন যে, 'ভাঙ্গা কাঁচ আর জোড়া লাগিবার আশা নাই'! দেখা যাইতেছে যে, একই ইতিহাস ও কৌশলের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। তবে, ১৯০৪ সাল ও ১৯৪১ সালের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পোর্ট আর্থার আক্রমণে টর্পেডো বোট ব্যবহৃত হইয়াছিল আর পার্ল হারবারের বেলা ব্যবহৃত হইয়াছে টর্পেডো-বোমারু। ক্যাপ্টেন লীডেল হার্টের ভাষায় মধ্যে সমসাময়িক শক্তিবর্গের যুদ্ধ মাত্রায় যান্ত্রিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বটে কিন্তু মানসিক অবস্থা একই রহিয়া গিয়াছে।

ঘাটে

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকী

দূরের পথিক হিয়াতে রয়েছে জীয়ে
পারের তরণী ঘাটের কিনারে বাঁধা।
মাঝি নাই, তাই কে খুলিবে বল তারে?
আকাশেতে মেঘ নিকষ কালায় বাঁধা।
মাঠের আশা মাঠে মরিছে কেঁদে।
মানস করে তীর বেদনা দিয়ে।
বয়ে চলে যায় চাকতে দিনের বেলা।
কখন্ ভাসিবে সাগরের বুকে ভেলা?



ভারতীয় নৃত্য বিজ্ঞান

নৃত্যশিল্পী নরনারায়ন

বর্তমানে প্রগতিশীল রঙ্গমঞ্চে আধুনিক রীতিতে বহু বিভিন্ন প্রকারের ও স্তরের নৃত্যকলা অভিনীত হইয়া আসিতেছে, শ্রম ও সমালোচনারও অভাব নাই। মোটামুটিভাবে বিচার করিতে গেলে বলিতে হয় যে, শিল্পগুরুগণের চিত্তাকর্ষণ নিমিত্ত সাধারণতঃ রুচি-সম্মত পরিচালিত নৃত্যাভিনয়ের অবতারণা করা হয়, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই; কিন্তু উক্ত পরিচালনায় বর্তমান অর্থনীতি চালিত বাজারে উচ্চাঙ্গ নৃত্যের কলার কতদূর উন্নতিসাধন হইবে এ বিষয়ে অবশ্য একটু মতামতের প্রয়োজন। ভারতীয় নৃত্যশিল্পী ইদানীং রঙ্গক্ষেত্রে নৃত্যাভিনয় আসরে অন্যান্য বৈদেশিক শিল্পীর সহিত এখনও উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। ইহার কারণ ভারতীয় নৃত্য-ভাব-ভঙ্গীর সহিত জাতীয় ভাবভঙ্গীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আমরা আর্যজাতীয়, আর্য্যাবর্ত্ত ইত্যাদি বলিয়া গৌরব করিতাম, আর্য্যধর্ম্ম, কলার রক্ষিতে অভিলাষী হইতাম, কিন্তু এখন ক্রমশঃ এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, ভারতীয় নৃত্যের রূপ বিলুপ্ত হয় ইহাই যেন আমাদের একান্ত ইচ্ছা! ইহার গূঢ় মর্ম্ম এই যে, বৈদেশিক ভাবধারায় আজকাল সুপণ্ডিত হইয়া ভারতীয় নৃত্য-বিজ্ঞানের আসল রূপ—তাহা জানাভাবহেতু যথেচ্ছ অবস্থায় ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। অর্থাৎ রঙ্গালয়ে নৃত্য অভিনয় বাজারের পক্ষে যথেষ্ট; এই রূপই যেন এখন আমাদের মনোভাব।

ভারতীয় সূক্ষ্ম শিল্প এবং অর্থনীতি চালিত শিল্প অধুনা আংশিক কৃতকার্য্যতা লাভ করিতেছে—কিন্তু কখনও শিল্পকে মেরে কখনও পৃষ্ঠপোষককে মেরে, এইরূপ অনেক ক্ষেত্রে শিল্প এমন একটি পর্য্যায়ে উপস্থিত হয়, যখন নৃত্যাভিনয় ব্যাপারটি শিল্পগুরুগণের নিকট বিষপাত্রের মত পরিত্যাজ্য হয়। কারণ নৃত্যাভিনয়ের ব্যাপারটি উন্নত সমাজ ও ধনীর অর্থ সূক্ষ্মশিল্পের (Fine art) ভাবধারার স্রোতে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু ঐ উচ্চাঙ্গ-দলের নাটকের অবতারণা করিতে গিয়া প্রযোজক ও শিল্পী অর্থাকাঙ্ক্ষার স্রোতে নিপতিত হইয়া মঞ্চালয় হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া থাকে। সুতরাং সত্যকার ভারতীয় নৃত্যবিজ্ঞানের ক্রিয়া-কলাপের তত্ত্ব অবগত হইতে তাহারা পারে না।

ভারতীয় নৃত্যশিল্পী, প্রযোজক ও শিল্পগুরুগণের যোগাযোগ ও সম্মেলন থাকা দরকার এবং একাধারে শিল্প, অর্থসাহায্য এবং পৃষ্ঠপোষকতা—এই বিষয়বস্তুর সমাবেশের সাহায্য লইয়া ভারতীয় নৃত্যাভিনয়ে সুযোগ সন্ধান করিতে পারিলে আংশিক কৃতকার্য্যতা হইতে পারে।

কতিপয় বিদেশ প্রত্যাগত এবং দেশীয় নৃত্যশিল্পীর চেষ্টায় ভারতীয় প্রাচীন নৃত্যকৃষ্টির দ্বারা বর্তমান রঙ্গমঞ্চে অভিনয় প্রদর্শন করিতে দেখা যায়, যথা—আর্য্যযুগের পৌরাণিক সুরাসুর ও শ্রীকৃষ্ণলীলা, বৌদ্ধযুগীয় (After Ajanta style), বাদশাহী (দরবারী মুজরা) এবং বর্তমানে একাধারে

লুপ্ত যে সকল নৃত্যকলা—কথাকলি মণিপুর, ছৌ পোয়ে ইত্যাদি যাহা বিশেষ বিশেষ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া থাকে, এই প্রকারের নৃত্যকলা সুচেষ্টার ফলে আংশিক কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহার ক্ষীণ জীবন-শিখা সপ্তাহকাল অভিনয়ের পরেই নির্ব্বাপিত হইয়া থাকে।

এই সব কারণে শিল্পী, প্রযোজক ও নৃত্যানুরাগী—ইহাদের আত্মবিশ্বাস সত্যসমস্যায় পরিণত হয় এবং বহুক্ষেত্রেই একে অন্যের অসমর্থতা উপলব্ধি করিয়া ভারতীয় নৃত্যকলা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া থাকে। ইহারা কেহই উপলব্ধি করিতে পারে না যে, আধুনিক বিদেশী কৃষ্টি সমর্পিত ভাবধারা দেশীয় রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতে যাইয়া একটি ভাববিহীন আড়ম্বরযুক্ত পরিচালনায় পরিণত হয়। এই সকল অভিনয়ে commercial art রঙ্গমঞ্চে প্রযোজকের misadventure ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এই সমস্যায় বর্ত্তমানে আমার আলোচ্য বিষয় এই যে, খাঁটি ভারতীয় নৃত্য-বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষণ কি, তাহা জানা আবশ্যক। ভারতীয় নৃত্যবিজ্ঞান ক্রিয়া-কলাপ উপযুক্ত ওস্তাদের কাছে শিক্ষা করিতে হইবে।

নাট্যশাস্ত্রে ৪র্থ অধ্যায়ে ২৩০ শ্লোকে পাওয়া যায় :—

দক্ষযজ্ঞে বিনিহতে সন্ধ্যাকালে মহেশ্বর।
নানাঙ্গহারৈর্নৃত্যতি লয়তালবশানুগঃ॥

এবং কূর্ম্ম পুরাণে পাওয়া যায়, নরনারায়ণ ঋষির আশ্রমে যোগতত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া শিব বলিয়াছেন,—

যোঽহং প্রেরয়িতা দেব পরমানন্দ মাশ্রিতঃ।
নৃত্যামি যোগী সততং যস্তদ্বেদ স যোগবিৎ॥

উপনিষদগীতায় নৃত্যবিজ্ঞানের ছন্দ ও তালের আর একটি রহস্য পাওয়া যায়—চতুর্ব্বেদ হইতে অর্দ্ধনারীশ্বর একটি বিন্দু যোগিগণের দৃষ্টিগোচর হয়—আবার ঐ বিন্দুটি ফুটিয়া দুইটি বিন্দু প্রকাশ হয়, দুইটি বিন্দুই নাচিতে থাকে, (দুইটী বিন্দুরই কম্পন) পুরুষের কম্পন বড় অধিক দেখাইল বলিয়া তাহার নাম হইল তাণ্ডব, আর প্রকৃতির কম্পন ধরিতে পারা গেল না বলিয়া তাহার নাম হইল লাস্য, তাই তাণ্ডবের "তা" আর লাস্যের "ল" মিলাইয়া শব্দ হইল তাল। অপর নাদের গর্ভ এই প্রকৃতি দেবীর তালে তালে পা ফেলিয়া যে বাঞ্ছন মিলন হয় তাকেই ছন্দ বলে। এই ছন্দ আবার হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত উচ্চারণের লঘুগুরু ভঙ্গিমায় সাতস্বরে শোনা যায়



শ্রীমতী পূরবী

ইহাই উপনিষদগীতাশাস্ত্রে ছন্দ বলিয়া কথিত হয়।

নৃত্য-বিজ্ঞান সুতরাং আনন্দ রসাত্মক—এই আনন্দ রসাত্মক জগতে পরমানন্দ লাভ ও উপকার সাধিত হয় ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা, নতুবা ইহাতে আমার মহাকবিত্বের পরিচয় আছে বলিয়া নহে।

পুনশ্চ শ্রীভরতকৃত নাট্যশাস্ত্রে বিবিধ ছন্দোবদ্ধ কতগুলি সংস্কৃত কবিতাতে নৃত্যানুষ্ঠানের বিষয় সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছে, তাহাই আর্য্যঋষিগণের তপোবননৃত্য বলিয়া কথিত হয়।

ভারতীয় নৃত্যশাস্ত্রমতে যদি ঠিক ঠিক ক্রিয়াকলাপ যথাযথভাবে পালন করা যায়, তবে আমার এইটুকু বিশ্বাস আছে, সেই শক্তিবলে ইহার স্বরূপের বিকাশ হইবেই।

নৃত্য বিজ্ঞানের শিক্ষার নিয়ম যৎকিঞ্চিৎ দেওয়া হইল।

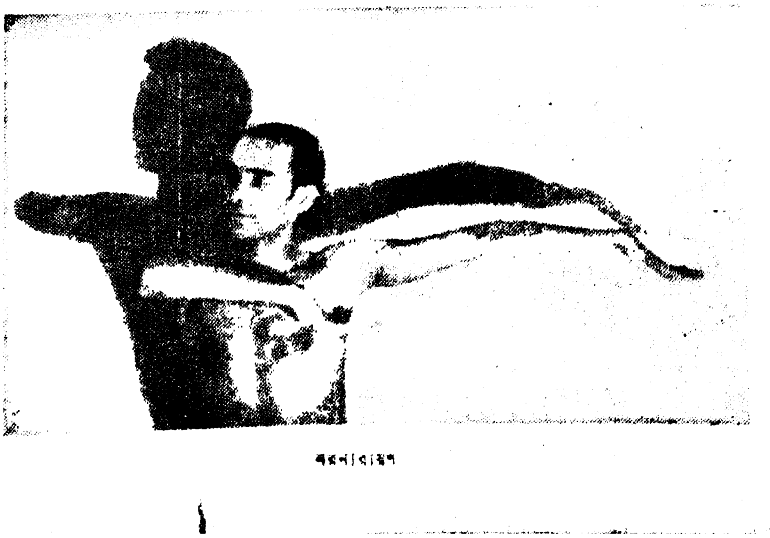
১। ছন্দঃ তাল-লয়-মান যুক্ত অঙ্গ-লহরীকে ছন্দঃ বলে, তাহার মধ্যে অনুষ্টুপ একটি ছন্দঃ। ছন্দঃ সাহায্যেই মন ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে।

২। করণ :—১০৮ প্রকার। অঙ্গহার ভঙ্গিমা। এই ১০৮ প্রকার করণ হইতে আবার হাজার হাজার ভঙ্গিমা প্রকাশ করা যায়। একটি অতি গোপনীয় স্থানে এই সব করণ ও অঙ্গহারের ক্রিয়াকলাপ শিক্ষা করিতে হয়। কি করিতেছি, কোথায় ইহা করিতেছি কাহাকেও ইহা জানাইতে নাই।

৩। মুদ্রা :—হস্ত ও অঙ্গুলি সাহায্যে মুদ্রা প্রকাশ হয়। যেমন—পতাকা, অর্দ্ধপতাকা, ত্রিপতাকা, সূচীমুখ, কপিত্থক, পদ্ম, সন্দংশিকা ইত্যাদি আরো বহুবিধ এই প্রকার মুদ্রা আছে। আর একপ্রকার মুদ্রা আছে তাহা নৃত্য শিক্ষার্থীদের বিশেষ প্রয়োজন হয়। যথা: মহামুদ্রা অশ্বিনী মুদ্রা। (যোগশাস্ত্র অনুসারে) ক্রিয়া করিতে হয়। হস্ত-পদ ইত্যাদির অশ্বিনী মুদ্রা করিলে বায়ু, পিত্ত, কফ ইত্যাদি উপশম হয় এবং শরীরের অস্থি সকল রবারের মত কোমল হয়। শরীরের গ্লানি নষ্ট হইয়া শরীরের একটি সুন্দর ভাব পরিস্ফুটিত হইয়া থাকে।

একটি কথা, কেহ এমন বলিতে পারেন নৃত্য আবার শাস্ত্র। এই বা কোন কথা,—কিন্তু শাস্ত্র মানিতে হইবে বলিতে হইবে দেবাদিদেব শিব এই নৃত্যের আদিগুরু, আমাদের মানব চরিত্রে সাধিকগত অভিজ্ঞতায় কাল্পনিক রূপক মাত্র হইতে পারে, কিন্তু শাস্ত্র মানিয়া চলিলে হিন্দুর নিকট ইহা কঠিন নহে।

আর দুই একটি কথা লিখিয়া উপসংহার শেষ করিব। রঙ্গালয়ে নৃত্য বাঙ্গলার পক্ষে যথেষ্ট নহে। শিল্পী যতই দক্ষ হউক এবং প্রযোজক যতই অভিজ্ঞ হউক না কেন, যতক্ষণ না পরিক্রম্য শিক্ষাপ্রার্থীর নিকট শিক্ষার্থ থাকে, ততক্ষণ শিক্ষা নৃত্যবিজ্ঞানে একটি স্থান হইতে একটি



নরনারায়ণ

সয়াবীন

খাদ্য ও শিল্পে



শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

খাদ্যে—

সয়াবীন শস্যটির সম্বন্ধে গত কয়েক বৎসরে নানা পত্রিকায়, বক্তৃতায় ও আলোচনায় সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করবার চেষ্টা হয়েছে। খাদ্য-সমস্যায় ও অপুষ্টিজনিত নানা ব্যাধিতে, সয়াবীনের ব্যবহারে আমরা অল্প খরচে অনেকটা পুষ্টি সংগ্রহ করতে পারি। এই পুষ্টি সংগ্রহ আজ আমাদের জাতীয় স্বাস্থ্যের পক্ষে ও জাতির উন্নতির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

সয়াবীন থেকে আমরা দুধের অনুরূপ প্রোটিন—শতকরা প্রায় ৫ ভাগ; ফ্যাট—প্রায় ২০ ভাগ; লবণাদি—প্রায় ৫ ভাগ ও ভিটামিন এ, বি, ডি, ই, যথেষ্ট পরিমাণে পাই। কার্বোহাইড্রেট আমাদের সাধারণ খাদ্যের অধিকাংশই, সুতরাং তার জন্য দুশ্চিন্তা নেই। বরং শ্বেতসার না থাকায়, সয়াবীন ব্যবহার করলে অল্প খরচে আমরা অনেকটা খাদ্যপুষ্টির সংস্থান করতে পারি।

সয়াবীনের খাদ্যমূল্য এই:—সয়াবীন জলীয় অংশ—৮'১, প্রোটিন—৪৩'২, ফ্যাট (ইথার এক্সট্রাক্ট)—১৯'৫, লবণাদি—৪'৬, আঁশ ইত্যাদি—৩'৭, কার্বোহাইড্রেট ২০'৯, ক্যালশিয়াম—০'২৪, ফসফরাস—০'৬৯, আয়রণ—১১'৫, ক্যারোটিন (আন্তর্জাতিক ভিটামিন ও ইউনিট ১০০ গ্রামে) ৭১০, ভিটামিন বি (আন্তর্জাতিক ইউনিট প্রতি ১০০ গ্রামে) ৩০০, ১ পাউণ্ডে মোট ক্যালরি—১৯৬৮, ১ পাউণ্ডের বর্তমান মূল্য ৩ আনা।

এই থেকেই সহজে দেখা যায়, আর্থিক প্রশ্নই সব সময়ে খাদ্য-সংস্কারের একমাত্র অন্তরায় নয়; সুতরাং আমরা অভ্যাসের গোঁড়ামী থেকে, বুদ্ধিসম্মত উপায় কেন গ্রহণ কোরব না, তার কোন কারণ নেই। চিনাবাদামও সস্তায় ভাল জিনিষ তবে তার প্রোটিন ও ফ্যাট, সয়াবীনের থেকে নিকৃষ্ট শ্রেণীর এবং 'পরিপাচ্যতা'ও অত বেশী নয়।

আপাততঃ অনভ্যস্ত রসনার পক্ষে অল্পাংশে খাদ্য-সহযোগী হিসাবে সয়াবীনের ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু, সয়াবীনে স্বভাবতঃ অল্প একটু তিক্তভাব ও একটি বিশেষ গন্ধ আছে, দুর্গন্ধ বললেই যার অনেকটা বলা হয়। তার জন্যে অনভ্যস্তর পক্ষে 'পরিবর্তিত সয়াবীন' ব্যবহার করা সহজ। এর পরিপাচ্যতাগুণও কাঁচা সয়াবীন থেকে বেশী। বাজারে নানা পেটেণ্ট নামে সয়াবীনের ঐরূপ 'পরিবর্তিত চূর্ণ' কিনতে পাওয়া যায়। ডাল হিসাবে সয়াবীন ব্যবহার সুবিধা হয় না, কারণ বহু সিদ্ধ করলেও সয়াবীন ডালের মত ঘন তরল পদার্থে পরিণত হয় না, তবে উপরোক্ত ঐ চূর্ণ দ্বারা ঝোল, তরকারী, ধোঁকা আমরা সহজেই তৈরী করতে পারি। রুটির জন্য ময়দায় মিশিয়ে দেওয়াও খুব সহজ উপায়। লুচী, কচুরীতে ব্যবহার করা অত ভাল নয়, কারণ প্রোটিনের গুণ ও অন্যান্য খাদ্য-উপাদানের গুণ তাতে অনেক নষ্ট হয়ে যায়। এই চূর্ণ পায়েসে দিয়ে, না শুধু জল দিয়ে, মিষ্টি দিয়ে ফুটিয়ে পানীয়ের মত খাওয়া যায়।

সয়াবীন বেটে নিয়ে, তার সঙ্গে প্রায় ৬ গুণ জল মিশিয়ে, ফুটিয়ে (৩০ মিনিটের বেশী নয়) ছেঁকে নিলে দুধের মত একটি তরল পদার্থ পাওয়া যায়। এই জিনিষটি 'সয়াবীনের দুধ' নামে খ্যাত। চীনে ও জাপানে এবং সম্প্রতি রাশিয়ায় 'সয়াবীনের দুধ' তৈয়ারীর বড় বড় কারখানা আছে। শিশুদের খাদ্য হিসাবে ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। 'সয়াবীনের দুধে' গরুর দুধের সবগুণই আছে, তবে ঠিক দুধের মত করতে গেলে আরও কতকগুলি জিনিষ মেশাতে হয় ও দুধের মত স্থায়ী করতে গেলে নানা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। স্থায়িত্বের প্রয়োজন এই জন্য যে, সয়াবীনের দুধে' ভাসমান কণিকাগুলির তলায় থিতিয়ে পড়বার আশঙ্কা আছে, সেইটিকে বন্ধ করা। বিশেষজ্ঞ রাসায়নিকের সাহায্য না পেলে ভাল দুধ করা সহজ নয়। এই দুধ থেকে ছানা কাটিয়ে সন্দেশ রসগোল্লা প্রস্তুত করা যায়।

সয়াবীনের ছানা চাপ দিয়ে জমিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে, ঘিয়ে ভেজে নিলে জাপানীর আদরের খাবার "টৌফু" হল। জাপানে "টৌফু" তৈয়ারীর অনেক কারখানা আছে। জাপানী জনসাধারণ অল্প খরচে মাংসের চেয়ে অধিকতর পুষ্টিকর এই খাবার খেতে পারে। আমাদের দেশের গবাদি পশুর অভাবজনিত মাংস-দুর্ভিক্ষে এই সব খাবার যদি প্রগতিশীল রেষ্টুরেণ্টরা প্রস্তুত আরম্ভ করেন, লাভ ও জনসেবার দুই পাখীই এক ঢিলে বধ করতে পারেন। শিক্ষিতা প্রগতিশীলা গৃহস্থালীর কর্ত্রীরা তাঁদের গৃহস্থালীতে এর প্রবর্তন করলে অন্ততঃ পরীক্ষামূলকভাবে দূরদৃষ্টি ও বাস্তব চেতনার পরিচয় দেবেন সন্দেহ নেই।

শিল্পে—

সয়াবীনের উপাদান—শতকরা ৪০ ভাগ প্রোটীন ও শতকরা ২০ ভাগ ফ্যাট বা তেল। এই দুইটিই শিল্পের উপাদান হিসাবে নানাদিকে ব্যবহার করা যেতে পারে। ভারতে যদিও সয়াবীনের আদি জন্মস্থান, তথাপি ভারতে তার যথেষ্ট চাষ নেই। নানা প্রচারকৌশলের মধ্যে দিয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ও সরকার (অর্ধ স্বগতভাবে) সয়াবীন চাষের দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সয়াবীন একাধারে 'খাদ্য শস্য' (food-crop) ও আর্থিক শস্য (cash-crop); সর্বসাধারণ এক দিকে সয়াবীনের ব্যবহারে স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা করতে পারে, আবার যদি ভারতীয় সয়াবীন শিল্প স্থাপন করা সম্ভব হয়, পুরুষানুক্রমিক দারিদ্র্যের কিয়দংশ লাঘবও করতে পারেন। তবে বাঙ্গলার 'আর্থিক শস্য' (?) পাট, লাক্ষার টাকার বৈদেশিক বণিকের ঝুলিতে কোটি কোটি মুদ্রার সংস্থান করলেও, বাঙ্গলার চাষীকে সাময়িক বিলাসব্যসনের আকর্ষণে 'কাণ্ডজ্ঞানরহিত করা' ছাড়া তার স্থায়ী আর্থিক অবস্থার কোনও স্থায়ী উন্নতি করেনি। কাজেই ব্যাপক সয়াবীনের চাষ ও ভারতীয় সয়াবীন শিল্পের প্রতিষ্ঠা হলেই চাষীর উন্নতি হবেই, একথা অভিজ্ঞতা থেকেই বলা যায় না। যে কৌশল এই সোজা ব্যাপার ঘটতেই দেয় না, তার প্রতিকার, দেশীয় সাধারণ রাজনীতির সাফল্যের প্রশ্ন, শিল্প প্রতিষ্ঠায় উৎসাহীদের জবাব দেবার নয়। তবে, সয়াবীন শিল্প একটি নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠানরূপে প্রভূত ধনোৎপাদনে সক্ষম, এইটিই আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় এবং ভারতে এই শিল্পপ্রতিষ্ঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। সয়াবীনের উপাদান নানা শিল্পে আশ্চর্যভাবে কাজে লাগান হইয়াছে। সয়াবীনের তেল, সয়ালেসিথিন, সয়ারেশম ও পশম আজ সর্বত্র পরিচিত।

———

প্রহেলিকায় সমাচ্ছন্ন থাকিবে।

যদি নৃত্যাভিনয় প্রতীচ্য সভ্যতার নাট্যমঞ্চে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তবে ভারতীয় নৃত্যবিজ্ঞান পরিকল্পনা রচয়িতার সন্ধান ও আবিষ্কার এবং বিষয়বস্তুর সুষ্ঠু চয়ন একমাত্র প্রয়োজনের উপরই নির্ভর করিতে হইবে।

এই পরিকল্পনার পশ্চাতে থাকিবে ধর্ম, জ্ঞান, শক্তি; তবেই শিল্পীকে অনুপ্রাণিত করিবে সেই পরিকল্পনার অবিবাহ অন্তঃস্রোত। এই সংমিশ্রণই হইবে শিল্পানুরাগীর মনের পরমানন্দ।

শকুন্তলার বিদায়

শ্রীকালিদাস রায়

কণ্ব— শকুন্তলা যা লইবে বিদায়
ভাবিতে ব্যথায় হৃদয় টুটে,
বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ আমার
চিন্তা জড়িমা নয়ন পুটে।
আমি বনবাসী ঋষি সন্ন্যাসী—
এত স্নেহার্ত্তি আমার চিতে,
জানিনা গৃহীরা কত ব্যথা পায়
প্রাণদুলালীরে বিদায় দিতে।

গৌতমী—(শকুন্তলার প্রতি)
সম্মুখে হের তোমার তাত,
হের আনন্দে নয়নে তাঁহার
অশ্রু গলিয়া ঝরিছে, মাতঃ।
সজল নয়ন ভুজযুগ দিয়ে
করিতেছে তোমা আলিঙ্গন,
প্রাণের ভকতি অর্পিয়া সতি
কর কর তাঁরে অভিবাদন।

কণ্ব—(প্রণতা শকুন্তলার প্রতি)
যযাতির আদরিণী শর্মিষ্ঠার সম
নিজ দয়িতের তুমি হও প্রিয়তমা।
তাঁহাদের বীরপুত্র পুরুর মতন,
লভ' পুত্র রাজচক্রবর্ত্তি-সুলক্ষণ।

(তপোবন তরুগণের উদ্দেশে)
তোমাদেরে জল না পিয়ায়ে যেবা
নিজে জলপান করেনি কভু,
ভূষণের প্রতি লোভ কম নয়,
পাতাটি ছিঁড়িয়া পারেনি তবু।
উৎসবে যেবা মাতিত, প্রথম
কুসুম ফুটিলে কারো বা গাছে,
সেই বনবালা চলে পতিগৃহে
তোমাদের কাছে আদেশ যাচে।

(আকাশ বাণী)
সরোজে শ্যামল সরোবর হোক
গমনের পথ সুমনোহর,
ছায়াতরুরাজি ছায়া সম্পাতে
সূর্য্য-কিরণ অপ্রখর।
পথধূলি তার পদ্মপরাগ
সংযোগে সুস্পর্শ হোক,
মঙ্গলময় হোক এ যাত্রা
শান্তানুকূল পবন বোক।

শকুন্তলা —(জনান্তিকে-প্রিয়ংবদার প্রতি)
আর্য্যপুত্রে হেরিবারে আকুল হয়েছে মোর
এ নয়ন মন।
তবু লীলা নিকেতন তেয়াগিতে তপোবন
চলে না চরণ।

প্রিয়ংবদা —
শুধু কি তুমিই সখি হয়েছ ব্যাকুল এত
আশ্রম-বিরহে ?
আশ্রমের দশা হের জড়জীব সকলেই
কি বেদনা সহে।
ফেলিতেছে দীর্ঘ শ্বাস মৃগীরা কুশের গ্রাস
করে উদ্গীরণ।
ময়ূরেরা আগেকার মতন করে না আর
লাস্যে নর্ত্তন।
পাণ্ডুপত্র পাতনের ছলে,
তোমার বিরহে দেখ লতিকার নেত্র হ'তে
অশ্রুরাশি গলে।

শকুন্তলা — (মাধবীলতাকে আলিঙ্গন করিয়া)
মম সোহাগিনী লতিকা ভগিনী
এসেছে আমার বিদায় ক্ষণ,
দূরে চ'লে যাই শাখা বাহু দিয়ে
কর কর মোরে আলিঙ্গন।

(কণ্বের প্রতি)
বিদায়ের কালে চাহিতে যাচে,
আমারি মতন ইহারাও যেন
স্নেহ পায় তাত তোমার কাছে।

কণ্ব—আমার সংকল্প ছিল অনুরূপ বরে তোমা
করিতে অর্পণ,
নিজ বলে পেয়েছ মা, আপনি সুযোগ্য বরে
করেছ বরণ।
নিশ্চিন্ত হয়েছি আমি তোমার বাসনা এবে
পুরাব নিশ্চয়,
এখন সহকারের এই লতিকার
দিব পরিণয়।

শকুন্তলা —
গর্ভ-ভার ক্লান্ত মৃগী পর্ণকুটিরের পাশে
করে বিচরণ,
নির্বিঘ্নে প্রসব হ'লে দূতমুখে সে বারতা
করিও প্রেরণ।

(একটি মৃগ শকুন্তলার বসন প্রান্ত
আকর্ষণ করিলে)

কণ্ব—কুশের কাঁটায় মুখে ক্ষত হ'লে
এর যন্ত্রণা মোচন তরে,
ইঙ্গুদী ফল তেল প্রলেপ
দিয়াছিলে যারে মমতা ভরে।
শ্যামা ধানের তণ্ডুল দিয়া
পোষণ করেছ মায়ের প্রাণে,
সেই মৃগশিশু পুত্র তোমার
গতি রোধ করে আঁচল টানে।

শকুন্তলা—(মৃগ শাবকের প্রতি)
জননী তোমারে প্রসব করিয়া
হায়রে বনে ত্যজিল প্রাণ,
তারপর হ'তে আমারি সোহাগে
তরুণ লালিত বর্দ্ধমান।
ছেড়ে যাই চ'লে তুমি তাই ব'লে
সাথে কি আমার যাইতে চাও ?
তব কি বৎস, তোমার ভাবনা
পিতা ভাবিবেন, ফিরিয়া যাও।

(শকুন্তলার অশ্রুমোচন)

কণ্ব—কেঁদ না বৎসে, পথ দেখে চল,
অশ্রু করিছে দৃষ্টি রোধ।
উঁচু নীচু পথ পদস্খলনে
হবে যে বৎসে বেদনা বোধ।

অনসূয়া—এই তপোবনে নাহি কোনজন
যে জন বিরহে কাতর নহে,
কমলিনী দলে ঐ দেখ চেয়ে
চখীটি চখারে কি কথা কহে।
উত্তর দিতে ভুলে গেছে চখা
জল আসে তার নয়ন ছেয়ে,
চঞ্চুতে ধরি মৃণাল খণ্ড
তোমার দিকেই রয়েছে চেয়ে।

কণ্ব—(শকুন্তলার সহযাত্রী ঋষিশিষ্য
শার্ঙ্গরবের প্রতি)
শকুন্তলাকে রাজার সমীপে
নিয়ে যাও তুমি তোমার সাথে,
আমার হইয়া এই কথাগুলি
ব'লো, সঁপে দিয়ে তাঁহার হাতে।
মোরা তপোধন তপই সম্বল
তব কুল করে ভুবন আলো
বন্ধুজনের অগোচরে বালা
তোমায় তোমা বেসেছে ভালো।
সব কথা তুমি বিচার করিয়ে
সকল রাণীর সমান দেখ,
এর বেশী শুধু ভাগ্য ব্যাপার,
মোরা আত্মীয়, কি বলিব এর ?

(শকুন্তলার প্রতি)
গুরু জনে সেবা করিও প্রিয় সখী সম ব্যবহারো
সপত্নী নিকরে,
নিষ্ঠুর হ'লেও স্বামী বিরূপা হ'য়োনা যেন
অভিমান ভরে।
দাসদাসীগণ প্রতি হ'য়ো যেন দয়াবতী,
সৌভাগ্যে সংযত,
কুলবধূ এমনি হ'লে লভে গৃহিণীর পদ
বামা, কুলাধয়।

শকুন্তলা—মলয় ভূধর হ'তে উন্মূলিতা চন্দন
লতিকার প্রায়,
পিতৃপদ চ্যুত হয়ে কেমনে ধরিব প্রাণ
পারি না ভাবিতে হায়।

কণ্ব—ব্যাকুল হ'য়োনা বৎসে, অভিজাত
কুলজাত
পতির ভবনে,
প্রজা, গৃহিণীর পদ অধিষ্ঠিতা হ'য়ে তুমি
সংসার অঙ্গনে,
অতুল ঐশ্বর্য্য মাঝে রাণী হয়ে নানা কাজে
পাবি না কো শোক
প্রাচীদিক সূর্য্য যথা, প্রসবিয়া পুত্রবর
ভুলিবে এ শোক।

শকুন্তলা—পিতৃদেব করি প্রণিপাত,
বল তাত এ আশ্রমে আবার ফিরিব কবে
কবে পুনঃ হইবে সাক্ষাৎ ?

কণ্ব—হ'বি বহুদিন ধরি ধরিত্রীর অধীশ্বরী
পুত্রহস্তে সঁপি রাজ্যভার,
মুক্তিকামনায় সাথে পতিসহ তপোবনে
ফিরে যেন আসিবে আবার।

শকুন্তলা—তপস্যায় মগ্ন হ'লে এ বেদনা
দূরে যাবে
শান্তি পাবে মনে,
তোমার বিরহ ব্যথা হ'বেনা মোর
চিরসাথী
ভুলিব কেমনে ?

কণ্ব—শুনিয়া তোমার কথা দ্বিগুণ
বাড়িতেছে ব্যথা
আমি জড় প্রায়,
অবিলম্বে যাত্রা কর' ব্যথাই বাড়িছে শুধু
কথায় কথায়।
পর্ণকুটিরের পাশে দাঁড়ায়ে নীবার বলি,
অঙ্কুরিত তারা,
সেগুলি হেরিয়া চোখে মোর বশীভূত শোকে
ঝরে অশ্রুধারা।

(শকুন্তলার প্রস্থান)
কন্যা ধনে নাহি অধিকার।
যার ধন তার করে ফিরাইয়া দিলে পরে
চিত্তে জাগে আনন্দ অপার।
আজ এতদিন পরে পাঠায়ে স্বামীর ঘরে
গচ্ছিত এ শকুন্তলা ধনে,
পবিত্র হইল আত্মা, আজি আমি ভার মুক্ত
লভিলাম নিত্যানন্দ মনে।

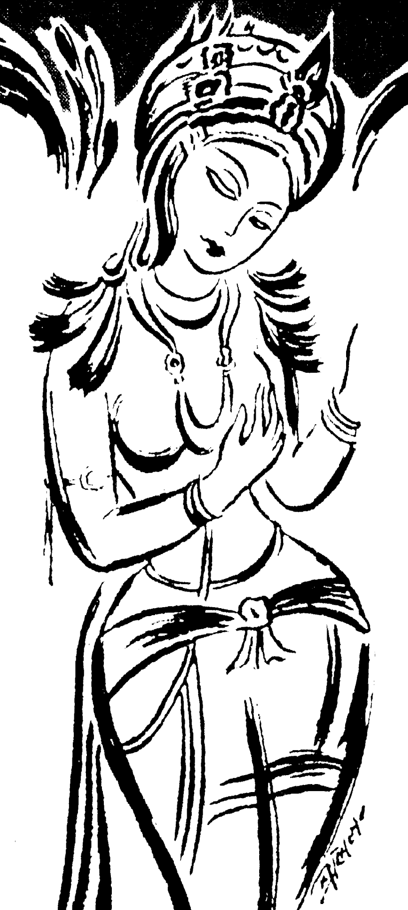


পরাশে তার ঘুম ভাঙ্গালো
ফুল কুমারীর ফুল রেনু-
ফুল রেণুর মতই মৃদু এবং সুবাস, মস্তিষ্কের শীতলতা সম্পাদন করিয়া কেশের সর্ব্ববিধ উপকার সাধন করিতে অদ্বিতীয়।
হেমকান্তি
কেশ তৈল
ইণ্ডিয়ান পারফিউম প্রডাক্টস্ ১৩৫/৪ আপার সারকুলার রোড কলিকাতা



PRABHATI
Highly perfumed
HAIR OIL
পৃথিবী শীতল করিতে
ভাগীরথী—
আপনাদের মস্তিষ্ক
শীতল রাখিতে
প্রভাতী
ALLIES CHEMICAL PRODUCTS
CALCUTTA

প্রাচীন যুগে নারী



ডাঃ শ্রীমতী রমা চৌধুরী
এম,এ ডি,ফিল

প্রাচীন যুগে নারীর সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বিশদভাবে বলা অসম্ভব। সেই জন্য সেই সময়ের নারীদের সম্বন্ধে দুই একটী কথা অতি সংক্ষেপে বলিব।

সাধারণভাবে নারীর তিনটী অবস্থা-ক্রম—কন্যা, পত্নী ও মাতা। যে অল্প-সংখ্যক নারী বিবাহ করেন না, তাঁহাদের অবশ্য শেষোক্ত দুইটী অবস্থার স্থলে অন্যরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়, যথা—শিক্ষয়িত্রী, সেবিকা প্রভৃতি। প্রাচীন যুগে নারীগণ উক্ত বিভিন্ন অবস্থায় কিরূপ সামাজিক সুবিধা ও অধিকার দাবী করিতেন, তাহার বহু প্রমাণ নানাদিক হইতেই পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ, কন্যার কথা ধরা যাক। বৈদিক যুগে কন্যা পুত্রের ন্যায় মাতাপিতার আকাঙ্ক্ষার ধন ছিল এবং কন্যা লাভের জন্য তাঁহারা বহুবিধ শাস্ত্রীয় ধর্মাচার, ব্রতাদি পালন করিতেন। যথা—পুংসবন নামক সংস্কার মাতাপিতা পুত্র ও কন্যা উভয়ের জন্যই ইচ্ছামত পরিপালন করিতেন, কেবল পুত্রের জন্য নহে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের মতে (৬.৪.১৭), যদি মাতা-পিতা পণ্ডিতা দুহিতা লাভ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে তাঁহারা উভয়ে ঘৃতসংযোগে তিলমিশ্রিত অন্ন রন্ধন করিয়া ভোজন করিবেন। পুনরায় আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের মতে কেবল কন্যালাভে ইচ্ছুক হইলে বর পাণিগ্রহণকালে বধূর বৃদ্ধাঙ্গুলি ব্যতীত অপর সকল অঙ্গুলিই স্পর্শ করেন; কেবল পুত্র-লাভে ইচ্ছুক হইলে, কেবল বৃদ্ধাঙ্গুলিই মাত্র স্পর্শ করেন এবং পুত্র ও কন্যা উভয় লাভেই ইচ্ছুক হইলে সকল অঙ্গুলিই স্পর্শ করেন। কন্যালাভে ইচ্ছুক হইলে তিনি পত্নীকে অরুন্ধতী, ধ্রুব ও অন্যান্য নক্ষত্রও দর্শন করান। কন্যালাভেচ্ছু দম্পতী দ্বিতীয়া তিথিতে কামশ্রাদ্ধ করিতেন। সংযুক্তনিকায়ের মতেও সুশীলা ও গুণবতী কন্যা পুত্র অপেক্ষাও শ্রেয়সী—বিদুষী কন্যা কুলের গৌরব।

পুত্রের ন্যায় কন্যারও উপনয়ন সংস্কারে পূর্ণ অধিকার ছিল। হারীতের মতে (সংস্কাররত্নমালা ২-৬-৭), নারীগণ দুই শ্রেণীর, ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূ (অথবা যাঁহাদের শীঘ্র বিবাহ হয়)। প্রথম শ্রেণীর নারীগণ উপনয়ন, অগ্ন্যাধান ও বেদাধ্যয়নে পূর্ণ অধিকারিণী, দ্বিতীয় শ্রেণীর নারীগণও উপবীত ধারণ করেন এবং তৎপরে শীঘ্রই বিবাহিতা হন। যমের মতেও পুরাকালে কুমারীগণের মৌঞ্জীবন্ধন, বেদাধ্যয়ন ও সাবিত্রী বচনোচ্চারণে অধিকার ছিল। এতদ্ব্যতীত কন্যার নানাযজ্ঞে মন্ত্রোচ্চারণেরও অধিকার ছিল। যথা—সাকমেধ যজ্ঞে কন্যা ত্র্যম্বক মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন (বাজসনেয় সংহিতা)। শতপথ ব্রাহ্মণের মতে কুমারী কন্যাগণ দক্ষিণ উরুতে আঘাত করিতে করিতে যজ্ঞবেদীর বামপার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে গমন করিবেন। এইরূপ বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। স্ত্রীর মন্ত্রোচ্চারণের দৃষ্টান্তও অসংখ্য। পুত্রের অভাবে স্ত্রীই মন্ত্র সহকারে পতির শ্রাদ্ধে অধিকারিণী—এই বিষয়ে বহু স্মৃতিকার একমত। শঙ্খের মতে (শ্রাদ্ধময়ূখ) সংস্কারের পরে দুহিতা পুত্রেরই ন্যায় অশৌচ পালন করিবেন, শ্রাদ্ধ করিবেন, পিণ্ডদান করিবেন এবং পিতার জন্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবেন। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের মতে বিবাহের পর হইতে গৃহস্থ স্বয়ং, তাঁহার পত্নী, পুত্র, কুমারী কন্যা বা শিষ্য নিয়মিতভাবে গৃহ্য অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবেন। সুতরাং স্ত্রী ও কন্যা ওঁম্ সহকারে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক, অগ্নিতে আহুতি প্রদানে পূর্ণ অধিকারিণী ছিলেন; কিন্তু নারীর যদি মন্ত্রোচ্চারণে অধিকার ছিল, তাহা হইলে উপনয়নেও অধিকার ছিল, কারণ উপনয়ন ব্যতীত কাহারও বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে অধিকার জন্মে না। গোভিলের মতে "যজ্ঞোপবীতিনী" অথবা যজ্ঞোপবীতধারিণী বধূকে বর বেদীর অভিমুখে লইয়া যাইবেন।

শিক্ষা ব্যাপারেও কন্যার পুত্রের ন্যায় সমান অধিকার ছিল। বৈদিকযুগে নারী-শিক্ষার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ঋগ্বেদের নারী "ঋষি" বা "ব্রহ্মবাদিনী"গণ। ইঁহারা ঋগ্বেদের কয়েকটী সূক্তের রচয়িত্রী ছিলেন। বিখ্যাত বেদজ্ঞ পণ্ডিত শৌনক তাঁহার "বৃহদ্দেবতা" নামক ঋগ্বেদ বিষয়ক গ্রন্থে সাতাশজন নারী ঋষির নামোল্লেখ করিয়াছেন—যথা, ঘোষা, গোধা, বিশ্ববারা, অপালা, নিষদ, উপনিষদ প্রভৃতি। সুবিখ্যাত বেদভাষ্যকার সায়নও ইঁহাদের নাম করিয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (২-৪-১) যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি তাঁহার পত্নী মৈত্রেয়ীকে গূঢ় আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। গার্গী বাচক্নবীর (বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৩-৮) কথা সকলেই জানেন। তিনি প্রথমে যাজ্ঞবল্ক্যকে জনকের রাজসভায় 'কিসে সমুদায় ওতপ্রোত' এই বিষয়ে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করেন (৩-৬)। পরে তাঁহাকে 'অক্ষর ব্রহ্ম' সম্বন্ধে দুইটী প্রশ্ন করিয়া যথাযথ উত্তর পান (৩-৮)। গার্গীর ন্যায় দার্শনিক জ্ঞানসম্পন্না ব্রহ্মজ্ঞা নারী জগতের ইতিহাসে বিরল। শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্র ও আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে গার্গী, বাচক্নবী, বড়বা, প্রাতিথেয়ী ও সুলভা মৈত্রেয়ীর নাম ঋষিদের নামের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। কাত্যায়ন এবং ভট্টোজি দীক্ষিত নারী আচার্য্যা ও শিক্ষয়িত্রীর বিষয় অতি সম্মানের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শিনী ঋষি সুলভার উপযুক্ত স্বামী পাওয়া না গেলে তিনি সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করেন এবং রাজর্ষি জনকের শিক্ষয়িত্রী হন। বিদুষী উভয়ভারতী স্বামী মণ্ডন মিশ্র ও শঙ্করাচার্য্যের মধ্যে তর্কযুদ্ধে মধ্যস্থা হন (শঙ্কর-দিগ্বিজয়)। মহাভাষ্যের মতে নারীগণ মীমাংসা এবং ধর্ম্মশাস্ত্রেও পারদর্শিনী ছিলেন। ভবভূতির "উত্তররামচরিতে" বর্ণিত আছে যে, (দ্বিতীয় অধ্যায়ে) আত্রেয়ী অগস্ত্য প্রমুখ বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণের নিকট হইতে বেদাধ্যয়ন করিবার জন্য উত্তর ভারত হইতে দক্ষিণ ভারতে গমন করিয়াছিলেন। এইরূপে প্রাচীন যুগে নারীগণ বেদ, কাব্য, দর্শন, ধর্ম্ম, মীমাংসা প্রভৃতি নানা বিষয়ে ব্যুৎপন্না ছিলেন।

বৈদিক যুগের পরবর্ত্তী যুগেও নারীগণ নানা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়া সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত ভাষাকে বহু ভাবে সমৃদ্ধতর করিয়াছেন। যথা—ন্যূনাধিক ৪০ জন সংস্কৃত নারী কবির প্রায় একশত পঞ্চাশটি কবিতা আমরা পাইয়াছি। ইঁহাদের নাম—শীলা, বিজ্জা, বিকটনিতম্বা, মারুলা, পদ্মাবতী, গৌরী, ভাবদেবী প্রভৃতি। ইঁহারা দেবতা, মনুষ্য, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য্য, প্রেম, জীবজন্তু, প্রকৃতি, ঋতু, বৃক্ষপুষ্পাদি, দর্শন, ধর্ম্ম প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ে অতি সুন্দর ও সরস কবিতা রচনা করিয়াছেন। বিখ্যাত কবি ঘনশ্যামের বিদুষী পত্নীদ্বয় সুন্দরী ও কমলা রাজশেখরের প্রসিদ্ধ নাটিকা "বিদ্ধশাল ভঞ্জিকা"র উপর "চমৎকার তরঙ্গিনী" নামক এক অতি জ্ঞানগর্ভ টীকা প্রণয়ন করেন। "চমৎকার তরঙ্গিনী" ভাষার সরলতায় ও ভাবের নিগূঢ়তায় সর্ব্বদিক হইতেই সত্যই অতি চমৎকার। রাজা মাণ্ডলিকের কন্যা ও রাজা হরিসিংহের প্রধানা মহিষী বীনবায়ী "দ্বারকা-পত্তল" নামক পৌরাণিক স্মৃতি বিষয়ক একটী গ্রন্থ রচনা করেন। বীনবায়ী বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বিনী ও রামানুজ মতানুসারিণী ছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি তীর্থযাত্রা, স্নান, পূজাদি, দান, প্রভৃতি বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ আলোচনা করিয়াছেন। নারীতান্ত্রিক প্রাণমঞ্জরী "তন্ত্ররাজতন্ত্র" নামক সুবিখ্যাত তন্ত্রগ্রন্থের উপর "সুদর্শন" নামক একটি টীকা রচনা করেন। তাঁহার স্বামীর নাম ছিল প্রেমনিধি। পুত্র সুদর্শনের মৃত্যুতে ব্যথিত হইয়া তিনি এই "সুদর্শন" টীকা রচনা করিয়া জগতে পুত্রের নাম অমর করিয়া রাখিয়া যান। তন্ত্রশাস্ত্রের অতি নিগূঢ় তত্ত্বাবলীতে প্রাণমঞ্জরী যে অতি ব্যুৎপন্না ছিলেন, তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ এই টীকা। লক্ষ্মী দেবী পায়গুণ্ড মাধবাচার্য্যের প্রখ্যাত স্মৃতিগ্রন্থ "কালমাধবের" উপর "কাল-মাধব লক্ষ্মী" নামক অতি উৎকৃষ্ট একটি টীকা প্রণয়ন করেন। তাঁহার স্বামী বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ড অতি পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনিও "কাল-মাধবের" উপর "কাল-মাধবীয় ব্যাখ্যান" নামক একটি টীকা রচনা করেন। এইরূপে ভারতীয় নারীগণ কাব্য, পুরাণ, তন্ত্র, স্মৃতি প্রভৃতি বহু বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ নানাবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া ভারতমাতার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। শুধু সংস্কৃত নহে, পালি ও প্রাকৃত ভাষাতেও নারীর অবদান অল্প নহে। বৌদ্ধ বিদুষী সন্ন্যাসিনী "থেরী"-গণ ও তাঁহাদের রচিত "থেরী গাথা"র নাম অনেকেই জানেন। ৭২ জন থেরী রচিত পাঁচশতাধিক গাথা সংগৃহীত হইয়াছে। ইঁহাদের নাম পটাচারা, অম্বপালী, ক্ষেমা, শুক্লা, শুভা, সামা, উপচালা প্রভৃতি। ইঁহারা নির্ব্বাণ বিষয়ে গাথা রচনা করেন। প্রাকৃত নারী কবিগণের মধ্যে অনুলক্ষ্মী, মাধবী, রেবা, রোহা, প্রভৃতি অন্যতম। ইঁহারাও সংস্কৃত নারী কবিগণের ন্যায় প্রেমের নানাবিধ অবস্থার বিষয়ে কবিতা রচনা করেন।

উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণী হইতে প্রাচীন যুগে নারী শিক্ষার উচ্চ আদর্শের কথা কিছু উপলব্ধি করা যাইবে। প্রাচীন যুগে নারী যে কেবল বেদ, দর্শন, ধর্ম্ম, কাব্য, মীমাংসা প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠেই কাল অতিবাহিত করিতেন, তাহাই নহে, অন্যান্য বহু কলা ও বিদ্যাও আয়ত্ত করিতেন—যথা, নৃত্য, গীত, যন্ত্রবাদন, চিত্রবিদ্যা, স্থাপত্যবিদ্যা, কবিতা প্রণয়ন বিদ্যা প্রভৃতি। বৈদিকযুগে নারীগণ যজ্ঞে সামবেদ এবং বিবাহাদি উৎসবে গাথা গান করিতেন। তাঁহারা নানাবিধ যন্ত্র বাদনেও সুনিপুণা ছিলেন। যথা, অপঘাটলিকা, পিচোরা, কাণ্ডবীণা, তালুকবীণা প্রভৃতি (শতপথ-শ্রৌত সূত্র)। তাঁহারা নৃত্যকুশলাও ছিলেন এবং বিবাহাদিতে নৃত্য করিতেন। পরবর্ত্তী যুগেও নারীদের কেবল পঠন পাঠন নহে, অন্যান্য নানাবিধ বিদ্যা শিক্ষাতেও মনোযোগ দিতে হইত। যথা—বাৎস্যায়নের কামসূত্রে (৩-১৪) নারীদের শিক্ষণীয় ৬৪টি বিদ্যার উল্লেখ আছে। ইহাদের মধ্যে সকল শ্রেণীর বিদ্যাই অন্তর্ভুক্ত আছে। যথা, নৃত্য, গীত, বাদ্য, চিত্রাঙ্কন, বেণী বন্ধন, তিলকরচনা, মাল্যগ্রথন, পুষ্পশয্যারচনা, প্রভৃতি কলাবিদ্যা; সুগন্ধদ্রব্য নির্ম্মাণ, পাককর্ম্ম, সূচীকর্ম্ম, বেত্রশিল্প, তক্ষণ (ছুতোরের কাজ), স্থাপত্যবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, বৃক্ষ চিকিৎসা, যন্ত্র পরিচালন, প্রভৃতি কার্য্যকরী বিদ্যা; ইন্দ্রজাল, হস্তলাঘব (হাত সাফাই), দ্যূতক্রীড়া, আকর্ষক্রীড়া (দাবা, পাশা প্রভৃতি), বাল ক্রীড়নক (পুত্তলিকা ক্রীড়া), কন্দুক ক্রীড়া বা ঘুড়ি খেলা প্রভৃতি বহুবিধ ক্রীড়া, নানারূপ ব্যায়াম এবং যুদ্ধবিদ্যা। এইরূপে নারীদের জন্য সকল প্রকার বিদ্যা শিক্ষারই ব্যবস্থা ছিল। মহাভারতেও শাম্ব ও কৃষ্ণের কন্দুক ক্রীড়া বা গোলা লইয়া খেলার উল্লেখ আছে।

বৈদিক যুগ ছিল নারী স্বাধীনতার স্বর্ণ যুগ। এইযুগে তর্ক সভায়, আমোদোৎসবে, ক্রীড়া-যুদ্ধে, এমন কি, প্রকৃত যুদ্ধে পর্য্যন্ত নরনারীর সমান অবাধ গতি ছিল। মহাকাব্যের যুগেও নর-নারীর সহশিক্ষা প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। আত্রেয়ী কুশ ও লবের সহপাঠিকা ছিলেন বলিয়া ভবভূতি উল্লেখ করিয়াছেন। "মালতী মাধবে"ও ভবভূতি (প্রথম অঙ্কে) কামন্দকীকে ভূরিবসু ও দেবরাতের সহপাঠিকা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বৈদিক নারী কবি ঘোষা তাঁহার সূক্তে বধ্রিমতী ও বিশপলা নামক দুইজন স্ত্রী যোদ্ধার উল্লেখ করিয়াছেন। বধ্রিমতী বিবাহিতা ও সন্তানবতী ছিলেন। কিম্বদন্তী যে, যুদ্ধে শত্রুগণ তাঁহার হস্ত ছেদন করিলে তিনি অশ্বিনীদ্বয়ের কৃপায় সুবর্ণময় হস্ত লাভ করেন। বিশপলা খেল রাজার সেনাদলে যোদ্ধা ছিলেন। যুদ্ধে শত্রুগণ তাঁহার জঙ্ঘা ছেদন করিলে, তিনি ও অশ্বিনীদ্বয়ের কৃপায় লৌহজঙ্ঘা লাভ করেন, এইরূপ কিম্বদন্তীর উল্লেখ আছে।

বৈদিকযুগে বাল্যবিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল না, উপরন্তু যৌবন বিবাহই ছিল সাধারণ নিয়ম। এ সম্বন্ধে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। গৃহ্যসূত্রাদির মতেও বিবাহযোগ্যা কন্যা "অনগ্নিকা" অথবা যৌবনপ্রাপ্তা হইবেন। ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ব বেদের মতে যৌবন সমাগতা কন্যা প্রথমে সোম, গন্ধর্ব্ব ও অগ্নি এই তিন দেবতার সহিত ক্রমান্বয়ে বিবাহিতা হন, পরে তাঁহার মনুষ্য স্বামীর সহিত বিবাহ হয়। পুনরায় বিবাহের চতুর্থ রাত্রে (স্থল বিশেষে, দ্বিতীয় রাত্রে) স্ত্রী স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া স্বামীর সহিত অভিন্ন দেহাত্মা ও অভিন্ন পিণ্ড গোত্র ও সূতক হন। ইহাও যৌবন বিবাহের অন্যতম প্রমাণ। অপর এক

[ইহার পর ৩০৭ পৃষ্ঠায়]

আধুনিক সঙ্গীতের ধারা

অজয় ভট্টাচার্য

সঙ্গীত বাংলা সাহিত্যের প্রাণধারার উৎস স্বরূপ। জয়দেব, চণ্ডীদাস থেকে সুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস গানের-ই ইতিহাস মাত্র। বাংলা সাহিত্য যদি বিশ্ব-সাহিত্যে স্থান পেয়ে থাকে, বাংলা-সঙ্গীতও অনায়াসে বিশ্ব-সঙ্গীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রতে পারে। স্বদেশীয় ব'লে এ কথা গর্বোক্তি বা অতিশয়োক্তি নয়। সঙ্গীত-সম্রাট একক রবীন্দ্রনাথ-ই বিশ্বের বিস্ময় রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশালত্ব বিদগ্ধ সমাজকে শুধু বিস্মিত-ই করেনা তার বৈচিত্র্য রসিকজনমাত্রেই শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করে।

রবীন্দ্রযুগের পূর্বে বৈষ্ণব-পদাবলী, কীর্তন, বাউল, গ্রাম্যগীতি এবং পল্লীগাথা বাংলাগানে প্রাধান্য লাভ করেছিল, দুঃখের বিষয় অধিকাংশ-ই আজ লুপ্ত, তবু-ও যা' বর্তমান আছে তার মূল্য কম নয়। পরবর্তী-যুগে আমরা পাই সাধক কমলাকান্ত এবং রামপ্রসাদকে। বিশ্বপালয়িত্রী শ্যামার সঙ্গে তাঁরা এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধন অনুভব করলেন এবং তাঁরই প্রমাণস্বরূপ শ্যামা-সঙ্গীতের অভ্যুত্থান। শ্যামা-সঙ্গীত রচনায় অমর কবিত্ব-শক্তিরই শুধু প্রকাশ হয়নি, তার অপূর্ব সুরসৃষ্টি চিরত্ব লাভ করেছে।

তারপর দেখি কবি রজনীকান্তকে। বাংলাগানের উন্নতির পথে রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী এই অমর কবির দান অপরিসীম। কবি-প্রতিভার সঙ্গে মঙ্গল সাধনার অপূর্ব সমন্বয়। এই সমন্বয় পূর্ণতালাভ করেছে রবীন্দ্রনাথের গানে। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে যদি কোন শক্তিশালী গীতিকবির বিকাশ হ'য়ে থাকে, তবে সে এই কান্ত কবি রজনীকান্তের।

রবীন্দ্রযুগে জন্মগ্রহণ ক'রেও অমিত প্রতিভাশালী নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল স্বকীয় বৈশিষ্ট্য-বলে সঙ্গীত রচনায় রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত ছিলেন। বিদেশী সঙ্গীতের ধারা অনুসারে তিনি রচনা করলেন সঙ্গীত—কিন্তু প্রতিভার যাদুমন্ত্রে বিদেশীয় সুর তাতে বাজেনি। তাঁর বীরত্বব্যঞ্জক এবং হাস্যরসের গান দেশবাসী শ্রোতার নিকট নিত্য নিবীর স্বাদ অপূর্ব রসধারা পরিবেশন করে আজও।

তারপর মূর্তিমান সঙ্গীতের ধারা রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। তিনি যদি জীবনে একটি ছত্র-ও পদ্য না লিখতেন—অবিমিশ্র গদ্য সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা অনায়াসে অধিকার করেছেন তিনি—বা সুবিপুল রবীন্দ্র-সাহিত্য না রচনা করতেন, তবু-ও তাঁর বৈদগ্ধ্যময় অবদান সঙ্গীতের জন্য বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতেন তিনি।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রধানতঃ চারভাগে বিভক্ত—১। ব্রহ্ম-সঙ্গীত ২। মরমী-গীতি ৩। প্রেম-সঙ্গীত ৪। দেশাত্মবোধক-সঙ্গীত।

নিজগৃহের ব্রহ্ম-উপাসনায় আবেষ্টনী অনুপ্রাণিত করেছে কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথকে। সৃষ্টির মূলে ঐশী শক্তিকে স্বীকার ক'রে প্রশস্তি গাইলেন ব্রহ্ম-সঙ্গীতে। তবে রবীন্দ্র-সঙ্গীত বলতে আজকের দিনে যা' বুঝি ব্রহ্ম-সঙ্গীত তা' নয়। এক্ষেত্রে কবি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে সাধক রবীন্দ্রনাথের বিকাশ বেশী।

'গীতাঞ্জলি'র রবীন্দ্রনাথ দেখা দিলেন সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে। পূজাহ ভগবানকে ধরা-ছোঁওয়ার উর্দ্ধে না রেখে তাঁকে চাইলেন দয়িতরূপে। এখানে কবি মরমী-ধর্মী। অজানাকে জানার আগ্রহে মানবমনের যে আকুলতা তারই প্রকাশ গীতাঞ্জলি'র বর্ণে বর্ণে

ভগবানকে অবিচ্ছেদ্য প্রিয়তমরূপে পাবার কী আকুলতা। শ্রীরাধিকার প্রেমের বিচিত্র ভাবাবেশ রবীন্দ্র-সঙ্গীতে পূর্ণ ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। তথাপি এই মরমী-সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বিত্ত—বাংলা সমাজের প্রাণধারার অভিব্যক্তি মাত্র

তারপর ব্রহ্ম-সঙ্গীত ও মরমী-সঙ্গীতের অতীন্দ্রিয়তাকে বাদ দিয়ে মানব-মানবীর মিলন বিরহের গভীরতম অনুভূতির সন্ধান পাই প্রেম-সঙ্গীতে। এই সঙ্গীতই প্রধানতঃ রবীন্দ্র-সঙ্গীত নামে সমাদৃত। বিশ্ব প্রকৃতির বিচিত্র রঙের খেলায় ঋতুর পরিবর্তনে কবিচিত্তের নব নব প্রকাশ। এই রবীন্দ্রনাথ বিদগ্ধ সমাজের বিস্ময়—এক্ষেত্রে কবি শুধু কবি-ই আর কিছু নয়।

সব শেষে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত। স্বজাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বহন করে আনলেন এই সঙ্গীতে, সমগ্র দেশের প্রাণে প্রাণে সৃষ্টি করলেন উন্মত্ত আলোড়ন প্রচণ্ড তেজস্বিতার সঙ্গে কবিত্বশক্তির অপরূপ সংমিশ্রণ

গানের রাজা রবীন্দ্রনাথ সুরের জগতেও এক অপূর্ব ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করেছেন। সুর সৃষ্টির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য তাঁর গানকে "রবীন্দ্র-সঙ্গীত" ক'রে তুলেছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে কবি রবীন্দ্রনাথের প্রাধান্য বেশী কিংবা সুরস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ বেশী তা আজকের দিনে-ও বিতর্কের বিষয়। গানকে তখন-ই গান বলে যখন কথার সঙ্গে হবে যথোপযুক্ত সুরের সংযোজনা। সে হিসেবে রবীন্দ্র-সঙ্গীত অতুলনীয়।

একাধিক রাগ-রাগিণীর মিশ্রণ ক'রে বিস্ময়কর সুরের সৃষ্টি করলেন তিনি। বর্ষার মেঘরন্ত্র কবি-অন্তরে কি যেন একটা আলোড়ন সৃষ্টি ক'রে যায় যার দ্যোতনায় পেলাম আমরা বর্ষা-সঙ্গীত। এ দুঃখ, এ অশ্রু সুখের চেয়ে-ও আনন্দদায়ক

রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনলে স্বভাবতঃ-ই প্রশ্ন জাগে কবি মানসে কথা আগে এসেছিল, না সুরস্রষ্টার নিকট সুরের মায়াজাল আগে ধরা দিয়েছিল। যদি যথার্থ সঙ্গীত হয় সুর বা কথা ভিন্ন ক'রে বিচার করতে যাওয়া দূষণীয়—কথা এবং সুরের সুষ্ঠু মিশ্রণে পূর্ণাঙ্গ সঙ্গীত রচিত। অনেক সঙ্গীত-বিশারদের মতে রবীন্দ্রসঙ্গীত একঘেয়ে, বৈচিত্র্যের নিতান্ত অভাব তাতে, অতি সরল তার সুর। কথার দুর্বলতাকে ঢাকতে হয় সুরের আড়ম্বর দিয়ে—তাই কথা যেখানে সাবলীল, একটুমাত্র সুরই সেখানে যথেষ্ট। সুরের সাধারণত্বেই অসাধারণত্ব লুক্কায়িত।

বাংলার প্রাণের বিত্ত দেশীয় বাউল ও ধ্রুপদের সম্মান চিরদিন-ই করেছেন রবীন্দ্রনাথ—তাঁর অধিকাংশ সুর-ই উভয় জাতীয় সুরকে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে উঠেছে, কিন্তু প্রতিভার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে নতুন রঙের পরশ পেল এরা।

আধুনিক সঙ্গীত নামে যে ধারা বাংলার আকাশ বাতাসকে মণ্ডিত করেছে, তার উৎসমূল-ও নিহিত রয়েছে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অন্তরতলে। আজকের দিনে যে সমস্ত উদীয়মান সঙ্গীত রচয়িতার উদ্ভব হচ্ছে তাঁরা শুধু রবীন্দ্র প্রভাবে প্রভাবান্বিত-ই নয়, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের শিষ্য।

কবি অতুলপ্রসাদ সেনের সুরসৃষ্টি নিজস্ব বটে কিন্তু তাতে ও লক্ষ্ণৌ ঠুংরীর আভাষ পাওয়া যায়। অবিমিশ্র ভাঙ্গা-কীর্তন এবং বাউল সঙ্গীত তাঁর একক বিত্ত।

রবীন্দ্র প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া আধুনিক কবিদের পক্ষে দুঃসাধ্য সত্যি, তবুও কি রচনায়, কি সুরে বাংলা গানে নতুনত্ব এনেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। গজল গান নজরুলের প্রাথমিক অবদান। ইতিপূর্বে অতুলপ্রসাদের "কত গান তো হলো গাওয়া" কিংবা দিলীপকুমারের "যদি দিন না দিবে তবে" ইত্যাদি গজল যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল, তথাপি নজরুলের বৈশিষ্ট্য, একটু অসাধারণ।

সুরসৃষ্টিতে নজরুলের সাফল্য অপূর্ব। শুধু ভারতীয় রাগ-রাগিণীতে-ই তিনি

[ইহার পর ৩০৭ পৃষ্ঠায়]

'ঐ মহামানব আসে'

বিভূতি চৌধুরী

পৃথিবীর নীলস্বপ্ন মুছে গেছে রক্তের লেখায়,
আকাশের বাতায়নে জ্বলে আজ
লাল বহ্নিশিখা,
ধরিত্রী কাঁদিয়া ওঠে মরণের ক্ষত বেদনায়,
দিগন্তের পারে নামে
যুগান্তের শেষ যবনিকা।
লোভীর রক্তাক্ত ক্ষুধা মানুষের
আনে অসম্মান,
দানবীয় হিংস্রতার যূপকাষ্ঠে
মানবতা দেয় আত্মবলি,
নির্যাতিত সুন্দরের বক্ষে
বাজে লক্ষ অপমান —
দেবতার তরে শুধু মানবের রক্তের অ[illegible]লি ?

দুর্যোগের রাত্রিশেষে আবার
আসিবে সূর্যোদয়,
সবুজ ঘাসের বুকে জাগে যেন নবীন স্পন্দন,
প্রলয়ের চিতা-ভস্মে মহামানবের অভ্যুদয়
হবে জানি—শুনি আমি
মানুষের আত্মার [illegible]ন্দন।
প্রাণের শোণিত-ধারা মুছে দেবে
পৃথিবীর গ্লানি,
পূবের দিগন্তে বাজে মহাজীবনের সেই বাণী।

— — — —

মাছেরা

রামপদ মুখোপাধ্যায়





আ[illegible] যে সব জলাশ[illegible] অন্তর্ভুক্ত [illegible] আছে। ভারতবর্ষের [illegible] বাংলায় অনেক ডোবাও আছে—ডোবাগুলো আছে—তবে কপাট আর পাঁচটা জলাশয়ের গুণে বিভূষিত। যে কোন শিকারীজাতীয় [illegible] যদি আড্ডা-ডোবার কথা বলা যায়—তবে শিকারীকে ও পর্যায়ে ফেলতে বাধা নাই—অন্ততঃ শিবকালীর ভাষায়: তোমরা বুঝবে না হে। সমস্ত চার—কোথায় চাঁদুল, বুটি কলাই, এলাচী, ঘিয়ের গাদ, পচা পনীর, পাউরুটি, লাল পিঁপড়ের ডিম ইত্যাদির সব মালমশলা জোগাড় করে শনিবারের বিকেলে—যদি পুকুর কাছে হয়—নতুবা রবিবার [illegible] চারকাটি পুঁতে আসতে হবে পুকুরে। মাছেরা যেমন সেয়ানী তেমনি চালাক। একটু গন্ধ পাইছে কি জলের উপর উঠতে চায় না। চারের কাছে একটু আধটু ঠোকরাবে কিন্তু মনোযোগ দেবে না। [illegible] একটা কিছু আছে তো। একবার—

বন্ধুর দল বাধা দিয়া বলে, এমন গল্প থাক শিবু, আমাদের রোববার কোথায় যাওয়া যায়, বল। ওবেলায় [illegible]—মাছেরা নিশ্চয়ই বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।

শিবকালী হাসিয়া বলে, না, মাছেরা প্রায়ই বিশ্বাসঘাতকতা করে না—ওরা আমাদের চেয়ে ভাল।

তাহলে ডাক্তার বাবুর সন্ধানে একটি পুকুর আছে—যাবে?

কোথায়!

কোথায়—বল না—ডাক্তার।

ডাক্তার অর্থাৎ সুধীর সবে আসেন [illegible] হইতে পাশ করিয়া বৈঠকখানায় সকালে ঘণ্টাখানেক ও বৈকালে ঘণ্টা দুই বিনামূল্যে দরিদ্র রোগী দেখিয়া পসার জমাইবার চেষ্টায় আছে।—এটি তার দ্বিতীয় পেশা—চাকরী একটি আছে—দশটা-পাঁচটা; সেইটিই সংসার-সমুদ্রের আসল নৌকা অবশ্য নৌকায় এখনও পাল তোলা হয় নাই—কেননা সে অবিবাহিত

একদা কোন ধনী আড়তদারের বাড়ীতে দুটি শক্ত কে[illegible] ভাল করিয়া সুধীর ডাক্তার তাহাদের কৃতজ্ঞতাপাশে দৃঢ়ভা[illegible]

আরম্ভ করিয়া ফেলে এবং ফলস্বরূপ কৃতজ্ঞ গৃহস্বামী তাঁহার দেশের পুষ্করিণীতে মাছ ধরিবার জন্য বার কয়েক সাদর নিমন্ত্রণও জানাইয়াছেন।

শিবকালী বলিল, বড় পুকুর নিশ্চয়।

বড় আর সখের। ওরা এখানে আড়তদার, দেশে জমিদার। আমাদের যে পুকুরে নিয়ে যাবে — সেখানে জমিদার বাড়ী আর অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব ছাড়া কাউকে ছিপ ফেলতেই দেয় না।

সকলে একসঙ্গে লাফাইয়া উঠিল, আজই ঠিক করে ফেল সুবীর দা।

একখানা চিঠি লিখিয়া দিল সুবীর। মিনিট দশেকের পথ আড়ৎ। উৎসাহী ছোকরা একজন ছুটিয়া গেল এবং অবিলম্বে মালিকের সাদর আহ্বান-লিপি লইয়া ফিরিয়া আসিল। বলিল বিকালে তিনিও আসবেন ক'জন যাবেন —

শিবকালী বলিল, কে কে যাবে হাত তোল

গুণিয়া ছয় জন হইল। ডাক্তার বলিল, আমি ছাড়া সকলের চেহারাই তো মাছটা বাঘে খেয়ে কুলোতে পারে না।

খুঁজো না বলছি ডাক্তার— আজ শনিবার।

খুঁজলে তোমাদেরই ভাল আচ্ছা — ওজন নেওয়া যাক।

গত মার্চ মাসের হিসাবমত সমবেত ওজন যাহা দাঁড়াইল —

বঙ্কু	৬৮০
হরকালী	৩৭
শ্যামবাবু	৩১২
মাণিক	২০৩
শিবকালী	২৬৮
সুবীর ডাক্তার	১৮৭

মোট [illegible]

ইহাদের মধ্যে আবার শিবকালী ছাড়া আর কেহ ভাল মাছ ধরিতেও জানে না। তবে ছিপ প্রত্যেকের জন্য মজুত করিয়া লওয়া হইবে। কারণ, ছিপ-ছেঁড়া পুকুর নহে— টোপ ফেলিয়া বসিবার যা অপেক্ষা যে কেহ একটু ছিপখানা নাড়িতে পারিলেই —বাস কমসে কম— পাঁচ সের একখানা —

সকলে সজোরে চীৎকার করিয়া উঠিল।

কথা রহিল রবিবার ভোর ছটায় যে প্রথম বাসখানি বেলগাছিয়া হইতে বসিরহাট যায় তাহাতেই চাপিতে হইবে।

কিন্তু সকলেই তো মৎস্য-শিকারী নহে— অত ভোরে উঠিবার অভ্যাস কাহারও নাই। শনিবারের রাতে তাস খেলিতে গল্প করিতে একটু রাত হইবেই। বাড়ীর মেয়েরাও খাওয়ার আয়োজন শেষ না করবে— নাইটের শোতে সিনেমা যাওয়ার উদ্যোগে মাতিয়া উঠে। ইহাদেরই বাড়ে বাবুরাটির কম শয়নের সুবিধা ঘটে না। শিবকালী মাছের মাছ ধরিবার নাম বলিয়া প্রত্যুষে উঠিয়া যথা-কর্তব্যগুলি সারিয়া নিকট প্রতিবেশী হরকালী ও বঙ্কুর দুয়ারে হানা দিল —

তারপর একে একে সবাইকে ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিল। হরকালী আসিল, মাণিক আসিল। তারপর সুবীর ডাক্তার।

শিবকালীকে দেখিয়াই সুবীর কহিল, আই অ্যাম রেডি। সিগারেট প্লীজ।

শিবকালী সিগারেট ধরাইয়া কহিল, ছিপ-টিপগুলো ঠিক করা আছে তো?

এভরিথিং।—ওরা কি করছে? হরা, বঙ্কা —বলিতে বলিতে ভোঁক ভোঁক শব্দে একখানা বাস বাহির হইয়া গেল। শিবকালী সখেদে কহিল, যাঃ।

সুবীর ডাক্তার সাশ্চর্য্যে প্রশ্ন করিল— যাঃ কি?

প্রথম বাস বেরিয়ে গেল। এখন উপায়?

সুবীর কব্জি উল্টাইয়া কহিল,—এখনও ছ'টা বাজতে চার মিনিট বাকি যে।

বাকি থাকলেই বা আমাদের কি। এক ঘণ্টা পরে সেই সেকেণ্ড বাস ছাড়া উপায় নেই। বেলা বাড়লে কি পুকুরে বসা যাবে?

সুবীর বলিল,— তাঁরা চারকাটি ফেলে সব ঠিক করে রাখবেন বলেছেন।

শিবকালী উষ্ণ হইয়া কহিল, রাখবেন, মানুষের মত মাছেরও মেজাজ আছে জান?

সুবীর কহিল, এখন চল অপদার্থগুলোকে টেনে তুলিগে— নইলে সেকেণ্ড বাসের আশাও শেষ।

ঘুম কি সহজে ভাঙিতে চায়! দ্বিতীয় বাস কিঞ্চিৎ দেরিতেই ছাড়িয়াছিল এবং হাত নাড়িয়া অনুনয় করিয়া তবে তাহাকে থামানো গেল। মানুষে ছিপে বাস আকণ্ঠ বোঝাই হইয়া গেল।

দু'জন লোক গোটাকতক খাবারের চাঙারি লইয়া অতিকষ্টে তাহাতে চাপিল। আড়ত হইতে গোলগাল মুখ ভুঁড়িদার এক ব্যক্তি গলা বাড়াইয়া বলিল,— চললেন তো তিনপোর বেলায় —খুব দায়িত্বজ্ঞান বাবুদের।

বাস তখন পূর্ণবেগে ছুটিতেছে। সুবীর চড়া গলায় কহিল, শিবু, শুনলে কথা?

কার কথা?

ঐ আড়তদারের ভাইয়ের। ও ব্যাটা নিজেকে নবাব খাঁজা খাঁ মনে করে। নেহি মাংগতা। এই রোখো — রোখো—

শিবকালী তাহার বাহুমূল ধরিয়া টানিয়া বসাইল, আরে—তাতে কি হয়েছে, বোস — বোস—

ছাড় ছাড়—ও আমাদের সবাইকে অপমান করেছে। যদি মনুষ্যত্ব থাকে—

সুতরাং মনুষ্যত্ব বজায় রাখিতে সকলকেই আড়ত হইতে প্রায় আধ মাইল দূরে নামিতে হইল। পুরা ভাড়া বুঝিয়া লইয়া বাস বাহির হইয়া গেল।

চাঙারি হাতে লোক দুইজনের পানে চাহিয়া বঙ্কু বলিল, মাইরি— তোরা এমন তাড়া লাগালি যে, নাস্তা করে আসবার ফুরসৎ পেলাম না। এইসা খিদে লেগেছে।

সুবীর কহিল, এইটুকু হেঁটে বেলগাছিয়ায় গেলেই তো হাজারটা দোকান— একটু সবুর সয় না!

সইতো দাদা, কিন্তু সামনেই ওয়েসিস্ দেখলে মরুভূমিকে কার ভাল লাগে! বলিয়া সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে খাবারের ঠোঙার দিকে চাহিল।

একজন লোক বলিল, তা খান না বাবুরা— এ তো আপনাদেরই জন্যে।

বঙ্কু এবং আরো অনেকে উৎসাহী হইয়া উঠিল। তাহাদের মিশ্র গুঞ্জনধ্বনিকে স্তব্ধ করিয়া দিয়া সুবীর ডাক্তার হাঁকিল, খবরদার, যদি আত্মসম্মানজ্ঞান থাকে—

অগত্যা আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া সকলেই ম্লানমুখে আড়তের সামনে পৌঁছিয়া গেল।

কেহ কোন কথা কহিল না।

কর্ত্তা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

অবশেষে একজন বলিল, আপনার ভাই আমাদের অপমান করেছে।

সেকি! বিস্ময়ে বিনয়ে কর্ত্তা হতভম্ব হইয়া গেলেন।

হুঁ —। আমরা না হয় ফার্ষ্ট বাস ধরতে পারিনি, তাই বলে টিট্ করা! বলে কিনা— এত বেলায় চললেন!

কি— হতচ্ছাড়া বলেছে এই কথা! হারামজাদার কান না ধরে—এই গদা— গদা—

কর্তাকে সলজ্জ নববধূ হইতে সহসা মুখরা গৃহিণীতে পরিণত হইতে দেখিয়া সকলেরই ত্রাস হইল। না জানি কি খুন-খারাপীই না ঘটিয়া যায়! তেমন কিছু অবশ্য ঘটিল না। গদা আসিয়া খবর দিল, ছোট কর্ত্তা শ্যামবাজারে বাজার করিতে গিয়াছেন।

আসুক ফিরে হারামজাদা—তার কি হাল করি।

আচ্ছা —নমস্কার।

কর্তা ছুটিয়া আসিয়া সুবীর ডাক্তারের পথ রোধ করিয়া কহিলেন, দোহাই ডাক্তারবাবু— আপনারা চলে গেলে আত্মহত্যা হবো। দাদাকে খবর পাঠানো হয়েছে— আপনারা না গেলে— দোহাই আপনাদের —

পালাক্রমে তিনি সকলকেই অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন।

অবশেষে সুবীর ডাক্তার নরম হইয়া কহিল, কিন্তু এখন যাবার উপায় কি —আর তো বাস নেই।

ট্যাক্সি—ট্যাক্সি করে যাবেন। যেমন করে হোক— যাওয়া চাই। গদা— শ্যামবাজারের মোড় থেকে ট্যাক্সি নিয়ে আয়— জলদি।

গদা ছুটিল। তিনি কোঁচার প্রান্ত ধরিয়া বিনীত হাস্যে বলিলেন, অনেক কষ্ট হয়েছে আপনাদের, আড়তের মধ্যে বসে একটু জল টল সেবা করে—

সে বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ ছিল না।—

সেবার কার্য্য কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে কর্ত্তা বলিলেন,— আচ্ছা— আমিও দেখছি যদি এখান দিয়ে কোন ট্যাক্সি যায়।

ইহাদের জল খাওয়া শেষ হইতে না হইতে কর্তার গলা শোনা গেল, এই ট্যাক্সি—রোখো—রোখো—

সাতজনের চাপা শেষ হইলে—ট্যাক্সি চালক ষ্টীয়ারিং ছাড়িয়া নামিয়া আসিল। একবার আরোহীদের পানে—আরবার টায়ারের পানে চাহিয়া কহিল, না বাবু, মাপ করবেন। সামান্য ভাড়ার জন্য গাড়ি-খানাকে জখম করবো না। দেখুন না হাওয়া পাম্প করা টায়ার কতখানি চ্যাপ্টা হয়ে গেছে।

কর্তা বলিলেন, বাবুরা বকশিশ দেবেন—চালিয়ে নিয়ে যাও।

পাঁচ টাকার কম নেব না—হুঁ।

অগত্যা তাই। ইতিমধ্যে মাছ ধরার বাতিক সকলের মধ্যে অল্প বিস্তর সঞ্চারিত হইয়াছে। জলখাবারের রাজসিক ব্যবস্থার পিছনে ভূরিভোজের বিরাট ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ করিতেছে সকলেই এবং সেই সঙ্গে মাছ ধরার অভূতপূর্ব আয়োজন। সে আয়োজনের কাছে পাঁচটি টাকা অকিঞ্চিৎকর।

যাত্রার পূর্বে ট্যাক্সিচালককে জলখাবার খাওয়াইয়া তাহার পূর্বস্মৃতিটুকু নিঃশেষে মুছিয়া দিল। সকলের সঙ্গে গাড়িটাও যেন আনন্দে মাতিয়া উঠিল।

কিন্তু সে আনন্দ কতক্ষণের জন্যই বা! মাইল দুই পথ বোধ হয় অতিক্রান্ত হয় নাই—একটা বিশ্রী শব্দের সঙ্গে গাড়ি কাত হইয়া একেবারে ন যযৌ—ন তস্থৌ। টায়ার ফাটিয়াছে। চালকের তখন রোখ চাপিয়াছে। অভয় দিয়া বলিল, কুছ পরোয়া নেই—একসট্রা টায়ার আছে—এখনই সব ঠিক করে নিচ্ছি।

নূতন টায়ারে সজ্জিত হইয়া গাড়ি পূর্ণ বেগে ছুটিল—সকলেই উল্লাস ধ্বনি করিয়া উঠিল।

বেড়াচাপা ষ্টেশনের ধার দিয়া যাইবার সময় বন্ধু কহিল, আঃ আঃ মাইরি—কায়দা ডাব সাজিয়ে রেখেছে—গাড়ি থামিয়ে গোটাকতক ডাব খেয়ে নিলে হ'তো।

কথা শেষ হইতে না হইতেই গাড়ি থামিয়া গেল। তেমনই একটা বিশ্রী শব্দ উঠিল এবং তেমনই কাত হইয়া পড়িল।

হরকালী মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, খাও ডাব। যত সব—

চালক হাসিমুখে বলিল, বাবু—আর টায়ার নেই—নামতে হবে।

চালক এমন অবস্থায় হাসিতেছে! কিন্তু হাসাটাই ওর স্বাভাবিক। গূঢ় প্রতিহিংসা তৃপ্তির আনন্দেই বড় বড় ক্ষতিতেও ওর ভ্রূক্ষেপ নাই।

পুরা ভাড়া সে পাইল না—তবু যাইবার সময় একটা নমস্কার করিতেও ভুলিল না।

শিবকালী বলিল, চল মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করে জানা যাক—ট্রেন কখন আসবে।

তুমি যাও—আমরা এই অশথ গাছের ছায়ায় বসি একটু।

শিবকালী ফিরিয়া আসিয়া কহিল, ট্রেন আসবে বারটা [illegible] নাগাদ। কোম্পানীর লাইন—কোন দিন ঠিক সময়ে গাড়ি আসে না—যদি আরও বিশ ত্রিশ মিনিট ধরে রাখো।

বন্ধু বলিল, ডাব আনাও মাইরি। ব্যাপারটা ক্রমশঃই ঘোরালো হয়ে আসছে। এমন তেষ্টা পেয়েছে।

সে তৃষ্ণা সংক্রামণীয়। এক কাঁদি ডাব শেষ হইলে আড়তের যে লোকটা সঙ্গে ছিল—সে কহিল, আপনারা ট্রেনেই যাবেন?

হাঁ—তা ছাড়া উপায়ই বা কি। কতখানি পথ আছে?

তা দু' ক্রোশ তো বটেই।

দু' ক্রোশ—অর্থাৎ চার মাইল?

আজ্ঞে।

শিবকালী সকলের পানে চাহিয়া কহিল, পারবে হাঁটতে?

বন্ধু প্রচণ্ড নিঃশ্বাস ছাড়িয়া ও সশব্দে হাসিয়া কহিল, মাপ কর বাবা।

সুধীর কাঁধ উঁচাইয়া কহিল, এপারেরটা বাকী, এরপর গিয়ে বসে মাছ ধরবে—

মালিক লোকটাও খাড়া হইয়া উঠিল, চলো হেঁটেই যাওয়া যাক।

বন্ধু গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়া আর একবার হাসিয়া উঠিল, ক্ষেপেছ!

অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল—একখানি গরুর গাড়ি লওয়া ভাল।

হরকালী বলিল, গাড়ি তো দু'খানা—একখানায় কুলোবে না। কিন্তু ট্রেনে গেলে আগে পৌঁছনো যেত।

শ্যামবাবু প্রতিবাদ করিল, ট্রেন থেকে নেমেও তো খানিকটা হাঁটতে হবে। কতখানি সে?

লোকটি উত্তর দিল, এজ্ঞে—পেরায় দু' ক্রোশ।

হরকালী বলিল, দু' ক্রোশ ছাড়া কথাই কও না যে।

ভদ্রলোকের এক কথা।

সুধীর বলিল, ডাক গাড়ি। একবার যখন চাপতেই হবে—এখন থেকেই হোক।

সেখানেই যাত্রা শুরু হইল। সে যাত্রাও কৌতুকের। এ-গাড়ির লোক ও-গাড়ির লোকের সঙ্গে হাস্য পরিহাস করিতে করিতে চলিল।

খানিক পরে পিছনের গাড়ি হইতে সুধীর হাঁকিল, বন্ধু কথা কচ্ছে না যে?

ও-গাড়ি হইতে শিবকালী উত্তর দিল, বন্ধুর আফিং [illegible]।

ঘুমুচ্ছে? সর্বনাশ! জাগো—জাগো, নাক ডাকলেই বলদ দুটো ল্যাজ তুলে মাঠের দিকে ছুটবে।

আচ্ছা—নাক ডাকলেই চিমটি কাটবখন।

বেলা বাড়িতেছে। উপরের চড়া রোদ ভিতরের আহার-পরিতৃপ্ত মানুষগুলির মাথাতে শিথিল তন্দ্রার আবেশ ঘনাইয়া তুলিতেছে। উভয় প্রত্যুত্তর আর কণ্ঠের মধ্যেই বদ্ধ হইয়া গেল।

তারপর প্রচণ্ড একটা শব্দে সকলে জাগিয়া উঠিল। না, মোটরের টায়ার ফাটার শব্দ নয়—লেভেলক্রসিংএর কাছে গাড়ি দু'খানা দাঁড়াইয়া আছে—আর গেটের ছোট ট্রেনখানি ঝম্ ঝম্ করিয়া বাহির হইয়া গেল। ঘুমের ঘোরে মৃদু শব্দও প্রচণ্ড বোধ হয়।

হরকালী বলিল, যাঃ ট্রেন বেরিয়ে গেল!

ডাক্তার কব্জি উল্টাইয়া কহিল, বারোটা বাজতে তিন মিনিট। ট্রেন আজ রাইট টাইমেই এসেছে।

ট্রেনে এলেই ভাল হতো। যত সব—প্রত্যেকে প্রত্যেকের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া কোলাহলটা বাড়াইয়া তুলিল। সেই কোলাহলের মধ্যে ঘর্ঘর শব্দে গাড়ি দু'খানা কাঁচ-কোঁচ, মৃদু আর্তনাদে মেঠো পথে টাল খাইতে খাইতে চলিল। ঝাঁকানির চোটে আর গল্প জমিল না, অনেকগুলি কণ্ঠনালী-বাহিত প্রাকৃত ভাষাই খেদোক্তির সঙ্গে বাহির হইল।

আসুন আসুন—এত দেরি করলেন!

আমরা কখন থেকে—একি মুখ চোখ শুকনো কেন? অসুখ টসুখ—

কেহ কোন কথা না বলিয়া বৈঠকখানায় বিস্তৃত সুসজ্জিত ফরাসে দেহ ঢালিয়া দিল। প্রকাণ্ড দুখানা তাল পাখা ঘুরিতে লাগিল। এক কাঁদি ডাব ও এক ডজন কাঁচের গ্লাস লইয়া কয়েকজন লোক দেখা দিল। সেবার প্রথম পর্বটা কাটিয়া গেলে স্নানের তাগাদা আসিল এবং স্নানের পর আহারের রাজসিক ব্যবস্থা। কেহই আর বাঙনিষ্পত্তি করিতেছে না। যেটি আসিতেছে সেইটিতেই অখণ্ড মনোযোগ। ছিপগুলি বাহিরের দেওয়ালে গোছা সমেত ঠেসানো আছে। ভূরিভোজনের চাপে ওগুলির মর্যাদা বুঝি নষ্ট হইয়া যায়।

বন্ধু তাকিয়ার উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া সিগারেটে প্রবল টান দিয়া কহিল, রাখ বটে।

হরকালী পান চিবাইতে চিবাইতে বলিল, রীতিমত অ্যাডভেঞ্চার।

ডাক্তার কব্জি উল্টাইয়া ঈষৎ হাসিল।

শিবকালী প্রশ্ন করিল, ক'টা?

বেলা যে পড়ে এলো—জলকে চল।

মাপ কর বাবা। এরপর একটি ঘুম না হ'লে—বন্ধু কাত হইল।

শ্যামবাবু বলিল, তাইতো শিবু—পড়িছে ভোজের মুখে—ভাঙ্গে হাঁটার ধার।

শিবকালী বলিল, চারটে বাজুক আর সন্ধ্যেই হোক—পুকুরধারে একবার বসতে হবে।

আমি তো বাবা পাদমেকং গচ্ছামি।

আমিও—

আমিও—

প্রতিধ্বনি মিলাইতে না মিলাইতে একজন লোক আসিয়া করজোড়ে কহিল, কর্তা আমারে পেটিয়ে দিলে বাবু তেনারা পুকুরধারে ছিপ এগুলে বসে আছে, আপনারা আসুন।

শিবকালী জিজ্ঞাসা করিল, কতদূর রে?

এজ্ঞে—কতদূর আর—এই রশিটাক। বাগেদের আমবাগান পেরিয়ে—একখানা মাঠের কোটি ওপারে—

আচ্ছা—মিনিট দশেক পরে যাচ্ছি।

স্নান অন্ধকারের পরিতৃপ্তিতে স্নায়ু পুনরায় শিথিল হইয়া আসিতেছে। নিদ্রাদেবী আর একবার রহস্য করিলেন। চাকরটা দু'বার ফিরিয়া গেল—তৃতীয়বার আসিল বাবুদের একজন আত্মীয়। সে শিবকালীর গায়ে মৃদু ঠেলা দিয়া কহিল, জেঠামশায় ডাকা-ডাকি করছেন—আপনারা কি আজ পুকুর-ধারে বসবেন না?

তন্দ্রাশিথিল চক্ষু টানিয়া শিবকালী জড়িতস্বরে কহিল, ক'টা বাজে?—প্রায় ছ'টা, এরপর গেলে—

শিবকালী লাফাইয়া উঠিল। পার্শ্বে শায়িত বন্ধুর পেটে একটা ঘুঁসি মারিয়া কহিল, এই রাস্কেল—ওঠ বলছি।

গাঢ় নিদ্রায় নাড়া খাইয়া বন্ধু মনে করিল—ঘরে চোর ঢুকিয়াছে এবং তাহার বাহুমূলের সোনার কবচটা ছিনাইয়া লইবার জন্য তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে। একটা বিশ্রী রকমের চীৎকার করিয়া সে ডাক্তারের দিকে গড়াইয়া গেল এবং সেই বেগ শ্যামবাবু ও হরকালী পর্যন্ত সঞ্চারিত হইয়া রীতিমত একটা গোলের সৃষ্টি করিল।

শিবকালী তৎক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চাপা গিজ্‌গিজে কণ্ঠে কহিতেছে, তোরা কি শুধু ঘুমোতেই এসেছিস? বেশ ঘুমো পড়ে পড়ে—আমি পুকুরধারে চললাম।

ডাক্তার উঠিল—তার সঙ্গে শ্যামবাবু, হরকালী প্রভৃতিও উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমরাও যাব। শেষ পর্যন্ত মোটা বন্ধুও ছিপ হাতে মোটা পায়ে পা বাড়াইল।

বাঃ—বেশ লাগছে—বন্ধু বলিল।

পাড়াগাঁর একটা লোভ আছে—সকালে আর বিকেলে—হরকালী মন্তব্য করিল।

বন্ধু মুখ মচকাইয়া বলিল, যেন চিরকাল বাস করে আসছিস—পাড়াগাঁয়। জন্ম অবধি তো বেলগেছের বাইরে পা দিলিনি—তুই কি বুঝবি রে—

নাঃ—বক বাক তুমি বেশী পেটুক হলে—কোন জিনিষই পেটের মধ্যে থেকে বেরোতে চায় না!

কি আমার কবি লোক রে—।

দু'জনের কলহে এবং বাকী সকলের মজুলো বাগেদের বাগান পার হইয়া ইহারা মাঠে আসিয়া পড়িল।

—পড়ন্ত রোদে মাঠের অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। জমিতে লাঙল দেওয়া হইয়াছে—এক পশলা বৃষ্টি হইলেই বীজ বোনা হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলে বিভক্ত অসংখ্য জমির— চলিবার পথ সেই সঙ্কীর্ণ আলের উপর দিয়া।

আর কতদূর বাবা?

এজ্ঞে—রশিটাক!

এ কি ডালভাঙ্গা রশি?

এজ্ঞে—উই যে শিল শিল করছে নারকোল গাছটা, ওটা পুকুরের মধ্যিতে।

বেশ—বাবা—বেশ।

পুকুরে পৌঁছিতে পড়ন্ত রোদটুকুও মুছিয়া গেল। কর্তা একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া প্রকাণ্ড পুকুরের সিকি অংশ জুড়িয়া চারকাঠি পুঁতিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। কর্তা হয়তো কিছু বলিতেন, কিন্তু বাবুদের চেহারা দেখিয়া বিশেষ কিছু অভিযোগ করিলেন না। এমন বিপুল বপুবিশিষ্ট লোকদের মাছ ধরিবার জন্য অনুযোগ বৃথা বুঝিয়াই শুধু কহিলেন, সন্ধ্যে হ'য়ে এলো।

শিবকালী বলিল, পথে আসতে যা এ্যাক্সিডেন্ট! আচ্ছা দেখি একবার চেষ্টা করে।

উদ্যোগ করিয়া বসিতে না বসিতে সন্ধ্যার ছায়া আম গাছের মাথা হইতে নামিয়া জলে পড়িল—ফাতনাও ক্রমশঃ সেই ছায়ায় মিশিয়া গেল।

কর্তা বলিলেন, আচ্ছা—কাল হবে। আজ তো সব ঠিক করাই রইলো—

নীরবে দলটি পথ অতিবাহন করিতে লাগিল।

রাত্রির রাজসিক আহারের পর বন্ধু বলিল, জায়গাটা মন্দ নয়। বেশ বড় পুকুর—মনে হলো মাছ আছে।

তাতে কি? ডাক্তার জবাব দিল।

না—তাই বলছি কাল খালি হাতে ফিরতে হবে না।

তুমি থেকো।

ডাক্তারের নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বরে হরকালী বলিল, তুমি থাকবে না?

না।

কেন? এমন খাটের ব্যবস্থা—

খাট দিতে আসিনি—মাছ ধরতেই এসেছিলুম।

তাইতো বলছি—কাল না থাকলে—

তোমার কি অফিস নেই! মাথা নাড়িয়া কহিল, না—কিছুতেই থাকা হবে না। ভোর বেলার প্রথম ট্রেনে ক'লকাতায় ফিরতেই হবে।

বন্ধু শিবকালীর পানে চাহিয়া কহিল, আচ্ছা শিবুদা, অত্যাধ বলছি কিছু? মাছ ধরতে এসে মাছ না নিয়ে গেলে—

ডাক্তার বলিল, বেশতো—তোমরা মাছ ধরেই নিয়ে যেয়ো। আমি শুধু থাকতে পারব না—তাই বলছি।

মাইরি আর কি। কি বলে সেই—গলা নেই গান গায় মনের আনন্দে—তাই আর কি।

ডাক্তার কিছুতেই রাজী হইল না। ভোর বেলায় উঠিয়া যথাকর্তব্য সারিয়া কহিল, রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াইলে—যে বাস আসবে—তাইতেই—

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বাস আর আসে না। ডাক্তার কব্জি উল্টাইয়া কহিল, সাড়ে সাতটায় ট্রেণ—হেঁটে গেলেও পাব।

পা বাড়াতেই মোটা বন্ধু কহিল, দু'—মাইলেরও বেশী রাস্তা—

ডাক্তার ততক্ষণে অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছে।

বন্ধু নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, ওর কি—ফিঙের মত শরীর ট্রেণ পেয়ে যাবে।

হরকালী বলিল, ট্রেণ না পেলে আজ আর একবার চেষ্টা করলে মন্দ হয় না।

শিবকালী কহিল, বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ঢুকলে মান থাকবে। তা ছাড়া ডাক্তার নেই। ষ্টেশনে আমাদের যেতেই হবে—তা যে ট্রেণই পাই।

ভোঁক ভোঁক করিয়া মোটরের আওয়াজ হইল।

শিবকালী কহিল, এস—সার বেঁধে দাঁড়ানো যাক—নইলে মোটর থামাবে না।

তাহার অনুমানই সত্য। ড্রাইভার চোখ পাকাইয়া কহিল, কেমন ভদ্রলোক আপনারা—পথ ছাড়ুন।

আমাদের নিতে হবে ভাই।

কোথায় নেব? ফুটবোর্ডে অবধি লোক ঝুলচে।

তা জানি না—নিতে হবে।

ভাল বিপদ তো! আপনাদের নিলে গাড়ি আমার থাকবে?

থাকবে ভাই, থাকবে। ওপরের দেখ-নাই শুধু ভেতর ফাঁপা। বোঝার ওপর শাকের আঁটি বৈত না!

শাকের আঁটিই বটে। কখনও ওজন নিয়েছেন নিজেদের?

অনেক—অনেকবার। এই আসবার আগেই—

থাম বক্তা। তাহাকে ধমকাইয়া শিব-কালী বলিল, ভাড়া না হয় বেশি নেবে—দেখচো তো আমরা হাঁটতে অক্ষম।

হরকালী বলিল, না নিলে পথ ছাড়বো না—তাতে যা ঘটে ঘটুক।

তবে আসুন—যায় যাক আমার গাড়ি।

কষ্ট সকলকারই হইল—চাকাও খানিকটা বসিয়া গেল। ড্রাইভার গজ গজ করিতে লাগিল। যাত্রীরাও খুব প্রসন্ন মনে নবাগত-দের গ্রহণ করিল না। আধ মাইল পথ আসিতে না আসিতে ডাক্তারকে দেখা গেল।

ওকে তুলে নিতে হবে—শিবকালী শ্যামবাবুর কানে কানে বলিল।

নিশ্চয়—থামাও—থামাও হে ড্রাইভার।

না মশায়—আর গাড়ি থামালে ট্রেণ ধরতে হবে না।

দোহাই ভাই—আমাদের সঙ্গের লোক উনি।

ঘন ঘন দড়ি টানাতে ও চীৎকার করাতে ড্রাইভারের আর ধৈর্য রহিল না। ঘ্যাঁচ করিয়া গাড়ি থামাইয়া সে ষ্টিয়ারিং

[ইহার পর ৩০৮ পৃষ্ঠায়]

লাশিওর মায়া

[২৬৭ পৃষ্ঠার পর]

তফাতে নদীর পাশেই একটি কুঁড়ে ঘরে। ঘুরে ঘুরে বড্ডো জলতেষ্টা পেয়েছিল, ভাবলুম যে, নদীতে নেমে খানিকটা জল খেয়ে নিই। আঁজলা ভরে জল খাচ্ছি দেখে চীনা সর্দার তার ঘরের দাওয়া থেকে চেঁচিয়ে আমায় ডাকলে, ইসারা করে বললে যে, ও খারাপ জল খেয়োনা, এখানে এসে জল খেয়ে যাও।

সর্দারের দাওয়াতে গিয়ে উঠলুম। আমি তাকে চিনি না, কিন্তু দেখলুম সে আমাকে চেনে, হেসে ডাক্তার বলে আমায় অভ্যর্থনা করলে। তার বৌ ঘর থেকে বেরিয়ে একটা বসবার জায়গা এনে দিলে। তিন চারটি ছেলে মেয়ে খেলা ফেলে এসে আমাকে ঘিরে দাঁড়ালো।

কিছুক্ষণ পরে সর্দারের বৌ নিয়ে এলো দুটি ডিম সিদ্ধ আর এক ঘটি জল। ডিম দুটো দেখে আমি অবাক হয়ে গেলুম, কী করবো স্থির করতে না পেরে আগে খানিকটা জলই খেয়ে নিলুম। ডিম খেতে আমি ইতস্ততঃ করছি দেখে সর্দারের বৌ তাড়াতাড়ি কী কতকগুলো কথা বললে। বুঝতে না পেরে আমি অপ্রস্তুত হয়ে চেয়ে রইলুম। তখন সে পেটে হাত দিয়ে দেখিয়ে বার বার ক'রে বলতে লাগলো—খুঃ খুঃ ? বলতে বলতেই সে হেসে গড়িয়ে পড়লো। বুঝলুম, সে বলতে চায় যে, এই দুটো খেলে কি তোমার পেটব্যথা করবে? তবুও ইতস্ততঃ করছি দেখে সে একটা ডিম নিয়ে জোর ক'রে আমার মুখে গুঁজে দিলে।

এরপর থেকে প্রায়ই আমি বেড়াতে বেরিয়ে তাদের বাড়ি যেতে লাগলুম। সহজেই একটা ঘনিষ্ঠতা জমে উঠলো। দেখলুম যে, এরা বেশ সুখী পরিবার। সর্দারের অনেকগুলি ছাগল ভেড়া আছে, কিছু মুরগী আছে, তরিতরকারির আর ভুট্টার ক্ষেত আছে। আমি গেলেই আমাকে খুব আদর আপ্যায়ন করে কিছু-না-কিছু খাওয়ায়।

একবার আমার জ্বর হলো, কিছুদিনের জন্যে ওদিকে যেতেই পারলুম না। সর্দার নিজে এসে আমার খবর নিয়ে গেল, দুধ এনে খাইয়ে গেল। তার পরে যখনই ওদের বাড়িতে যেতুম তখনই ওরা আমাকে দুধ খেতে দিত; সর্দারের বৌ বলতো, রোগা হ'য়ে গেছ দুধ খাও, দুধ খেলে পেটব্যথা করবে না। সর্দারের বৌ আমাকে তাদের ভাষাটা কিছু কিছু শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছিল, প্রয়োজনের কথাগুলো কিছু কিছু বুঝতে পারতুম

মেয়েটির উপস্থিতবুদ্ধি বড্ডো বিস্ময়কর। বিদ্যা আলাদা জিনিস আর বুদ্ধি আলাদা জিনিস। বুদ্ধি জিনিসটা শিক্ষার উপর কতখানি নির্ভর করে তা জানি না, কিন্তু এই অশিক্ষিত পার্বত্য রমণীর তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পেয়ে মাঝে মাঝে আমি অবাক হয়ে যাই। যেমন ভাবে সে তার দুর্ধর্ষ স্বামীটিকে পোষ মানিয়ে রেখেছে—শুনেছি লোকটা আগে রাহাজানি করতো—, যেমনভাবে ছেলেমেয়েগুলিকে স্বাস্থ্যবান রেখে যত্নের সঙ্গে মানুষ করছে সেটা মেয়েদের পক্ষে খুব অসাধারণ কিছুই নয়, কিন্তু এ ছাড়া আরো তার অনেক রকম অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় আমি পেয়েছি। সব কথা আমার মনে নেই, কিন্তু একটি কথা এখনও বেশ মনে আছে।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে ওদের বাড়ি থেকে ফিরছি, হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে পায়ে কী কামড়ালো। পায়ের দিকে চেয়ে দেখি কামড়ে ধরেছে প্রকাণ্ড এক পাহাড়ে কাঁকড়াবিছে। সেটাকে যদিও তখনি টেনে ফেলে দিলাম, কিন্তু তার যে কী জ্বালা! উন্মাদের মতো ছটফটিয়ে আমি ওদের বাড়ির দিকে ছুটলুম, দাওয়ার নিচে শুয়ে পড়ে নিদারুণ যন্ত্রণায় গড়াগড়ি দিতে লাগলুম। তখন কেবল গোঁ গোঁ করছি, কথা বলবার শক্তি নেই। সর্দারের বৌ ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, তৎক্ষণাৎ বুঝে নিলে ব্যাপারটা কী। একবার কেবল জিজ্ঞাসা করলে কোথায় কামড়েছে, আমি গোঙাতে গোঙাতে পাটা দেখিয়ে দিলাম। তৎক্ষণাৎ সে ঘর থেকে একটা নরুণের মতো যন্ত্র নিয়ে এলো, তাই দিয়ে পায়ের মাংসটাকে চিরতে লাগলো। খানিক পরেই হঠাৎ নরুণ ফেলে সে পা-খানা দুহাতে দিয়ে চেপে ধরলো আর ক্ষতস্থানে মুখ লাগিয়ে প্রাণপণ জোরে চুষতে লাগলো। কী ভীষণ তার শক্তি! অনেকক্ষণ ধরেই চুষতে লাগলো, কিছুতে ছাড়তে চায় না। ডাক্তারিতে কাপিং করার প্রক্রিয়া দেখেছি, তাতে যেমন সজোরে মাংস চুষনের দ্বারা রক্তমোক্ষণ করে, অনেকটা তেমনি ব্যাপার। যখন ছেড়ে দিলে তখন অনেক রক্ত বেরিয়ে মাংসটা জবাফুলের মতো লাল হ'য়ে উঠেছে আর কতকটা অসাড় হ'য়ে এসেছে। তখন কী একটা গাছের পাতা তুলে এনে দাঁতে দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে তার উপর প্রলেপের মতো লাগিয়ে দিলে। দেখতে দেখতে আমার সমস্ত জ্বালা কমে গেল, আমি সুস্থ হ'য়ে উঠলুম।

এইখানে একটা জিজ্ঞাস্য আছে, যে প্রশ্ন আমারও তখন অনেকবার মনে জেগেছিল,—ওর এই সব অদ্ভুত আচরণ সম্বন্ধে—তোমরা কী বলতে চাও? এ কি সেই—তোমরা যাকে বলো অজানা মনের প্রতি চিরন্তনী নারীর একটা কৌতূহলজনিত ইন্দ্রিয়বাঞ্ছিত প্রেম,—না সুযোগসন্ধানী পুরুষের লোভ জাগানোর প্রতিক্রিয়া? ওসব কিন্তু কিছুই না। একেতো আমার চেয়ে তার বয়স যথেষ্টই বেশি। আর আমার চেহারাটা এমনিতেই অতি অপরূপ তার উপর দাড়ি-গোঁফ গজিয়ে অযত্নে অবহেলায় আরও অনেক বেশি অপরূপ হ'য়ে উঠেছিল, আর ঐ আরশোলা রঙের মতো কদাকার দেখতে আমার পা দুটো—না না, এই কুৎসিত ভেতো ভীরু বন্দী বাঙালীর প্রতি ঐ শক্তিমতী পাহাড়িয়া নারীর দুর্নিবার প্রেম জন্মাবে এ তোমরা কখনোই ভেবো না। প্রেম, অনুরাগ, ভক্তি, বাৎসল্য ও সব কিছুই না। চীনা সর্দার যথেষ্ট শক্তিমান ও সুপুরুষ, ও তাকে যথেষ্ট ভালোবাসে। স্নেহ করবার পাত্রেরও তার অভাব নেই। এ ক্ষেত্রে সেই সহজাত মমতা ছাড়া কোন অর্থ নেই, উদ্দেশ্য নেই, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা নেই, যা পৃথিবীতে প্রথম প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয় জীবের মানসিকতায় জন্মলাভ করেছিল। মমতার মধ্যে নিছক মমতা ছাড়া অন্য কোন অর্থ থাকতে পারে, এটা অসম্ভব। হয়তো এতে পেট ভরে না, কিন্তু নিতান্ত নিবিড় স্নেহ এটুকু না থাকলেও মানুষ বাঁচে না। আমাকে তো এর এটুকুই ওখানে অনেকদিন বাঁচিয়ে রেখেছিল।

ওদের বাড়িতে আমি ছাড়া আরো একজন বিদেশী লোক প্রায়ই যাতায়াত করতো। সে যে কোন জাতের লোক ঠিক বুঝতে পারতুম না। মনে হতো লোকটা যেন জাপানী, কারণ জাপানীদের মতোই বেশভূষা ক'রে সে থাকতো। তবে ঐ আমার মতোই সে আসা যাওয়া করতো, আমাদের জাপানী সৈন্যদলের মধ্যে তাকে কোনোদিন দেখিনি। দেখতুম যে, সর্দার আর বিশেষতঃ সর্দার পত্নীর সঙ্গে তার খুবই অন্তরঙ্গতা। কিন্তু আমি উপস্থিত থাকলেই সে একেবারে চুপ ক'রে থাকতো, আর একটিও কথা বলতো না। অনেকবার আমি তার সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা করেছি, নানা ছুতোয় কথা বলতে গিয়ে দেখেছি, কিন্তু কখনো তার মুখের কথার কোন সাড়াই পাইনি। সকল কথার উত্তরেই সে একটুখানি মুচকি হাসি হেসে বোকার মতো চুপ ক'রে থেকেছে। তখন আমার ধারণা হতো যে, আমার কোনো ভাষাই সে বুঝতে পারে না। নিরুপায় অপদস্থ হ'য়ে আমি আলাপে বিরত হতুম, আমার ভাবগতিক দেখে সর্দারের বৌ খুব হাসতো। ওর হাসি দেখে আমার মনে মনে রাগ হতো, বিরক্ত হ'য়ে আমি ভ্রূকুঞ্চিত করতুম। সর্দারের বৌ এর এটুকুও নজরে এড়াতো না, আমার মুখের দিকে চেয়ে সে আরো জোরে হেসে উঠতো। বিরক্ত হয়ে আমি ভাবতুম, এত হাসিরই বা কারণটা কী?

জাপানীদের মধ্যে বহুদিন বাস ক'রে ওদের কথাগুলোও কিছু কিছু বুঝে নিতে পারতুম। অনেক সময় ওদের সিপাহী-সান্ত্রীরা উপযাচক হ'য়ে আমার সঙ্গে আলাপ-সালাপ করতো। যুদ্ধের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেই ওরা আমার কাছে প্রায় বলাবলি করতো এবং ওদের যে কতখানি অপরাজেয় শক্তি, সেই কথাটাই আমাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করতো। ওদের নিশ্চিত ধারণা ছিল যে,

ওরাই যুদ্ধে বরাবর জিতে আসছে আর ভারতবর্ষের মধ্যে ক্রমাগতই অগ্রসর হ'য়ে চলেছে। প্রায়ই ওদের মুখে শুনতে পেতুম যে, এতদিনে ওদের সৈন্যেরা দিল্লীর কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছলো, ভারতবর্ষ দখল হ'য়ে যাবার আর বেশি বিলম্ব নেই। আরো শুনতুম যে, বাংলাদেশ তো ওদের অধিকারে এসেই গেছে, কলকাতায় বোমা ফেলে ওরা সমস্ত বাড়ীগুলোকে চুরমার ক'রে দিয়েছে, সেখানে এখন জাপানী নোট দিয়েই সমস্ত কেনাবেচা চলছে। এই সব কথা সম্পূর্ণ না হোক, কতকটা সঠিক ব'লে আমি বিশ্বাসও করতুম। বাইরের খবর কিছুই সেখানে পাওয়া যায় না, ওরা যা বলে তাই মেনে নিতে হয়। সৈন্য বিভাগের লোক, নিশ্চয় কিছু কিছু খবর রাখে। আমি এক রকম ভেবেই রেখেছিলুম যে, এবার জাপানীরাই আমাদের দেশে রাজত্ব চালাবে, আমাকে এবার জাপানী ভাষাই শিখতে হবে আর জাপানী ডাক্তারি প্র্যাকটিস করতে হবে। জাপানীরা জিতছে শুনে আর দুঃখ হতো না, মনে মনে বরং একটা আশাই উঁকি মারতো। এই লড়াইটা যেমনভাবে হোক নিষ্পত্তি হ'য়ে গেলেই বাঁচা যায়, দেশে ফিরে গিয়ে তখন না হয় ওদের সম্বন্ধে করা যাবে, এটাই যখন আমাদের পক্ষে সব চেয়ে নিরাপদ।

অনেক কাল পরে একবার একদল সৈন্য চীনে যাবার পথে যেতে যেতে আমাদের দলের কাছাকাছি ছাউনি গাড়লে। দুই দলের সৈন্যদের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের আলাপ আলোচনা হ'তে লাগলো। তাদের মুখেই অনেক নতুন খবর শুনতে পেলুম, বুঝলুম যে, আগেকার শোনা খবরগুলো সবই মিথ্যে, সম্প্রতি নাকি এরা মণিপুর দখল করতে গিয়েছিল, কোহিমাতে মার খেয়ে ফিরে আসতে হয়েছে।

এর পর থেকেই মাঝে মাঝে আমাদের উপর বোমার উৎপাত হ'তে সুরু হলো। যেখানে যেখানে কুলীদের দল কাজ করতে যায়, সেখানেই উপর থেকে বোমা পড়ে। কখনো কখনো প্রকাণ্ড আমেরিকান বোমারু-গুলোকে দেখতে পাওয়া যায় কখনো বা কিছুই দেখা যায় না, অদৃশ্য বোমারু থেকে বোমা বৃষ্টি হয় কুলিরা ভয়ে ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়ে, তাড়াতাড়ি খানার মধ্যে গিয়ে লুকোয়।

তারপর প্রচুর লোকক্ষয় হ'তে লাগলো। এক একটা বম্বার্ডমেন্টের পরে অনেক লোক মরে যায়, অনেককে খুঁজে পাওয়া যায় না। কুলিদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল কেউ আর কাজ করতে যেতে চায় না, সৈন্যদের সঙ্গিনকেও তারা আর ভয় করে না। অনেক কষ্টে তাদের কাজে লাগাতে হয়। আমারও অনেক কাজ বেড়ে গেল, কেবল টিংচার আইডিন দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধার কাজ।

এই সময় একদিন সেই চীনা সর্দারের বৌ আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—যখন বোমা পড়ে, তখন তুমি কোথায় থাকো?

আমি বললুম—তখনকার মতো খানার মধ্যে মাথা গুঁজে থাকি, তার পরেই আমার ব্যাণ্ডেজ বাঁধার কাজ শুরু হয় কিনা।

ও বললে—সে কাজ পরে করলেও চলবে। প্রথম আওয়াজটা শোনবামাত্র সবাই যেমন পালায়, তুমিও তেমনি পালাবে। এবার যেই শুনবে বোমার আওয়াজ অমনি ঐ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বরাবর একছুটে এখানে পালিয়ে আসবে। বুঝতে পারলে? এ কথা নিশ্চয় যেন মনে থাকে, কিছুতে ভুল না হয়।

বার বার করে বলাতে কথাটা আমার মনেই ছিল, তারপর যেদিন আবার বোমা পড়তে শুরু হলো এবং যে যেখানে পারলো ছুটে পালাতে লাগলো, সে দিন আমিও ছুটে গিয়ে একেবারে চীনা সর্দারের বাড়িতে হাজির হলুম। অনেকখানি পথ, ছুটতে ছুটতে হাঁপিয়ে পড়েছিলুম।

সর্দারের বৌ দাওয়ার নিচে দাঁড়িয়ে যেন আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। যেমনি গিয়ে উপস্থিত হয়েছি, অমনি সে আমার হাত দু'খানা সজোরে চেপে ধরলে, দেখলুম তার দুটি হাতই তখন থর্‌থর্‌ ক'রে কাঁপছে।

উত্তেজিত হ'য়ে সে বলে উঠলো—এবার পালাও, পালাও, এখনই তুমি পালাও।

—সে কি? আবার কোথায় পালাবো?

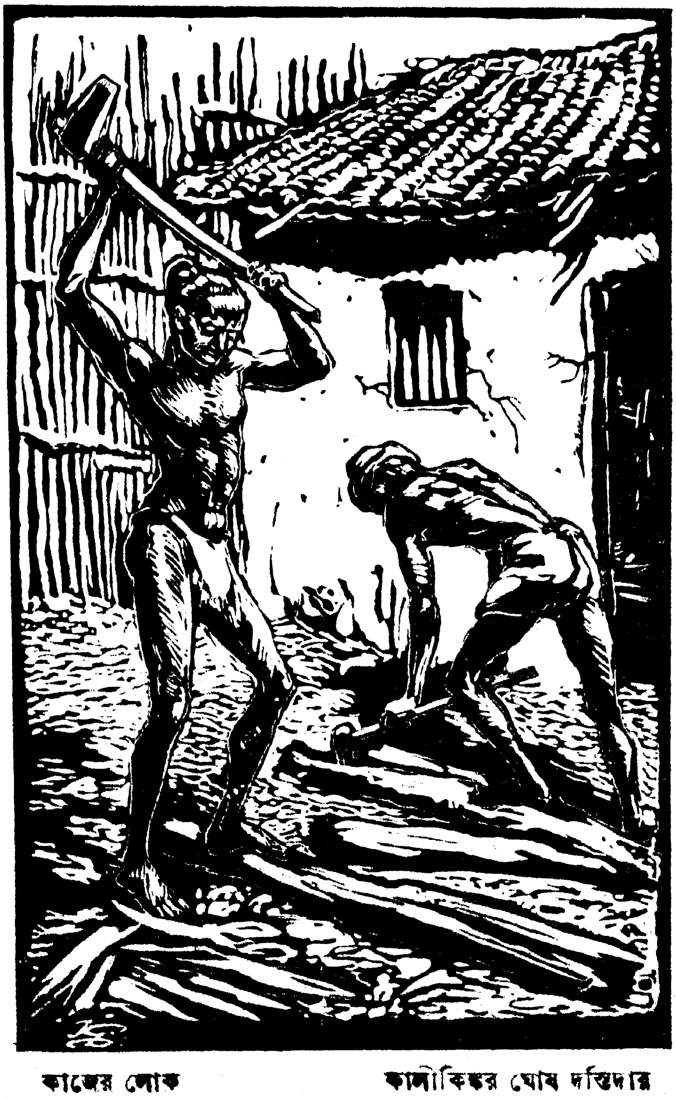
—পালাও তোমার দেশে, তোমার আপনার ঘরে।

—তা কি হয়, আমায় ওরা খুঁজবে, পালাতে গেলেই ধরে ফেলবে।

—কেউ খুঁজবে না, মনে করবে তুমি বোমা লেগে খতম হ'য়ে গেছ। আমরা সেই কথাই এখানে রটিয়ে দেবো।

—কিন্তু আমি রাস্তা চিনি না যে, এখান থেকে বেরোবার কোনো রাস্তাই নেই।

[ইহার পর ৩০৮ পৃষ্ঠায়]



কাজের লোক কালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার

আধুনিক সঙ্গীতের ধারা

[২৯২ পৃষ্ঠার পর]

সন্তুষ্ট ছিলেন না, বিদেশীয় বহু সুরের ব্যবহার করেছেন তিনি। ঐশী-শক্তিকে স্বীকার ক'রে তিনি যেমন কালী-কীর্তন রচনা করেছেন, তার রচনা ও সুর অপার আনন্দ দেয় রসগ্রাহী শ্রোতাকে। নজরুল স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত।

এরপর বহু নবীন গীতিকার চেষ্টা করছেন বাংলা-গানকে আরও সমৃদ্ধশালী করতে, তাঁদের মূল্য কম নয়।

এবার সুরস্রষ্টা এবং গায়কদের পর্যায় প্রাসঙ্গিক হ'য়ে উঠেছে। কথাকে যাঁরা সুর দেন আর যাঁরা সেই গানকে কণ্ঠগুণে মাধুর্য মণ্ডিত করেন তাঁদের অবদান অসামান্য। সুরসাগর হিমাংশুকুমার দত্তের সুর বাংলা-গানে বৈচিত্র্য এনেছে। অপরিসীম তাঁর ছন্দজ্ঞান—ইউরোপীয় ছন্দকে নতুন ছাঁচে ঢেলে নিয়ে বহু সুর রচনা করেছেন তিনি। তাঁর এ দান বাংলাদেশ অসীম শ্রদ্ধায় গ্রহণ করেছে।

কবি এবং গায়ক দিলীপকুমার রায়ের কণ্ঠ-বৈশিষ্ট্য সাধারণ গান-ও সুর মূর্চ্ছনায় অসাধারণত্ব লাভ করে। কীর্তনের আঙ্গিককে সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন তিনি বাংলাগানে আর একথা সত্য যে বাংলা গান গাওয়া যে যুগে অপমানজনক ছিল তাঁর-ই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সে গান কৌলীন্যলাভ করেছিল।

তারপর আরেক বিখ্যাত অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে। ক্লাসিক্যাল রাগ-রাগিণীর ব্যবহার করেছেন তিনি বাংলা গানে। তাঁর সাবলীল কণ্ঠে বাংলা গানে পশ্চিম ভারতীয় ঠুংরী সুর অপরূপ হ'য়ে ফুটল। পরে কীর্তনগানে তিনি নিয়োজিত করেছেন নিজেকে।

কুমার শচীনদেব বর্মনের কণ্ঠমাধুর্য শ্রোতাকে শুধু আকৃষ্টই করে না, হৃদয়ে সুরের ঝঙ্কার তোলে। চমৎকার তাঁর সুর করার পদ্ধতি, অপরূপ তাঁর সঙ্গীত। বাংলাদেশ চিরদিন ঋণী থাকবে তাঁর গানের জন্য শুধু গায়ক বলেই নয়, সুরস্রষ্টা হিসেবেও তাঁর সাফল্য অপরিমেয়। ঠুংরী সুরকে নিজস্ব ক'রে বাংলা গানে ব্যবহার করেছেন সুন্দরভাবে। গ্রাম্যগীতিতে তাঁর তুলনা আছে ব'লে আমরা জানি না। অন্তর দিয়ে বাংলা গানকে ভালবেসেছেন বলে আজ তাঁর এ সাফল্য।

লোকপ্রিয় পঙ্কজকুমার মল্লিকের গাইবার পদ্ধতি অপূর্ব। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে তিনি অতুলনীয়। তাঁর গান রাগীঁশ্রিত সুরে হলে-ও নিজস্বতা-ও যথেষ্ট আছে। গানের প্রত্যেকটি লাইন এমনভাবে গাইবেন তিনি যে তার অন্তর্নিহিত ভাব আপনা থেকেই শ্রোতার নিকট ধরা দেয়। তিনি বলেন, "বাংলাগানে সুরের আড়ম্বরের প্রয়োজন হয় না, তাতে লিরিক বর্ণের অঙ্গহানি হয়। বাংলা গান "ভাবে'র গানের 'আবৃত্তি'।" আবৃত্তির মত গান তাঁর কণ্ঠে সত্যি অপরূপ।

সহস্রধারায় প্রবহমান আধুনিক সঙ্গীতের কথা একটিমাত্র নিবন্ধে সম্পূর্ণ করা অসম্ভব। বাংলা গান আজ আপন শক্তিতে গরীয়ান। বিচিত্রমুখী সুরের মাধুর্যে এর সৃষ্টি সার্থক।*

* অজয় ভট্টাচার্যের "Modern Bengali Songs" নামক ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে সুধময় ভট্টাচার্য কর্তৃক সারাংশ গৃহীত।

প্রাচীন যুগে নারী

[২৯১ পৃষ্ঠার পর]

প্রমাণ এই যে, গৃহ্যসূত্রাদির মতে, কন্যাদানের পরে বিবাহাচারাদিতে কন্যার পিতার আর স্থান নাই—পরের ক্রিয়াকলাপ, মন্ত্রোচ্চারণ, আচার পরিপালন প্রভৃতি স্বয়ং বর কন্যারই কার্য। অবস্থা বিশেষে, কন্যা পিতা বা পুরোহিতের সাহায্য ব্যতিরেকেও স্বয়ং বিবাহিতা হইতে পারিতেন। এ স্থলে মন্ত্রোচ্চারণে অধিকার থাকিলে, সেই সকল মন্ত্রের অর্থ উপলব্ধি করিবার মত শক্তিও থাকা প্রয়োজন। সুতরাং মন্ত্রোচ্চারণকারিণী কন্যা যে বয়ঃপ্রাপ্তা ও শিক্ষিতা ছিলেন—তাহা সহজেই অনুমেয়। পরবর্তী যুগের যে বহুদিন পর্যন্ত যৌবন বিবাহই ছিল সমাজের প্রচলিত রীতি, তাহার অসংখ্য প্রমাণ আমরা পাই মহাকাব্য, নাটক, কাব্যাদি প্রভৃতিতে। বর নির্বাচনেও কুমারীর পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। অথর্ববেদের মতে, কন্যা স্বয়ংই স্বামী নির্বাচিত করেন—মাতাপিতা তাঁহাকে সাহায্য করেন মাত্র; ঋগ্বেদের মতে মনের মত স্বামী নির্বাচনে অকৃতকার্যা হইলে, কনিষ্ঠা ভগ্নী জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর পূর্বেও বিবাহ করিতে পারেন, অকৃতকার্যা হইলে চির কুমারীও থাকিতে পারেন। অথর্ববেদের প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী দমনার্থ [illegible] প্রেম বিষয়ে কৃতকার্যতা লাভের জন্য [illegible] মন্ত্রতন্ত্র ও পারিবারিক আচারাদির [illegible] আছে। কেবল কন্যা নহে, কন্যার মাতাপিতাও কন্যার প্রেমবিষয়ক সুখের জন্য কয়েকটি ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করেন। পরবর্তী যুগের স্বয়ম্বর প্রথা এবং সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতির স্বয়ং স্বামী নির্বাচনের কথা সকলেই অবগত আছেন। কামসূত্রের মতেও, ব্রাহ্ম (যে স্থলে মাতা পিতা স্বেচ্ছায় কন্যা দান করেন), দৈব (যে স্থলে বর যাজ্ঞিক পুরোহিত), আর্ষ (যে স্থলে বর কন্যাকে গোদান করেন), প্রাজাপত্য (যে স্থলে বরই বিবাহের প্রস্তাব করেন), গান্ধর্ব (বর ও কন্যার দ্বারা স্থিরীকৃত প্রেমমূলক বিবাহ), আসুর (যে স্থলে কন্যার পিতা বরের নিকট অর্থ গ্রহণ করেন), পৈশাচ (আত্মীয়-বান্ধবের অনুপস্থিতিতে বলপূর্বক কন্যা হরণ) ও রাক্ষস (আত্মীয়-বান্ধবকে হত্যাপূর্বক কন্যাহরণ)—এই অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে গান্ধর্ব বিবাহই সর্বশ্রেষ্ঠ।

ফসল

সমরজিৎ বসু

আশা আলো জাগে,
বুকে ভাষা, মুখে হাসি ফুটাই
জোনাকি আলোর মালা গাঁথি
সারা জীবনটাই,
সাহসী শপথে জনতা মিছিলে ডাক পাঠাই।
চলে পথ দেখি আলো যেন
কারা কঠিন হাতে
সারা দুনিয়ার ইমারৎ গড়ি জীবন পাতে,
আনে অনাগত জগতে স্বর্ণ সূর্যরথে :
শোষণের চাপে যাহাদের মেরুদণ্ড বাঁকা
ঘোলাটে দুনিয়া কুয়াশা মলিন
আঁধারে ঢাকা,
নয়া ফসলের মাঝে কোক
তার জাকিই আঁকা।
আমাদের গণতন্ত্র যাহারা সেকেলে চাপে
রক্তপাতে জমানো নীতির তোলায় মাপে,
তাদের জন্যে থাকুক ভ্রূকুটি তাকানো পাপে।
বাসা বাঁধি তাই বুকের গহন তলেতে আজ
এ জমিতে মোরা শেষ করে যাব আগামীকাজ,
এর পরে মনে অনাগত মাঠের অরূপ সাজ।
আশা বাজেনে আলো পরিণত দেখিতে পাই
মিলিত কণ্ঠে দিগ্‌দিগন্তে দাবী জানাই,
স্নেহ ভালবাসা আলো যত পারি
হাসি বিলাই।

বৈদিক যুগে বিবাহ নারীর পক্ষে বাধ্যতামূলক বলিয়া পরিগণিত করা হইত না। অবিবাহিতা নারীদের বৈদিক যুগে "অমাজু" বলিয়া অভিহিত করা হইত। সেই সময়ে অবিবাহিত নারীদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না বলিয়াই এই বিশেষ শব্দটির প্রয়োজন হইয়াছিল। নারী স্বেচ্ছাক্রমে বিবাহিত জীবনই বরণ করিতে পারিতেন অথবা চিরকুমারী থাকিয়া ব্রহ্মবাদিনী ও আচার্যা হইতে পারিতেন। মহাভারতের যুগেও সুলভা প্রভৃতির দৃষ্টান্ত ইহাই প্রমাণ করে।

প্রাচীন যুগে কন্যার সামাজিক অবস্থা কিরূপ উন্নত ছিল এবং শিক্ষায় দীক্ষায়, সর্বক্ষেত্রে তিনি কিরূপ পুরুষের সহিত সমান অধিকার দাবী করিতেন, তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। স্ত্রী ও মাতারও যে সমাজে সমান সম্মানীয় স্থান ছিল, তাহা এই প্রবন্ধে প্রদর্শন করার স্থান নাই। প্রাচীন ঋষি ও সমাজপতিগণ মহানির্বাণতন্ত্রের সেই মহা বাক্য "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন, কারণ, তাঁহারা জানিতেন যে, নরনারী লইয়াই সমাজ,—নারীর উন্নতি না হইলে সমাজের অবনতিও অবশ্যম্ভাবী। বর্তমান স্বাধীন প্রগতির যুগে আমরা যেন সেই মহাঋষিদের মহাবাক্য শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ ও পালন করি।

মাছ-ধরা

[৩০০ পৃষ্ঠার পর]

াড়িয়া দিল।—কহিল, ডাকুন—কে কাথায় আছে—ডেকে তুলুন।

ডাক্তার অপেক্ষাকৃত কৃশ হইলেও গাড়ির ঠরে প্রবেশ করিতে রীতিমত পরিশ্রম হল। অসন্তোষজনিত মিশ্র কোলাহলে 'ড়ি কল কল করিয়া উঠিল। এঞ্জিনের কান শব্দই শোনা গেল না।

উঃ-হ—গেছু-গেছু—খুন করে ফেলেছে বা! কোথাকার ভূত ডাকাতরা—

সরে—সরে। ইস্ মেয়েলোকটির পা ড়িয়ে দিয়েছেন বাবু!

কিন্তু পা তুলিয়া হামাগুড়ি রাখিবে জায়গাটুকুও যে নাই। থামের মত মোটা উঁচু করিয়া বিষন্ন মুখে মোটা বন্ধু লন, কতক্ষণ ত্রিশঙ্কুর মত থাকবো বাবা, মের থেকে পাখানা খসে যাবে যে।

একজন বলিষ্ঠ চেহারার গ্রাম্য লোক খা উঠিল, আসবে বাবে। মেয়েছেলের লিয়ে দিয়ে আবার ভদ্রপালি। তোম রে লোকের যা কিছু করেছে।

বন্ধু কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে কহিল, অ-হরকালী দা—তোদের কাঁধে হাত দু'খানা রাখতে ভাই। নইলে—

ন্ধুর কাতর কণ্ঠের সঙ্গে আহত মেয়েটির ন্দনি ও ক্রুদ্ধ যাত্রীদের মৃদু গালির শব্দ শা গেল। যাক কিন্তু হাতুর মত হয়া আছে।

ও ড্রাইভার ভাই—চালাও না।

না—চালাব না।—আপনারা না নামলে ছতেই চালাবো না।

গ্রাম্য লোকটিও রুখিয়া উঠিল, যাব বাপু—টেরেন ফেল হলি তোমাদের আর আস্ত রাখবো না।—

তাহার পিছনে অসন্তুষ্ট যাত্রীদের পাওয়া গেল।

ডাক্তার—তুমিই রাগ করে মাটি করলে—ঠেলা সামলাও।

'ডাক্তার—' শুনিবামাত্র মন্ত্রবৎ কার্য্য। ভিড়ের মধ্য হইতে কে একজন ল, আমার মস্ত পা পাক দিচ্ছে—বাবু—একটু ওষুধ যদি দেন—

মেয়েলোকটিরও পায়ে ঘা লেগেছে—স্টেশনে পৌঁছে সবাইকে ওষুধ দেব ভাই। চালাতে বল।

ক্তার অনুরোধ ড্রাইভার ঠেলিতে না। গাড়ি ছুটিল।

কন্তু ওদিকের গাড়ি তখন ষ্টেশন পিয়াছে। এক মিনিটও দেরিতে নাই—বা হাতে নাই।

কি উল্টাইয়া দুঃখে ক্ষোভে ডাক্তার বলিল, এইটুকু[illegible] নাই—তার আবার পাকুয়ামিটি।

বসে বন্ধু [illegible] ডাক্তার—ট্রেণ সেই বিকেলে।

একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক সম্মুখে আসিয়া করজোড়ে কহিল, আপনারা যদি দয়া করে এই গরীবের বাড়ি পায়ের ধুলো দেন—

না, না,—একটি বেলা জলটল খেয়েই আমরা—

না—সে হবে না, আপনারা না এলে আমি আন্তরিক দুঃখিত হব।

বন্ধু শিবকালীর কানে কানে কহিল, ডাক্তারকে রাজী কর—নইলে আমাদের দুঃখু কেউ ঠেকাতে পারবে না।

ডাক্তার ভদ্রলোকের অনুরোধ ঠেলিতে পারিল না।

আড়ম্বরহীন বাড়ি, আম কাঁঠাল গাছের ছায়া ভরা, পরিষ্কার উঠান—এক-পাশে গোয়ালঘর—তুলসীমঞ্চ—ঢেঁকিশালা ইত্যাদি। বাড়ির পিছনে একটি ছোট পুকুরের চারিধারে অনেকগুলি নারিকেল গাছ। একটি কিশোরী মেয়ে ও কিশোর একটি ছেলেতে মিলিয়া অতিথি সৎকারে মনোনিবেশ করিল।

ভদ্রলোক কহিলেন, গৃহিণীহীন সংসার—মেয়েটি সব গুছিয়ে গাছিয়ে করে।

অপরাহ্ণে ট্রেণে চাপিয়া দু'ধারে প্রসারিত মাঠের পানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া ডাক্তার বলিল, চমৎকার।

বন্ধু প্রতিধ্বনি তুলিল, চমৎকার। ভদ্রলোকের পুকুরটি ছোট হ'লেও কিছু মাছ আছে মনে হ'লো। আসচে হপ্তায় আসবে ডাক্তার?

ডাক্তার হাসিয়া বলিল, আসতে দোষ কি। বড়লোকের বাড়ির মত খাওয়াদাওয়ার আড়ম্বর হয়তো [illegible] করতে পারবেন না—

হরকালী বলিল, আর সুন্দর—সুন্দর—পাত্তা পারতেই বা দোষ কি।

শিবকালী মুচকি হাসিয়া বলিল, মেয়েটি বেশ স্বাস্থ্যবতী। যার স্বাস্থ্য আছে সেই সুন্দর।

এই পরিহাসে ডাক্তার রাগ করিল না—হাসিমুখে বলিল, সে কথা আমিও ভাবছি। পণ-প্রথাকে ঘৃণা করি বলেই এতদিন বিয়ের মত দিইনি। নিজেকে বাজারের পণ্য করতে কোন্ আত্মমর্য্যাদাবান ভদ্রলোকের না ঘৃণা হয়। বিয়ে যদি করতেই হয়—অমনি গরীব গৃহস্থ ঘরের একটি মেয়ে—

সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—জয়—সুধীর ডাক্তারের জয়।

লাশিওর মায়া

[৩০৪ পৃষ্ঠার পর]

—আছে রাস্তা, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি; ঐ যে সরু রাস্তাটা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের গা দিয়ে চলে গেছে, দেখলে মনে হয় যেন বেশি দূরে যাবার তেমন কোনো রাস্তাই নয়, মাঝে মাঝে বনে জঙ্গলে ঢাকাও পড়েছে, এটি ধরেই তুমি বরাবর একেবারে সোজা চলে যাও। কোনো ভয় নেই, নির্ভয়ে চলে যাবে। ঐ রাস্তায় যাকেই দেখতে পাবে, জানবে সে আমাদের বন্ধু। ওখানে আমাদের আপন লোক ছাড়া আর কোনো লোকই থাকবার উপায় নেই। একজন লোক তোমার জন্যে ঐ রাস্তায় অপেক্ষা ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, সে তোমার দেশে যাবার ব্যবস্থা ক'রে দেবে। আমাদের বাড়িতে সে প্রায়ই আসতো, যার সঙ্গে আলাপ করতে তুমি চেষ্টা করতে, সে তোমাদেরই দলের লোক। বুঝতে পেরেছো? এবার চলে যাও।

—তোমার কথা ঠিক বুঝিতে পারছি না। দাঁড়াও, আগে অল্প একটু জিরিয়ে নিই, ছুটতে ছুটতে বড্ডো হাঁপিয়ে গেছি। কেমন ক'রে যে—

—এক লহমাও আর সময় নেই, এখনই চলে যাও, এখনও বোমা পড়ার শব্দ হচ্ছে, এই তো পালাবার সময়।

এমন ব্যস্ত হ'য়ে সে কথাগুলো বললে যে, আর এক মুহূর্তও দেরী করা উচিত নয় ভেবে তখনই আমি ছুটলুম। খানিক দূর গিয়ে যখন একবার পিছনে ফিরে চাইলুম, দেখলুম সে কোমরে হাত দিয়ে তখনও দাওয়ার উপর দাঁড়িয়ে আছে, মনে হলো যেন চোখে কাপড় দিয়ে কাঁদছে। থমকে আমি দাঁড়িয়ে গেলুম। সে অমনি জোরে জোরে হাত নেড়ে বারবার বলতে লাগলো—চলে যাও, চলে যাও, চলে যাও।
